নতুন
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ / নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮২

ক. সি. পালের ছাতা
সবাই ব্যবহার করেন

কারণ, এই ছাতাগুলি ওয়াটার-প্রুফ কাপড়ে এবং এর প্রতিটি অংশ
বাজারের সেরা জিনিস দিয়ে তৈরী যার ফলে এগুলি দীর্ঘদিন টেঁকে।

সর্বত্র পাওয়া যায়

কে. সি. পাল এণ্ড সন্স
৮২ ৩ত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট • কলিকাতা-৭ • ফোন: ৩৩-৭১০৪

CENTRAL LIBRARY

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে

ছেলেবেলার দিন—হেসে খেলে চিরকাল কেটে যাবার দিন! এই সময়ে ওকে ইনক্রিমিন সিরাপ নিয়মিত দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে আলাদা তো পুরের কথা, কিছু খেতে দিয়ে যেন খুশি হয়ে যাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে। ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর অ্যামাইনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার ছোটোকে আজকের পুরো পুরি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

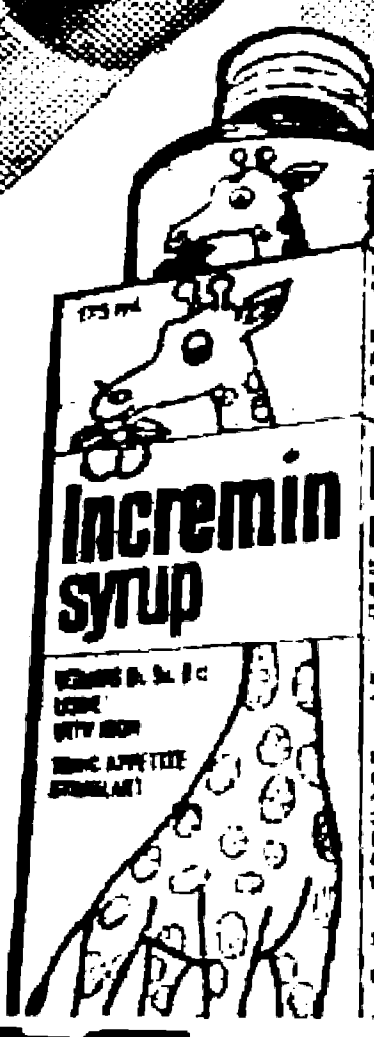

ইনক্রিমিন* টনিক

ড্রপস্—১ গ্লাস জলে
সিরাপ—১

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত

ডাক্তারের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম—

গ্লাক্সো ল্যাবরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের একটি নিবেদন *আমেরিকার গ্লাক্সো ল্যাবরেটরিজ কোম্পানীর

॥ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় গ্রন্থনিচয় ॥

উপন্যাস

বিকল্পবট—[illegible]
আকাশের নীচে নাই—[illegible]
সংঘর্ষের আলো—[illegible]
অরুণা মজুমদার—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অমাবস্যা—[illegible]
অনাবৃষ্টি—নরেন্দ্রনাথ
নাচন—নিমাই ভট্টাচার্য
যে বাড়ি দর্পণে—মণিপদ্মা দেবী
উনি নন্দন স্বাক্ষী—বিমল মিত্র
অবরোধ—অমরেন্দ্র বসু
বন্ধুবাগিনী—[illegible]
কাননের ধূপে—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অভিধান

বৈজ্ঞানিক অভিধান—[illegible]

ভ্রমণ

মেসার্স তীর্থ তীরে—শঙ্কু মহারাজ

রচনাবলী

কিরীটী অমনিবাস ৩য় ও ৬ষ্ঠ—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
তারাশঙ্কর রচনাবলী—৮ম ও ৯ম
সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী—১, ২,
বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী ২য়—

আত্মজীবনীমূলক

বনস্পতির জৈবিক রহস্য—প্রবোধকুমার সান্যাল
ললাট অঙ্কের রাত্রি—অবধূত

ছোটদের

ছেলেদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—[illegible]

নাটক

[illegible] অব জাউট—প্র-না-বি

বিবিধ

বেঙ্গল ফ্লাইটিং—প্রবোধ চক্রবর্তী
[illegible]—প্রমথনাথ বিশী
১৯৭৩ কেমন যাবে—[illegible]

পুনর্মুদ্রণ

শিবেন্দ্র [illegible]
ঠাকুরমার ঝুলি—[illegible]
নকশীকাঁথার—[illegible]
[illegible]—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
উল্কা [illegible]
আমাদীপাটির—নিমাই মিত্র
সাবী [illegible]—[illegible]
উপাধ্যায়ের ঘটি—[illegible]
স্থানীয় সংবাদ—[illegible]
শ্রেষ্ঠ রম্য রচনা—সৈঃ মুজতবা আলী
শ্রেষ্ঠগল্প—বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র [illegible]—প্রমথনাথ বিশী
পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—অতিন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত
নিঃসঙ্গ পথিক—[illegible]
নিরুদ্দেশের নিত্যে [illegible]—[illegible]
নিরালাপ্রহর—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী
কবি—[illegible]
[illegible]—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
গল্পেশ্বর—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বিভূতি রচনাবলী ১২শ—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপারেশন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তারাশঙ্কর রচনাবলী

দশম খণ্ড প্রকাশিত হল

মূল্য ১০ টাকা

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

২০

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ডেট কাপড় ধোয়ার কেক

অন্যান্য সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়—তা সে জল যে ধরণেরই হোক।

ডেট কাপড় ধোয়ার পাউডার

সাদা কিম্বা নীল — যে কোন সাইজে পাবেন। কেবল ডেট গোলা জলে চুবান আর ধুয়ে নিন। এটি আপনার হাতের পক্ষেও নিরাপদ।

এন-ডেট

দাগ ধুয়ে পরিষ্কার করার এনজাইমযুক্ত পাউডার, সক্রিয় কিন্তু ক্ষতিকর নয়।

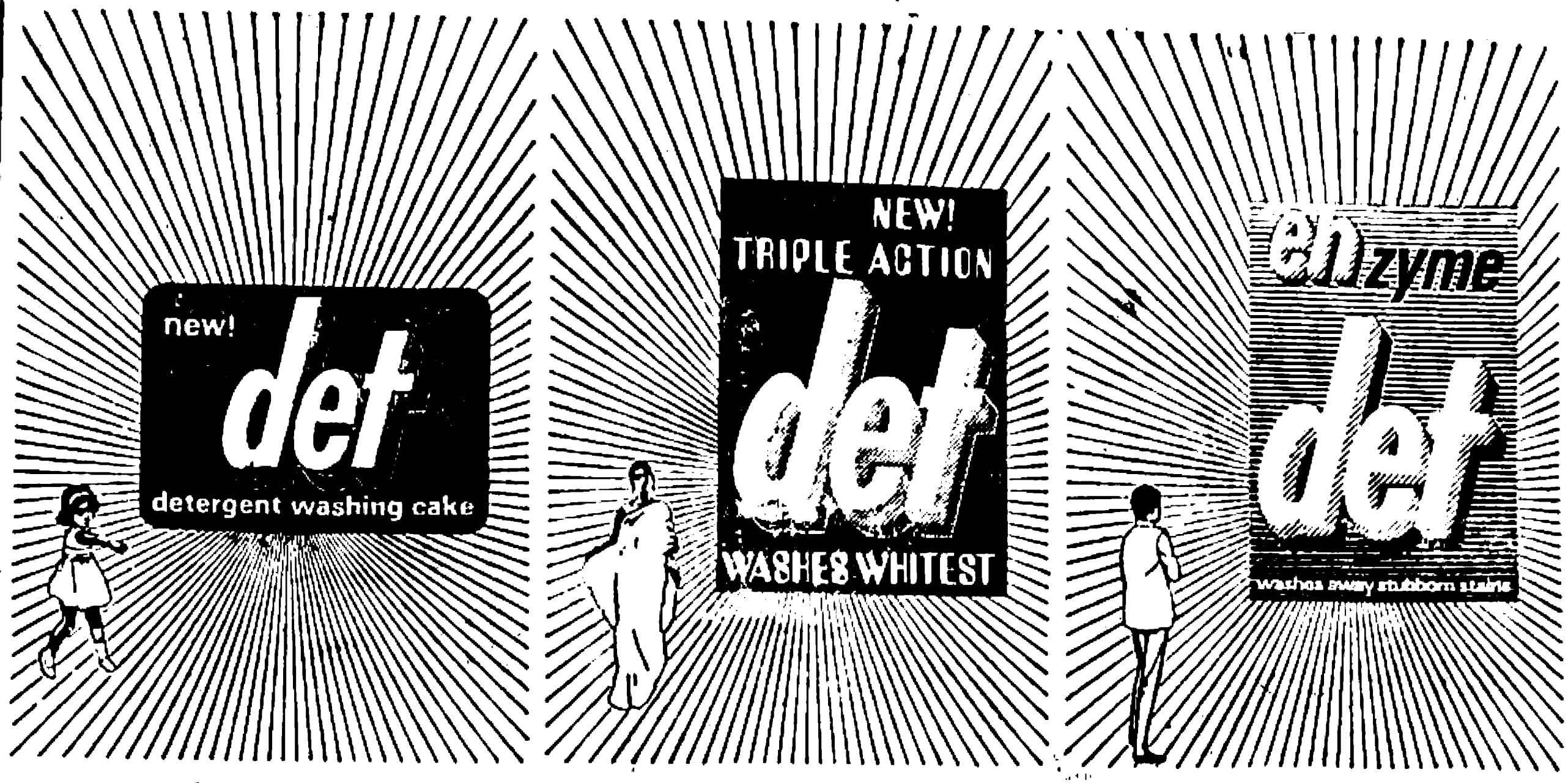

না কখনও ছিল,না থাকবে—এমন শুভ্রতা ডেটের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Shilpi HPMA SA/14 Ben

P 24,066

শঙ্কু মহারাজ-এর সার্থকতম ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে

তিন পর্বে সম্পূর্ণ

ব্রজপর্ব ১০৲ * বনপর্ব ১০৲ * মহাবনপর্ব ১২৲

বৃন্দাবন যে আজও মধুময় তারই মধুময় কাহিনীর পরিচয় পাবেন এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে, সেই সাথে জানতে পারবেন বৃন্দাবনের ইতিহাস, মন্দির ও ঘাটের কথা; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং ষড়গোস্বামিদের কথা; বৈষ্ণবধর্মের কথা; শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মতালম্বীর কাহিনী — আর লেখকের মানসীর কথা...অসংখ্য আলোকচিত্র শোভিত।

ভারত - সোভিয়েত মৈত্রীর পটভূমিকায় **সুভাষ সমাজদারের** একখানি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়-বঙ্গের এক বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী তিন জাহাজ বোঝাই মালপাই সিল্কের পসরা নিয়ে সুদূর রাশিয়ার পাড়ি দিয়েছিল। সেই দুঃসাহসী বাঙালী যুবকের রোমাঞ্চকর বাণিজ্য যাত্রার মধ্য দিয়ে লেখক সেই সময়কার ভারতীয় ও রুশ ব্যাপারীদের ব্যবসায়িক লেন-দেন, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার—পরস্পরের মৈত্রী বন্ধনের কথা ও কাহিনী মূর্ত করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে এ-জাতীয় উপন্যাস আজও লিখিত হয়নি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭৲

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

ভালোবেসেছিলাম ৮৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১২৲

কল্‌হন-এর নতুন উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ৮৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুনতম উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮৲

প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কাশীকান্ত মৈত্রের শ্রেষ্ঠতম রচনা

রাজনীতি।বিপ্লবকূটনীতি ২০৲

শৈলেশ দে'র

আমি সুভাষ বলছি

তৃতীয় খণ্ড ২০৲

প্রথম খণ্ড (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ২০·০০ * দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) ২০·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৯

বেদুইন

মাটির ক্ষুধা ৮৲
বিচিত্র এই কলকাতা ৯৲
আমায় বাঁচতে দাও ৮৲
বিক্ষোভ বিদ্রোহ বিপ্লব ৮৲
রাজনীতির পটভূমি ৮৲
কলকাতার ইতিকথা ৬৲
মোজাম্বিক ৬৲

রমাদাস হালদার

প্রজ্ঞ পরেশ ২৲

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

রাগ বিহঙ্গী ৩৲

কৃষানু বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তিপদ রাজগুরু

রং নিয়ে খেলা ৭৲
কয়লার রং কালো ৮৲
মাটির পুতুল ৬৲
পথের পানে চেয়ে ৫৲
তমসা ৬৲
মুক্ত ত্রিবেণী ৫৲
চেনামুখ ৩৲

মনোরঞ্জন ঘোষ

অশ্বিনীকুমার কাঞ্জিলাল ৫৲

সচ্চিদানন্দ সরকার

বাংলার ঘরোয়া ছেলে ৫৲

সুনীলকুমার ঘোষ

নেপথ্য নায়িকা ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভদ্রবরণী ৩৲

নিগূঢ়ানন্দ

দেব দেউলে ভারত ৫৲
দুর্ধর্ষ তাতার ৬৲
হারেম থেকে বলছি ৭৲
ছন্দহারা ৩৲

সনৎ মিত্র

কমরেড লেনিন ৭৲
হো চি মিন ৫৲

নটরাজন

মুখোপাধ্যায় ৬৲
বলরাম ৫৲

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোরেন্দার দপ্তর ৫৲
বহুদর্শী
বহুদর্শীর নকশা ৬৲

নিশাচর

রহস্যের জন্মকাল ৫৲

শৈলেশ দে

যেন ভুলে না যাই ৮৲
রক্তের অক্ষরে ৯৲
বিনয় বাদল দীনেশ ৭৲
ক্ষমা নেই ৫৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প ১০৲
রায়গড়ের রোমান্স ৩৲
আহুতি ১-৫০

অমরেন্দ্র দাস

রেকর্দার খাতা ৫৲
আলোর ফাগুন ৩-৫০

চিরঞ্জীব সেন

পাকিস্তান রহস্য ৬৲
হাইজ্যাক ৮৲

আশাপূর্ণা দেবী

শিকলি কাটা পাখি ৫৲
হারানো খাতা ১২৲

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডকারণ্যের অন্ধকারে ১০৲
দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন ৮৲
পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা (যন্ত্রস্থ)

সনৎকুমার মিত্রের

পশ্চিমবঙ্গের
লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা ১০৲

ভোলানাথ ঘোষের

সাহিত্য চারণা ১০৲

সিতিকণ্ঠ ঘোষের

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ৪৲

ছোটদের উপযোগী কয়েকটি বই :—

বিশ্ব বিশ্বাস

বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৪৲
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ৫৲
বিক্ষুব্ধ বাঙলা ৬৲
স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত ৭-
জয় বাংলার অভিযুদ্ধ ৫৲
বিপ্লবী বাঘা যতীন ৬৲
বিপ্লবী মাস্টার সেন ৫-
বিপ্লবী সূর্য সেন ৫৲
বীর সাভারকর ও বীরাঙ্গনা ৫৲
শহীদ ভগৎ সিং ৭৲
আজাদ শহীদ বতীন দাস ৪৲
অভয়ের বিবেকানন্দ ৪৲
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ২-১০
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ৪৲
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ৩৲
সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ২-৫০
অগ্নিবীণার্য রত্ন ২-৫০
বিপ্লবযোগী বিদ্যাসাগর ২-৫০
আচার্য পি সি রায় ২-৫০
ভক্তকবি বিজেন্দ্রলাল ৩৲
বিদ্রোহী কবি নজরুল ২-৫০
জগদীশচন্দ্র বসু ৩৲
অভয়ের রামপ্রসাদ ২-৫০
মার্কসিজম ফোর্থ ৩৲

বাঙালীর পরিচয় ২৲
আইনের গল্পগাছ ৩৲
ছোটদের মহাভারত ৪৲

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথার রাজপুরী ২-৫০
বোম্বাইয়ের বলে ৩-
মহাত্মাজী মহাত্মা গান্ধী ৪৲
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২-৫০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২-৫০
বালবিহারী বসু ৩৲
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৪৲
মাইকেল মধুসূদন ৩৲
রাজা রামমোহন ৩-

মহামায়া দেবী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৩৲
রাণী রাসমণি ৪৲
জগন্মাতা সারদামণি ৩৲
স্বামী বিবেকানন্দ ৩-
ভগিনী নিবেদিতা ৩৲

সুজিতকুমার নাগ

মানবহরণী ইন্দিরা ৫৲
সখা রাজার অভিযান ৩৲
রূপকথার আসর ২-৫০

সুনীল সরকার

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ৪৲
জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র কথা ৪৲
কেমন করে আবিষ্কার হলো ৪৲
বিজ্ঞানের গল্প শোন ৪৲

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

জাতীর জনক গান্ধী ২-৫০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের চিরন্তন কাহিনী ৫৲
বিদেশের চিরন্তন কাহিনী ৪৲

বিমল দত্ত

ভূত কুইক ছোট ৩৲
যদু পাগলা ঠাকুর ২-৫০
সাত রাজ্যের রূপকথা ৩৲
রাজাদেশালের গল্প ২-৫০
পেন্সিলনো ১-৫০
ঘুঘু ও ঘোড়ার রূপকথা ৩৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কথাসরিৎ সাগরের গল্প ২-৫০
ভারতের রূপকথা ৩৲

চিত্তরঞ্জন সুর

গান সজ্জা অভিনয় ৩-
বিজন স্কীলে রবিনসন ৩-

অশোক সী

রূপকথার ডালি ৪৲
গল্প মেলা ৩৲

অশোক গুহ

আরবের রূপকথা ৪৲
মহাভারতের রূপকথা ২-৫০
বেনহুর ৩৲

মোহিতকুমার লাহিড়ী

আলকার রহস্য ৩-

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পের জাদুকরী ৩৲
রূপকুমারের রূপকথা ৩৲

সেক্সপীয়রের ত্রিশখানি নাটকের উপন্যাসরূপ
অনুবাদক—অশোক গুহ
প্রতি খণ্ডের দাম তিন টাকা মাত্র

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫।১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। ফোন : ৩৫-১৮৩৯

UNIVERSITY

অমৃত

"ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইণ্ডিয়ান পিউপল পেপার সোসাইটি লিমিটেড"

Friday, 9th May, 1975 শুক্রবার ২৫ বৈশাখ ১৩৮২

নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৮২

সূচীপত্র

গল্প-সংকলন

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১০	রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে নারী : অবরোধ থেকে মুক্তি	ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী
১৫	কথামালার দেশ	অন্নদাশঙ্কর রায়
১৭	শেষ পর্যন্ত	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
২০	বাংলা ভূতের গল্প	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
২৬	বেবা বোর্ডিং	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০	ক্যাপাসাস ম্যাকি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩	গরীবের ছেলে	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৩৪	ফোন	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৩৬	পতনু পুরাণ	শ্রীবনফুল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নতুন রহস্য উপন্যাস

সোনার পিতল মূর্তি ৭.

ডুবন্ধর গোয়েন্দা কর্ণেল বাংলা রহস্য সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাঁচমহল ওরা রহস্যময় বাগানবাড়ির দুই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কাহিনীর শুরু। মুক্তিলাভ বিভীষিকায় রোমাঞ্চকর।

জাহানুল হক্কারের মুগোপযোগী নতুন উপন্যাস

রাত পাখির ডাক ১২-০০

নটরাজনের সাড়াজাগানো গ্রন্থ

ওরা সেই পুলিশ ১২-০০

ডঃ বটব্যালের অসাধারণ ভ্রমণ উপন্যাস

হিমালয়ের তিন সঙ্গী ১২-০০

সন্তোষকুমার ঘোষের নতুন আদিবাসী উপন্যাস

গুড্ বাই ক্যালিফোর্নিয়া ২০.

কালকূটের আলোড়নসৃষ্টিকারী উপন্যাস

জ্যোৎস্নায় বাঘবন্দী খেলা ৫.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

অভিমান ৫.

শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

দুজন একাকী ৫.

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন কিশোর উপন্যাস

পাতালে লম্বুদা ৩

সুনীলকুমার নাগের নতুন উপন্যাস

দ্রৌপদী প্রেম ৬.

নিশাচরের রহস্যোপন্যাস

রক্তঝরা সন্ধ্যায় ৫.

তিন তাসের খেলা ৫.

মরণ মহল ৫.

নিখিলচন্দ্র সরকারের উপন্যাস

স্বপ্নের ধ্বনি ৮.

এ সি সরকারের বড় কাহিনী

আনন্দ চুমকী ৮.

বাসুদেব বসুর নতুন উপন্যাস

রাজগৃহে রাজা নেই ৪.

কাঁদিছে মৃত্তিকা ৫.

বহুরূপীর অসাধারণ রস-রচনা

লৌকিকতার পরিবর্তে ৭.

একটি শিশিরবিন্দু ৪.

শঙ্কর রায়চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

স্বর্ণ মৃগয়া ৪.

বনে বনান্তরে ৭.

সুবোধ ঘোষের নতুন উপন্যাস

পুনর্নবা ৪.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

এই জীবন ৫.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

বন হরিণী ৩.

পূর্ণ প্রকাশন : ৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯ ।। ফোন : ৩৪-১০৯২

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

LO S/70

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৩৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের ইন্ডিয়ান স্যাম্বের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য

॥ প্রকাশিত হল ॥

জলছবি ১২৲

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত।
আর্টপেপার সূচী :—সত্যজিৎ রায়, জয়াসন্ধ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীপান্থ রাজগুরু, হরপ্রসাদ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, চিরঞ্জীব সেন ও চিরঞ্জীব প্রভৃতি।

প্রকাশিত হয়েছে প্রথম খণ্ড

টলস্টয়

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রর ভূমিকা-সম্বলিত ৫ খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ১৩ টাকা

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত

উৎসব ৭৲

১৲ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক হোন। ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে। ছোটদের জন্য আকর্ষণীয় পূজা বার্ষিকী। গ্রাহকদের জন্য ৬৲ টাকা।

নববর্ষ সংখ্যা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৯	লগ্ন	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৪০	রাবণের সিঁড়ি	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
৪৮	ডেটেকটিভ সাহেবের গল্প	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৫২	মৃত্যুর আগে	বুদ্ধদেব বসু
৫৫	রাণী দর্শন	শ্রীমনোজ বসু
৬০	পরাভূত মৃত্যু	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬০	খোসামোদের ফল	শ্রীসুধাকান্ত ঘোষ
৬৭	টাক্কো	শ্রীবিমল মিত্র
৭০	অতঃপর	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৭৪	মাধা	শ্রীসতীকান্ত গুহ
৮১	এক আধুনিক চোরের গল্প	শ্রীশরদিন্দু গোস্বামী
৮৪	আহ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৮৭	মই	শ্রীলীলা মজুমদার
৯০	যৌবন	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

শেক্‌স্‌পীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহ

৪ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা। রেকসিনে বাঁধাই ও সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া। বহু আর্ট পেপার ছবিসহ। একমাত্র আমরাই আক্ষরিক অনুবাদ ও সমগ্র সনেটসহ দিচ্ছি। অনুবাদক মণ্ডলী : ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, উৎপল দত্ত, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নাকুমার সেন, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মৈত্র, মণীন্দ্র রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুবোধ ঘোষাল, নির্মল সেন, বীরেন্দ্র চৌধুরী, বীরেন দত্ত প্রভৃতি।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

গিরিশ সমগ্র রচনাবলী

সম্পাদনায় : দেবনারায়ণ গুপ্ত, রেকসিনে বাঁধাই ও জ্যাকেটে মোড়া, বহু দুষ্প্রাপ্য আর্ট পেপার ছবিসহ। ৫ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

মোপাসাঁ রচনাবলী

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রর ভূমিকা সম্বলিত ৩ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা। রেকসিনে বাঁধাই।

গোর্কি রচনাবলী ৪ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা

চেকভ রচনাবলী ৪ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা

দস্তয়েভস্কি রচনাবলী ৫ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

এমিল জোলা রচনাবলী ৩ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা

চার্লস ডিকেন্স রচনাবলী ৪ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা

আলেকজান্ডার ডুমা রচনাবলী ৪ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

ওয়াল্টার স্কট রচনাবলী ৩ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

বঙ্গদর্শন ৮ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

দেশ বিদেশের ভৌতিক গল্প ২ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা

অর্থনীতি অভিধান সম্পাদনায়—সমরেশ মৈত্র। দাম—২০৲ টাকা

রাজনারায়ণ বসু হেমচন্দ্র রচনাবলী ১ খণ্ডের দাম ১৫৲ টাকা

ভূদেব রচনাবলী ২ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

দামোদর রচনাবলী ৩ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

অক্ষয়দত্ত রচনাবলী ২ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা ২ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহক হলে ৫৲ টাকা, গ্রাহক হবার ও মণি অর্ডার পাঠানোর মূল্য কেন্দ্র।

জ্যোতি প্রকাশন ।। ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা-৯

জিজ্ঞাসা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের

ত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রকাশন অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী

আগামী ২৪-৫-৭৫ শনিবার শ্রীশিক্ষায়তন হলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবে।

Dr. Subodh Chandra Sengupta

Portraits and Memories

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে

শ্রীদীপ ভাগচি

আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা

শ্রীঅমলকুমার গুপ্তগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র (২য় খণ্ড)

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীনিখিলযোতি ঘোষ

রাগ-তালের মৌল বিষয় ও নূতন সঙ্গীত লিপি পদ্ধতি

প্রদর্শনীর স্থান : কলিকাতা তথ্যকেন্দ্র

২৫শে মে রবিবার থেকে ৮ই জুন রবিবার পর্যন্ত বেলা ২টা থেকে রাত্রি ৮টা

সাম্প্রতিক প্রকাশন

রাজনারায়ণ বসু : জীবন ও সাহিত্য

ডক্টর শ্রীমতী অশ্রু কোলে

রাজনারায়ণ বসু ঊনবিংশ শতকের একজন বিখ্যাত মানুষ। দেশের তৎকালীন প্রগতিবাদী ধারাগুলির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড়; সর্বোপরি আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রোদ্যোক্তা-উদ্গাতা ছিলেন এই ঋষিকল্প পুরুষ। বাংলা সাহিত্যে এই সর্বজনের স্থান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থখানি প্রতিকৃতি চিত্র, পাণ্ডুলিপি-চিঠি ও লোকচিত্র পরিচয়ে ভূষিত। মূল্য : ৩০-০০

বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে

ডক্টর অশোককুমার দে

একজন বৈজ্ঞানিক জাসলে কিছু সমোগ করেন না, পরন্তু যা আছে তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন। সাহিত্য-সমালোচক সাহিত্য-এলাকায় সেই বৈজ্ঞানিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ শ্রীঅশোককুমার দে বৈজ্ঞানিক-নিষ্ঠায় বাংলা উপন্যাসের বিশেষরূপ নির্ণয়ের সেই চেষ্টাই করেছেন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তথ্যের সাহায্যে তাঁর এই পরিশ্রম। বাংলা গদ্যে সামাজিক মানুষের চিত্র বাংলা কথা গদ্যের বিকাশ পরিস্থিতি বিভিন্ন অধ্যায় লেখকের বহু পঠন ও অনুসন্ধিৎসা তথ্য বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি পরিচয় বহন করেছে। মূল্য : ১২-০০

চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয়

ডক্টর নীলরতন সেন

সমগ্র চর্যাগীতির বিশদ আলোচনা ও তাহাদের পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ। মূল্য : ২০-০০

বাংলা বিদ্যা-চর্চা

ডক্টর নীলরতন সেন সম্পাদিত

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলা অনার্স ; এম এ এবং গবেষণা স্তরে বাংলা ভাষা সাহিত্যের পঠন-পাঠন সম্পর্কিত আলোচনা চক্রের বিস্তৃত বিবরণী এবং পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মূল্য : ২০-০০

সর্বোদয় আন্দোলনের ইতিহাস

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বোদয় আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস এই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হল। মূল্য : ২০-০০

কান্ত-গীতলিপি ১ম / ২য় খণ্ড

শ্রীদিলীপকুমার রায় / শ্রীশচীন্দ্রকুমার দাস

কান্তকবির আপন ধরনের সঙ্গীত স্বরলিপি। মূল্য : ৫-০০ / ৭-০০

জিজ্ঞাসা ॥ প্রকাশন বিভাগ : ১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বিক্রয় কেন্দ্র : ১০০এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলি-২৯ ॥ ৩৩ কলেজ রো, কলি-৯

CENTRAL LIBRARY

নববর্ষ সংখ্যা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৯৫	অর্থশাস্ত্রের ফল ও মূল	শ্রীসত্যব্রত রায়
১০০	ব্লাড প্রেসার	সতীনাথ ভাদুড়ী
১০১	কৌতুক ও কৌতূহল	শ্রীশচীন্দ্রকুমার মিত্র
১২১	সংহার	শ্রীতারাশঙ্কর নন্দী
১২৬	ঘনশ্যাম বসন্তের নয়না চৌধুরীকে একটি চিঠি	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
১২৯	খাঁচার জন্যে	শ্রীপ্রফুল্ল রায়
১৩০	পাহাড়ের রক্ত	শ্রীসুমথনাথ ঘোষ
১৩৭	সৌমিত্র চিন্তিত	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
১৫২	হেস্টিংস ও তার প্রশাসনী	শ্রীবিনু মুখোপাধ্যায়
১৫৮	বন্দরপার বৃত্তে	শ্রীঈশান বসু
১৬১	সেই নকশাগুলো	শ্রীশ্রীকান্ত বসু
১৬৯	শীতল সেনালী হাতে	সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ
১৬৮	তোমার জন্য (উপন্যাস)	শ্রীবিনুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীসুবোধ সামন্ত

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

মপাসাঁ রচনাবলী

আঞ্চলিক অনুবাদ। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হলে প্রতি খণ্ড দশ টাকায় পাওয়া যাবে। অনুবাদক : প্রথম খণ্ড —সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। দ্বিতীয় খণ্ড—লেখা সেনগুপ্ত

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হবে জুন মাসে

শেক্সপীয়ার রচনাবলী

আঞ্চলিক অনুবাদ। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হলে প্রতি খণ্ড দশ টাকায় পাওয়া যাবে। অনুবাদক : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

কৌটিল্য গুপ্তের সাড়া জাগানো উপন্যাস

ব্যুরোক্র্যাসী ১০. **ফুল ও স্ফুলিঙ্গ** ৭.

প্রশাসনের এক চাঞ্চল্যকর ফটোগ্রাফ বাংলা সাহিত্যে বিরল।

একটি বেকার জীবনের দুর্দান্ত কাহিনী।

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৬১৮০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র উপন্যাস

সূর্যমহল ৮.
রিপু সংহার ৬.
দরবারী ৫.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কালরাত্রি ১০.
অভিনেত্রী ৬.
মহানগরী ৫.

প্রেম ও প্রয়োজন

উত্তমপুরুষ-এর উপন্যাস

জীবনের খেলাঘর ১০.

অবধূত

জরাসন্ধ বিচিত্রা ৮.

সুনীল চক্রবর্তীর উপন্যাস

আমি মন্ত্রী হব ১০.

অবধূত-এর উপন্যাস

বিশ্বাসের বিষ ১০.
অনাহত আহুতি ৬.
স্বামী ঘাতিনী ৫.

আশা বসুর উপন্যাস

দূরবগাহিনী ৫.

অন্নদাশঙ্কর উপন্যাস

কামনার রঙ ৮.

রোমেইন

মন্ত্রীপতন ৮.

সুবোধকুমার ঘোষ

কাম্বোডিয়া ঝড়ের পথে ১০.

পরেশ সরকার

রূপ-পসারিণী ১২.

কারুশিল্প সামগ্রী ব্যবহার আপনার
রুচি ও কৃষ্টির কৌলীন্যের পরিচায়ক

উৎকর্ষে ও বৈচিত্রে পশ্চিমবাংলার কারুশিল্প অপ্রতিদ্বন্দ্বী

প্রাপ্তিস্থান

ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যান্ডিক্র্যাফট কো-অপারেটিভ
সোসাইটি লিমিটেড

৮বি, আর, এন, মুখার্জী রোড, কলকাতা-১

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

নববর্ষ ১৩৮২

রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মদিনে অমৃত তার জীবনের আরেকটি বছরে পূর্ণ করল। পনেরো বছর একটি সাহিত্যপত্রের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আজ আমরা গতেপ্ট গৌরবের সঙ্গেই বিগত দিনগুলোর দিকে তাকাতে পারি। এ-যাত্রায় সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারাও আমাদের বন্ধুবাকে সঙ্গত বলেই সম্মতি জানাবেন বলে আশা করি। বাংলা সাহিত্যের মহৎ উত্তরাধিকার নিয়েই অমৃতের পথ চলা এটাই অমৃতের পথ চলাতে দিয়েছে শক্তি ও সম্বল। বাঙালী সংস্কৃতিপ্রেম জাতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগ অপরিসীম। জীবন ও জগতের প্রতি তার কৌতূহল ও আগ্রহ সে কালেই অন্তহীন এবং চিরসজীব।

অমৃত তার প্রচেষ্টাকে বাঙালী পাঠকের সেই সংস্কারগত কৌতূহল ও আকর্ষণ মেটাতেই নিয়োজিত করেছে। এই প্রয়াসে আমরা বাংলার শ্রেষ্ঠ ও সেরা সাহিত্যিক শিল্পীদের স্নেহ-প্রীতি ও সহযোগিতা লাভ করে এসেছি। তাঁদের মধ্যে অনেকে আর আমাদের মধ্যে নেই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁদের রচনায় অমৃত এক সময়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা আজ লোকান্তরিত। অবশ্য জীবিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা লাভে ধন্য হয়েছি আমরা। তাঁদের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য এই উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। অমৃত অনেক তরুণ সাহিত্যিক পাঠকসমাজের সঙ্গে পরিচিত করেছে। প্রবীণ ও নবীনের সৃষ্টিতে নতুন কালের প্রশ্ন যেমন ফুটেছে, তেমনি উজ্জ্বল হয়েছে সাহিত্যের চিরকালীন অনুবেদন।

শিল্প-সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞান, চলচ্চিত্র রীড়া প্রভৃতি সকল বিভাগেই অমৃত যুগের জিজ্ঞাসা ও আলস্যকে রূপায়িত করার প্রয়াসী। তরুণদের জন্য অমৃত তার পৃষ্ঠা অবারিত করে রেখেছে। সংসাহিত্য সমগ্রজীবনবোধ ও সজনধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য অমৃত গত চৌদ্দ বৎসর ধরে যে চেষ্টা চালিয়ে এসেছে আগামী দিনগুলোতেও তা থাকবে চির অম্লান। এই সংকল্প সবিনম্র পেশ করেই আমরা নববর্ষে সকলের কাছে আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। পাঠকে বেদনার পুণ্যাদিন সকলের জীবনে আনুক শান্তি সমৃদ্ধি ও সার্থকতা।

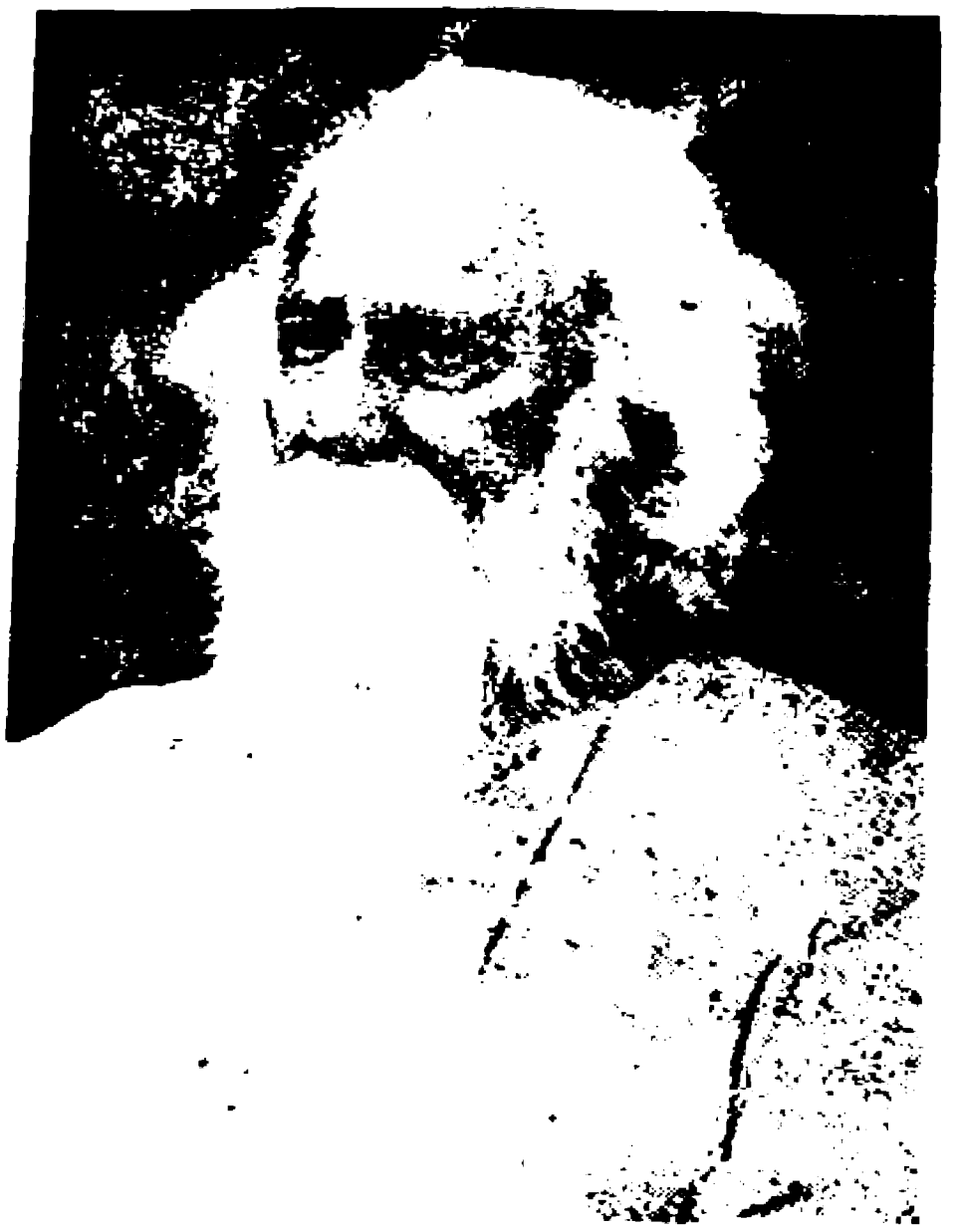

রবীন্দ্রনাথের গল্প শুচ্ছে নারী : অবরোধ থেকে মুক্তি

গল্পগুচ্ছে বিচিত্র মানুষের ভিড়। বিরহিনী মেয়ে, অত্যাচারিত স্ত্রী, গ্রামে প্রক্ষিপ্ত যুবক, পণ্ডিত অকর্মণ্য স্বামী, অত্যাচারী স্বামী, গুপ্তধনান্বেষী লম্পট, প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন শিশু ও কিশোর নিরুদ্ধ যৌবনোন্মেষে শিহরিত কিশোরী, বিধবা প্রেমিকা ও বেনামী নায়ক, দেহবিচ্ছিন্ন সতীত্বে উদ্দীপ্ত নারী, উদাসীন স্বামী ও সর্বলোভী স্ত্রী, খোকামী ইত্যাদি থেকে গৃহত্যাগী স্ত্রী ও পতিতা পর্যন্ত কত অজস্র স্বভাবের মানুষের ভিড়। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ধারাবাহিক সূত্র পাই নারী ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের মধ্যে—তার অবরোধের যন্ত্রণা, মুক্তিচেষ্টা, বিদ্রোহ ও বলিষ্ঠ আত্মবিকাশের মধ্যে। এবং সমাজের পরিবর্তিত পটভূমি এই ব্যক্তিত্বের সূত্র ধরে যতটা স্পষ্ট হয়েছে, অন্য কোনো সূত্রে এই ধারাবাহিকতা ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিছু কিছু গল্প অবলম্বন করে এই ব্যক্তিবিকাশের ধারাবাহিকতাকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

যখন রবীন্দ্রনাথের গল্পকাহিনীতে গল্পরস স্পষ্ট হয়নি তখনকার লেখা 'ঘাটের কথা' 'রাজপথের কথা'তেও বিরহিনী নারীর প্রাণ অন্তর্বেদনার কথা আছে। এই গল্প দুটি লেখার বছর সাতেক বাদে ছোট গল্পের ফর্মকে হাতের মুঠোয় এনে 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যখন গল্প লিখতে শুরু করলেন তখন প্রথম গল্প লিখলেন 'দেনাপাওনা'। এই গল্পে দেখা গেল, বিয়ের পণের টাকা পুরো উসুল হলো না বলে বরপক্ষ, বিশেষতঃ বরের মা, বধূর ওপর অত্যাচার শুরু করলেন। সে অত্যাচারে নিরীহ মেয়ে নিরুপমার মৃত্যু হলো। তার সৎকারে চন্দন কাঠের চিতায় ঘি ঢালা হলো ঘটা করে শ্রাদ্ধ হলো, এবং তার-পরেই বিশ হাজার টাকার পণ হাতে হাতে আদায় করে দ্বিতীয়বার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের বিয়ে দেওয়া হলো। হিতবাদী পর্যায়েরই শেষ গল্প জয়প্রসাদের কীর্তিতে দেখা গেল, পণ্ডিত অথচ নির্বোধ ও অকর্মণ্য স্বামীর প্রতি অসীম ভক্তিবশতঃ স্বামীর নিঃস্ব সংসারে সন্তান প্রসবের সমস্ত অপরাধ মাথায় নিয়ে ধাত্রীরূপী মৃত্যুর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে।

'সাধনা'-পর্বে আবার যখন রবীন্দ্রনাথ নতুন করে গল্প লিখতে শুরু করলেন তখন নারীর প্রতি তাঁর সমবেদনা প্রকাশ পেল 'সুভা' গল্পে। এর কিছু আগে লেখা 'কঙ্কাল' গল্পেও দেখেছি, বালবিধবা ক্রমশঃ তরুণী হয়েছে। তার মনে প্রেমের অনুভূতি এসেছে নিঃশব্দ চরণে। সে প্রেমের অম-র্যাদাও হয়েছে। তারপর নিঃশব্দ করুণ আত্মঘাতী মৃত্যুতে সব শেষ হয়েছে। ত্যাগ গল্পেও দেখেছি, কুসুমে তার চিরজীবনের সাধ মিটিয়ে স্বামীর দুটি পা আবেগে চেপে ধরে চরণচুম্বন করে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে জীবনের ঊর্ধ্বে তার স্বামীর দীপ্ত পৌরুষকে জাগিয়েছে। সুভা গল্পে বোবা মেয়ে সুভার অন্তর্বেদনাকে অস্বীকার করে স্বামী একটি ভাষাবিলাসী জীবকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ নীরব সুভার অবাক কান্না শুনতে পায় নি।

কিন্তু 'মহামায়া' গল্পে ধীরে ধীরে নারীর সহনশক্তি ও নিরুপায় আত্মসমর্পণের ভাব কেটে গিয়ে মাতৃত্ব ফুটে উঠলো। লেখকের ভাষায় মহামায়া 'নবতের পুরোক্ত মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি নিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং নির্ভীক।' এই নির্ভীক নীরব মহিমাতেই মহামায়া শেষ পর্যন্ত উদাত্ত বজ্রের মতো রাজীবের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে হরসুন্দরীও নীরব সহনশক্তিতে স্বামীকে তার অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দ প্রতিবাদে। কারণ সে বুঝেছিল, কেবল হটবাজার পলিসমলা তরিতরকারির বস্তা লইয়াই (সে) সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়ন কক্ষের পার্শ্বে এক গোপন রহস্যরহস্যময় ভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি শুদ্ধে বালিকা একেবারে রাজরাজে-শ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে।'

'শাস্তি' গল্পে অন্য সমাজের ছবি। নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী সমাজের নারী চন্দরা স্বামীর সেবায় ঋণের বোঝা বহন করে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড অভিমানে ফাঁসির মুহূর্তে স্বামীকে দেখতে চায়নি, দেখতে চেয়েছে নিজের মাকে। চন্দরা মধ্যবিত্ত নারীর মতো সংস্কারের অবরোধে জীবন কাটায় নি বটে, কিন্তু স্বামীর প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল। তাই অন্যের অপরাধের বোঝা ঘাড়ে পড়তেই সে প্রচণ্ড অভিমানে কেটে পড়েছে এবং কিছুটা কৈশোরসুলভ চাপল্যবশতঃ প্রচণ্ড একগুঁয়েমিকে আঁকড়ে ধরে স্বামীকে ছোড় মাকে দেখতে চেয়েছে। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পেও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখি। কর্তব্যনিষ্ঠ কঠোর হৃদয় নিঃসন্তান নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-বিধবা ঘৃণা জীবের প্রতি করুণার মন্দিরের পবিত্রতা ও জনমত উপেক্ষা করে তেজস্বিতা দেখিয়েছে। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে নারী-ব্যক্তির অনেকটাই অবরুদ্ধ। কিছু আগে লেখা গল্পেও এই অবরুদ্ধ ব্যক্তিত্বকে পেয়েছি। মুগ্ধ স্বামীসর্বস্ব স্ত্রী কিশো-রাসিনীর প্রতি আত্মগর্বিত স্বামী অনাথ-বন্ধু নির্মম ব্যবহার করেছে।

এরপরেই 'বিচারক' গল্প। বোধ হয় পতিতা বিষয়ক এই প্রথম বাংলা গল্প। এ-গল্পে দেখি, যে-পুরুষ নারীকে পতিতা-বৃত্তির পথে ঠেলে দিয়েছেন ঘটনাচক্রে সেই পুরুষই নারীর অধীশ্বর হয়ে বিচারকের আসন থেকে পতিতাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছেন। প্রকৃত অপরাধী-বিচারক মোহিতচন্দ্র যখন ক্ষীরোদাকে নিজেরই দেওয়া চব্বিশ বছর আগেকার আংটি হাতে নিয়ে ক্ষীরোদাকে চিনতে চেষ্টা করেছেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা-রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণশতদলীরেখার উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পতিতা এখানে কলঙ্কপর পুরুষের চোখে যেভাবে ধরা হয়েছে ও পরে দেখা দিয়েছে, পতিতার নিজের দিক থেকে এই আত্ম-অবমাননার জন্য তেমনটা প্রতিবাদ দেখা যায় নি। বোধ হয়, উনিশ শতকের শেষ দশকের

উজ্জ্বল মজুমদার

দেখা এই প্রথম পতিতা কাহিনীতে সে আশাও করা যায় না। কিন্তু হৃতসর্বস্ব পতিতা যে নিজেরই জীবিকার বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে নূতন প্রণয়ীকে দেখেই ফণা তুলে বাঘিনীর মতো গর্জন করে তেড়ে গেছে—সেই বাঘিনী গর্জনটুকুও সে-যুগের পক্ষে যথেষ্ট। এই গল্পেরই কিছু পরে লেখা 'দিদি'র মধ্যে দেখি, স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে স্বামীর ছোট ভাইকে বাঁচিয়ে স্বামীর অজস্র নির্যাতন অনায়াসে উপেক্ষা করে স্ত্রী শশী দিদিটিকে সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দিয়েছে।

শশীর মতোই এই রকম অহংহীন মর্মবেদনার মনভোলন গল্পের গিরিবালা মূর্খ স্বামীর অনাদরের জন্যে স্বামীর সংসার ত্যাগ করে স্বামীর অভিনেত্রী-লিপ্সাকে চরিতার্থ করার আশায় অভিনেত্রী হতে চেয়েছে। এতকাল অন্যত্র সংসারের মধ্যেই অবরোধের যন্ত্রণা ও প্রতিবাদ দেখেছি। এবার দেখছি, নারী সংসার ছেড়েছে স্বামীর মনের মতো হবার জন্যে। গিরিবালা অভিনেত্রী-জীবনে চলে এসেছে।

২

এইসব গল্পই প্রকাশিত হচ্ছিল 'সাধনা' পত্রিকায়। সাধনা চার বছর চলে উঠে গেল। এই পর্বের গল্পে নারী ঘরছাড়া হলো বটে কিন্তু সে ঘর-ভাঙা ঘর-বাঁধবার আশা-তেই। এরপর রবীন্দ্রনাথ যখন 'ভারতী' সম্পাদনভার নিলেন তখন ভারতীতে তাঁর প্রথম গল্প বেরুল 'ঘাটের কথা'। এ গল্পেও নারী-বিদ্রোহ নেই। নারী-মহিমা আছে। পুরুষের তুলনায় সে মহিমা যে বড় তাই দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে, প্রেমের নিষ্ঠুর পরিণতিতে নারীর ট্র্যাজেডি পুরুষের ট্র্যাজেডির চেয়ে অনেক বেশি গভীর। 'দৃষ্টি-দান' গল্পেও নারীর পতিনিষ্ঠা দেখানো হয়েছে। কিন্তু পতিনিষ্ঠার জন্যেই এখানে নারী যেন স্বামীর চরিত্রের স্পষ্ট সমালোচক ও বিচারক। তাই স্বামী যখন বলছে, 'তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব, বকিব, রাগ করিব সোহাগ করিব গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী চাই।'—তখন স্ত্রী উত্তর দিয়েছে : 'আমি বিশ্বাস করিতে চাই নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই: তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে স্নেহের দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না—আমাকে সর্ব বিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।' ভারতীর পর এবার 'প্রদীপে' লেখা শুরু। সন্দিগ্ধচিত্ত স্বামীর হাতে পড়ে স্বল্পভাষী দৃঢ়চিত্ত স্ত্রী গৌরী উদ্ধার গল্পে স্বামীর সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গুরুদেবের কাছে গেছে। কিন্তু গুরুদেবের অধঃপতন দেখে গৌরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সদাশ্রান্ত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছে। গৌরী-চরিত্রের জীবন্ত আলেখ্য মহামায়ার চরিত্র ও পরে লেখা চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনীর চরিত্র-দীপ্তিকে ম্লান করিয়ে দেয়।

এরপরে বিশে শতাব্দীর সূচনায় অসমাঞ্জস প্রেমের বিখ্যাত গল্প 'নষ্টনীড়'। দেওর-ভাজের সম্পর্ক নিয়ে এই কাহিনী সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীর ঔদাসীন্যে স্ত্রী যে তার দেওরকে অবলম্বন করেই তার নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছে এটি স্বামীর কাছে যখন পরিষ্কার হয়েছে তখন সে নতুন করে দেওরের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ভূপতির নিঃসঙ্গ ট্র্যাজেডির বেদনা গভীর ঠিকই, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই উভয়ের দারুণ নিঃসঙ্গতার নীরব বোধ দুটি ব্যক্তিকেই সমান গভীরতায় নিয়ে গেছে। হৃদয়ের ক্ষতি স্বামী-স্ত্রীকে সমপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। কেউ কারুর বন্ধ দরজায় ঘা দিতে চায় নি।

'নষ্টনীড়ের' পর বঙ্গদর্শন ও ভারতীতে কিছু গল্প বেরিয়েছে, কিন্তু নারী-ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোনো প্রকাশ সে-সব গল্পে দেখা যায় নি। কিন্তু 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু গল্প লিখলেন যার মূলে সুর হলো পুরুষের মূঢ়তা বা অন্ধতার ফলে নারীর নিষ্ঠা ও ভালোবাসার অমর্যাদা কিংবা প্রত্যাখ্যান। এই পর্বের হৈমন্তী, বোষ্টমী ও স্ত্রীর পত্র—তিনটি গল্পেই হৈমন্তী, বোষ্টমী এবং মৃণাল প্রতিকূলতার তিনটি মূর্তি। বেনোপাওনার নিরুপমাই যেন নীরব আত্মত্যাগের মুখোশটি খুলে রেখে পুরুষের কাপুরুষতাকে আকাশের মতো বিস্তৃত উদার মনটি নিয়ে প্রচণ্ড ধিক্কারে দিয়েছে। বোষ্টমী হলেছে, পৃথিবীতে দুটি মানুষ তাকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলো, ছেলে আর স্বামী। মিথ্যা গুরুবোধ তাকে টানে নি। ছেলে আর স্বামীর ভালোবাসাই তার নারায়ণ। সেই নারায়ণ মিথ্যা সইতে পারে নি। ছেলে বোষ্টমীকে ছেড়েছে, বোষ্টমী স্বামীকে ছেড়েছে—মিথ্যাকে ছেড়ে সত্যকে পাবার জন্যে। স্ত্রীর পত্রের মৃণাল লাঞ্ছিত বিন্দুকে আশ্রয় দিয়ে সংসারের নির্মম অত্যাচার সয়েছে। ওই আশ্রিতার ভালোবাসাই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন সেই আশ্রিতা যেদিন আত্মঘাতি হলো সেই দিনই নিঃস্বার্থ ভালবাসার দায়ে সে সংসারের বন্ধন ছেড়ে গেল। কিছু আগে পড়া ইবসেন কিংবা শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার বহু আগে থেকেই তো তাঁর গল্পে নারীর অবরোধের যন্ত্রণা ও মুক্তি চেষ্টা যে রূপ নিচ্ছিল তা আমরা দেখে আসছি। এরপরেও 'অপরিচিতা' বা 'পয়লা নম্বরের' মতো গল্পে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে। বোঝা গেছে, পুরুষের অবমাননার যোগ্য উত্তর নারী দিতে পারে। বোঝা গেছে, পয়লা নম্বরের নায়কের মতো একমনে জোবেয়ার, টলস্টয় টুর্গেনিভের গল্পের নির্বিঘ্ন প্রেমের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক সময়েই সেই নির্বিঘ্ন প্রেমের জালেক টুনেই স্বকীয়া স্ত্রী পরকীয়া হয়ে যায়।

* তিন সঙ্গীত গল্পগুলি গল্পগুচ্ছের শেষ পর্যায়ে। ইতিমধ্যে আমাদের সাহিত্যে নারীর রূপ পালটে গেছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা এই পর্বের গল্পগুলিতে পুরুষের বন্ধু, সমালোচক, প্রেরিকা। পণ্ডিত প্রবর, পুরুষকে ঠাট্টা করে তাদের জীবনীর রসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভালোবাসার সকাম-নিষ্কাম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এডুকেশন নিয়ে তর্ক করে। গ্রন্থকীটের তপস্যা ভাঙিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। —সোজা কথায়, নারীর আত্ম-মাহাত্ম্য পুরুষে হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছে। এই স্বীকৃতির চরম প্রকাশ ল্যাবরেটরি গল্পের সোহিনীর মধ্যে। সোহিনী বুঝিয়ে দিয়েছে, মৈত্রের সতীত্ব শিক্ষা-সংস্কার সাপেক্ষ। সতীত্বের অভাবে দৈহিক শুচিতা যে হারিয়েছে সে শুধু মনের জোরেই স্বামী বা ভালোবাসার পাত্রের ওপর নিষ্ঠা রেখে সতীত্বের উঁচু আদর্শ বজায় রাখতে পারে। সোহিনী ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, প্রাণ নিতে পারে। স্বামীর ল্যাবরেটরি তার বুকের কলিজা। তার মাঝখানে পাঁঠাকে ছিলিক-দেওয়া ছুরী।

নারীব্যক্তির এখানে সুতীক্ষ্ণ শিখর-চূড়ায়। এরও ওপরে কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এর ওপারে যে অতলস্পর্শী খাদ আছে তা আমাদের সকলেরই জানা।

ডঃ দীপক সে-র পি. এইচ. ডি,
-/ ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণা গ্রন্থ
বঙ্কিম মূল্যায়ন ১০.
যৌন আচরণ নিয়ে যাঁরা উদার মতবাদ প্রচার করেন, তাঁরাও আপন স্ত্রীর বহু পুরুষচারিতা মেনে নিতে পারেন কিনা—এই জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থটি। বঙ্কিম অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠির কথাকার বলে এরকম বই নাই—
উদারপন্থী ৫,
কলকাতা দেখেছি ৩,
ভারতায়ন
৭২।২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলি০

CENTRAL LIBRARY

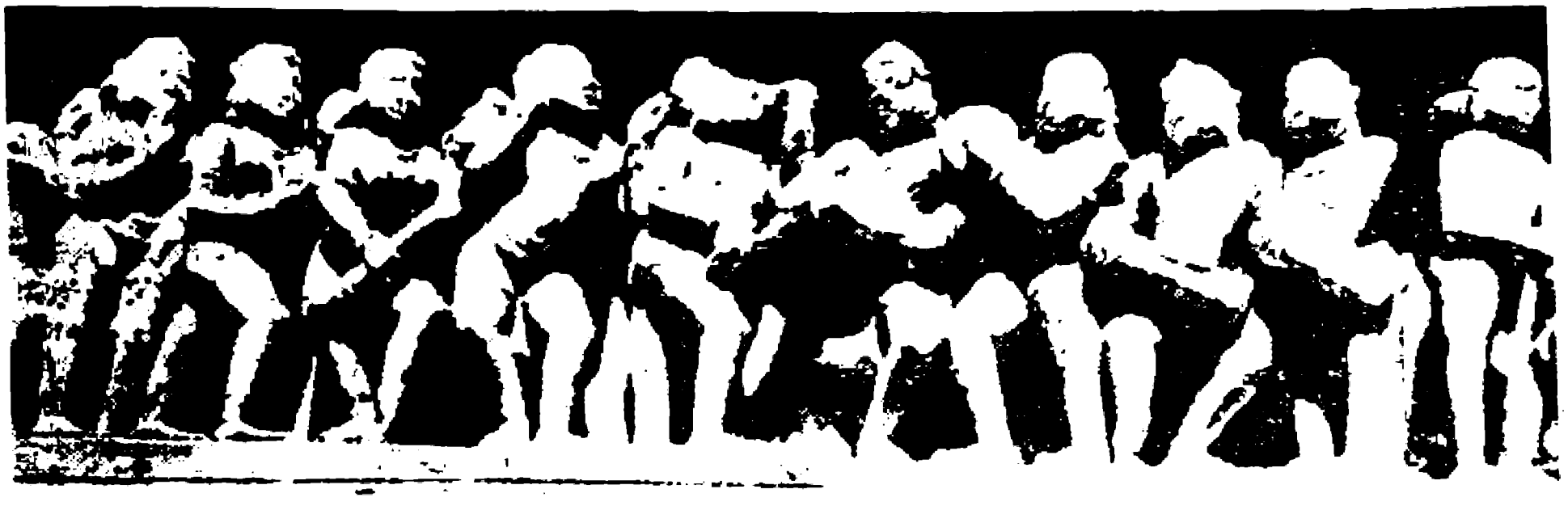

কথামালার দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন বাসী-পিসি বার হবার বয়েস গেছে। মাথার ছেলের চুল গজানো বন্ধ, মাড়ি ফুঁড়ে আক্কেল দাঁতও ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল পাকা দাড়ি-গোঁফ আর হাত-পায়ের নখ কটার উৎকর্ষের উৎসাহ বলে বেরিয়ে পড়ার উৎকণ্ঠার উৎপাত কত মরুন কাঁচি কলের উঁচো খরচা চালিয়েও থামানো গেলো না। তাদের এক কথা— আমরা চলবো বাহিরে? তুমি চলতে না চাও তা আর কি?

দাড়ি যে গোনা যায় না এতগুলো আঙুলিং আঙ্গুল দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে আমায় সুড়সুড়ি দিয়ে বলে—দেখ তোমার পায়ের আগা চুলকোচ্ছে, এবার নিশ্চয় দেশ পর্যটন আছে তোমার কপালে।

আমার বুড়ো আঙুল জোড়া খঞ্জনের কাঁচা ক্ষেতের ঘোড়ার মত চমকে দুবার নড়েই ঠান্ডা। ঠিক যেন চিৎপুরের লুচিলা-বাবার বুড়ো-আংলা দুটো চেলা এক হাঁচে দাঁড়িয়ে সুধার দিকে চেয়ে ঘোরতর তাকিয়ে রয়েছিল, হঠাৎ পায়ে পিঁপড়ে কামড়াতে একটু সজাগ হয়ে আবার ধ্যানস্থ হল।

গোঁফদুটো দুষ্টু ছেলের মত সবাই পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেয় থেকে-থেকে ঘুমে জাগাতে চেয়ে: বলে—জাগো না, শোনো না।

গোঁফ আর দাড়ির শিয়রে বসে আছে খাবা গোড়ে কথামালার ঘুমন্ত সিংহ হাটে নাকের ছেঁদা ফুলিয়ে। ছোট একটা গোঁফ বটা তার নেংটি ইঁদুরের মতো অনাট-কালো সে থেকে থেকে সরু লেজটা সিংহের নাকের মধ্যে চালিয়ে দয়, অমনি সিংহ গর্জন করে এক ঘুংকার ছেড়ে খাবাচ্ছে ছুড়ে। খাবা ঘুমের ঘোরে উঠে এলে দাড়ির টুঁটি চেপে ধরে উলুল বাহাদুর বলে যায়।

অজপাড়ার গেলা থেকে মন-মরুরার পাখীটি আনার হারুণ-অল-রসিদ বাহলায় দেওয়া—বাখারী নয় শাঁখারীর সরু সরু কাটি দিয়ে গড়া পুরনো কলের একটা খাঁচায় বসে বসে সারা দিন দরোজার কাঁকে চোঁচ ছলে আর বলে—

ওগো ভাই
খাঁচা খোলো যাই।
বহুত দিন না দেখি দুনিয়া
দুনিয়ার হাওয়া দিয়া
ঠান্ডা করি মন দিয়া গো।

পাখী নিশ্চয় ছিল মধুমালার দেশের বাসিন্দা—সেই যেখানে ছিল সপ্ত-মর্মর পক্ষিরাজ হুদকে বন্ধ রাজপুত্তুরের মা আর ধাইমা। এক একদিন ভোরে উঠে তখন পাখীটাকে দুয়োরের খিল খুলে বলে—যা-বেরিয়ে যা এইবেলা, কেউ কোথাও নেই।

পাখী খোলা দুয়োরের চৌকাঠে বসে দুবার ডানা ঝেড়ে উড়ি-উড়ি করে যেমন থেকে মালতী ফুলের লতায় ছিরে মৌমাছি হয়—ঠিক সেই সময় কাক ডাকে—না না না! আমি ভয় পাই, মন করে বন্ধ করি দরজা।

এই অবস্থায় তখন কাটছে দিন-রাত—বন্ধ খাঁচায় বন্ধ অন্ধ অন্ধের কারু নয়ন জল—নিজের দেশে যাওয়া ফুরিয়ে গেছে পরের দেশের টিকিট কাটবার ইচ্ছেও নেই পয়সাও নেই। পদ্মপুকুরে মনসাই পাগলী গাইয়েন কেবলী কলে-বলে আয়ে-হায়ে জন্মুখন্ত তোমাদের অনুরোধে ভাঙা পলায়—বেলা যায় না, বেলা যায় না বয় না কেন জানুল বেলা।

হঠাৎ এসে হাজির কহবতী কথামালার সপ্তো ছেলায় ধাবা। ছোলকালে ছোন ছেলে তাদের দুজনার সপ্তো দেখা তা মনেই নেই। তারাও চেষ্টা করে ঠিক করতে পারলে না যে পদ্মপুকুর ইটালিতে না পুরুলিয়ায়, না মণিপুর না মগধায় না এই ছোড়াদাঁকোর পাঁচ ছোড়ে অলাপ হয় প্রথম আমাদের। কবি সমস্তটুকু মনে পড়ল। এক রোজ চার ঘড়ি বাকি রাত থাকতে। সেই সময় কজনে দেখা-দেখি শুনা পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন ঠাহার করে ঝিলে-গঙ্গা এনে দুজনকে খেতে দিয়ে বল্লেম—তবে এবার কোথা থেকে আগমন?

ছেলাম বাবা বল্লেন—আমি হরেই ছেলাম।

কহবতী বল্লেন—আমি সরস্বতীতে ডুব দিয়ে কথামালার দেশটা একবার ঘুরে এলাম।

আমি বল্লেম—আমি খালি বসে-বসে ভাবছিলাম কোথাকে যাইমু, কাহারে যাইমু কে মোর জানিবে বারতা।

কহবতী বলে উঠল—ময়মনসিংহ গীতি তাহি এক ছত্রে, এ থেকে বোঝায়?

আমি খড়ীর হয়ে বল্লেম—ময়মনসিংহ,

কহবতী ভীষণ কাঁদে পাঁড়িয়ে বল্লে—চমৎকার।

—আরে হাও কোথায় বসো।

কহবতী বল্লে—বাকি এ ছত্রে সংগ্রহ করতে, বলেই সে গেয়ে উঠল।

সময় তো থাকবে না থাকবে না
কথা রবে শুধু কথাই রবে।
ভাল কিম্বা মন্দ যাই জগতে যে যথা রবে
মনুষ্যের কথা মানুষ কথায়,
সুখ দুঃখ তিন সাতে
এত ওতে গাঁথাই রবে।

কথামালাটা ফেলে চলে গেল কহবতী। ছেলেরা বসে জীবে-গঙ্গায় খাল-পাতের ঝোঁপাটা টেনে করে মাথায় দিয়ে সেখান ঠকে চম্পট দিলে। আমি কথামালা নেড়েচেড়ে দেখতে থাকলেম।

বিলাসকরের কথামালার মতো প্রেসে ছাপা বই নয়। হাতের লেখা কপি। পৃথিবীতে যা-কিছু আছে—হরিণ, খরগোশ, ঘোড়া, টুপি, টাই, হরিণ হরিণী ছিলকে, মাছের পেটের মতো ছিপছিপে মাছের আঁশ—এ সবের চেয়ে পাতলা ছিপছিপে কি একরকম কাগজে লেখা কবিতাটা যেন এক এক পাতা করে এপিঠ ওপিঠ করে লেখা নয়ন দিয়ে আঁকা—একেবারে যাকে বলে রীতি অনুযায়ী পুরাতন কথামালা পদ্ধতিকা—সাহিত্য পরিষদে নেই, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতেও নেই, সম্ভবত বিলাসাগরের ঘরেও নেই যা এমন জিনিস সেটি। আর সবচেয়ে মজার কথা—এই কবিতা চশমা নিয়ে পড়া যায় না—বইখানি চোখে ঠেকালেই হল— একটি একটি অক্ষর ফুটফুটে হয়ে এসে সামনে হাজির হয়, কথা বলে, গান গায়, নাচে আবার নেপথ্যে চলেও যায়। আস্ত বাজিয়ে প্রবেশ করে, বন্ধ করে চলে যায়।

সেকালে বিলেত থেকে যখন চলচ্চিত্র বেজনা আমদানি হত তখন এই রকমের সব বই আসতো। এক একটি ছবির পাতা, ওল্ট ও আর সঙ্গে সঙ্গে আর্গিন বাজাই ঘোড়া নাচছে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার তিনখানা খাচ্ছে, কুকুর চুপ করে তাকে বসে বেড়ালকে, বেড়াল লাফিয়ে উঠেছে গাছে, সঙ্গে সঙ্গে বাজছে আর্গিন।

কহবতী কোথা থেকে পেলে এ জিনিস শহরে, তাই ভাবছি। বইখানা পেলে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেমন ঠিক নয়? সেটি হবার যো নেই, সে আমার লোহার সিন্দুকের মধ্যে। একটা পান ছাপিয়ে দিলেম, পড়ে দেখ কতকটা বুঝবে কি জিনিস লুকোনো আছে আমার মরচে-ধরা লোহার সিন্দুকে।

—তারা-বুঁড়ির একতারা নক্তাগীত—
যথা—

এক একসুরে একতারা প্রিং প্রিং প্রিং
ফোটে তিন আর তিন তারা এই নই তিন
বাঁশ পাতায় সিঁকির ডানা শব্দ দেয়
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্
টিম্ টিম্ টিম্
চিন চিন চিন বোল পড়ে
তাল পাতার সেপাই থেকে
ওল তলোয়ার প্রিং প্রিং প্রিং।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে কহবতী সুরে সুরেই অনুবাদ করে দিলে—

সহা, তোতা আপন কাজ!

অমনি চক্ষুর নিমেষে ভীষণ মূর্তিতে এক ঘাড়া। কি বলবো, সত্যযুগ সে এক ঠিক সত্যমূর্তি। হাতে হোমকুণ্ড জ্বালাবার চন্দন ঘি ঢালবার হাতা, গলায় কুশের পৈতে, পিঠে হরিণের গা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নরম-গরম ছাল, কোমর থেকে কুঁচো ছোট্ট একটা আস্ত চামড়ার মোশক—তাতে ঘরের জল ভরা। দাড়ি গোঁফ জটাজুটে।

ত্রেতা যুগে এলেন সম্ভবত এক সবুজ মানুষ হরধনুতে টঙ্কার দিতে দিতে।

দ্বাপরে এলেন ধনিকেন্দ্র তিনি তীক্ষ্ণ কর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বাজনা বাজাতে ঘটোৎকচ মূর্তি।

কলি এলেন একেবারে ভীষণ একখানা কালো—কিছু দেখবার যো নেই। খালি শোনা যাচ্ছে গালাগালি, মারামারি, কোলাহল মাঝে মাঝে হরিবোল, রাম-রাম সত্য, হুইট, লেবট আর উড়ো জাহাজের ভুরুর ভোঁ ঘটরের ফোঁ ফোঁ।

এরা সেখ দিয়ে মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল একটা মস্ত পোল, তার মুখেই একটা ইস্টিশন-ঘর দেয়ালে লেখা—কথামালা প্লাটফরম নং ওয়ান। একটা সিগনাল-কুলি পাহারালার লণ্ঠনে তেল জল দিচ্ছে আর গাইছে।

বলব কি অবাক কাণ্ড—এই কুলিটার কাছে আমি নিজেকে দেখলাম, লাঠি-হাতে ঘোড়াতে ঘোড়াতে উপস্থিত। ঠেহারা ঠিক এই, কেবল চশমা নেই চোখে আর বয়েস হয়ে গেছে একষট্টি উল্টে ১৬। ঘাড় নেই, গোঁফ একটু একটু, সুরে পোকার মতো দেখতে। হাতে মন-মনুষ্যের খাঁচা মাথায় বকের পালক দেওয়া জরীর তাজ পরনে মখমলের কোট-পেন্টুলেন, বুকে চার-পাঁচটা মেডেল—ঠিক যাত্রার রাজা যুধিষ্ঠিরটি।

এঁকে কাণ্ড চাবছি, এমন সময় দেখি কহবতী আর ছেলাম-বাবা দুইজনে প্রবেশ করলে। একজন যুবরাজ যাত্রার মন্ত্রীবর, আর একজন গালপাট্টাধারী কোটাল। ছবিটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। আমকাঠে টুং-টাং করে আর্গিন বাজতে লাগল, সুরে গেয়ে যেন কে বলছে—

(গীত)

পারো কি না পারো চিনিতে
ওহে চিনিতে
চেনা জনে চিনতে হয়
এ কি বিপরীত এ
মুখে রইলে মুখ চিনিতে—

—যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ে গেল নিজের কোনকালের চেহারাখানা। কিন্তু কোন রাজত্বের যে যুবরাজ ছিলেম কিছুতে মনে এল না। থিয়েটারেও তো আজ্ঞনি কোনদিন যুবরাজ। ভাঁড় সেজেই ভাঁড়ামো করে এসেছি চিরকাল। বড় সমিস্যের পড়ে ভাবছি, এমন সময় তারা-বুঁড়ি আবার দেখা দিয়ে গেয়ে উঠল—

(গীত)

ওহে ও প্রবাসী কোন আকাশে
তোমার মেলে রবে প্রবাস
ঘরে প্রবিবার কিবা প্রয়োজন,
আছে দু-নয়ন নয়ন তারা পাশ।

তারা-বুঁড়ি চলে যেতে চলি হাত পুইয়ে গেছে।

কবিতা ও কবি-ব্যক্তিত্বের অসামান্য বিশ্লেষণ

এক সময়, দুই কবি

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার দুই প্রধান প্রতিনিধি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে সবচেয়ে জরুরী কথা সম্ভবত এই যে, বর্তমান সময় ও সমাজকে তাঁদের চেয়ে স্পর্শকাতরভাবে, প্রবলভাবে আর কেউ স্পর্শ করতে পারেন নি। আমাদের কাল ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে এই প্রথম তাঁদের কবিতা ও কবি-ব্যক্তিত্বের রহস্য উন্মোচন করা হলো।
দুই কবির সুদীর্ঘ দুটি আলেখ্য-সংবলিত এই বই, না পড়লে তাঁদের কবিতার মর্মান্তিক্য পাঠোদ্ধার সম্ভব হবে না। দাম : ৫-৫০

উৎপল দত্তর নাটক
দিল্লী চলো ৪-৫০

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর—
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ৯-০০

নন্দিনী শতপথীর গল্পগ্রন্থ
'কেতাটি কথা'র বঙ্গানুবাদ
কত কথা : গল্পসংকলন ৪-০০

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের
শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী ৯-০০
শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা ৩-৫০
শরৎ-অন্বেষণের অপরিহার্য
Sarat Chandra Chatterjee
Prof. Humayun Kabir 4.00
Bengali For Foreigners
Safali Nandy 5.00
Stalin Era
Anna Louise Strong 4.00

নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন সাহিত্য ভাবনা ও তাঁর নির্মাল্য বেদুনের জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে।

পপুলার লাইব্রেরী : ১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

শেষ পর্যন্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রাত তখন ন'টা; ক্লাবেই মদ্য খাওয়া-দাওয়া সেরে ক্লাবের দোতলার বারান্দার নিরালা কোণে চেয়ারে বসে ক্ষিতীশ চক্রবর্তী সিগার সেবন করছেন, সামনে ছোট্ট টেবিলে হুইস্কি আর সোডার বোতল মাঝে মধ্যে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তিনি চেয়ে আছেন বাইরের আকাশের পানে—মনের মধ্যে চিন্তার লহর বইছে। ক্লাবের বয় এসে জানালো এক সাহেব এসেছেন.....দেখা করতে চান। ক্ষিতীশের যেন চমক ভাঙলো। তিনি বললেন, বাঙ্গালী সাহেব? না—বাঙ্গালী সাহেব। ক্ষিতীশ বললেন, এখানে নিয়ে এসো—আর একখানা চেয়ার দিয়ো। বাঙ্গালী সাহেবকে এবং সেইসঙ্গে একখানা চেয়ার পৌঁছে দিয়ে বয় চলে গেল। বাঙ্গালী সাহেবকে উপবেশন করে ক্ষিতীশ বললেন—বসুন। বাঙ্গালী সাহেব চেয়ারে বসলেন, বসে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ক্ষিতীশ চক্রবর্তী? —হ্যাঁ। আপনি? তিনি বললেন, আমার নাম শেখর সান্যাল, ইনস্পেকটর, ক্যালকাটা পুলিশ ডি-ডি.....মানে, বিশেষ জরুরী কাজে আপনাকে বিরক্ত করতে এলুম। —পুলিশ! ক্ষিতীশ খুব আশ্চর্য বোধ করলেন, বললেন—আমার সঙ্গে পুলিশের প্রয়োজন? শেখর সান্যাল বললেন—আছে প্রয়োজন..... বলি...মিত্তল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার করুণাময় মিত্তকে আপনি নিশ্চয় জানেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু খবর জানতে এসেছি। ক্ষিতীশ বললেন—কেন, করুণাময় কি করেছেন? শেখর সান্যাল বললেন, তিনি কি করেছেন তা জানি না। কাল রাত্রে তিনি বাড়ী ফেরেননি, আজও তাঁর কোন পাত্তা নেই। তিনি নিরুদ্দেশ! ক্ষিতীশের দুচোখ হলো বিস্ফারিত। তিনি বললেন—বলেন কি! বয়স হয়েছে...পঁচিশজন মানুষ—অতবড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার—দায়িত্ববোধ আছে। তিনি নিরুদ্দেশ হবেন কি। এই পর্যন্ত বলে ক্ষিতীশ চুপ করলেন—শেখর সান্যালের দু চোখের অবিচল দৃষ্টি তাঁর মুখে নিবদ্ধ। একটা উদাস নিশ্বাস ফেলে ক্ষিতীশ বললেন—তাঁর স্ত্রী শুনেছি পুরী গিয়েছেন, সেখানে তাঁর কাছে.....বাধা দিয়ে শেখর সান্যাল বললেন, তাঁর স্ত্রী কাল বিকেলে পুরী থেকে ফিরে এসেছেন—রাত্রে করুণাময় বাড়ী ফিরলেন না দেখে তিনি ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারকে ফোন করেছিলেন—ক্যাশিয়ার বলেছেন, ব্যাঙ্ক থেকে তিনি ঠিক সময়ে বেরিয়ে গেছেন, কোথায় যদি গিয়ে থাকেন তিনি বলতে পারেন না, তখন তিনি ভোরে ডি-ডি'র ডেপুটি সাহেবকে ফোন করে এ-খবর জানান, ডেপুটি সাহেব আমাকে ডাকিয়ে তাঁর সন্ধান নেবার ভার দিয়েছেন। আমি সারাদিন করুণাময়বাবুর যত আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সন্ধান নিয়েও কোনো পাত্তা পাইনি।...শেষে সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্কের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার আমাকে বললেন—আপনি বিকেলে করুণাময়বাবুর কাছে গিয়েছিলেন তাঁর ব্যাঙ্কে.....আপনার সঙ্গে তিনি গিয়ে আপনার ক্লাবে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবেন, কথা হয়েছিল, তিনি শুনেছেন...তাই আপনার কাছে এসেছি তাঁর সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে। ক্ষিতীশ বললেন—হ্যাঁ একথা ঠিক। আমি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম—তিনি বললেন, আমার সঙ্গে ক্লাবে আসবেন, ক্লাবেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবেন আমার সঙ্গে... বলেছিলেন স্ত্রী পুরী গিয়েছেন, বাড়ী নির্জন লাগে...মানে তাই—শেখর সান্যালের দৃষ্টি পলকহীন—ক্ষিতীশের মুখে নিবদ্ধ...শেখর সান্যাল বললেন—ব্যাঙ্ক থেকে আপনারা একসঙ্গে বেরুলেন...তাঁর মোটরে? না ট্যাক্সিতে? ক্ষিতীশ বললেন—তাঁর মোটরেই এলুম, এসে তিনি গাড়ী ছেড়ে দিলেন। বললেন কত রাত্রি হবে—ড্রাইভারকে কেন কষ্ট দেওয়া ...ট্যাক্সিতে ফিরবেন। শেখর সান্যাল বললেন—তখন কটা বেজেছে? ক্ষিতীশ বললেন—তখনো সন্ধ্যা হয়নি, প্রায় ছটা হবে! দুজনে এসে খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলি...তারপর খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া-দাওয়া সেরে এইখানে বসে গল্পসল্প এবং হুইস্কি পান—নানা কথার মধ্যে ঠিক হলো, সামনের রবিবারে দুজনে যাবে সিঙ্গাপুরে নন্দ বোসের পুকুরে মাছ ধরতে...দিব্যি সুস্থ মানুষ, মনে কোনোরকম উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিনি। আর সে মানুষে... আপনি বলছেন নিরুদ্দেশ! শেখর সান্যাল বললেন, আপনার সঙ্গে তাঁর বহুকালের পরিচয়! নিশ্চয়, বেশ দৃপ্ত কণ্ঠে ক্ষিতীশ বললেন—পঁচিশ বছরের পরিচয়—স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়েছিলুম।—ভালো কথা, কোনো এ্যাকসিডেন্ট? যে দিনকাল পড়েছে, বিচিত্র নয়! মাথা নেড়ে নিঃশ্বাস ফেলে শেখর সান্যাল বললেন, না। আমরা কোনো হাসপাতাল সন্ধান নিতে বাকি রাখিনি। নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষিতীশ বললেন—তাইতো আপনি অবাক করলেন! সব মিস্টি... ভৌতিক ব্যাপার যেন। ক্ষিতীশের মুখে শেখর সান্যালের দৃষ্টি অবিচল, ক্ষিতীশের জন্যও সে দৃষ্টি সরছে না। শেখর সান্যাল বললেন—ক্লাব থেকেই দুজনের বিদায়-গ্রহণ হলো? —না, না, ক্ষিতীশ বললেন—গল্প করতে করতে আমার মনে পড়লো, ভালো এক বোতল ব্রাণ্ডি পেয়েছি, বোতলটা এখনো খোলা হয়নি—দুজনে.....বলতেই করুণাকে—করুণা বলতে—কেন কথা! তখন দুজনে ক্লাব থেকে বেরিয়ে আমার ফ্ল্যাটে

এলুম। —টালিগঞ্জে? —হ্যাঁ। কোথায় আপনার ফ্ল্যাট?...পার্ক সার্কাসে, পার্ক হাউস বলে যে নতুন পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী, সেই বাড়ীর তিন তলার দুটো কামরা নিয়ে আমি থাকি—বাচ্চার মানুষ...হা হা হা. শেখর সান্যাল বললেন—ক্লাব থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটে কখন পৌঁছলেন? চু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—তখন রাত? হা—হা. রাত সাড়ে নটা কিংবা পৌনে দশটা।—তিনি আপনার ফ্ল্যাটে কতক্ষণ ছিলেন? কিতীশ বললেন, ব্যাণ্ডির গ্লাসটা খোলা হল...তারপর দুজনে বসে গল্প সেই সাড়ে দশটা-সাড়ে... হুঁ! শেখর সান্যাল বললেন—আপনার ফ্ল্যাট থেকে তিনি কখন গেলেন? —ঠিক এগারোটা...ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজতেই কবুণা বলল—এগারোটা বাজলো—এবার উঠি। বলে সে চলে গেল।—আপনার ফ্ল্যাটে লিফট আছে? —নিশ্চয়! তবে কবুণা লিফটে নামেনি—বরাবর হেঁটে টিপে টিপে দাঁড়িয়ে থাকা—তার চেয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'খানার সম্বাবহার করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া ভালো। এই কথা বলে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। —আপনি তাকে সঙ্গে নীচে নেমেছিলেন? —না, আমার কামরার দরজাতেই অমায়িক গুডনাইট। শেখর সান্যাল বললেন—আপনার সঙ্গেই তাহলে তাঁর শেষ দেখা। হ্যাঁ, আপনি তাঁকে সবশেষে দেখেছেন! কিতীশ বললেন—একরকম তাই। অবশ্য ফ্ল্যাটের সদরে রাত এগারোটা থেকে একজন দোরা খাকে আটকান...এত বড় ফ্ল্যাট কখন যে বেরোয় কখন যে ফেরে তাদের সুবিধের জন্য; সে হয়তো তাকে দেখে থাকবে! শেখর সান্যাল কি ভাবলেন, তেবে বললেন হুঁ, আমি তাহলে এখন আসি, আপনাকে বিরক্ত করলুম—ক্ষমা করবেন। উপায় নেই...পুলিশের অফিসার...স্টান্ডিং অর্ডার। কিতীশ বেশ একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—না, বিরক্ত করা নয়। ...তবে আপনি ভাবিয়ে তুললেন—তবে আমার মনে হয়—এখান থেকে বেরুবার পর কোথাও আটকে পড়েছেন! কোথায় যাবেন? তিনি আসবেন নিশ্চয়! শেখর সান্যাল বললেন—আটকে পড়লেও তিনি ব্যাঙ্ক কামাই করবেন. এইখানেই তো মুস্কিল। তাঁর স্ত্রী কিরকম উতলা হয়েছেন।

(২)

ব্যাঙ্কের কারবারে এ ব্যাপার নিয়ে দুদিন খুব হৈ-চৈ চললো—বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা—বিচক্ষণ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নিখোঁজ। মন্তব্য বেরুলো. অনেকের অনুমান, ব্যাঙ্কের তহবিল তছরুপ করে তিনি ফেরার কিন্তু এ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—ব্যাঙ্কের একটি কপর্দকও খোয়া যায়নি। তার কারণ তিনি অতি সাধুসজ্জন ব্যক্তি। কেউ কেউ ইঙ্গিত করেছেন, হয়তো নারী ঘটিত দুর্বলতা কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে সে দুর্বলতা তাঁর আদৌ ছিল না। তাঁর অতি বড় শত্রুও তাঁর সম্বন্ধে এমন অপবাদ দিতে পারেন না। কোনো কাগজে মন্তব্য বেরুলো নিশ্চয় পাকিস্তানী হানা। কাদন ঘুসে-ঘাসে, মাঠে-ঘাটে অফিসে আদালতে বসেছে—এ ব্যাপার নিয়ে কতরকম জল্পনা-কল্পনা চলেছে। পুলিশ জোর তদন্ত চালিয়েছে—এখনো কোনো ফল পাওয়া যায়নি। তারপর দেশে নিত্য নূতন দুর্ভোগ—আজ পাকিস্তানী হামলা—কাল গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে দেড়শো যাত্রী বোঝাই ছটলন্ত বাস পথের ধারে বড় গাছে ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ে যাওয়ায় দশ জনার। কাজেই এসব দুর্ভোগের চাপে করুণাময়ের নিরুদ্দেশের ব্যাপার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! শেখর সান্যাল তবে তলন্ত করেছেন—চারিদিকে তোখকান সজাগ রেখে তিনি চলছেন। চারিদিকে সন্ধান করছেন। যথারীতি কাজ চলছে..... এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার বসছেন ম্যানেজারের চেয়ারে—সেনদেনের কাজে কারো কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ করুণাময়ের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া পাবলিক তাঁর কথা ভুলে গেছে; আর তাঁর স্ত্রী? স্ত্রীর কথা না বলাই ভালো। এক মাস পরে...কিতীশ চক্রবর্তী কাশ্মীর ভ্রমণের ব্যবস্থা করছেন। কলকাতা থেকে তিনি দিল্লী যাবেন, তারপর দিল্লী থেকে কাশ্মীর। যাবেন শেনে। লগেজ তিনি বেলা দশটা নাগাদ শেয়ালদর অফিসে নিয়ে গিয়ে বুক করে এসেছেন— একটা ট্রাঙ্ক একটা সুটকেশ আর বেডিং সঙ্গে থাকবে শুধু তাঁর এ্যাটাচি কেস। ফ্ল্যাট ছেড়ে তিনি এসেছেন ক্লাবে, ক্লাব থেকে যাত্রা। যাত্রার পূর্বে তিনি ক্লাবের সেই বারান্দায় বসে হুইস্কির পাত্র করছেন—বয় এসে কার্ড দিলে—কার্ডে নাম শেখর সান্যাল...কাল-বাটী পুলিশ, ডি-ডি। তিনি খুব বিরক্ত হলেন—যাবার পূর্বক্ষণে এ আবার কি আপদ। কিন্তু পুলিশের অফিসার...কি করেন, বয়কে বললেন—এখানে পাঠিয়ে দাও. শেখর সান্যাল এলেন—বললেন, নমস্কার। আবার বসতে হলো বিরক্ত করতে। নিরুপায় পুলিশ অফিসার...ডিউটি বাউন্ড। মনের বিরক্তি মনে চেপে কিতীশ বললেন—কেমন করুণাময়ের সন্ধান? শেখর সান্যাল বললেন —না কয়েকটা পয়েন্ট. সেগুলো ক্লিয়ার করতে চাই, তবে আমার আশা। আপনি শুনেছেন কাশ্মীর যাচ্ছেন— ভ্রমণ— হাউ নাইস! আজই যাচ্ছেন? কিতীশ বললেন—এখনি। তখন দিল্লী মেলটি. যাব রিজার্ভ...এই পর্যন্ত বলে তিনি ঘড়িতে টাইম দেখলেন তারপর বললেন, আমার সময় খুব অল্প—চটপট সেরে নিন...শেখর সান্যালের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি...হেসে বললেন—কিন্তু এসব আজ যে হঠাৎ বলতে চটপট সারা, চলে না মিস্টার চক্রবর্তী। তবে হ্যাঁ—মিথ্যা আপনার সময় নষ্ট করবো না। শেখর সান্যাল বললেন—আপনি ক্লাব থেকেই এয়ারপোর্টে চলেছেন—তার কারণ? আপনার ফ্ল্যাট...কিতীশ বললেন—এরও কৈফিয়ৎ দিতে হবে? আমি ভোর, না ঘাটশাড়া: এক কারণ, কাল দুশো মাসের পালা তারিখ ...তাই আজ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে এসেছি। আজ চলে না এলে ফ্ল্যাটের এ মাসের ভাড়াটা দিতে হবে—জাস্ট এ মিট এক-নম্বিজ্যান্স! শেখর সান্যাল বললেন—আপনি সেদিন বলেছিলেন সে-রাত্রে করুণাময়বাবু সিঁড়ি দিয়ে আপনার ফ্ল্যাট থেকে নেমে গেলেন আপনি তাঁর সঙ্গে নীচে নামেননি এবং সে রাত্রে আপনি মোটে নীচে নামেননি বা ফ্ল্যাট থেকে বেরোননি।—না। কিন্তু এ পুরোনো কথা আবার হঠাৎ...বাক্স দিয়ে শেখর সান্যাল বললেন, কারণ আছে—হ্যাঁ আপনি কতদিনের জন্য কাশ্মীরে চলেছেন? —যাচ্ছি যখন খরচ করে—এক মাস, দেড় মাস থাকবো তারপর অবশ্য যদি ভালো লাগে?—কি কি লাগেজ নিচ্ছেন সঙ্গে? কিতীশ বললেন—একটা ট্রাঙ্ক, একটা সুটকেশ আর বেডিং—সেগুলো এয়ার অফিসে বুক করে দিয়ে এসেছি...সঙ্গে থাকবে একটা এ্যাটাচি কেস। তাতে কি কি জিনিস আছে, তাও বলতে হবে? শেখর সান্যাল বললেন—না, তা জিজ্ঞাসা করবো না। তবে মনে করে দেখুন তো একটা ট্রাঙ্ক আপনি নর্থ ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে সেখানকার স্ট্রং রুমে ডিপজিট রেখে এসেছেন কিনা? দু চোখ বিস্ফারিত করে কিতীশ বললেন— ও হ্যাঁ—আপনি তো সে কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। সে ট্রাঙ্কে আমার বৈদেশিক কাগজপত্র আছে আর দামী দামী ফ্যামিলি কিউরিয়ো প্রভৃতি আছে। যখনি আমি বাইরে যাই সেটা ব্যাঙ্কের স্ট্রং রুমে ডিপজিট রেখে যাই। দামী জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘোরার প্রয়োজন নেই। দু-মিনিট অবিচল দৃষ্টিতে কিতীশের দিকে চেয়ে থেকে শেখর সান্যাল বললেন—সে ট্রাঙ্কটি আমি সার্চ করতে চাই—তাহলেও কোর্টের অর্ডার আছে...দেখুন। কিতীশ বললেন—বেশ... দেখুন—এই নিন তার চাবি। একথা বলে তিনি চাবি দিতে উদ্যত হলেন। শেখর সান্যাল বললেন—উহুঁ তা হবে না। আপনার সামনে ট্রাঙ্ক খুলে সার্চ করবো। আপনি আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাবেন এখনি—আপনি নিজের হাতে চাবি দিয়ে ট্রাঙ্ক খুলবেন। কিতীশ বেশ বিরক্ত হলেন, বললেন—এতি জ্বালাতন আপনি? আমি এখন কি করে যাবো? আমাকে যেতে হবে সরাসরি এয়ারপোর্টে... আপনি চান আমি কেন মিস করবো? একগুচ্ছ টাকা লোকসান—তাছাড়া হয়রানি।

ঈষৎ হেসে শেখর সান্যাল বললেন—নো হেল্প দিস ইজ রুটিন ওয়ার্ক। ক্ষিতীশ হাত-ঘড়ির দিকে চাইলেন। শেখর সান্যাল বললেন, আসুন সহজভাবে না এলে আমাকে আনপ্লেজান্ট স্টেপস নিতে হবে—তাতে আপনার ইজ্জত থাকবে না। নিরুপায় হতাশ কণ্ঠে ক্ষিতীশ বললেন কিন্তু.....তাঁর কথা শেষ হলো না। শেখর সান্যাল বললেন—কথা বাড়াবেন না। আসুন...। ক্ষিতীশকে আসতে হলো—ক্লাবের বাইরে পথে শেখর সান্যালের ট্যাক্সি—ক্ষিতীশকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে শেখর সান্যাল তাঁর পাশে বসলেন। ট্যাক্সি চলল হেস্টিংস স্ট্রীটে নর্থ র‍্যাঙ্কের দিকে — ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে হলো...ট্যাক্সিতে দুজনের মুখে কথা নেই। ...ট্যাক্সি থামবা মাত্র ক্ষিতীশ ট্যাক্সির দরজা খুলে লাফিয়ে পথে নামলেন...সেন্সেই যে ছুটে। কিন্তু পথে বেশ ভিড়..শেখর সান্যালও সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরলেন—ভিড়ের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্য...ক্ষিতীশকে ধরে ট্যাক্সিতে তুলে তাঁর হাতে শেখর সান্যাল পরালেন হ্যান্ড-কাফ বললেন—আমার অপরাধ নেই। ইউ কমপেলড মী...ট্যাক্সি আবার চললো... ক্ষিতীশ বললেন—আপনার এমন সন্দেহ... শেখর সান্যাল বললেন—আপনার ফ্ল্যাটের বয় বলেছিলেন—সেদিন রাত এগারোটায় আপনি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিলেন একলা—সঙ্গে আর কেউ ছিল না—তারপর আপনি ফ্ল্যাটে একলা ফিরেছিলেন রাত একটার পরে—সেই থেকে আপনার ওপর আমার নজর রেখেছি। আমার লোক তখন থেকে আপনার গতি-বিধি লক্ষ্য করছে। ...আজ বেলা এগারোটা নাগাদ একটা ট্রাঙ্ক নিয়ে আপনি ব্যাঙ্কে রেখে আবার ফ্ল্যাটে ফিরেছিলেন। তারপর বেলা দুটো নাগাদ এখান অফিসে যান লগেজ বুক করতে —সেখান থেকে ক্লাবে আসেন। ও ট্রাঙ্কের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা.....সন্দেহ হবার কথা হবে না কেন, বলুন? —হুঁ কিন্তু এক মাস কেটে গেল এখনো...শেখর সান্যাল বললেন—আপনার ফ্ল্যাটের লিফটম্যান আর সমস্তের দারোয়ান দুজনকেই অনেক জেরা করে শুধু জেনেছিলাম—ফ্ল্যাটে এসেছিলেন দুজন—ফ্ল্যাট থেকে রাত এগারোটায় একা আপনি বেরুলেন—দুজন নন—আবার রাত একটার পর আপনি একলা ফ্ল্যাটে ফিরেছেন নজর রেখেছি... আজ ঐ ট্রাঙ্কটি ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছেন—হঠাৎ কাস্টমার সার্ভিস ঐ ট্রাঙ্কের সম্বন্ধে সন্দেহ—তাই সার্চ করবার হুকুম নিয়ে এসেছি। ...আপনি আজই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে এসেছেন—ফ্ল্যাট সার্চ করে কিছুই পাইনি...তবে আপনার একটা কমরেড আপনার গন্ধ পাই. আমার বিশ্বাস ঐ ট্রাঙ্কই পাবো করুণাময়ের সন্ধান...ক্ষিতীশ বললেন—শেষ রক্ষা যখন হলো না তখন বলতে বাধা কি তাঁর ব্লাডের গ্রুপের সঙ্গে বিষ্ণু ট্রাঙ্গ রক্তমেল...তাতেই আধ ঘণ্টার মধ্যে সব-শেষ। তারপর বেরিয়ে যাই ফ্ল্যাট থেকে... বয় ভাববে করুণাময়ই বেরিয়ে গেলেন। ফিরে আসবার সময় ভেবেছিলুম—বয়টা কিম্বারে দেখতে পাবে না—কিন্তু তা হলো না। তারপর নিজের কামরায় এসে বড় ট্রাঙ্ক করুণাময়ের দেহখানা দুমড়ে মুচড়ে ঢুকিয়ে বন্ধ করলুম। আরকের গন্ধ বলছেন। হ্যাঁ...দুবং একটা ডিসইনফেকট্যান্ট ছিটিয়েছিলুম—সব কিছুদিন কাটলে ট্রাঙ্কটি ব্যাঙ্কের ভল্টে ডিপজিট রেখে সরে পড়বো। এমন ডিপজিট কেনো ব্যাঙ্কে কোনোকালে থেকে না... ডিপজিটের জন্য ৬ মাসের টাকা দিয়েছি। শেখর সান্যাল বললেন—কিন্তু এতকালের বন্ধু তাকে হত্যা.....নিরুপায় কেন ক্ষিতীশ বললেন জীবনে এমন একটা অপকর্ম করেছি যে কথা করুণা ছাড়া কেউ জানে না —যদি সে প্রকাশ করে, তাহলে আমার সাজার সীমা থাকবে না। একদা তার কাছে কোনো গোপনের মত ব্যক্ত করেছিলুম দীর্ঘকাল এই যন্ত্রণা ভোগ...তাই...নর্থ র‍্যাঙ্কে ট্রাঙ্ক খুলতে পাওয়া গেল তার মধ্যে করুণাময়ের মৃতদেহ এবং...তারপর... সে কথা ক্ষিতীশের যা হলো যাঁরা নিত্য খবরের কাগজ পড়েন, তাঁরা জানেন অতএব.....

বিনয় ঘোষের

কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত

কলকাতা সম্পর্কে সমস্ত রচনাবলী ও নতুন রচনাসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে।

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী
১ম—২০৲ ২য়—১৮৲

দিলীপকুমার রায়ের
স্মৃতির শেষ পাতায় ২০৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
ঊর্ধ্বনিবেশ ৮·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
শ্রেষ্ঠ গল্প ৭·০০

ওঙ্কার গুপ্তের
ব্যাপার কী? ৫·০০

সন্তোষকুমার অধিকারীর
অবিশ্যি ৩·৫০

জরাসন্ধর হাসির নাটক
এবাড়ি ওবাড়ি ৪·০০

বনফুলের
প্রথম গরল ৮·৫০

নিমাই ভট্টাচার্যের
উৎস সন্ধানে ৬·০০

বিমল মিত্রের
এর নাম সংসার ১০·০০
সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত
অমূল্যপ্রসাদ সেন ১০·০০
কৃষ্ণ ধর-এর
মুক্তির থেকে দেখা ৬·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
প্রেমপাশা ৬·০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
গল্পাপদ বসুর নাটক
অপরাজিত ৩·৫০

শংকর-এর

এক যে ছিল

প্রথম প্রকাশন ১লা বৈশাখ
৫ দিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।
২য় মুদ্রণ নিঃশেষ প্রায় দাম : ৮·০০

এপার বাংলা ওপার বাংলা
৩০শ মুদ্রণ নিঃশেষিতপ্রায় ১২·০০
মোম বিদ্রোহ পরে ভাগ
২৪শ মুদ্রণ ৮·০০

চাণক্য সেনা
তিন ভুবন ৭·০০
নারায়ণচন্দ্র চন্দ্রের
পাখির পরিচয় ৮·৫০
যমুনা নাগ-এর
হারানো মানুষ ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
কাঁচের আড়াল ৫·০০
তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের
শেষ অধ্যায় ৪·৫০

পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ন ১ম ১৫·০০

হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিশিপদ্ম ৪·০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
জাতক ৪·৫০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
পরীক্ষণী গৌরী ৭·০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
পৌষ ফাগুনের জন্যে ১৮·০০
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মার্কসবাদ ও মুক্তবাদ ৭·৫০
ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের
দ্বিজেন্দ্রনাথ : কবি ও নাটকার ১৬·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
কুলের সন্ধানে কবি ৩·০০
নলীমাধব চৌধুরী
শেষ অধ্যায় ১৬·০০
সচীন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মিতহাস্য অধ্যায় ১০·০০
দীপক চৌধুরী
আবৃত আগুন ১০·০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
বসু ও শংকর সম্পাদিত
কিশ্ব বিচিত্রা ১২·০০
নবগোপাল দাস
দুই নারী ৬·০০
নমিতা চক্রবর্তীর
অচেনা রাত্রি ২·০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

বংশী ভুজাওয়ালা

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বংশী ভুজাওয়ালার দোকান ছিল আমাদের পাড়ায়। ভুজাওয়ালা বলে ডাকছি বটে কিন্তু সেই। বিরাট বড় দোকান—সকাল থেকে রাত দশটা অবধি খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে।

বংশীর বাবা শুকদেও প্রথম জীবনে ফেরি করত। তখন কলকাতা শহরে এত বরেরা ছিল না। আমাদের সিকটায় কিছুর লোক থাকি পড়েছিল। তারই খানিকটা ইলাকা নিয়ে সে ছোট একটি দোকান পেতেছিল। সেই দোকানই ক্রমশ বড় হয়ে আজ বংশী ভুনাওয়ালার দোকানে পরিণত হয়েছে।

শুকদেওয়ের তিন ছেলে—বংশী গণেশ ও রামস্বরূপ। এই ছেলেরাই পরে বাপের ব্যবসাকে ফলাও করে তুলেছে। খালি ভুনা-ওয়ালার দোকান নয়—দোকানের সঙ্গেলগ্ন আরো খানিকটা জমি নিয়ে তারা গোডাউন হটকেক্স করেছিল। এইখানে তারা ভাড়াও দিত এবং নিজেরাও থাকত।

শুকদেও মারা যাবার পর এরা তিন ভাইয়ে অক্লান্ত চেষ্টা করে ছোট্ট সেই দোকানটিকে বড় কারবারে পরিণত করলে। তিন ভাই বিয়ে করলে: বৌরা এসে স্বামী-দের কারবারে লেগে গেল। এখন মস্ত উঁচু মাচায় গামলায় করে থরে থরে পদ্ম সাজানো—চালভাজা, কড়াইভাজা ছোলা-ভাজা, চানাচুর ছোলা ঘরের ছাতু ছোলার ছাতু আরও কত কি! নিচে গনগন করছে উনুন—পাশে বোরা বোরা ঘুরোচ্ছে। কেউ বা বাড়ির ভেতর রাঁধছে কেউ বা মাচার ওপরে দোকানে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করছে। ছেলেরা কেউ স্কুলে পড়ে ইসকুলে যাতায়াত করছে। এক কথায় বংশীর যেমন জমজমাট ব্যবসা তেমনি জমজমাট পরিবার।

বংশীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু তার স্ত্রীর বয়স তার থেকে অনেক বেশি। বংশীর বয়স হলেও তাকে তখনো ছোকরা বলে মনে হতো কিন্তু তার বৌকে অসল বয়সের চেয়েও অনেক বেশি বয়সের বলে মনে হতো। একই মধ্যে বংশী দিন কয়েকের জন্য কোথায় গিয়ে এক বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। বংশীর কাণ্ড দেখে তাদের বাড়ীর সবাই তো বটেই, পাড়াসুদ্ধ লোক অবাক। দিনকতক খুব হৈ-চৈ ঝগড়াঝাঁটি—চালে আর কাক-চিল বসতে পারে না এমনই অবস্থা।

দিনকতক বাদে অবশ্যই একটা সাময়িক ভাব এসে পৌঁছলে সকলে বংশীর নব-বিবাহিত স্ত্রীকে চোখ মেলে দেখলে এবং দেখে নিতান্ত নিরীহ অসহায় মানলে।

নতুন বৌয়ের বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে। ওটা মাজা-মাজা—বংশীদের ঘরে তাকে গৌরবর্ণাই বলা চলে। টানাটানা চোখ দুটি তীক্ষ্ণ একটি শাণিত ছুরির দুটো ফলা। মুখখানা একটু রুক্ষ এবং অল্প শ্রী-মণ্ডিত। দেহলতা নিটোল বেন কুঁদে বার করা হয়েছে। এরকম সুন্দরী অনেক বড় ঘরেও মেলে না।

নতুন বৌ এসেই নিজেকে বিপরীত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে। দুদিনের মধ্যেই সে দাঁড়িপাল্লা ধরতে শিখে গেল এবং বাংলা বলতে লাগল বংশীদেরই মতো। নতুন বৌয়ের নাম ফুলবাসিয়া।

ফুলবাসিয়ার আগমনের পর বংশীর দোকানের বিক্রি বেড়ে গেল প্রায় দ্বিগুণের পাড়ার বারা জন্মেও ভুনাওয়ালার দোকান থেকে জিনিস কিনতেন না তাঁরা হঠাৎ ছোলাভাজা ও চালভাজার অনুরাগী হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফুলবাসিয়া তাদের অনুগ্রাহককে গ্রাহ্যই করলে না। দরকার হলে সমানে তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতেও ছাড়ত না। আমরা জানি এই ফুলবাসি অনেক দূর-দূরান্তের ভূখণ্ড [illegible] হয়ে হেঁটে আসত কিন্তু ফলের চারটি [illegible] করাই তাদের সার হতো। সকলকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হতো।

ফুলবাসিয়ার বচন ছিল তীক্ষ্ণ, সমানে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় যে পাল্টা জবাব করে যেত। কিন্তু তবু খদ্দেরের ভিড় কমত না। বংশী ভুনাওয়ালার দোকান এখন লোকের কাছে ফুলবাসিয়া ভুনাওয়ালীর দোকানে পরিণত হলো।

CENTRAL LIBRARY ρ 24,066

ইতিমধ্যে ফুলবাসিয়া আবার পাঁচুদের কোন জায়গা থেকে গোটা পাঁচ-ছয় বধেশ ছাগল আমদানি করলে। গাধার মত সর্বাঙ্গে লম্বা-লম্বা লোমওয়ালা এবং গরুর পালানের মত পালানওয়ালা সেই ছাগলের দল দেখবার জন্যে রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে যেত। এগুলি ছিল ফুলবাসিয়ারই নিজস্ব সম্পত্তি। সে নিজে তাদের পরিচর্যা করত, নিজে দুধ দোয়াত এবং বিক্রিও করত। উদ্বৃত্ত দুধ যা থাকত তা তাদের সংসারের জন্য খরচ হতো।

বর্ষা আর শীতকাল ছাড়া সংশীদের পরিবারের পুরুষেরা প্রায় সকলেই রাস্তায় খাটিয়া পেতে রাত্রি কাটাতো। ছাগলগুলোও এই সময়ে বাইরেই থাকত। তাদের বাড়ীর কয়েকপা দূরেই ছিল প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠে দুপুরবেলা ফুলবাসিয়াই ছাগল-গুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসত। তারা স্বচ্ছন্দে ঘাস-টাস খেত। আবার বিকেল নাগাদ সেগুলোকে সংগ্রহ করে এনে বাগানের খুপরিতে বেঁধে রাখত।

এখন এই মাঠটি ছিল আমাদের খেলা-ভূমি। পাড়ার এবং বেপাড়ার আমরা কয়েকটি সেরা ছেলে এই মাঠে ফুটবল খেলতুম এবং আড্ডা দিতুম। ফুলবাসিয়ার দিকে না এগোলেও আমাদের মধ্যে তার সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত ছিল না। খেলা যে রোজই হতো তা নয় কিন্তু যেদিনে খেলা হতো না সেদিনে নানান বিষয়ের আলোচনার মধ্যে ফুলবাসিয়া ছিল একজন।

সেবাশিস থাকত আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে। সে ফুটবল খেলত না আলো-চনার মধ্যে অতি সামান্যই কথাবার্তা বলত, কিন্তু সে ছিল আমাদের সিগারেটের ভাণ্ডারী।

—দেবা একটা সিগারেট ধরা।—বলা-মাত্রই সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে ফুটবল মেরে আমাদের দিকে এগিয়ে দিত। ও ছিল অতি ভালোমানুষ ও নিরীহ লোক। আমাদের যেদিন কিছুই করবার থাকত না, সেদিন সেবাশিসকে নিয়ে চাঁদোয়ার করে দৌড়ানো হতো। কখনো কখনো দুজনো পাতা যোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে তার মধ্যে নিয়ে সেবাশিসকে দোলানো হতো। আর সে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচাত। আমরা তাতে পরমানন্দ উপভোগ করতুম। সেবাশিস হাসিমুখেই এসব সহ্য করত এবং একদিনই আড্ডা কামাই করত না।

সেবাশিস ছিল পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে কিন্তু তার কোনো চাল ছিল না বললেই হয়। মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি মোটা ধুতি—এই ছিল তার পোষাক। আর ছিল ভদ্র মেজাজ। অমন শরীফ মেজাজের লোক আজও আমার চোখে পড়েনি। কখনো তাকে বিরক্ত হতে বা রাগতে দেখিনি।

আমাদের মাঠ রাস্তার ধারে হলেও তার তিন ভাগ ছিল কতকগুলো বাড়ীর আড়ালে আর এক ভাগ ছিল রাস্তার দিকে খোলা। একদিন বিকেলে আমরা মাঠে বসে গল্প-গুজব করছি। ফটবলটা পাম্প হচ্ছে—এখুনি খেলতে নামব এমনি অবস্থা—ঠিক সেই সময় কে যেন সেবাশিসের কাছে সিগারেট চাইলে। সেবাশিসের পকেট তখন সিগারেট ছিল না।—এখুনি কিনে নিয়ে আসছি—বলে সে উঠে রাস্তার দিকে অগ্রসর হলো। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে ফুলবাসিয়ার আবির্ভাব ঘটল।

ফুলবাসিয়া এসেই চীৎকার করে তাদের উচ্চারণে গালাগাল দিতে সুরু করল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলুম—কি হলো রে! তার সেই উত্তেজিত অবস্থার সামনে যেয়োবার সাধ্য আমাদের ছিল না। দেহকালে বলতে পারা গেল তার ছাগলের পালকে তাড়া দিয়ে কে মাঠের বার করে দিয়েছে।

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রবোধবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন ২য় খণ্ড—৮ম সংস্করণ (Indian Philosophy)	12.00
ভারতীয় দর্শন ২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ (Indian Philosophy)	7.00
পাশ্চাত্য দর্শন—৯ম সংস্করণ (Western Philosophy)	12.00
পাশ্চাত্য দর্শন—(দর্শনের ইতিহাস সহ)—৩য় সংস্করণ for B.U.	16.00
নীতিবিজ্ঞান—৮ম সংস্করণ (Ethics)	12.00
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ (Social Philosophy)	12.00
মনোবিদ্যা—৬ষ্ঠ সংস্করণ (Psychology)	22.00
Handbook of Social Philosophy — 2nd edition	16.00
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বেন-হিউম)—৩য় সংস্করণ	12.00
ধর্মদর্শন— (Philosophy of Religion)	22.00
সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social Psychology	10.00

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক অমৃতভূষণ রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ (Principles of Education)	14.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—৩য় সংস্করণ (Educational Problems)	15.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ (Educational Psychology)	22.00

শিক্ষক শিক্ষণ (B. Ed., P. C. Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ (General Methods)	16.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (Economics & Civics)	14.00
ভারতের শিক্ষা-সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্য যুগ)	4.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস (History Method)	15.00

অধ্যাপক হালদার ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস (History of Education)	16.00

অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব (Principles of Education)	16.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)	25.00

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্কবিজ্ঞান প্রবেশ (৭ম সংস্করণ) — অধ্যাপক চৌধুরী ও সেনগুপ্ত

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫।১।১ কলেজ রো, শিল্প—৭০০০০৯। ফোন ৩৫-৭২০৪

ফুলবাসিয়া চেঁচাচ্ছে। এমন সময় এদিক থেকে দেবাশিস এগিয়ে গিয়ে ফুলবাসিয়াকে কি যেন বললো। আমরা সবাই হাঁ করে দেখছি যে এবার কি হয়। ফুলবাসিয়া দেবাশিসের কথায় কি একটা জবাব দিলে কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। তারপর দুজনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো—কি কথাবার্তা হলো কিছুই আমরা বুঝতে পারলুম না—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে তারা দুজনে রাস্তার দিকে চলে গেল।

কি কথাবার্তা হতে পারে তা অনুমান করবার চেষ্টা করছি এমন সময়ে আমাদের ফুটবল পাম্প হওয়া শেষ হয়ে গেল। আমরা মাঠে নেমে পড়লাম—খেলার উদ্যোক্তারা দেবাশিস ও ফুলবাসিয়া উভয়েই ডুবে গেল।

পরের দিন আমাদের জন্য ডায়মণ্ডের ম্যাচ খেলা। তার পরের দিন পাড়ার মাঠে মোহনবাগানের ম্যাচ। এই রকম উপরি-উপরি কতকগুলো ব্যাপারে সেদিনের বিকেলের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। সেদিনের সেই ব্যাপারের পরে দেবাশিস যে আর মাঠে আসবে না—এটা আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি।

প্রায় পনের দিন এইভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে মাঠে আমি একলা বসে আছি এমন সময় দেবাশিসের কথা মনে পড়ে গেল। একটু পরেই নির্মল মাঠে আসতেই আমি তাকে বললুম—এই দেবাশিস আসছে না কেন? কি হলো তার?

নির্মল বললে—অনেকদিন আসছে না দেখে আজ সকালে তার বাড়ী গিয়েছিলুম। সে বললে—একটা ছেলে পড়াবার কাজ পেয়েছি ভাই। বিকেলবেলা ব্রেক আড্ডা না দিয়ে তাকে পড়াতে যাই। বেশ টাকা করে দেবে বলেছে—মন্দ কি!

নির্মল বলতে লাগল—জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার টাকার কি এত ভাবনা? যখনই চাইছ বাবার কাছ থেকে পাচ্ছ। আমার কথা শুনে দেবাশিস আমতা আমতা করতে লাগল স্পষ্ট জবাব কিছুই দিলে না।

নির্মল আরো বললে — ব্যাপারটা রহস্যময় বলে বোধ হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি কাল বিকেলে ওর পেছু নিয়ে দেখবো যে ও কোথায় যায়।

আমি বললুম—আমিও তোর সঙ্গে যাব।

ঠিক হলো কাল আমরা দুজনে দেবাশিসের পেছু নেব। সে চারটের সময় বাড়ী থেকে বেরোবে। আমরা বেলা সাড়ে তিনটের সময় গিয়ে তার বাড়ীর আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকব।

পরের দিন আমি আর নির্মল তাদের বাড়ীর থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত বাড়ীটাকে নজরে রেখে—এক জায়গায় ওঁৎ পেতে বসে রইলুম। বেলা চারটে নাগাদ দেবাশিস বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। দেখলুম তার গায়ে ধোপদস্ত পাঞ্জাবি, পরনেও তেমনি ফর্সা ধুতি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে একবার চারদিকে ভালো করে দেখে আমরা যেখানটায় বসেছিলুম তার বিপরীত দিকে হন হন করে চলতে লাগল। খানিকটা চলে আমরা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এসে পৌঁছলুম। তখন রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। দেবাশিস তারই মধ্যে দিয়ে উত্তরমুখে এগিয়ে চলল। আমরাও সমান সাবধান রেখে তার অনুসরণ করতে লাগলুম। দেখলুম সে খানিকটা করে চলে আর ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে চায়—আবার চলতে থাকে। নির্মল বললে—দেখছিস! ছেলে পড়াতে যাবে তো এত সন্তর্পণে কেন বাবা!

যাই হোক আবার সে চলতে লাগল। মানিকতলার ভেতরে ঢুকে যে হঠাৎ মারলে ট্রেন দৌড়। কি কাণ্ড! আমরাও দৌড়তে লাগলুম। পঞ্চাশ ষাট গজ—দেখি একটা পানের দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখান থেকে সিগারেট কিনে একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলে দুলে চলতে [illegible] দিকে। আমরা যতদূরে [illegible] লুকিয়ে লুকিয়ে তার [illegible] লাগলুম। তারপরে বাঁ দিকে [illegible] মধ্যে ঢুকে পাঁচখানা বাড়ী পেরিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকে যেতে দেখলুম। আমরাও ছুটে গিয়ে সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। দেবাশিস ততক্ষণ উঠোন পার হয়ে ওধারের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমরা তার এত কাছে এসে পড়েছি তবু সে টের পেল না। ওপরে দোতলায় উঠে সে বারান্দার ধারে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আর বাকাব্যয় না করে আমরাও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। দেবাশিস উঠে আমাদের দেখে বলে উঠল! আরে—তোরা কোত্থেকে? আমার পেছনেই লাগলি বুঝি? আবার দৌড় থেকেই মনে হচ্ছিল কে যেন আমার পেছু নিয়েছে। যাকগে—যখন এসেই পড়েছিস তখন বোস ভাই।

ঘরের মধ্যে একদিকে একটা [illegible] —তাতে বালিশ পাশবালিশ সবই [illegible]। বিছানার সামনে মাদুর পাতা [illegible] জুতো খুলে মাদুরে বসলুম। [illegible] ঘরে অন্য দিকের একটা দরজা [illegible] ফুলবাসিয়া।

কিমাশ্চর্যতঃপরম্। [illegible] কিংবা ইলোরা আর কৈলাস [illegible] কল্পনা অন্তত করা যায়। [illegible] কল্পনাতীত।

দেবাশিস বললে—ফুলবাসিয়া, চেনা। এরা আমার বন্ধু। আমার অসুখের আমার পেছু নিয়ে একেবারে এখানে এসে হাজির হয়েছে।

ফুলবাসিয়ার মুখ দেখে মনে হলো সে আমাদের আসাটা মোটেই পছন্দ করেনি। একটু হেসে শুধু সে বললে—তাই নাকি!

ফুলবাসিয়াকে আজ [illegible] দেখাচ্ছিল। একেই তো সে ছিল সুন্দরী তার উপরে দেহে কাঁচন সাবান পড়েছে—মাথায় ঢেউ —সুন্দর একখানি চওড়া পেড়ে তাঁতের শাড়ি হিন্দুস্থানী ধরণে পরা—মাথার কবরীতে একটি বেলফুলের মালা জড়ানো— সত্যিই চমৎকার দেখাচ্ছিল ফুলবাসিয়াকে।

দেবাশিস আমাদের বললে—এ বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্যে এসে উঠেছি বটে কিন্তু

● প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য ●

• সম্পাদিত : প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শন—ডঃ সুনীল বাস ১০·০০

• উপন্যাস—বিভূতি ভাণ্ডার—নিশিচন্দ্র ৭·০০, গল্প কথা—সম্পাদনা—সুজিত নাগ ৬·০০, গল্পের মত নীল—চতুরঙ্গ ৮·০০, প্রথম প্রেম দ্বিতীয় পুরুষ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ৬·০০, কল্পনারী—মণিপা দেবী ৫·০০, কথকুরা—প্রমোদ গুপ্ত ৩·০০।

• ছোটদের বই—প্রমোদ সাহা—ক্যাপ্টেন কীর্তি ০·০০, প্রবোধ সাহা—ছেলে ঘুমোয় কাঁথ ০·০০, অমরেন্দ্র ঘোষ—গল্প সোনার গল্প ০·০০, সুমন্ত ঘোষ —সোনেলা পাখি ০·০০, করেন আচার্য—বাঘেরাজারী ০·০০, অরুণকান্তি সাহা —রামায়ণের গল্প ০·২৫, শালিনার অভিযান—চিত্তরঞ্জন রায় ৪·০০

• অনুবাদ— কিশোর কবিতা—অরুণকান্তি সাহা ৫·০০

• জীবনী গ্রন্থ—বীরবিক্রম — হরেন্দ্রমুখোপাধ্যায় ৩·০০, সারদামণি—হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪·০০

• শার্লক—হোমসের গল্প :—

১। রহস্যের মাস্টার ৪·০০ ২। ঈশ্বর দিয়া ছাপা— ৩·০০, দর্পণে প্রতিবিম্ব —অরুণকান্তি সাহা, ভোর মন্ত্রোর—তপনকুমার সেন ৪·০০।

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন
৪০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

'জিজ্ঞাসা' তার সীমিত সাধ্য নিয়ে বিগত একত্রিশ বছর দেশ ও জাতি গঠনের পক্ষে মহৎ ভাবোদ্দীপক গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করেছে। 'জিজ্ঞাসা'র উদ্দেশ্য ও প্রয়াস—সে কীর্তিতে যদি বসা যদি তবে হি জীবিত।

জিজ্ঞাসা প্রকাশিত ও পরিবেষিত একশত নির্বাচিত গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অক্ষর ১/২ ॥ পরমানন্দ সরস্বতী প্রতি খণ্ড ০·৫০
আজীর-সন্ধ্যার কথা ॥ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১২·৫০
আধুনিক [illegible] সাহিত্যের মূল্যায়ন ॥ নারায়ণ চৌধুরী ০-৫০
ইন্দ্রাণী ॥ [illegible]/বসু ও অন্যেরা ২০-০০
ঈশ্বর গুপ্তের জীবন ও কবিত্ব ॥ বঙ্কিম/ভবতোষ দত্ত ২০-০০
উনবিংশে শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ॥
অরুণ মুখোপাধ্যায় ১২·৫০
কল্পেষ ও নক্ষত্র ॥ বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ ১০·০০
কাব্যতত্ত্বের রূপরীতি ॥ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১০-০০
কাব্যগীতিলিপি ১/২ ॥ দিলীপ রায় ও প্রফুল্ল দাস
৫-০০/৭·৫০
কাব্যপরিমিতি ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৩-০০
কাব্যবাণী ॥ ভবতোষ দত্ত ১০·০০
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ॥ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ৬·০০
কেশবচন্দ্র ॥ মণি বাগচি ৪-৫০
গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ ॥ নবেন্দু সেন ১৭·০০
গীতায় সমাজদর্শন ॥ গিরিজাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ৪·০০
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ॥ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১০-০০
গ্রাম্য বঙ্গ সংস্কৃতি ॥ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২·০০
ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য ॥ দীনেশচন্দ্র সেন ১২·০০
চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ভবতোষ দত্ত ৮·০০
ছন্দজিজ্ঞাসা ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন ৩০-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥ সুশীল রায় ১০-০০
দুই মনীষী ॥ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬·০০
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ॥ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫·৫০
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতিকথা ॥ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ৬-০০
ধ্বন্যালোকলোচনম্ ॥ মানবেন্দ্রনাথ/দেবেশ দাস ৪-০০
নাটক লেখার মূলসূত্র ॥ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৫·০০
পঞ্চতন্ত্র বয়স্কের পদাবলী ॥ বিমানবিহারী মজুমদার ১২·০০
পিতৃস্মৃতি ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬-০০
পুণ্যস্মৃতি ॥ সীতা দেবী ১০-০০
পৌরাণিকী ॥ দীনেশচন্দ্র সেন ৬-০০
প্রেমে আছে শুধু একজন ॥ আব্বাস/গোপালশঙ্কর ৫·০০
বঙ্কিমচন্দ্র ॥ মণি বাগচি ৬-০০
বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন ॥ অমিয়সূদন ভট্টাচার্য ১২-০০
বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মননসাধনা ॥ সত্যনারায়ণ দাস ১৬-০০
বিশ্বসন্তান ॥ সুনীলকুমার গুহ ৫·০০
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ॥ অমিয়সূদন ভট্টাচার্য ২০-০০
বাংলার চৈতন্য ॥ অন্নদাশঙ্কর চৌধুরী ৬-০০
বাংলা উপন্যাসের উষা-সন্ধানে ॥ আলোক রে ১২·০০
বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ চৌধুরী ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় ১২-০০
বাংলা সাহিত্যে মধ্য শহীদুল্লাহ ॥ আজহারউদ্দীন খান ৭-৫০
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ॥ প্রমথনাথ বিশী ৬·০০
বাংলার গীতিকার ও গানের নানাদিক ॥ রাজেশ্বর মিত্র ৮·০০
বাংলার পুরুষ্কারী ॥ দীনেশচন্দ্র সেন ৮-০০
বিদ্যাপতি পদাবলী ॥ সারদাচরণ মিত্র/মিত্র ও মজুমদার ২৫·০০
বিদ্যাসাগর ॥ সবিতা চক্রবর্তী ৬·০০
বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ ॥ সারস্বত সমাজ, মেদিনীপুর ২০-০০
বিপ্লবরত্নাকর মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ ॥ সান্যাল ১০-০০
বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য ॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায় ২০·০০
বন্ধ্যপথ ॥ সত্যপ্রিয়রঞ্জন বক্তৃতা ৬·০০
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ১-৫০
ভক্তকবি রামপ্রসাদ ও উৎকলে নবযুগ ॥ অবন্তী দেবী ৬-০০
ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ ॥ গিরিজাশঙ্কর ৬-০০
ভারতপথিক রামমোহন ও রাধানগর ॥ কল্যাণ ব্রহ্মচারী ১০·০০

ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ॥ সুধা সেন ১০-০০
ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ ॥ দিলীপ রায় ৬-০০
ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় ॥ সুকুমার বিশ্বাস ৭·৫০
মনীষী স্মরণে ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১০·০০
মন্ত্র ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল/বঙ্কিমচন্দ্র রায় ৭-০০
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ॥ অমিত চক্রবর্তী ২৫-০০
মহাপঞ্চক গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ সুধা সেন ৮-০০
মাইকেল ॥ মণি বাগচি ৭_০০
মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন ॥ দেবেশ দাস ২৫-০০
মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ ॥ বাসু ও দত্ত ১৮-০০
যুগসন্ধি, আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা ॥ সৌরেন্দ্রনাথ
৩-৫০
যুগান্তর ॥ শিবনাথ শাস্ত্রী ৮-০০
রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা ॥ সত্যবতী দে ২২-০০
রবীন্দ্র উপন্যাসের পথম পর্যায় ॥ মৈত্রেয়ী দেবী ৮-০০
রবীন্দ্র কাব্যের [illegible] ॥ গৌরীপ্রসাদ ঘোষ ৭_০০
রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ ১।২ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস ৭-৫০।১০-০০
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা ॥ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-০০
রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রন্থ ১।২।৩ ॥ প্রফুল্ল দাস
৫-০০।৭-০০।৭-০০
রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস ॥ পল্লব মজুমদার ৩২_০০
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ॥ সতীশচন্দ্র কালগুপ্ত ১০.০০
রবীন্দ্রনাথে শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ॥ সুনীলচন্দ্র সরকার
৬-০০
রাগাম্বুধি ॥ প্রফুল্লকুমার দাস ১৩-০০
রাজনারায়ণ বসু : জীবন ও সাহিত্য ॥ অজিত ঘোষ ৫০-০০
রামমোহন ॥ মণি বাগচি ৬·০০
শিল্পের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ॥ ক্ষুদিরাম চৌধুরী ৮-০০
শরৎচন্দ্র : দেশ ও সমাজ ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬-০১
শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ ॥ নগেন্দ্রনাথ অধিকারী ৩·০০
শেলী ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২·৫০
শ্রীকৃষ্ণ কথামৃতম্ ॥ বিমল দাশ/বিমানবিহারী ১৭-০০
শ্রীরামকৃষ্ণায়ন ॥ মাখন শর্মা ৪·১০
শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাপথের প্রসঙ্গে ॥ গিরিজাশঙ্কর ৫·২০
সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০
সঙ্গীত রত্নাকর ॥ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮-০১
সঙ্গীতে সুরের ॥ হারাধন/সাধন ভট্টাচার্য ৫-০০
সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ॥ নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৬·০০
সমন্বয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ॥ তারিণী চৌধুরী ১৮·০০
সমাজের আত্মজাগরণের ইতিহাস ॥ গুরুদাস বন্দ্যোঃ ২০-০০
সমাজতান্ত্রিক অর্থবিজ্ঞান ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪-০০
সমাজসংস্কারকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ ॥ পরমেন্দু মুখোঃ ১০·০০
সাহিত্য সমালোচনা ॥ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা ১০·০১
সাহিত্যসাধক শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ হারিপদ ঘোষ ১০-০০
সাহিত্যতত্ত্ব ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭·০০
স্বাধীনতা সংগ্রামে নবদ্বীপ ॥ সুরেশচন্দ্র দে ৮·০০
স্বাধীনতা সংগ্রামে ॥ অমিয়নাথ সান্যাল ৭-০০
হুগোপাধ্যায় সঙ্গীতের কাহিনী ॥ দীপক্ষর সেন ৪-০৫
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস ॥ ধীরেন্দ্রকিশোর ২·৫০
হিন্দুস্থানের ঐতিহ্যের [illegible] ॥ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮·০০

জিজ্ঞাসা ॥ প্রকাশন বিভাগ : ১।১ কলেজ স্কো. কলিকাতা—৯
বিক্রয়কেন্দ্র : ১৩৩।১, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলি—২৯ ॥
৩৩ কলেজ রো. কলি—৯

CENTRAL LIBRARY

জন্যে বাড়ী আমি ঠিক করেছি। শীগগিরই সেখানে উঠে যাব—

একটুক্ষণের মধ্যে ফুলেবাসিয়াও মুখর হয়ে উঠল। আমি আর থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা ফুলেবাসিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করি রাগ করবে না তো?

সে বললে—না না আপনারা বন্ধু লোক আপনাদের কথায় কি রাগ করতে আছে?

জিজ্ঞাসা করলুমে—অনেকগুলি ধনী লোক তোমায় অনুরোধ করেছিলেন তারা নিরাশায় ফিরে গিয়েছে। শেষকালে তোমার মধ্যে তুমি কি দেখলে—

ফুলেবাসিয়া আমার কথার মাঝখানে বললে—ওর ওপর বড় মায়া পড়ে গেল। তাছাড়া দিনরাত সহীনের সঙ্গে খিটিমিটি আর ঐ বুড়ো কে সহ্য করতে পারলুম না। তার ওপরে দেখলুম মানুষটা ভালো—তাই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম।

জেবা বললে—কিন্তু ভাই, তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করো আমরা যতদিন বেঁচে আছি একথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না—

প্রতিজ্ঞা করলুম ফুলেবাসিয়া খপ করে আমার দু হাত ধরে বললে—কারুকে বলবেন না। আমার স্বামী খবর পেলে নির্ঘাৎ কতকগুলো মার্কিণই আনা পুলিশ হবে।

ফুলেবাসিয়ার হাত ধরে বললুম—তুমি নিশ্চিন্ত থাক—কারুকে বলব না।

জেবার কল্যাণে জেবদুলঁভ ফুলেবাসিয়ার সঙ্গে আলাপ করলুম।

কন্সেলবনের কাছে ফুলেবাসিয়াও জেবা-শিশুর কথা প্রকাশ না করলেও তার সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত রইল না। কোথায় গেল সে—কেন আসছে না—কেন রাগ করেছে ইত্যাদি। যাই হোক দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে আমি কিংবা নির্মল কেউই আর ওদিকে যাইনে।। একদিন নির্মল জেবার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল—তার বাবা মারা গিয়েছেন। সে নিজের জিনিস-পত্তর বেচে বন্ধকবাড়ীর ভাগ ভাইদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

দিন কাটতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই চাকরি পেয়ে প্রসন্ন হতে লাগল। ফুটে ফুটবল খেলা ছেড়ে ভবের খেলা সুরু করবার ডাক পড়ল। মাঠ থেকে ঘাট, ঘাট থেকে আড়তদারি কোম্পানি ত্রিকোণীতে ঘা খেয়ে ফিরতে লাগলুম। গুরুজনদের অনুশাসন তখনও একেবারে নির্মমতায় আড়ষ্ট সাধারণের কল হাতে হাত লেগে ছোলায়। তখনকার যুগে এখনকার মত চাকরি এত সহজ ছিল না। দোঁড়ের জোর না থাকলে চাকরি পাওয়াই শক্ত না। অনেক উমেদারির পর একটা বড় সওদাগরি আপিসে শেষ কালে চাকরি জুটে গেল।

কিছুদিন যায় তারা বললে—বিয়ে-থা না করলে উন্নতি হবে। বাস্ বিয়ে চলে গেলুম।

দীর্ঘদিন—অতি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর বদলী হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলুম। মাথার চুল ঝিচুড়ি রোগে চলল, দাঁত পড়তে সুরু করেছে—এই অবস্থা। কলকাতায় ফিরে এসে দেখলুম বংশী হুক্কাওয়ালার অবস্থা অনেক ফিরে গিয়েছে।

তাদের মাটকোঠা হয়েছে অনেক বিস্তৃত। শুনলুম তারা টাকা ধারধোর দেবার কারবারও করে। কারা যেন দু-তিন-খানা বাড়ীও তাদের কাছে বাঁধা রেখেছে। একখানা নিজস্ব বাড়ীও করে ফেলেছে। তাছাড়া ওরা আবার খুচরোর সঙ্গে পাই-কারী কারবারও আরম্ভ করেছে। বস্তা বস্তা চালডাল্লা ছোলাভাজা কড়াই ভাজা ফুটো খই পাইকারী কারবারীরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বংশী ও তার ভাইয়েদের হাতে সোনার চাপা উঠেছে। বংশীর বেশ ভুঁড়িও হয়েছে। মেয়েরা-বৌরা আর তাদের কার-বারের কাজ করে না। ছটা-সাতটা লরিগর দিন-রাত কাজ করে চলেছে। এক কথায় অবস্থা তারা ফিরিয়ে ফেলেছে।

ইওরোপে তখন যুদ্ধের সাড়া লেগেছে। সকলেই নিজের ঘাঁটি সামলাচ্ছে—হিটলারের হিট অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতদিন সবাই ঘরোচ্ছিল তাই মধ্যে সে নিজেকে অসম্ভব শক্তিশালী করে তুলেছিল। তার কিছু কিছু ঢেউ আমাদের ভারতবর্ষে একেও লাগছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা যুদ্ধ ঘোষিত হলো।

যুদ্ধ ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন সকলেই উন্মাদ হয়ে অপেক্ষা করছিল—যে যার ঘরে পারল লাফিয়ে পড়ল। আমাদের শহরের হালচালও গেল বিগড়ে। সন্ধ্যায় দীপমালা নিষ্প্রভ হতে হতে একেবারে নিভে গেল। দোকানপাট সব বন্ধ। সরকার জীবনধারণের জন্য যারা বিক্রেতার ভার নিজে নিলেন। ফলে একশ-দেড়শ বছর ধরে এখানে যারা মুদির দোকান করে আসছে তারা কাপ বন্ধ করে স্নান মুখে দেশে ফিরে গেল। সন্ধ্যে হলেই সব বন্ধ। বংশী হুক্কাওয়ালার দোকানও এরি-মধ্যে টিমটিম করে চলে একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

পাড়ার লোক সন্ধে—তাই তো বংশী, তোমাদের এতকালের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল।

বংশী ওপরের দিকে হাত দেখিয়ে বললে—পরমাত্মা যা করবেন তাই হবে।

কিন্তু সেই দিনই পাড়ার লোক সবিস্ময়ে দেখল বংশীর মাটকোঠার সামনে খানতিনেক লরী বস্তা বোঝাই হয়ে এসে দাঁড়াল। লরীতেই লোকজন ছিল। তারা কটপট নেমে মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি বস্তাগুলো দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল। বস্তাগুলো ছোট বড় লাল সাদা নানান আকারের কাঁকরে ভরা। তারপর কেওকিন মাটিপাথরোনো তার মধ্যে আছে। সারা রাত ধরে সেই সব কাঁকর বালি ধুলো চালে ডালে ছোলায় মটরে কলায়ে ধনে-জিরেয় আটায় ময়দায় মিশ্রিত হয়ে শেষ রাত্তিরে তিন লরীর বদলে ছ লরীর মাল চালান হয়ে গেল। আবার দিনের বেলায় আসতে লাগল চাল ডাল আটা ময়দা। বংশীরা ফুলে ফেঁপে উঠল। শুধু বংশীরা নয়—এরকম অনেক বংশী অর্থলোভে পাইকারি করে নরহত্যা করতে লাগল।

যুদ্ধের ঘূর্ণিতে মানুষের মাথা গেল বিগড়ে। সংসারের হাওয়াই উলটে গেল। ছেলে বাপকে ধরে ঠেঙাতে লাগল—চাকর মনিবকে। চোর হল সাধু সাধু হল চোর, মেয়েরা হয়ে উঠল বেহুঁশোয়া। এর মধ্যে বিদেশ থেকে দলে দলে সৈনিক এসে পড়ল। সহরে কিপ গাড়ী সাজোয়া গাড়ী দিন রাত পথের উপর দিয়ে ছুটতে লাগল। যুদ্ধ নরহত্যা করবার উল্লাসে তারা লোক-চাপা দিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি লোক-চাপা দিয়ে তারা হাসতে হাসতে ছুটে গেছে। লোকে ছুটেছে—কোথায় টাকা, হা টাকা, বো টাকা! এই উন্মাদনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যে দেখেছে নটরাজের তান্ডব সেই জেনেছে কি মহান কি বিরাট আর কি অপ্রতিহার্য এই ধ্বংসের লীলা।

এরই মধ্যে একদিন দেখা গেল বংশীদের অত বড় মাটকোঠা ভেঙে একেবারে মাঠ করে ফেলা হচ্ছে। সে সময় এক মুঠো সিমেন্ট কিম্বা এক পাত ইস্পাত শতগুণ দাম দিয়ে লোক যোগাড় করতে পারে না সেই সময় বংশীর বিরাট প্রাসাদ গড়তে লাগল। দাঁত-দাঁত করে এক বছরের কাজ দু-মাসেই শেষ হয়ে গেল। একদিন যেখানে বংশী হুক্কা-ওয়ালার ছোট ঘর ছিল সেখানে উঠে পড়ল এক বিরাট প্রাসাদ। তাদের বাড়ীর কাছেই মস্ত একটা খালি জায়গা পড়েছিল সেটা কিনে নিয়ে বংশী নিজের নামে বাজার বসিয়ে ফেলল। বাজারের চারদিকে তেতলা বাড়ী—বাড়ীর ওপর লেখা হল বংশীধরের বাজার। সহরের আর একদিকে আর একটা বাজারের নাম হলো 'গণেশ মার্কেট,' আর একটার নাম হলো 'রামধারুর বাজার'। বংশীরা এক এক ভাই আট-দশ লাখ টাকার ওয়ার-কন্ট কিনে ফেললে। বংশীর বাড়ীর গেটে আমার সেদিন বড় বড় পেতলের হরফে লেখা হলো— 'বংশীপ্রসাদ জয়সোয়াল এন্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড'। দরজার আর এক দিকে লেখা হলো 'জয়সোয়াল প্যালেস'। গেটের দুদিকে বন্দুকধারী সেপাই বসল। আরো আশ্চর্যের বিষয় বংশীকে সরকার দুদিন থেকে নিয়ে গেল। জেনারেল পোস্টাফিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বংশীপ্রসাদ ওয়ার বন্ড সম্বন্ধে লেকচার দিতে এল।

সেদিন ছিল সহরময় ছুটি। ছেলে বেলায় মায়ের হাত ধরে আমরা দুই ভাই দুর্গা দেখতে যেতুম। মেছোবাজারে একটা বাড়ীর উঁচু রক থেকে আমাদের চাঁড়ের ওপর দিয়ে মা'কে নিয়ে পালে পালকিতে। সেই সন্ধ্যার ধুনি ও কলরোল, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, আগুন খেলা, লুপ খেলা— এই সব দেখতে দেখতে

আমাদের বুকের মধ্যেও দুরুদুরু বাজতে লাগল। কখনো ভয়ে, কখনো উৎসাহে সময়টা যে কি করে কেটে যেত তা বুঝতে পারতুম না। ফেরবার সময় দুই ভাইয়ে দুটো কিংকিংপোকা কিনে বাজাতে বাজাতে ফিরতুম। তারপর থেকে সখ করে কখনো মহরম দেখতে যাইনি। বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে দু-একবার যেতে হয়েছিল বটে, কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় কিছুই ভালো লাগেনি।

সেদিন ছিল আপিসের ছুটি। কাজকর্ম কিছুই নেই। খুড়ো-জাঠা আর অবশিষ্ট নেই যে ঘরে গঙ্গাযাত্রা করি— নিজেই গঙ্গাযাত্রা করলে হয় এমনই অবস্থা— দুপুরবেলা সার্কুলার রোডে মহরম দেখতে গেলুম। এক জায়গায় ভিড় একটু কম দেখে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। চোখের সামনে লাঠি খেলতে খেলতে দলের পর দল চলেছে। দেখলুম সেই আন্ডারওয়ারের ওপরে জরির ফিতে দেওয়া জামিয়ার বাহুল্য আর নেই— অধিকাংশেই পেন্টালান-হাফপ্যান্ট-হুলশার্ট পরে নেমেছে। এই সব দেখছি— এমন সময় দেখি আমার পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সে ধীরে ধীরে আমাকে লক্ষ্য করে দেখছে।

দেখলুম লোকটির মুখ হাত কান— সব কুষ্ঠরোগে ফুলে উঠেছে। মনের মধ্যে অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলুম— মনে হলো আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ি। সেই সময় লোকটি ঘুরে দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমিও তার মুখের দিকে তাকালুম— মুখটা অসম্ভব ফোলা, চোখদুটো কোথায় গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে— কিন্তু দেখতে দেখতে সেই দুই চোখে পরিচয় ভরে উঠতে লাগল। বলে উঠলুম— আরে! দেবাশিস যে। কি খবর?

ভাঙা ভাঙা গলায় সে বললে—চিনতে পেরেছেন?

আপনি বললুম— দেবাশিস, আমাকে আপনি বলছ কেন?

দেবাশিস বললে— কি জানি, যদি কিছু মনে করো।

দেবাশিস চলতে আরম্ভ করল উল্টো মুখে। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম। জিজ্ঞাসা করলুম— ফুলবাসিয়ার খবর কি?

সে বললে — ফুলবাসিয়া মারা গেছে বছর দুই হলো। তুমই তো প্রথমে এই রোগ বয়। ডাক্তার দেখে বললে— এ বড় খারাপ জাতের কুষ্ঠ। একে একুণি আশ্রমে পাঠিয়ে দাও, সেরে যাবে। মধ্যপ্রদেশে বড় আশ্রমে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিলুম কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাইল না। বললে— তোমাকে ফেলে কোথাও গেলেই আমি মরে যাব। দেখতে দেখতে সে ফুলে ফেটে পড়তে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যে সে মারা গেল। তারপরেই আমাকে এই রোগে ধরেছে।

বললুম— কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তোমার— তোমার মুখ— তোমার চেহারা!

দেবাশিস বললে—খালি আমার চেহারার পরিবর্তন দেখছ? সমস্ত দুনিয়াটা কি ফুলে ফেঁপে পচে ফেটে পড়ছে না? কি বদলে যায়নি? আমাদের ছেলেবেলার মেয়েদের নারীর ধর্ম সমাজ— সবই তো কি অদ্ভুত বদলে গেছে। এর মধ্যে যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে সেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

বললুম— তুমি কোনো আশ্রমে চলে যাচ্ছ না কেন?

দেবাশিস বললে— আমি যাব ঠিক করে ফেলেছি। বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করতে যা একটু দেরি।

চলতে চলতে দেবাশিস বললে— আশ্রমে যাবার আগেই আমি একটা পরিবর্তনের আশা করছি।

জিজ্ঞাসা করলুম— কি পরিবর্তন?

—মৃত্যু।

কথাটা বলেই দেবাশিস বাঁদিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। তার পা-দুটোও অসম্ভব রকমের ফুলে উঠেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। অবশেষে সেই চেহারা ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

তারপর দুর্নীদাসের একটা গলিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ দাস-এর নতুন বই

স্বপ্ন হ'তে বিদায়

দাম : ৮·০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অবনীন্দ্র রচনাবলী

১ম ১৪·০০ ২য় ২২·৫০ ৩য় বন্ধস্থ

বিনয় ঘোষের

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

৩ খণ্ডে প্রকাশিত হবে, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪০; ৩০শে জুনের মধ্যে ১৫ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হলে ২৫% কমিশন পাবেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ গল্প ১২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরোগ্য নিকেতন ১৫
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
উত্তর আহ্লী ১০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
হাসের আকাশ ৪

প্রবোধকুমার সান্যালের
রাশিয়ার ডায়েরী ২৫

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
বুদ্ধ যখনবর ৮-৫০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
ষৈদেশিকী ৫·৫০
রাধা চন্দ-র
জেনানা কাউক ৬-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অন্ধকারান্তা ৬

বনফুলের
সপ্তর্ষিলোক ৬-৫০
সতীনাথ ভাদুড়ীর
জাগরী ৭ দিগন্তরাল ১০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বনাকার মন ৬-৫০

নারায়ণ সান্যালের
নাগচম্পা ১০

শিবনারায়ণ রায়ের
ভারির নির্বাসন ও অন্যান্য
ভাবনা ৭·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সমুদ্রের ছড়া ৭-৫০

শিশিরকুমার সরকারের
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
ও মূল্যায়ন ১২

নীলকণ্ঠের
রাজপথের পাঁচালী ৬

জগদীশ গুপ্ত
উত্তরাধিকার ১২

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
ছেলেবেলার দিনের কথা ৮

বিমল মিত্রের
কথা চরিত্র মানস ৬

বঙ্গেশ্বর রায়ের
বাসরঘর ৫

অমল মিত্রের
কলিকাতায় বিদেশী রন্ধনালয় ৬

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের
মানব কল্যাণে রসায়ন ৭·০০

গোপাল হালদারের
অগ্নিগর্ভ কুরু ৪
ডাঃ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা কবিতার
রূপরেখা ১৫

সুবোধ ঘোষের
জুলুস ১৫
শঙ্কর
কালো ঘোড়া ৭
চাঁদকা সেনের
রাজপথ জনপথ ১০
সমুদ্র শিহর ৮

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পদ্মানদীর ইতিকথা ৮
ধরাবাঁধা ও বন্ধন ১০-০০

বিনয় ঘোষের
বাংলার বিদ্রোহ সমাজ ৭·৫০
রমাপদ চৌধুরীর
পিকাপলম্ব ৩·৫০
সুরেশচন্দ্র সাহনর
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে ৫·৫০
গৌরচন্দ্র চক্রবর্তীর
দিগন্তের রং ৭ মধুবন ৭
দেবল দেববর্মা
বাড়ি ৭

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২

রেবা রোধসি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র তুণীবর্মাকে রাজ্য হইতে নির্বাসন দিতে হইল। রাজা শিববর্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ইন্দ্রবর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুণীর যে অপরাধ করেছে তাতে মৃত্যুই তার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু সে আমার পুত্র, তাকে চরম দণ্ড দিতে আমার হৃদয় বাধিত হচ্ছে। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। তাকে বলে দিও, আমি তার মুখদর্শন করতে চাই না সে যেন আর কখনও এ রাজ্যে পদার্পণ না করে।

যুবরাজ ইন্দ্রবর্মা বিষণ্ণ মুখে বললেন, —যথা আজ্ঞা আর্য।

ন্যূনাধিক সাত শত বছর পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে মহেশগড় নামে এক রাজ্য ছিল। রাজ্য আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী। কয়েক বছর আগে আলাউদ্দিন খিলজি যখন দেবগিরি রাজ্য লুণ্ঠনের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন তিনি মহেশগড় রাজ্যের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু তদবধি নর্মদা অববাহিকার রাজ্যগুলিতে শঙ্কা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। যবন জাতি অতি কপট ও নিষ্ঠুর। তাহারা বিশ্বাসঘাতক বন্ধুত্বের ভান করিয়া সম্ভাব-প্রতিপন্নকে হত্যা করে। যবন সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মহেশগড় রাজ্যও এই সন্ত্রাসের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। রাজশক্তি সৈন্যদল গঠন করিয়া আততায়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, যবনেরা ফিরিয়া আসিল না। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সতর্কতাও শিথিল হইতে আসিল। সৈন্যদল হ্রাস পাইল, রাজপুরুষদের বাহিরের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আভ্যন্তরীণ কলহ কূটনৈতিক খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে। শত্রু চোখের আড়াল হইলেই মনের আড়াল হইয়া যায়। আবার যখন শত্রু আচম্বিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহা অপ্রত্যাশিত উৎপাত বলিয়া মনে হয়। আমরা অতীতকে বড় সহজে ভুলিয়া যাই, তাই বোধ হয় আমাদের ইতিহাসের প্রতি আসক্তি নাই।

মহেশগড়ের রাজা শিববর্মার বয়স হইয়াছে। সেকালে রাজাদের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, যিনি যতগুলি রাজকন্যা ঘরে আনিতেন তাঁহার মর্যাদা তত বেশি। শিববর্মার সাতটি মহিষী পুত্রসংখ্যা দ্বিশের উর্ধ্বে। তন্মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, অন্য রাজকুমারদের কোনো কর্ম নাই। তাঁহারা আহার, বিহার ও মৃগয়া এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া জীবনযাপন করেন। পুরুবংশক্রমে এই উদ্বৃত্ত রাজপুত্রেরা এবং তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রেরা রাজপুত জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহজাত কাণ্ডজ্ঞান ছিল; তাই অদ্যাপি রাজপুত পুরুষেরা সৌর্য-বীর্য বাহুবল ভুবন বিখ্যাত এবং রাজপুত রমণীর গর্ভছন্দে রাজধানীর গর্ব সুপরিস্ফুট।

তুণীরবর্মা রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভজাত চতুর্থ পুত্র। তিনি কোনোকালে রাজা হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব দুরন্ত ও দুঃশীল, কেহ তাঁহাকে শাসন করিতে পারিত না। তারপর তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার স্বভাব আরও প্রচণ্ড ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, দেহ তেমনিই বলশালী, তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে কেহ সাহস করে না। উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি

স্বচ্ছন্দচারী হইয়া উঠিলেন। ভোগবাসনে তাঁহার রুচি রাজকীয় ভক্তাইয়ের পন্থা অবলম্বন করিল; জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।

রাজপুত্রেরা কেহই শান্তশিষ্ট মিতাচারী হন না; কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রা অতিক্রম করিলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। তুণীরবর্মার আচার-আচরণ লইয়া রাজার নিকট নিত্য অনুযোগ অভিযোগ আসিতে লাগিল। রাজা পুত্রকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে তুণীরবর্মা এক অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিলেন, এক অন্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্যাকে অপহরণ করিলেন।

এ মহাপাতকের মার্জনা নাই। রাজা পুত্রকে কারারুদ্ধ করিলেন, তারপর তাহার নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

কারাগার হইতে তুণীরবর্মাকে মুক্ত করিয়া যুবরাজ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরদ্বারের অভিমুখে চলিলেন। আগে পিছে দুই দল ধনুর্ধর রক্ষী চলিল।

রাজপথের দুই পাশে নাগরিকের ভিড় জমিয়াছে। অধিকাংশই নীরব কচিৎ কেহ ধিক্ ধিক্ করিয়া তিরস্কার জানাইতেছে। তুণীরবর্মার মুখে কখনও হিংস্র ভ্রূকুটি, কখনও খরশান ব্যঙ্গ হাসা। তিনি পাশে মুখ ফিরাইয়া যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন —আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—বধ্যভূমিতে।

ইন্দ্রবর্মা ধীর স্বরে বলিলেন—না, মহারাজ তোমাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়াছেন।

তুণীরবর্মার অধর বিদ্রূপে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, তিনি বিকৃত হাসা করিয়া বলিলেন, অসীম করুণা মহারাজের। তোমার যদি অধিকার থাকত তুমি বোধ হয় আমার প্রাণদণ্ড দিতে।

ইন্দ্রবর্মা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলিলেন, উত্তর দিলেন না।

নগর হইতে রাজ্যের সীমান্ত বহুদূরে। অশ্ব দাঁড়াইয়া তাঁহারা নর্মদার তীর ধরিয়া পূর্বমুখে চলিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে রাজ্যের সীমান্ত স্তম্ভ দেখা গেল। সীমান্ত স্তম্ভের নিকট আসিয়া ইন্দ্রবর্মা অশ্ব স্থগিত করিলেন, একটি কোষবদ্ধ তরবারি তুণীরবর্মার হাতে দিলেন, স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন— ভাই এই অশ্ব এবং এই তরবারি আর এখন তোমার সম্পত্তি। রাজার আদেশে তুমি নির্বাসিত হয়েছ। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার ভুজবলই তোমার ভাগ্য। যাও, আর কখনো এ রাজ্যে ফিরে এসো না। কিন্তু মাঝে মাঝে মাতৃভূমিকে স্মরণ কোরো।

তুণীরবর্মা তীব্রতিক্ত ব্যঙ্গ হাসা করিয়া বলিলেন— মাতৃভূমি! মহেশগড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু। যদি কোনোদিন ফিরে আসি, একা ফিরব না, এই তরবারি হাতে নিয়ে ফিরব আসব।

ইন্দ্রবর্মা জানিতেন ইহার ক্রোধের আস্ফালন মাত্র, তিনি দুর্মদ সাহসী ও হঠকারী, কিন্তু সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্ব করা তুণীরবর্মার সাধ্যাতীত। ইন্দ্রবর্মা শান্ত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন, নিজের বংশে কলঙ্ককারোপ কোরো না।

তুণীরবর্মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন— আমার বংশ নাই, মাতৃভূমি নাই। পৃথিবীতে আমি একা। বলিয়া তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পূর্বদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

সে রাত্রি তুণীরবর্মা নর্মদাতীরের এক বৃক্ষতলে কাটাইলেন, পরদিন আবার পূর্বমুখে চলিলেন। নর্মদার তীর কখনও সমতল, কখনও শৈলবন্ধুর। কদাচিৎ দুই একটি আরণ্যক জাতির গ্রাম। গ্রাম হইতে খাদ্য মিলিত।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের প্রাককালে তুণীরবর্মা একটি গ্রামের নিকটবর্তী হইলেন; দেখিলেন নদীসৈকতে কয়েকটি আর্টবিক জাতীয় যুবতী গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নিরাবরণ বক্ষে বন্য ফুলের মালা, কেশকুন্তলীতে শিখিপুচ্ছ।

তুণীরবর্মা অশ্ব দাঁড় করাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তারপর অশ্ব হইতে নামিয়া যুবতীদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতীরা ভয় পাইল না, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটি যুবতী হাসিল না, কাছে আসিয়া তুণীরবর্মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর নিজের গলার মালা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল।

অন্য যুবতীরা কলহাস্য করিতে করিতে ছুটিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

তুণীরবর্মা যুবতীকে হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলেন, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি?

যুবতী স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—রেবা।

কিছুক্ষণ পরে একজন আর্টবিক পুরুষ ভয় পাইয়া উপস্থিত হইল, তুণীরবর্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, —এ কে?

যুবতী বলিল— ওর গলায় আমি মালা দিয়েছি, ও আমার পুরুষ।

পুরুষেরা তখন তুণীরবর্মাকে প্রশ্ন করিল—তুমি কে?

তুণীরবর্মা তখন তরবারির মুষ্টিতে হাত রাখিয়া বলিলেন— আমি রাজপুত।

পুরুষদের মধ্যে যে সর্বাধিক বয়স্ক সে বলিল —রাজপুত, এখানে এসেছ কেন?

তুণীরবর্মা বলিলেন—আমাকে কেউ ভালবাসে না, তাই রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছি।

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, —তুমি আমাদের গ্রামে থাকবে?

তুণীরবর্মা বলিলেন—থাকব।

গ্রামের একান্তে নর্মদার তীরে কুটির বাঁধিয়া তুণীরবর্মা রহিলেন। রেবা এই নূতন ঘরের ঘরণী।

রেবার শ্যামল দেহটি যেমন পদ্ম কমনীয়, তাহার মনও তেমনি শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্ন। তুণীরবর্মা এমন রমণী পূর্বে দেখেন নাই। নাগরিক রমণীদের অন্তরে ক্ষুধা অধিক, ভ্রান্ত কল্প। তুণীরবর্মা রেবাকে লইয়া সুখের সাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

আর্টবিকদের জীবনে অধিক বৈচিত্র্য নাই। তাহারা অল্প চাষবাস করে, নদীতে মাছ ধরে, ধনুর্বাণ লইয়া বনে শিকার করে। মহুয়া এবং বনমধু হইতে আসব প্রস্তুত করিয়া তাহারা পান করে, নেশায় মত্ত হইয়া নৃত্যগীতে মাতামাতি করিতে করিতে কে কাহার স্ত্রী কে কাহার পুরুষ ভুলিয়া যায়। আদিম অনিরুদ্ধ তাহাদের জীবন, সংস্কারের বন্ধনে তাহাদের মন পঙ্গু হইয়া যায় নাই।

তুণীরবর্মার মনে চিন্তা নাই। তিনি যখন ইচ্ছা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটেন, তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুক্ষেপে নর্মদার জল তোলপাড় হয়। কখনও তিনি রেবাকে বসিয়া জলসভায়ে মাছ ধরেন। কখনও বা গ্রামের যুবকদের সঙ্গে বনে গিয়া মৃগয়ার হরিণ বরাহ শিকার করিয়া আনেন। আর্টবিকদের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহারাও রাজপুতকে আপন করিয়া লইয়াছে। তুণীরবর্মা উপলব্ধি করিয়াছেন যে অন্তরে তিনি বন্য আর্টবিক মানুষ, এই জীবনই তাঁহার প্রকৃত জীবন। এতদিনে তিনি স্বক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন। নাগরিক জীবন যাপনের জন্য তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র পিপাসা নাই।

কচিৎ সূর্যাস্তকালে নর্মদাসৈকতে একাকী বসিয়া নানা কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। নদীর স্রোত পশ্চিম দিকে বহিয়া চলিয়াছে। এখন যে-জল এখানে বহিতেছে সেই জল হয়তো কাল প্রাতঃকালে মহেশগড় নগরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইবে। মহেশগড়ের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার মন বিমর্ষ হয়। তিনি ভাবেন, মহেশগড় আমার জন্মভূমি নয়, মহেশগড়ের মানুষ আমার আপনজন নয়। এই নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম তাঁহার আপন স্থান, এই বন্য অর্ধনগ্ন মানুষগুলি তাঁহার পরমাত্মীয়, রেবা নাম্নী এই শ্যামলী মেয়েটি তাঁহার

For Your Bookshelf

J. STALIN
*On Chinese Revolution — 7.00
*On organisation — 1.50
*Marxism and the National Question — 3.50
*Works, Vol. 1 — 12.00
*Works, Vol. 2 — 15.00
David Guest
*Lectures on Marxist Philosophy — 5.00
Chen Po-ta
*Mao Tse-tung on Chinese Revolution — 1.60
C. P. C.
*Leninism or Social Imperialism — 0.60

New Book Centre
14, Ramanath Majumdar St.
Calcutta-9

অন্বেষণ। জীবনে তিনি আর কিছু চাহেন না।

এইভাবে দিন কাটিতে থাকে। বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়া যায়।

একদিন হেমন্তের দ্বিপ্রহরে তুর্গাবর্মা রেবাকে বলিলেন, 'চল রেবা, বনে শিকার করতে যাই।'

রেবা উল্লসিত হইয়া বলিল—'আমাকে নিয়ে যাবে?'

তুর্গাবর্মা বলিলেন,—'হাঁ আজ আর কেউ নয়, শুধু তুমি আর আমি।'

'বেশ চল।' বলিয়া রেবার মুখে একটু শঙ্কার ছায়া পড়িল—'ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়? বনে নেকড়ে বাঘ ভালো অনেক আছে।'

তুর্গাবর্মা বলিলেন,—'যদি রাত হয়ে যায়, দুজনে গাছের ডালে উঠে রাত কাটিয়ে দেব। আয়।'

নদীর ধারে অশ্বটি চরিতেছিল, তুর্গাবর্মা তাহার মুখে রজ্জুর বল্গা পরাইলেন, লাফাইয়া তাহার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, রেবাকে টানিয়া নিজের সম্মুখে বসাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

গ্রাম হইতে ক্রোশেক দূরে পশ্চিমে শাল পিয়াল মহুয়ে তিন্তিড়ীর বন। বনের কিনারে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তুর্গাবর্মা রেবার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। তুর্গাবর্মার হাতে ধনুর্বাণ আছে বটে কিন্তু মৃগয়ার দিকে মন নাই।

ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা। হাসিকৌতুক ছুতানাতার সহিত বহুক্ষণ বিহার করিবার পর বনবীথি নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। তুর্গাবর্মা যখন সময় সম্বন্ধে সচেতন হইলেন তখন প্রহরদ্বয়ের বনের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং সূর্যাস্ত হইতেও বিলম্ব নাই।

তুর্গাবর্মা বলিলেন,—চল্ চল্, এখনো বেলা আছে, অন্ধকার হবার আগে বন পেরিয়ে যেতে পারব। তিনি রেবার হাত ধরিয়া অরণ্য বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহাদের গতিরোধ হইল, উত্তর দিক হইতে গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তুর্গাবর্মা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দূরে যেন দুন্দুভি বাজিতেছে, তাহার সহিত রণোন্মাদ। এ শব্দ তুর্গাবর্মার অপরিচিত নয়—হস্তিবাহিনীর। তাঁহার নাসাপুটে স্ফুরিত হইল, তিনি শোন চক্ষু ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন।

দূরে এক সারি তরুর ফলক দেখা গেল; তারপর দেখা গেল অসংখ্য অশ্বারোহীর দল। তাহারা এই বনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

রেবা ভীতভাবে তুর্গাবর্মার হাত টানিয়া বলিল,—'ওরা কারা? আমার ভয় করছে, চল পালিয়ে যাই।'

তুর্গাবর্মা বলিলেন, 'সৈন্যদল আসছে, বোধ হয়, বোধ হয় এই বনে রাত্রি যাপন করবে। কিন্তু পালাব না। দেখতে হবে ওরা কারা?' তিনি একবার চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া একটি বৃহৎ পত্রহরিদ শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, বলিলেন,—চল, ওই গাছে উঠে লুকিয়ে থাকি।'

দুইজন শালবৃক্ষের উচ্চশাখায় উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘন পত্রের অন্তরাল হইতে তুর্গাবর্মা দেখিতে লাগিলেন, সৈন্যদল বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকট তাহাদের লৌহ নিরস্ত্রাণ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি অস্ফুট স্বরে রেবাকে বলিলেন,—ম্লেচ্ছ সৈন্য।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি তমসাচ্ছন্ন হইল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল বনের মধ্যে কাঠ যাপনের আয়োজন করিতেছে। কয়েক স্থানে আগুনের চুল্লী জ্বলিয়া উঠিল। যে বৃক্ষে তুর্গাবর্মা রেবাকে লইয়া লুকাইয়াছিলেন সেই বৃক্ষতলে একদল নিম্নতম সেনানী আগুন জ্বালিয়া আহারাদির সিদ্ধ পক্ক করিতে লাগিল। তাহাদের ঝলসিত মাংসের লোভা গন্ধ তুর্গাবর্মার নাকে আসিতেছে। তাহারা বাক্যালাপ করিতেছে; তাহাদের ভাষা অধিকাংশ দুর্বোধ্য, তুর্গাবর্মা কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে যাহা বুঝিলেন তাহার মর্মার্থ এই : ম্লেচ্ছ কাফুর নামক এক সেনাপতি এই ম্লেচ্ছ বাহিনীর অধিনায়ক; তাহারা দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছে, কিন্তু নর্মদা নদী পার হইবার পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে যত হিন্দু রাজ্য আছে, সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া যাইবে, যাহাতে পশ্চাৎ হইতে শত্রু আক্রমণ করিতে না পারে।

জন্মপূর্ণার বই

শিশু ও কিশোরদের জন্যে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ৬-০০

খুশির হাওয়া ৫-০০

কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

নাণ্টুমামার গাড়ি ৫-০০

শিশিরকুমার মজুমদার

আকাশে আগুন পাতালে আগুন ৭-০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ৬-০০

কমিকস : মযূখ চৌধুরী

মহাকালের মন্দির *১-৫০

পলাতক সূর্য্য (যন্ত্রস্থ)

জন্মপূর্ণা পাবলিশিং হাউস, ৭-ই লিণ্ডসে ষ্ট্রীট কলকাতা—৭০০০১৬

রাত্রি গভীর হইল। সৈন্যদল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ভূমিশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল, আগুন নিভিয়া গেল, বন আবার নিস্তব্ধ হইল। বৃক্ষশাখায় তুলীবর্মা বৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠাপণ করিয়া নিঃশব্দে রেবাকে কোড়ে তুলিয়া লইলেন। রেবা যদি ঘুমের ঘোরে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় কিংবা চিৎকার করিয়া ওঠে তবেই সর্বনাশ।

রাত্রি শেষ হইল। দুন্দুভি ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। স্কন্ধে সৈন্যদল বোড়ায় চড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল।

তুলীবর্মা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মুখে নিদ্রাহীন রাত্রির ক্লান্তিরেখা, কিন্তু আরক্ত নেত্রে চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। রেবা তাঁহার হাত ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পূর্বদিকে লইয়া চলিল। রেবার চক্ষু সতর্কভাবে চারিদিকে ফিরিতেছে, তুলীবর্মা চিন্তায় আচ্ছন্ন। বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রেবা বলিয়া উঠিল —কৈ, আমাদের ঘোড়া কোথায়?'

তুলীবর্মা চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন—'ঘোড়া নেই! বনের মধ্যেও নেই?'

রেবা বলিল, 'না। থাকলে দেখতে পেতাম।'

তুলীবর্মার মুখ কঠিন হইল, তিনি বলিলেন, 'স্কন্ধ তস্করগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।'

ফিরিয়া তুলীবর্মা উত্তর পূর্ব করিয়া আহার করিলেন। তারপর নর্মদার তীরে গিয়া বসিলেন। রেবা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া পাশে বসিল।

নর্মদার স্রোত কলকল শব্দ করিয়া চলিয়াছে; যেদিকে তুলীবর্মার মাতুলভূমি সেইদিকে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তুলীবর্মার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল, হৃদয়ে অসহ্য আবেগ উপস্থিত হইয়া উঠিল। তিনি স্থির বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গভীর স্বরে বলিলেন,—রেবা!

রেবা তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ করিতেছিল, শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল—'কি?'

তুলীবর্মা বলিলেন—'আমি চললাম। মহেশগড়ে সংবাদ দিতে হবে, শত্রু আসছে।'

রেবা কাঁদিয়া উঠিল—'তুমি চলে যাবে?'

তুলীবর্মা বলিলেন—'আমাকে যেতেই হবে। আমার জন্মভূমির সমস্ত নাড়ী আমায় টানছে, না গিয়ে উপায় নেই।'

রেবা ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া বলিল—'কিন্তু তুমি যাবে কি করে? তোমার ঘোড়া নেই, পথ অনেক দূর এগিয়ে। তুমি কি ওদের আগে পৌঁছতে পারবে?'

'পারব।' তুলীবর্মা নর্মদার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—'এই নদী আমাকে পৌঁছে দেবে।—রেবা কেঁদো না, যদি আমি বেঁচে থাকি, আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'

তিনি রেবাকে একবার বক্ষভরে বুকে চাপিয়া লইলেন তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া হাসিমুখে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সেদিন সূর্যাস্তকালে স্রোতবাহিনী নর্মদার তীরে একটি জটিবটে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নদীতে জল আনিতে গিয়া দেখিল, স্রোতের মাঝখান দিয়া একটা মানুষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা নিরুৎসুক চোখে দেখিল, গ্রাহ্য করিল না। একটা কাকের যদি ডুবিয়া মরে, বলুন কি?—

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে মহেশগড় জলপুরীর পশ্চাতে বাঁধানো ঘাটে একটি মানুষ জল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় তাহার সিক্ত দেহ কিকমিক করিয়া উঠিল। ঘাটে প্রহরী নাই। রাজপ্রাসাদ দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে।

কিন্তু তুলীবর্মা জানিতেন, কী করিয়া বন্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়। তিনি গুপ্তপথে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর যুবরাজ ইন্দ্রবর্মার মহলে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন—'দ্বার খোলো—দ্বার খোলো—'

ইন্দ্রবর্মা নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তুলীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—'একি! তুলীর—তুমি?'

তুলীবর্মার দেহ এতক্ষণে অবশ হইয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন—'শত্রু আসছে—স্কন্ধ শত্রু মহেশগড় আক্রমণ করতে আসছে—তোমার প্রস্তুত হও—' এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি জ্ঞান হারাইয়া অবসন্ন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

*

সেবার মালিক অক্ষরের সৈন্যদল মহেশগড় রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

অন্নপূর্ণার বই

কবিতা :
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
সুখে আছি ৫-০০

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের
জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব ব'লে ৪-০০

জীবনী গ্রন্থ :
মনি বাগচি-র
বিজ্ঞান সাধক সত্যেন বোস ৭-০০

উপন্যাস :
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
মোহানার নৌকো (যন্ত্রস্থ) ৬-০০

রম্যরচনা :
সুশীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
নীল লোহিতের যৎসামান্য (যন্ত্রস্থ) ৭-০০

অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস ৭/ই লিণ্ডসে স্ট্রীট কলকাতা — ৭০০০১৬

CENTRAL LIBRARY

ক্ষ্যাপাদের বাবাজী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় ভাবনা নাই ক্ষ্যাপামন—
জয় ভাবনা নাই
এ-পার ও-পার যেথেথা লাইন
পেতেছে — নিমাই।
গড়াগড়িয়ে যাবি চলে
ওরে ঘর ভাসাতে হবে না
ক্ষ্যাপামন — নাই ভাবনা নাই।

এমনি ধরনের একখানা গান শুনেছিলাম অনেক দিন আগে। তা অবশ্য বছর পঁচিশ আগে হবে। অমরপুরে জংসনে বসে গানখানি গাইছিল ক্ষ্যাপা বাউল। ক্ষ্যাপা বাউলের সাথেই ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা চেহারা। চুল ছাঁড়তে গোঁফে কোন বিন্যাস নেই বটে; কিছুটা ধুলোমাখা। গায়ের নানা রঙের ছিট জড়ে বিচিত্র জামাটা ছেঁড়া পুরনো হয়ে এসেছে; বেশ একটু বাঁকে পাবগবেগাবে বাঁকিয়ে গানখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়েছিল। এবং জমিয়েছিল খুব।

তখন লিখেও রেখেছিলাম একখানা সস্তা নোটবুকে। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেছে আজ। মনেও নেই গানখানা। তবে ভাবখানা মনে আছে সেটা হল এই যে, ক্ষ্যাপা মন জন্মালি আর চলা শুরু হল। পা দুটো কি আর মিছে পেয়েছিস রে; চলতে হবে। কোথায় যাবি কে জানে—তবে নদীর একটা পার আছে—সুতরাং এপার ওপার বলা যায়। ওই পরে যে কি আছে তা কে জানে: বড়ই চিন্তা ভাবনা ছিল রে। দুর্গম পথ, কোথাও খনা কোথাও খন্দ কত বাধা কত বন্ধ ছাঁটি ভেঙে হাত-পা ছড়ে রক্ত-মাখা দেহে অতিক্রম করতে হয়। মানুষের জন্মই হল চলতে; চল ক্ষ্যাপা মন চল। পার চল। সব থেকে বিপদ থেয়াঘাটে।

মানুষের এইসব কষ্ট দেখে নিমাইচাঁদ রেল লাইন পেতেছে — নদীর উপর পুল বানিয়েছে — তার উপর রেলগাড়ী চলছে ধোঁয়া ছেড়ে। ওরে বলতে পারলি নির্বিঘ্নে—গড়াগড়িয়ে নদীর পুলের ওপর দিয়ে সোজাসুজি ওপারে পৌঁছবি। বস তেপে বস নিশ্চিন্তির নিশ্চিন্তি। টিকিট মাস্টার দয়াল নিতাইচাঁদ; টিকিটের দাম শুধু মুখে নাম নেওয়া,

"হরি বলে চাইলে টিকিট নিতাই আমার
দেবে কেটে
নাম নিয়ে মন চড় গাড়ীতে
মরবি কেন হেঁটে হেঁটে।"

এই ধরনের গান। যে লাইন কটা ছিলাম সে হয়তো নেই পরের লাইনে —আমি বানিয়ে দিলাম—তবে ভাবটা ওই।

গান থামলে আমার দেখে ক্ষ্যাপা আধখানা দেহ নুইয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে —জয় গৌর, বাবা কখন গো?

বললাম—এই তো ট্রেনে নামলাম।

—কলকাতা থেকে?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কোথায় এখানে? যাবে কোথায়?

—যাব তো ছেবেছিলাম বাবা, নবদ্বীপের দিকে, কিন্তু—

সবিস্ময়ে বললাম—এদিকে নবদ্বীপ? কাটোয়া হয়ে যেতে হবে—। সে তো উল্টো মুখে, তা অমরপুরে কেন?

হেসে বললে, — ওই দেখুন, নেশা আর কাকে বলে? নেশার ঘোরে এক রকম। অভয়পুরের গোঁসাই গেলেন নলহাটি জংসন-টেশনকী সঙ্গ হল লাভপুরে — দুজনে গাঁজা খেতে খেতে চলে এলাম কাটোয়ায় বকলে আমদপুরে, এসেছি যাবা বাল, কিন্তু যাই যাই করে যাওয়া হয় নাই। টেশনের পর টেশন চলে গেল, আমি বাবা উঠতে পারলাম না;

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাচছি আর গান গাইছি—নাচছি আর গান গাইছি। আর নেশা করছি। সঙ্গী পাছি না বলে খেতে পারছি না। এবার আপনকার সঙ্গ মিলেছে এবার কাটোয়াযুখো হতে পারব।

জিজ্ঞাসা করলাম—তা হলে বল জয়দেহল ভাল। নগদনারায়ণ—

—তা দুচার পয়সা করে হয়েছে কিছু, বেশী নয়, তবে চা খেয়েছি ভাঁড়ে ভাঁড়ে—পঞ্চাশ ষাট বার।

—শুধু চা খাবার জন্যে ট্রেন ফেল করলে ক্ষ্যাপাচাঁদ? নিতাই মাস্টার টিকিট নিয়ে বসে রইল—নিলে না, গাড়ী চলে গেল; করলে কি?

হা - হা করে হেসে উঠল ক্ষ্যাপা বাউল। তারপর বললে, খুব বলেছেন বাবা। খুব বলেছেন। সেটা তো মনে হয়নি গো। জানেন—এই চেনা মানুষে আর অচেনা? মানুষে এমন নেশা ধরালে যে ট্রেনের কথা ভুলিয়ে দিলে। জানেন এত জনার সঙ্গে দেখা হল এই জংসনে, আবার নতুন আলাপ হল এত জনের সঙ্গে যে, সে যেন বন্ধু করে দিলে গো!

আমার সঙ্গ পেয়ে ক্ষ্যাপা আমদপুর জংসনের মায়া ছেড়ে কাটোয়া লাইনের গাড়ীতে চড়লে। ট্রেনে চড়ে ক্ষ্যাপা বললে—বাবা, মাঝখানে যদি কোথাও নেমে পড়তে চাই তো যেন নামতে দিবো না।

বললাম—কথাটা মনে থাকবে তো? তখন বারণ করলে শুনবে?

ক্ষ্যাপা একটু ভাবলে, বললে — তা বলেছ ঠিক, তখন মনে থাকবে হয়।

আর একটু ভেবে বললে — দাদা —

—বল!

—তুমি জোর করে ধরে রেখো। খুব ধরে রাখা করে।

ট্রেন ছাড়ল। ক্ষ্যাপা বললে — একটা সিগারেট দাও দাদা।

সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে বললে—বলি হ্যাঁ বাবা, এমন গাড়ী নাই যা ছড়লে পরে নবদ্বীপের আগে ধরে না। কি বলে যে ধরে, টেরেন না কি!"

বললাম — না ক্ষ্যাপাচাঁদ — তা নেই।

ক্ষ্যাপা চোখ বন্ধ করে সিগারেট টেনে দিতে লাগল। বুঝলাম, ক্ষ্যাপা ভাবছে কিছু। কিছু কেন — সম্ভবতঃ এই কাটোয়া পর্যন্ত যেতে পারবে কিনা ভাবছে।

বিচিত্র মানুষ ক্ষ্যাপা বাউল। ১৯৫১ সালে আমার বয়স ৩০।৩৪, ক্ষ্যাপার কত তা বলা কঠিন, তবে তখনই তাকে অর্ধবৃদ্ধ বলা চলে, পঞ্চাশ বলে পঞ্চান্ন — ষাট পঁয়ষট্টি বললেও চলতে পারে, কাঁচা পাকা চুল দাড়ি, তাতে হেলা পড়েনি, রুক্ষ এলোমেলো হয়ে উড়ছিল। মধ্যে মধ্যে এমন চেহারা হয়। যখন এমনই করে মনে তখন হয়। এক্ষণি শুনছি শুধুই গান শুনছি না; নিজে গান গেয়ে নিজেই তরিফ করে বলে — হায় হায় হয়। মরিবে মরি।

ওর নাম কি তা কেউ জানে না; আমাদের গ্রামের পথে বৈরাগী আখড়া সেখানে এসে জুটেছিল; মহান্ত হরেই সেখানকার। ক্ষ্যাপাদাস বাবাজী বলে বিখ্যাত। আখড়ার খানিকটা জমিজিরেত স্বত্বের বিষয় ছিল — সেখানে নাম জারী করবার সময় ওই ক্ষ্যাপাদাস করা অবধি নাম জারী করেছে।

যেদিন আমার সঙ্গে ঘরে ফেরবার পথে চোখ বাঁজে ভাবছিল ক্ষ্যাপাদাস।

বললাম — কি ভাবছ?

বললে — কি ভাবব? ভাবছি নবদ্বীপ হওয়া হল না। শুনে, ট্রেনে নাকি বসে— সেই ট্রেনে চড়লে নাকি গাড়ী থামে না। একেবারে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। তা —

একটু চুপ করে থেকে বললে — দেখ, এই সেনা মানুষেই গোল বাধালে। বুঝলে, সেনা মনে কি জানো, এমন মুখ আছে যাকে দেখলেই মনে হয় চিনি। আর সেনাও বট গো। এ-জন্মে ছিল তোমার অন্য জন্মের বউ। বলে তার কাছে গিয়ে বলি — কি মনে পড়ছে? মনে পড়ছে, নিশ্চয়? কোথা যাওয়া হবে। কিছুই মনে না — তবু তার সঙ্গেই চলতে সুরু করি।

জানো, ছেলে বয়সে মেলা দেখতে এসে সুন্দর মেয়েদের বিভূতি কাণ্ডকে দেখে তাই মনে হল। রাধা সাক্ষাৎ বিভূতি। জমজমে পান-টুড়ে ছুঁড়ে আলাপ করলাম। তার-পরে সঙ্গের সঙ্গেই চলে গেলাম। গানের গলা ছিল, অধিকারী চাকরি দিলেন। বাবা মা রাগ করলেন, ঘরে চাববাস জমি জেরাত — ভাল অবস্থা; ছুটে—।

ছেলে ক্ষ্যাপা বললে — সে আর নাই শুনলে, সং ছুতে গেলে। ওই হল — হয়ে গেলাম যাত্রা দলের ছোকরা, কাল নয় কালের রূপ। তার পরেতে যখন নবরস তোমার ভাঙতে আরম্ভ হল, তখন বলে বলরাম সর্দার। হাতে কলকে — চোখে সুরমা — কাঁচা; নীল কাপড় পরে নীল ফিতে বেঁধে মাথায় চূড়া বেঁধে কাঁধে লাঠি নিয়ে চোখ পাকাতে পাকাতে এসে বলি — কি-রে কৃষ্ণ, এখনও তোর নিদ্রা ভঙ্গ হল না, এত ধুন, আয় গোষ্ঠে যাবি আয়। শ্যামলী ধবলী হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে তোকে—কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলে, শুনতে পাস না?

বাবা, ছোকরাদলে এসে দেখা হয়ে গেল হরিদাস বৈরাগীর সঙ্গে, দুপাশে দুই বৈরাগী নিয়ে গানে মাতিয়ে তুলেছে।

মনে হল চেনা। কত চেনা। বয়েছ, বয়স বল ছেড়ে বৈরাগীর গলা ধরলাম।

বাবাজীর কাছে ডেক নিলাম। বৈরাগীকে গরু করলাম। বৈরাগীর সঙ্গে অনেক ঘুরেছি গো। বৈরাগীই নাম দিয়েছিলেন ক্ষ্যাপা। বৈরাগী কানে ফুঁ দিয়ে নিজের নাম দিলে, বললে — যা; এই পথ ধরলি— ফিরবি না। আর চেনা জনকে চিনবি না।

সেই হয়েছে বিপদ। চেনা জানলে নিয়েই বিপদ।

পথে আটকে রই।

প্রথম আটকালাম — মন্ত্র - আটক পড়লাম — উৎসবপুরের পথাচালে দিয়ে দেখলাম এক বোষ্টমীকে। মনে হল কত চেনা। সে বয়েস — একদল বোষ্টমী; তার মধ্যে সেইসব থেকে ঝলমলে। সব থেকে সুন্দর। মন চন্দন করলাম তাকেই। লোকে বলাবলি—কি দেখে ভুললে ক্ষ্যাপাদাস? ও যে নেহাত কুচ্ছিত—পাকা দুটো চোখ আর চুল এক পাঁজা। আমি কি করে বোঝাই বল। বলতাম — এই দেখ আমার চোখ দুটো যদি তোমাকে দিতে পারতাম তো দেখতে পেতে। রূপ কি বলে বোঝানো যায়? দেখে মজতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম — বৈরাগী আখড়ায় যে বষ্টুমী আছেন — বড় বড় চোখ —

— ধরে - ধরে! ওতো সাতজনার পরের বষ্টুমী — আমার বষ্টুমী! সে হল প্রথম-জন গো।

বলতে বলতেই ট্রেনটা ছোট স্টেশনে দাঁড়াল।

ক্ষ্যাপা বললে — সে এখন এখানে থাকে। বলেছে! আমাকে ছেড়ে এখানে এক বেশ্যাকে মালাচন্দন করেছে। ওই দেখ — ওই যে তাল গাছটা — ওরই ওদের আখড়া —।

বলতে বলতে ক্ষ্যাপা তার জিনিসপত্র বগলে পুরে ট্রেন থেকে ঝপ করে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। বললে — তুমি যাও, আমি কাল যাব গো। তার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

চমকে উঠলাম। সে কি? নবদ্বীপ যাবে না?

পিছন ফিরেই উত্তর দিলে ক্ষ্যাপাদাস — যাব। যাব। একবার দেখা করে যাই, মনে যখন পড়ল। যাব। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, গাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে। ক্ষ্যাপার নবদ্বীপ যাওয়া হয়েছিল কি না জানি না।

•

আজ বসে বসে ক্ষ্যাপার কথাটি। হঠাৎ তাকে মনে পড়ে গেছে। ভাবলাম ক্ষ্যাপার সঙ্গে আলাপের পরিচয় করিয়ে

নতুন নাটক

শৈলেশ গুহনিয়োগীর
নতুন পূর্ণাঙ্গ নাটক

জীবন রঙ্গ

একটি জনপ্রিয় সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। দুটি নারী চরিত্র এবং দুটি সেট। মূল্য ৪-৫০

সবুজ রায় এবং সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

তিনটি জনপ্রিয় একাঙ্ক

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের—প্রত্যাবর্তন পদাবলী
প্রবীর লহর—ফিরিঙ্গি
অমল রায়ের—ঘণ্টোৎসব
একত্রে তিনটি বিখ্যাত বাংলা একাঙ্ক নাটকের সংকলন।
মূল্য : ৫-৫০

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পূর্ণাঙ্গ নাটক

সূর্য এনে দাও

একটি সেট। একটি নারী চরিত্র।
মূল্য : ৪-৫০

মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের
একটি জনপ্রিয় পূর্ণাঙ্গ নাটক

মহাক্ষুধা

একটি নিটোল কাহিনী। পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। মূল্য : ৫-০০

রাধারমণ ঘোষের
বহু বিতর্কিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

হারাধনের দশটি ছেলে

নতুন আঙ্গিকের পূর্ণাঙ্গ। একটি নারী। মূল্য : ৫-০০

সমর বসুর
একটি জনপ্রিয় একাঙ্ক নাটক

ডাইনোসেরাস

নারী বর্জিত। মূল্য : ৩-০০

পরিবেশক : নবগ্রন্থ কুটির
৫৯।৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

LUX
লাক্সে
এক্সাটিকা
চ্যাল্ক এক্সাটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
LUX

CENTRAL LIBRARY

গরীবের ছেলে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মা আর ছেলে—ছেলেটি বছর পাঁচেকের। বিবি ফুটফুটে দেখতে সুন্দর। মুখখানি করুণ। দেখলে দয়া হয়। মার নাম ফুলকুমারী, ছেলের নাম স্বপনকুমার। ফুলকুমারী দলটা বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। স্বপন তার পিছুপিছু ঘুরে বেড়ায়। ফুলকুমারী রান্না করবার সময় পায় না। না নিজের জন্যে, না ছেলের জন্যে। এরা ওদের বাড়ীতে রুটি দেয়। তাই খেয়েই ওদের দিন কাটে। ছেলেটা বলে রোজ রোজ রুটি খেতে ভাল লাগে না মা। তুমি ভাত রান্না করতে পার না? —ভাত খাবার কপাল করেছিস যে খুকি? কথাটা মুখুজ্জে গিন্নীর কানে যায়। বলেন—ভাত তো আমাদের রান্না হয় মা, সেই সঙ্গে ওকেও চারটি খাইয়ে দিও। সেইদিন থেকে সেই ব্যবস্থাই চলছে। মুখুজ্জে গিন্নীর যায়া হয়, স্বপনকে ডেকে বলেন তুইও বসে পড়। তুইও চারটি খেয়ে নে। স্বপন প্রস্তুত হয়েই ছিল। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে। স্বপনের ব্যবহার বড় বিচিত্র। প্রথম প্রথম চপচাপ খেয়ে-দেয়ে উঠে চলে যায়। তারপর ক্রমশঃ তার মুখ খোলে। যিনি পরিবেশন করেন তাঁরই সঙ্গে স্বপনের কথা হয়।

—আজ বুঝি মাংস রান্না করেছেন? —বেশী করে দেবেন। মাংস আমি খুব ভালবাসি। —তুমি ভালবাস তো আমার বয়েই গেল। মাংস কি তোমার জন্য রান্না হয়েছে? স্বপন সেদিন আর কিছু বলে না। পরের দিন আবার—

—আমাকে তো দেখতে দিলে না? —দেখতে কোথায় পাবি? স্বপন বললে, ঐ যে ওরা খাচ্ছে। —ওরা বাবুদের ছেলে। ওদের সঙ্গে তোর—কথাটা শুনে ফুলু ছুটে এলো। —ওকি কথা স্বপন? বাবুদের ছেলে যা খাবে তুই তাই খাবি? স্বপন বললে হ্যাঁ খাবো। ও আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খায় কেন? বলতে গেলে ভেংচি কাটে। স্বপনের মা বললে বেশ করে। ও কে জানিস? স্বপন বললে জানি। মেজবাবুর ছেলে। ফুলু বললে অমন করে ওদের বলতে আছে? গিন্নীরা শুনতে পেলে রাগ করবে যে। স্বপন বললে না না রাগ করবে না। গিন্নী মা আমাকে খুব ভালবাসে। বলেই স্বপন ছুটে চলে গেল বাইরে। খানিক বাদে পাশের বাড়ীর বৌ মুখুজ্জে গিন্নীকে ডেকে বললে মাসিমা, শুনুন। মাসিমা শুনবার জন্যে এসে দাঁড়ালেন। ওকি আপনার বাড়ীর ঝি-র ছেলে? হ্যাঁ মা কেন বল তো?

ও তো দেখছি পাড়ার সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। —কেন? কি হয়েছে। —জানেন না কি হয়েছে? শীতকালে কারো গায়ে জল ছিটোচ্ছে কারো বগলে কলা ছিঁড়ছে। কিছু বলতে গেলে ঢিল মারে। গিন্নী মা বললেন, তা আমি কি করবো বাছা। —তা জানি। যা করবার করবে ওরা মা। তা সেই মেয়েটাই বা কোথায়? তাকে একটু বলে দিন না। বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। ও শুনবার ছেলে নয়। তার চেয়ে আপদ বিদেয় করে দিলেই পারেন। ওকে রেখেছেন কেন? সত্যিই একদিন আপদ বিদেয় হল। মেজবাবুর ছেলেরা স্বপনকে খেলতে নেবে না। স্বপন ঢিল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেজবাবুর ছেলেকে মারবে। সত্যিই একদিন মেরে বসল। আর তার ফলে স্বপনের মার চাকরী গেল। লজ্জায় সে আর কাজে আসে না। এরপর শহরের জনারণ্যে স্বপন আর স্বপনের মা কোথায় যে হারিয়ে গেল, আমরা তার খবর রাখি নি। অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল স্বপন একটা গাড়ী করে মুখুজ্জে গিন্নীর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। —একি রে! কার গাড়ী? গাড়ী থেকে নেমে স্বপন গিন্নীমাকে প্রণাম করল। স্বপন বেশ বড় হয়ে গেছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। পরিচ্ছন্ন বেশবাস। —কি রে তুই স্বপন না? —হ্যাঁ মা। আমি স্বপন। কি করছিস আজকাল? একটা মোটরের কারখানায় কাজ করি। এরপর কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বপন চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ গিন্নী মার নজর পড়লো কাগজের একটা প্যাকেট। স্বপন, এটা কি ফেলে গেলি? ডাক শুনে স্বপন ঘুরে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো ফেলে যাইনি মা, ওটা আপনার জন্যেই এনেছিলাম দিতে লজ্জা করছিল। গিন্নীমা খুলে দেখলেন, একখানা শাড়ী। —এতে লজ্জা কেন বাবা। বলেই শাড়ীটা নিয়ে উঠে গেলেন সবাইকে দেখাতে। —ও বৌমা দেখো দেখো স্বপন আমার জন্যে কি এনেছে। বলে পাশের বাড়ীর বৌমাকে মুখুজ্জে গিন্নী ডেকে দেখতে চায়।

—স্বপন কে মাসিমা? ওমা। তাও জানো না। স্বপন গো আমাদের ফুলুর ছেলে। —কি-এর ছেলের এতো আদিখ্যেতা কেন? —কেন তা তুমি বুঝবে না, সে আমি বুঝবো—বলেই গিন্নী হনহন করে নীচে নেমে গেল। কৈ তু স্বপন। স্বপনকে ডেকে দাও। স্বপন তখন কোথায়? স্বপনের গাড়ী তখন অনেক দূরে।

ফোন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একটা যন্ত্রণা, একটা অস্বস্তি, একটা ভোঁতা চাপা প্রতাপ। সব কিছু একসঙ্গে মিলিয়ে বহুক্ষণ আচ্ছন্নতার মধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ একটা উৎকণ্ঠার ঢেউ-এর পরে ঢেউ। অনেক মুহূর্ত এইভাবে ধীরে ধীরে তন্দ্রাটা চট করে ভেঙে গেল। কেউ চুপিচুপি হয়ে গেল বলাই—উচিত। অন্ধকার ঘরটাই যেন তীব্র অর্থবহভাবে আর্তনাদ করছে। ব্যাপারটা অবশ্য কিছু নয় বলিও। মেয়েটা ছোট থেকেই বড়ো ভয় পায়। এত রাতে ফোন বাজা মানেই অবশ্য একটা দুঃসংবাদ। টেবিলের ওপর রাখা হাত-ঘড়িটায় দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আচমকা ঘুম ভাঙার জড়তা নিয়ে ফোনটা তুলে একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,— হ্যালো..... আর যা বলতে যাচ্ছিলাম তা বলা হল না। আমার কথার মাঝখানে ওধারের আওয়াজ শোনা গেল,—গলাটা ভারি-ভারি বোধহয়। ঘুমোচ্ছিলে বুঝি? এমন কথায় রাগ-বিরক্তি জড়িয়ে যাওয়া কি না। বাঁকা একটা বাজতে চলেছে। এমন সময় লোকে ঘুমোয় না তো কি করে। মেজাজটা কোন-রকমে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম,— কিন্তু আপনি কে জানতে পারি? কাকে চাইছেন? কাকে চাইছি। ওধার থেকে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল—চাই তো তোমাকে। শ্রীমতী অন্বেষণের বাড়ি। আর আমি হলাম ঈশ্বর ভবতোষ হালদার, ওরফে ভবা। কেমন চেনা? না হয় না। কড়া গলাতেই বলতে গেলাম,— প্রথমতঃ আমি..... নামটা পালটাই। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওধারে ভবা বা ভবতোষ যেই হোন পুরোন করে বললেন— তেমন অবস্থায় সবাইকেই পালটাতে হয়। কিন্তু ফোন ধরতে যাই বলাও আমি যে ঈশ্বর ভবতোষ। ঈশ্বর হলেই অবশ্য চিনতে পারছ না। শ্রীমতী যখন ছিলাম তখন ভালোই চিনতে। অন্বেষণা এই অধীনের বাড়িতে ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে না গেলে ভাত হজম হত না। তারপর সেই প্রায়শ্চিত্তটার পড়ার পরে পরেই ধারণা তুমি করেছ। তার ফলে ভবতোষের নামটাও ঘুরে ঘুরে এসেছে। কিন্তু নাম পালটাও সেই জন্যে কারুরই ঘুমনো নিষেধ? অন্যের ক্ষতি ও করা হচ্ছে। এই বাজুনিতে লম্বা লম্বা কথা শুনিয়ে মিতে নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে টানলাম। হেসে বললাম,— না ভাই। একবার নাম পালটালে বারবারই পাল্টাতে হয়। আমদানি রপ্তানি ছেড়ে এখন কারখানা খুলেছি। বন্দুকের কাতিরে, এ কারবার আর তোমার ভোগাতে দেব না। একটু থেমে আবার বললাম,—কিন্তু তুমি কি করছ এখন? চৌধুরীদের সে বাড়িটায় ছিলে সেটাই দেনার দায়ে নিলেম করিয়ে ছেড়েছে সেই কবে! নিজের খুশিধর মোটে কি সুবিধেটাই খোয়ালে বলো তো। পরের ধনে পোদ্দারী করছিলে, তার ওপর কলকাতা শহরে খাওয়া-পরা থাকার জায়গাটাও ঘুচে-ছিল। কিন্তু সে সুখ তোমার সইল না। তাই এখন আবার কার স্কন্ধে ভর করেছ? চৌধুরীর হাবাগোবা সেই ভাইপোটার? সেই যে, জানোয়ারে খেয়ে ঠাকুর বয় মাথায় হাত বোলাতে কি নাম যেন গণেশ হ্যাঁ হ্যাঁ গণেশই তো। ওপরে . কয়েক সেকেন্ড কোন সাড়া শব্দ নেই। টেলিফোনটা নামাতে যাচ্ছি এমন সময় কানের পর্দা কাঁপানো একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসই যেন শোনা গেল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের পর তারই সঙ্গে সুর মেলানো হতাশ কণ্ঠ,— গণেশ আর নেই। গণেশ নেই,— সবিস্ময়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে হয়,— গেল কোথায়? মারা গেছে।— আবার একটা দীর্ঘ-শ্বাস—বলিও মারাই গেছে বলা উচিত নয়। সামলাতে আমার একটু সময় লেল। তারপর বললাম,— শেষ পর্যন্ত মারাই গেল। তা যাওয়া আর আশ্চর্য কি। ষাঁড়া বাঁশে বয়স বুঝে বলেছিলে তখনই আমি সর্বনাশের বেশী দেরী নেই। কিন্তু তাহলে তোমার বেশ মুস্কিল হয়েছে দেখছি। আস্তানা গাড়-বার মত একটা জায়গা পাওয়াও আজকাল সোজা নয়। ওদিক থেকে এবার হাসির শব্দ এল। শুধুনো বিদ্রূপ হাসিই বলা উচিত। তারপর তাচ্ছিল্যভরে জবাব,— আমার আস্তা-নার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। ভুলে যাচ্ছ কেন আমি এখন ঈশ্বর ভবতোষের ওপরে ভবা। তা ঈশ্বর ভবতোষ, ভবলীলা সাঙ্গ করলে তাহলে। হ্যাঁ, তাই করতে চল।— ভবতোষের উদাস কণ্ঠ,— খবরের কাগজে দেখেছ নিশ্চয়। না আমি আমার আইন আদালতের পৃষ্ঠাটা পড়ি না। ও পড়লেই ভয় হয় আবার বুঝি নিজের নামটা দেখতে পাও! সেই মামলার পর থেকেই অরুচি ধরে গেছে, কেমন? তবে আইন আদালতের পৃষ্ঠায় নয় আমার খবরটা..... খামোকা বিদ্যে বলছ, তোমার খবরটা কাগজে না পড়েও জানি। জানো?— ঈশ্বর ভবতোষ যেন একটু বিচলিত। হ্যাঁ তোমায় একবার যখন চিনেছি তখন তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে কি আর কিছু বাকি—তা বলিও ভালোই এঁটেছ। তুমি এটাকে ফন্দি বলছ!— ভব-তোষ কিছু কিনা ঠিক বোঝা গেল না— ফন্দিটা কোথায় পেছ? ওই ঈশ্বর হওয়াটাই একটা ফন্দি। এক ঢিলে একজনই নয় একেবারে সব পাখি মারা হয়ে গেল। পাওনা-দারেরও ফাঁকি দিয়ে আবার আড্ডা-বাজা-দেরও একটা গাঁট মেরে গেল। আড্ডা-বাজা আবার কোথায় যে!— ভবতোষ ক্ষুব্ধ। ও তাহলে খানিকে খানিকে আমাকে ও-সব গল্প শোনাতে! সেই অন্ধ কোন পাড়াগাঁয়ে সাঁঝ ফোন এসে কলকাতায় স্বর্গীয় করতে সেই তোমার স্ত্রী লীলাবতী নাকি ও সেটা সেই সঙ্গে তোমরা এবার? হাউস সঙ্গীত সঙ্গে। ঈশ্বর ভব অত মিথ্যা কথাটা বলি কি করে! হুঁ, কিন্তু সারা জীবনের অভ্যেসটা কি অত সহজে ছাড়া যায়। সেই কি যেন নয় ওই যে তোমার গণেশ চৌধুরীরই মাসতুতো বোন হয়, পড়াবার নাম করে যার সঙ্গে প্রেম করতে— হ্যাঁ হ্যাঁ রেবা সেই রেবার কাছেও ওই মিথ্যেটা কেন চালাতে এখন তবলা বুঝছি। বুঝছ? ঈশ্বর ভবতোষ যেন হাসি —রেবার কথা তাহলে তোমার মনে পড়ছে! পড়বে না? নিজের নাম বাড়াতে কত ভালো ভালো লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ দেখা-যার জন্যে আমাকে ধরে বেঁধে ও বাড়িতে কি কম যাতায়াত করতে হয়েছে? আমাকে? ও সবসুদ্ধ একটি

.....ইচ্ছে করেই ওইটুকু বলে থামলাম। ঈশ্বর ভবতোষ কেমন যেন অস্বস্তি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে— ও রকম একটি কি? ও রকম একটি— সত্যের খাতিরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—হতকুচ্ছিত! তবুও আমি অন্ততঃ একলো দেখিনি। ধরি মাছ না ছুঁই পানি কায়দায় নিজের কাজ হাসিল করতে তুমি হয়তো প্রেমিক সাজতে তা কি আর বুঝি না! স্ত্রী থাকতে বিয়ের প্রস্তাবের ভয় নেই অথচ ভালবাসার ভান করলে যা পাওয়া যায় হাতিয়ে নেওয়ার সুবিধে। হোক আবছা গিরিমাই ত ছিলে। ফোকাস একটু সামলে চললে ও বাড়ি কি নিদেনপক্ষে ওঠে! যাই হোক ঈশ্বর হেসে একটা সুমিষ্টি জ হুরেছে। ফটো তোকে ফেলে যাবার সুযোগ নিয়েছে। ওই ট্রেনের অন্তর্ধান-টাতেই কাজ হল কেমন? ট্রে-ট্রেনের অন্তর্ধানে কা-কাজ হল তুমি বলছ!— ঈশ্বর ভবতোষ একটু তোৎলা মনে হল। হ্যাঁ বলছি। আর আমায় বলতে হবে কেন, তুমি জানো না! ছন্দি কাটিয়ে কাটিয়ে গণেশকে ত তখন সেরে এনেছে। তার চুলের টিকিটি পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। তা তাকে পালাবার পরামর্শ দিয়ে ভালোই করছিলে। নিরুদ্দেশ হওয়া ছাড়া তার গতি কি! নিরুদ্দেশ হওয়ার পক্ষে বড় শহরের মত এমন সুবিধের জায়গা আর নেই, আর বড় শহরের মধ্যে বোম্বাই-এর তুলনা হয় না। সেখানে কোট প্যান্ট কি পাজামা পাঞ্জাবী পরলে কে কোন মুলুকের চেহারা দেখে চেনে কার সাধ্য। দম নেবার জন্যে একটু ঈশ্বর ভবতোষ তাড়া দিলে— বলো থামলে কেন? তার তাড়া দেবার দরকার ছিল না। নিজের উৎসাহেই আমি বলে চলেছিলাম— সেখানেই নাম ভাঁড়িয়ে বলেছ তখন কোন অঘটনে পাড়ার ঘাপটি মেরে আছে। ছন্দি গন্ধি গণেশের চিরকালই ভোঁতা। নাম ভাঁড়াতেও তোমার নামটা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসেনি। কিংবা তুমিই সে পরামর্শ দিয়েছিলে কেমন? তাতে আমার লাভ!— ভবতোষের একটু অতদূর খেল কি? বাঃ লাভ না থাক লোকসান ত নেই। আর দেশ পর্যন্ত এই ঈশ্বর হওয়াই মন্দ কি? গণেশ মাস কয়েক অজ্ঞাতবাস করবার পর তুমি নিশ্চিন্তে তার কাছে গিয়ে হাজির। ধরলী বন্দ সেজেই গেছলে। তবে তার অস্তানায় যাওনি। এখানে সেখানে কখনো স্টীপাটিতে কখনো চার্চ গেটে দেখা করেছিলে। তুমি যাবার কথন গাদেই কিন্তু বোরিবিলির কাছে সেই দুর্ঘটনা। সকাল বেলা লেখা লেডিজ লাইনের ধারে একজন মহিলার মৃতদেহ পড়ে আছে। অনেক রাত্রে বোরিবিলি থেকে বোম্বাই আসবার শেষ ট্রেনের কোনো কামরা থেকে সে মাল্টী পড়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিংবা কেউ ঠেলেও ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। দেরী রাত্রে বোম্বাই ফিরতি প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলো অনেক সময়ে একেবারে খালি থাকে, মহিলার পকেটে আর্থিক টিকিটের তাই নাম পাওয়া যায়। সে নাম তোমার—ভবতোষ হালদার। তুমিই ঠেলে দিয়েছিলে না কি কামরা থেকে? কিন্তু ভদ্রলোক হাতে বিপদ হওয়া ছাড়া তোমার অন্য লাভ কি। লাভ আছে বইকি আছে। যা ঠিক বলেছ কামরা থেকে ঠেলেও দিতে পারি।—ভবতোষ উত্তেজিত। দিতে পারো মানে? এবার ভবতোষ হতভম্ব হবার পালা, — আবার ঠেলে ফেলে কি? অহা এইবারই তো দেব। আমি ওই খুন করবার প্ল্যানটাই যে ভাবছিলাম। অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা তোমার মানে আপনার ঠিকানাটা আর ফোন নাম্বারটা বলে দিন ত চট করে। আমার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার? কেন আমাকেও খুন করবার প্ল্যান আছে নাকি?— আমি স্তম্ভিত। আরে না, না বলবার অবশ্য। ছাপা হলে আপনাকেই পাঠাব। আমাকেই ছাপা হলে পাঠাবেন? কি পাঠাবেন? কি দেখাতেই পারেন। এখন বলুন চটপট করে ঠিকানাটা। না হয় শুধু ফোন নম্বরটা বলুন। কিন্তু ফোন নম্বর আবার কেউ নাম্বর না জানলে ফোন করেন কি করে? আপনিও ফোন!— ভবতোষ হেসে ফেলল হাসি যেন মেঘ— নম্বর কেউ ফোন করছে নাকি! আজকাল যা পড়ছে তার দুটো-একটা ফোনের স্টাইল বলতে পারেন। বেচে থাকতে প্রায় কেউ আসি। হোক করেন! দুপয়সা বাড়ে ফোনের স্টাইল। আর তুমিতে আমাকেই মাঝে মাঝে ফোন করে নাঃ খুনের প্ল্যানটা আমাকেই করতে দেবে। আপনার ফোন নম্বরটা ... ভবতোষ ঘাড় কাত করে ফোনটা নামিয়ে রাখার শব্দ পেলে।

বাংলা সাহিত্যের যুগোত্তীর্ণ লেখকদের অপরিহার্য সমগ্র রচনা সম্ভার

মাণিক গ্রন্থাবলী
১২শ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত।
১৩শ খণ্ডে সমাপ্ত।

বনফুল রচনাবলী
৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত।
৭ম খণ্ড যন্ত্রস্থ।

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী
১ম খণ্ড প্রকাশিত।
২য় খণ্ড আষাঢ়-শ্রাবণে।

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ
১ম খণ্ড প্রকাশিত।
২য় খণ্ড আষাঢ়-শ্রাবণে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাসংগ্রহ
প্রস্তুতির পথে

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী
প্রস্তুতির পথে।

প্রতি খণ্ড অমূল্য ভথাপঞ্জী সমৃদ্ধ। ১।৮ ডিমাই/ক্রাউন ১০০ পৃষ্ঠা। সুদৃশ্য বাঁধাই। বর্তমান মূল্য প্রতি খণ্ড ২০৲। নিয়মিত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুযোগ। বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

উদিত ভানুর দেশ জাপান

বিকাশ বিশ্বাস। একটা প্রগতিশীল দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উৎসব, আনন্দ, নবজাগরণ এবং আরও অনেক বিষয়ের এমন তথ্যবহুল সচিত্র গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নি। এটা একটা দেশের ক্যাটালগ নয়, সম্পূর্ণ একটা জাতির সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাস এবং তৎসহ আমাদের দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রগতির উপরে আলোকপাত। সুদৃশ্য বাঁধাই/সুদৃশ্য মুদ্রণ/অনেক ছবি/মূল্য ১২ টাকা। সদ্য প্রকাশিত।

কর্ণাটরাগ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু প্রতীক্ষিত উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসে যেমন দেশ-কাল-পাত্র-পরিবেশ বিস্তৃতি, এখনও তাই গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। নব মুদ্রণ প্রকাশিত ।। ৮৲ ।।

অন্যান্য কয়েকখানি বিশিষ্ট উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য

পদসঞ্চার
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।। ৮৲ ।।

কাঠগোলাপের গন্ধ
নিরঞ্জন চক্রবর্তী ।। ৪৲ ।।

চাঁদের দাম এক পয়সা
বিমল মিত্র ।। ৮৲ ।।

নগ্ননন্দিনীর রূপকথা
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ৬৲ ।।

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড/১১বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

পতানু পাগলা

বনফুল

অনেক ছেলেবেলার পতানু পাগলা মণিহারী গ্রামে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রাণী ছিল। 'প্রাণী' কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিতেছি। আকৃতিতে মনুষ্য হইলেও আচার ব্যবহারে সে পশুর স্তরেই ছিল। কালো কুচকুচে গায়ের রং মাথায় সকলের টাক, কাঁকড়া ঘন ভ্রূ দুটি যেন ঝুঁকিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ দুইটির ভিতর কি আছে। টিকোলো নাক। খুতনি নাই বলিলেই হয়। মুখময় কাঁচাপাকা খোঁচা-দাড়ি। মুখে সর্বদা একটা হাসি যেন লাগিয়াই আছে। সর্বদাই যেন সে একটা মজা দেখিতেছে। মজাটা যে কিসের তাহা অন্য লোকে বুঝিতে পারিত না। হয়তো মনে একটা ছাগল চরিতেছে, পতানু তাহার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে হয়তো হাসির বেগ বাড়িয়া গেল, তখন মুখে জোর চাপা দিয়া থেকে থেকে করিয়া হাসিতে লাগিল। এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যাইত।

পতানুর মা আমাদের বাড়িতে আসিত। তাহার মুখে তাহার পাগলামির আদি ইতিহাস শুনিয়াছিলাম। তাহার বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি বছর তখন তাহাকে পাগ্‌লাটে' ভুলাইয়া লইয়া যায়। তখনকার দিনে বিশেষ কাজ করিবার জন্য এজেন্ট হইতে কুলি চালান দেওয়া হইত। এজেন্টরা নিরক্ষর জনসাধারণকে মিথ্যা আশায় ভুলাইয়া রিক্রুটিং অফিসারদের নিকট হইতে টিপসই লইয়া তাহাদিগকে কখনও সিংহল, কখনও কোনমা, কখনও বা আর কোথাও চালান করিয়া দিত। প্রায় এসব কুলি আর বাড়ী ফিরিত না। পতানু কিন্তু সতর দশক পরে ফিরিয়াছিল। এমন অবস্থায় ফিরিয়াছিল যে তাহার মাও প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। মাথায় চুল নাই, অথচ এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আসিয়া প্রথমেই সে ঘরে ঢুকিয়া একেবারে কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখে আঙুল দিয়া সভয়ে কেবল বলিয়াছিল 'চুপ'। আর কোন কথা বলে নাই, খাইতে দিলে খায় নাই পর্যন্ত। কোণে উবু হইয়া বসিয়াছিল সমস্ত রাত। তাহার পরদিন সকালে তাহাকে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। সাতদিন সে গা ঢাকা দিয়া রহিল। কোথায় গেল কেহই কোন পাত্তা করিতে পারিল না।

অষ্টম দিন রাত্র গ্রামের চৌকিদার রহমন পাহারা দিতে বাহির হইয়া হঠাৎ 'ভূত' 'ভূত' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নায়েব মশাইয়ের বাড়ীতে উঠিয়া পড়ে।

নায়েব মশাই বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রহমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"কি ব্যাপার রহমন?"

"ভূত হুজুর। স্বচক্ষে দেখলাম ওই প্রকাণ্ড গামহার গাছ থেকে নামল। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে নাংগা—"

সেই রাত্রেই পতানু ধরা পড়িল আবার। দিনের বেলা সে বড় গামহার গাছের মগডালে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। রাত্রে গভীর রাত্রে চুপি চুপি নামিয়া আসিত।

সকলের পরামর্শ অনুসারে ইহার পর পতানুকে বাঁধিয়া রাখা হইল। বেশী দিন নয়, মাত্র দুইদিন বাঁধিয়া রাখার পর পতানু গোপ্য, রাশনিক হইয়া গেল। তাহার মুখে

একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিত। সে হুলস্থুল কাণ্ড করিল—লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়। বিদ্রোহ করে লাভ নেই। ইহার পর হইতে তাহার মুখের হাসিটা প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

আমরা যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম তখনও সে প্রায় উলঙ্গ হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে একটা ন্যাকড়া তাহার কোমরে জড়ান থাকিত বটে কিন্তু প্রায়ই থাকিত না। থাকিত কেবল দাঁড়িটা।

সে উঁচু জায়গায় উবু হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমাদের বাড়ির সামনে যে হাট বসিত, সেই হাটতলার পূর্ব ও পশ্চিম কোণটা বেশ উঁচু। আর একটা উঁচু জায়গা ছিল পোস্টাফিসের সামনে, আর একটা পীর বাবার পাথরের কাছে। ইহারই কোনো একটাতে পতানু ভোরবেলা আসিয়া বসিত। বসিয়া আপন মনেই হাসিয়া যাইত। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিত, তাহার পর উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা উঁচু জায়গায় গিয়া বসিত। সেখানেও ওই, কিছু একটা দেখিয়া হাসি। হয়তো একটা ছেঁড়া কাগজ, বা একটা ছেঁড়া জুতা। এইসব দেখিয়াই খুশিতে মশগুল হইয়া থাকিত পতানু।

আর সে পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

একদিন কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিল। পতানু গোয়ালা পোস্টাফিসের সামনে উঁচু জায়গাটায় বসিয়া ধাড়ি সার দোকানের দিকে চাহিয়াছিল। ধাড়ি সা হালুয়াই মানে ময়রা। সে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল। একটু পরেই স্টীমারের যাত্রীরা এদিক দিয়া যাইবে, তাহার সদা ভাজা পুরির একটিও পড়িয়া থাকিবে না। ধাড়ি সা রোজই ইহা করে, পতানুও রোজই বসিয়া দেখে। কিন্তু সেদিন পতানুর মনস্তত্ত্বে কি যে গোলযোগ ঘটিয়া গেল জানি না, সে সোজা উঠিয়া ধাড়ি সার দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আমার লুচি খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে লুচি দাও—"

ধাড়ি সা তো অবাক।

বলিল, "ভাগ পাগলা! লুচি খাবি? পয়সা আছে?"

পতানুর পয়সা ছিল না সত্য, কিন্তু যাহা ছিল তাহা পয়সার চেয়ে প্রবল। প্রচণ্ড শক্তি ছিল তাহার।

সে সোজা দোকানে উঠিয়া গেল ও বারকোশশুদ্ধ লুচিগুলা নামাইয়া হাউ হাউ করিয়া খাইতে লাগিল। ধাড়ি সা বাধা দিতে গিয়া পড়িয়া গেল প্রচণ্ড এক চড় খাইয়া। তাহার পর সে চীৎকার চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া ফেলিল। কিন্তু পতানুকে সহজে কাবু করা গেল না। সে সমস্ত লুচিগুলি তাড়াতাড়ি খাইয়া মিষ্টান্নও খাইতে লাগিল। তাহার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া সহজে কেহ তাহার নিকট ঘেঁষিল না।

সে খাইতে খাইতে চোখ পাকাইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"খবরদার—"

তাহাকে পুলিশে যখন হাসপাতালে লইয়া আসিল তখন তাহার হাতে ও কোমরে দড়ি। শোনা গেল, পতানু ধাড়ি সার দোকানের পরাত দিয়াই কয়েকটি লোককে জখম করিয়াছে। আমার বাবাই তখন তখন হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সে যুগে উন্মাদ পাগলের যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি করিলেন। ব্যবস্থাটি বড় ভয়ানক। পতানুকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া চার-পাঁচজন বলিষ্ঠ লোক তাহাকে ধরিয়া রহিল। বাবা একটা মোটা গরু ছুঁচ দিয়া তাহার ঘাড়ের মাংসে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া একটা মোটা সুতা পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যদনাস্তসি করলেই সুতোটা ধরে টানবে। ভয়ানক চিকিৎসা। এই চিকিৎসার গুণেই কিন্তু পতানুর দুর্দান্ত ভাবটা কাটিয়া গেল। কিছুদিন আর সে ঘরের বাহির হইল না। মাস দুই পরে দেখিলাম আবার একদিন সে হাটতলার উঁচু জায়গাটায় উবু হইয়া বসিয়া আছে। ঘাড়ের ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, সুতোটাও আর নাই। ভাবিলাম তাহার সহিত গিয়া একটু কথা বলি। কিন্তু কিছু দূরে গিয়াই আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। পতানু কাদা হাতে লইয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ডাক্তারবাবু, রিনডাইন।"

রিনডাইন! এ আবার কি জন্তু?

পতানু ক্রমাগত বলিয়া চলিল—ডাক্তারবাবু রিনডাইন, ডাক্তারবাবু রিনডাইন ডাক্তারবাবু রিনডাইন। যতক্ষণ রহিল ততক্ষণ বলিল।

আমি আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম না। পরে দেখিলাম এই 'রিনডাইন' শব্দটা পতানুকে পাইয়া বসিয়াছে। রোজই সে কোথাও না কোথাও বসিয়া 'রিনডাইন' করিতেছে। তবে নমুনাটা রোজ এক নয়। কোনদিন ডাক্তারবাবু রিনডাইন, কোনদিন দারোগাবাবু রিনডাইন, কোনদিন বা নাজেরবাবু রিনডাইন।

কিছুদিন পরে একটা পাগলা মহিষের উপদ্রবে গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহিষটা কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানা গেল না। সে মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইত তাহাকেই আক্রমণ করিত। মহিষ বাহির হইয়াছে রব উঠিলেই সবাই ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল দিত।

— কালজয়ী উপন্যাস —

শরৎচন্দ্রের
বিরাজ বৌ ৫৲
বিন্দুর ছেলে ২-৫০
রামের সুমতি ২-৫০
পথ-নির্দেশ ২৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সরোবর ২-৭৫
এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০

প্রফুল্ল রায়ের
নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পিপাসা ৪-৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের
স্বয়ংসিদ্ধা ৩৲

— নাটক —

শরৎচন্দ্রের
বিন্দুর ছেলে ৩৲
রামের সুমতি ২-৫০

দেবনারায়ণ গুপ্তের
বিদ্রোহী নায়ক ৩-৫০
১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ নাটকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবালা পুরস্কার প্রাপ্ত।

শিবেন্দ্রলালের
চন্দ্রগুপ্ত ৫৲

পঞ্চানন ভট্টাচার্যের
বিবস্ত্র মানব ৫-৫০
দেহ ও দেহাতীত ৪৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
প্রিয় বান্ধবী ৬৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
জল-মাটির গন্ধ ২-৫০
পতঙ্গে-উধানে ৫৲
সুধা হালদার ও
অন্যান্য ৩-৭৫

অনুরূপা দেবীর
বাগদত্তা ৫৲
বিবর্তন ৪৲

শচিন্দ্র মজুমদারের
কাজলগাঁয়ের কাহিনী ৫৲
মণিবেগম ৬-২৫

— বিবিধ গ্রন্থ —

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের
অপরাধ-বিজ্ঞান
১ম খণ্ড—৮৲ ২য় খণ্ড—৮৲

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের
আয়ুর্বেদ-সোপান ৪-৫০

সোমেশ্বর ভট্টাচার্যের
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম
সচিত্র। ১ম খণ্ড—৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পহলান্ এবদন পোস্টাফিসের সামনে বসিয়া স্টিনভাইনা বানাইতেছিল। হঠাৎ পথের মানুষটা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িল। পহলান্ কিন্তু পলাইল না। লাফাইয়া গিয়া পথের মানুষের দুই পায়ে দড়ি দুইটা দড়িয়া ফেলিল সে। দুই পায়ে অনিবার্য বন্ধন হইল। কিন্তু যখন পহলান্ মানুষ ধরিয়া মানুষের পথচলা অনিবার্য। পহলান্ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ দিয়া তাহার পেট-ই ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে সে বলিয়া গেল—পাপ, টাইস স্টিনভাইন।'

অনেকদিন পরে একটি বিক্ষুব্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। বৃদ্ধ লোক, বিটায়ার্ড করিয়াছেন। আসাম অঞ্চলে কাজ করিতেন। কথায় কথায় যখন জানিতে পারিলেন আমার বাড়ি মণিহারী তখন বলিলেন যে মণিহারী গ্রামের এক পহলান্ তাহাদের চাবাগানের কুলি ছিল। লোকটা চাবাগানের সাহেব মালিককে এক ঘুঁসিতে জখমী করিয়া সাঁথিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর বলিলেন, সাহেবটা পাজিও ছিল মস্ত। কুলিদের বড়ই নির্যাতন করত। কথায় কথায় বলত— 'Bring down the whip.' তার বাড়িতে দোতলার উপর একটা লম্বা চওড়া লাঞ্চ দিয়ে টেবিল চারদিক ছিল। সেইটে দিয়ে সপাসপ চাবকাত কুলিগুলোকে।' সে জানে পহলানের স্টিনভাইন—ইংরেজি **Bring down** কথার অপভ্রংশ কিনা।

ইস্পাত চক্রের
আবর্তনে
ইস্পাত কারখানা

যুগ যুগ ধরে চক্র আমাদের প্রগতির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সমৃদ্ধির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে মানুষের মহান আকাঙ্খার প্রতীক এই চক্র দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে নিকট থেকে লাভ করেছে। দেশের ইস্পাত কারখানার—ভিলাই, রুরকেলা,

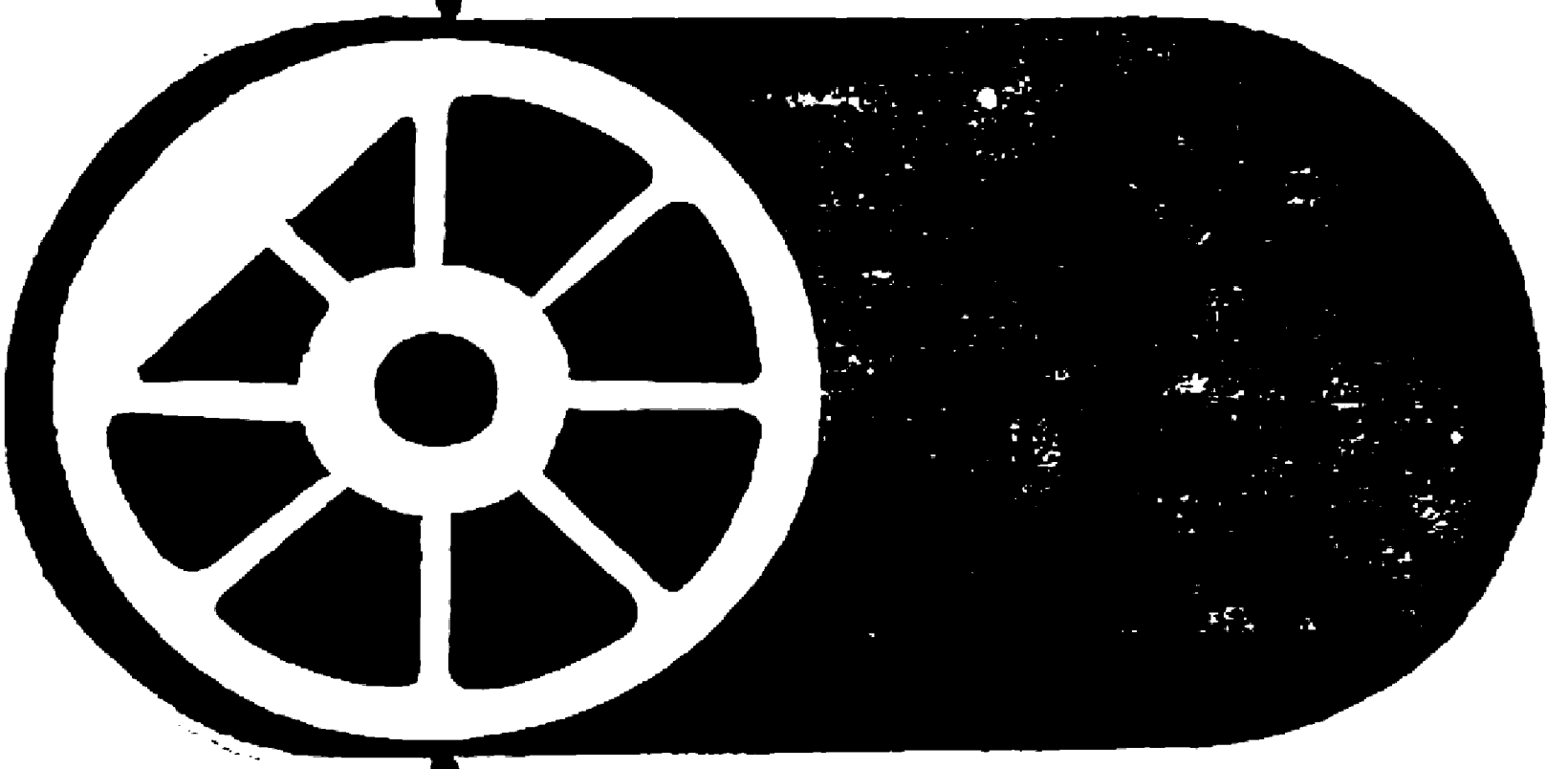

চাটানগর, বার্ণপুর দুর্গাপুর—জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং কারখানাগুলি থেকে মূল্যবান ইস্পাত পরিবহণের সুযোগ পেয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে গর্ব অনুভব করছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
যোগানে কারখানারও মহিমা বেড়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

CENTRAL LIBRARY

লগ্ন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জন পঁয়ত্রিশেকের পার্টি। সবার সঙ্গে যে সবার পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা আছে এমন নয়। একে চলতলা নিয়ে অফিস এমনিই আলাদা-আলাদা ভাব ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগ জোটেও কম সবাই। আজকের দলে আবার অন্য একটা কারণে কিছু অপরিচিতের জাজাল এসে পড়েছে। প্রত্যেক মেম্বারের একজন করে সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে আসার অধিকার ছিল, যাতে জন-আষ্টেক ছিল ক্লাব-গণ্ডীর একেবারে বাইরের। সূচিরা হচ্ছে এই রকম একজন; সে এসেছে তার বালাসঙ্গী অমলার সঙ্গে।

যেখানে পরিচয় নেই সেখানে আবার ঘনিষ্ঠতর পরিচয়েরই আয়োজন বেশি থাকতে পারে নৈলে রোমান্স জিনিসটা মাঠে মারা যেত। সূচিরার বেলায় তাই হোলো।

পিকনিকের জায়গা ঠিক হয়েছিল স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে। নিকটতম গ্রাম থেকেও বেশ খানিকটা তফাতেই। একটা বড় পুকুর, প্রায় দীঘিই বলা চলে, তার চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। পুকুরের ধারে লাল লালুক ফুল, ভিড় করে ফুটে আছে। সম্পাদিকা আফিসের একজন ওপরওয়ালার; বেশ সম্ভ্রান্তও।

প্রায় সমস্ত দিনের প্রোগ্রাম, এমন মজা: ট্রেনে পরিবেশ থেকে আনন্দে কাটল। পুকুর ঘুরে বেড়িয়ে ছোট ছোট দলে একত্র হয়ে আলাপ-আলোচনায় যে যেমন মনোমত। যা যা এসে পড়েছে। সঙ্গীত সাহিত্য নাটকলা আফিস সমাজ; কিছু রাজনীতিও পিকনিকে বিসম্বাদী হলেও। পরিবেশ জনের একেবারে পক্ষপাতিত্ব রকম না হোক অবজ্ঞাও হওয়ার কথা নয়।

সূচিরা যে গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, বা বেটা ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল সে, তার আলোচনার পরিধি ছিল বিস্তৃত। সুতরাং গোষ্ঠীটিও একটু বড়। এইখানে সূচিরার সঙ্গে ভূপেশের পরিচয় হলো এবং যাদের চোখ-কান আলোচনার বাহিরেও সজাগ-সতর্ক ছিল তারা বুঝল এ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সূচিরার বয়স বছর চব্বিশ হবে। ও মোটামুটি-এ-পরিবেশে নূতন হলেও যেমন-ভাবে এর বুদ্ধি সমর্থন ওর বুদ্ধির প্রতিবাদ করে আস্তে আস্তে আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করল তাতে বোঝা গেল বেশ সপ্রতিভ। বেশ জানাশোনাও আছে মনে হলো, অর এ ধরনের আলোচনায় অভ্যস্তও।

আলোচনার মধ্য দিয়েই ভূপেশের সঙ্গে পরিচয়। ও-ও ভূপেশ আগাগোড়া এ দলে ছিল না। সবারই আফিস সংক্রান্ত আলোচনা নিয়েই কাটিয়েছে—ইউনিয়ন স্ট্রাইক, য়্যাপিল ভাতা—এই সব। সূচিরার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সময়। এ অনির্বাচনীয়তা। নয়তো মেয়েরাই কজন পরিবেশনের ভার নিজেদের হাতে নিয়েছিল। তার মধ্যে ও ছিল একাধিক আর সপ্রতিভ বলতে ওদেরই আফিসের দীপ্তি মিত্রই রয়েছে; সুন্দরীও। কিন্তু সূচিরার যেমন কোথায় কি একটা রয়েছে, ধরা যায় না, ওদের তেমনি কিসের রয়েছে একটা যেন অভাবই।

আহারপর্ব শেষ হয়ে যাওয়া, আবার মৌচুমুটি আগেকার মতোই দলে দলে আম বাগানের ছায়ায় ছড়িয়ে পড়ল, আগেকার আলোচনার জের টানতে টানতে। দেরিতে যাওয়া বেলাও পড়ে এসেছে। ছড়িয়েও বেড়াচ্ছে অনেকে একাই বা ছোট দলে।

ভূপেশ সিগারেট টানতে টানতে একসময় নিরুদ্দেশভাবেই পায়চারি করতে করতে সূচিরাদের দলটি সমুখে এসে দাঁড়াল। এদের তখন স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে চলছে। দীপ্তি মিত্রও রয়েছে এবং স্বভাবতই [illegible]

পক্ষীয়ের মধ্যেপক্ষী হয়েই। অফিসের ট্রাফিক একাউন্টেন্ট প্রভাত সান্যাল প্রশ্ন করল বেশ তো, আপনারা কতটা চান তাই বলুন না।

'আপনার প্রশ্নটাই অবান্তর, এর আর জবাব দেব কি?' উত্তর করল দীপ্তি মিত্র। বলল—'দেখছেন' দানের প্রশ্ন চাকরীর ক্ষেত্রে থেকেও উঠে যাচ্ছে, যেখানে একদল অপর এক দলের 'বেতনভোগী'। সেখানে আমাদের দেশাবন হচ্ছে প্রাপ্য উপেক্ষা যতটা পারি টেনে নিতে। সমাজজীবনে তো কেউ কারোর তোয়াক্কাও করছে না, এখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অধিকার, ঘটনে সীমারেখার কি আছে?'

—ও যখন বলে একেবারে অনেকখানি বলে বেশ একটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি নিয়ে।

কিন্তু সমস্ত জীবনের সঙ্গে চাকরি জীবনকে এক করা চলে? এবার প্রশ্নটা সুচিরার।

'কেন নয়?'—একটু চকিত হয়ে চাইল দীপ্তি ভিনজন মেয়ে, তার মধ্যে একজন বিপক্ষ দলেই। বেশ প্রীতিকর হওয়ার কথা নয়।

সুচিরা উত্তর করলো—'এই জন্যে নয় যে চাকরির ক্ষেত্রে অফিসের স্বার্থ আর কর্মীর স্বার্থ অনেকখানি আলাদা। অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী; সমাজের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের স্বার্থ আলাদা নয়...'

আমি একটা কথা বলতে পারি?—শেষ সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করল ভূপেশ। দাঁড়িয়ে আছে, সবার দৃষ্টি ওর ওপর গিয়ে পড়ল।

নিশ্চয় করবেন। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন'—বলে উঠল দীপ্তি।

ভূপেশ একটু মাথা কাঁকিয়ে আমন্ত্রণটা স্বীকার করে নিয়ে বলল—বেশ তো আছি। ওকে আমার প্রশ্ন অবশ্য এটা স্বীকার করে

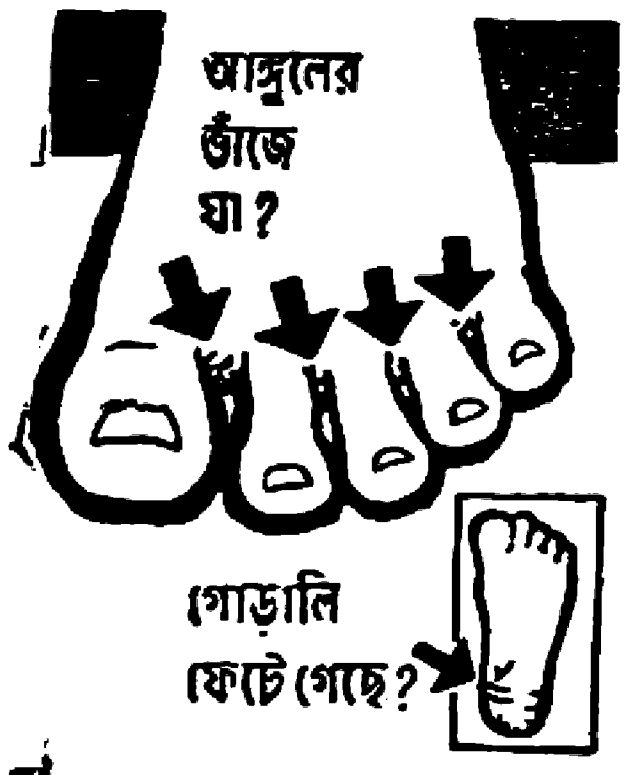

নিয়েই যে অফিস আর সমাজ গঠনে একটা প্রভেদ আছেই—তবে এতটা প্রভেদ কোথায় যে একেবারে তুলনা করা চলে না?'

'প্রভেদটা এইখানে যে একটার গঠন নিছক প্রয়োজনের ওপর, কড়ায় গণ্ডায় টক্কা পাবে। একটার গঠন মন আর হৃদয়ের ভিত্তিতে।'

'কাজ দিলেও মন পাবে না'—তৃতীয় মেয়েটি একটু মন্তব্যই টিপ্পনী করল। কারুর সঙ্গিনী হয়েই এসেছে সুচিরার মতো—তবে প্রকৃতির দিক দিয়ে ওর মতো নয় একটু লাজুকই।

ঐ ধরনের একজন যুবকের কাছ থেকে সমর্থনও এল—মন্দ বলেন নি।

বড় কঠিন জবাবটা দিল ভূপেশই, স্পষ্টভাবে সুচিরার মুখের দিকে চেয়ে—

কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, এই হৃদয় আর মনের ভিত্তির ওপর গঠিত সমাজের ইতিহাস কি গোড়া থেকেই স্ত্রী-পুরুষের সংঘাতের ইতিহাস নয়?

যাতে আমরাই হার মেনে এসেছি।

—একেবারে উত্তমপুরুষেই নিজের ঘাড়ের ওপর নিয়ে সমর্থন জানাল এবার দীপ্তিই। পাশেই রয়েছে, মাঝখানে শুধু তৃতীয় মেয়েটি; একটু হেসেই চাইল ওর দিকে সুচিরা। এবার কি একটু ভেবে নিল, তারপর হাসির সঙ্গে পিঠটা একটু গুটিয়ে নিয়ে বলল—হাতের বাধা গায়ে নিয়ে হারকে স্বীকার করা যায় না অবিশ্যি, তবুও এটা না স্বীকার করেও উপায় নেই যে আদি অন্ত সমাজের কিংবা ইতিহাসে ঐ গোটাকতক অধ্যায় ছিল একটা ফোর্স; সেগুলো ধরে থাকলেই চলবে না।

গায়ের ব্যথাটা মিলিয়ে এসেছে বলেই কি আপনি মন আর হৃদয়ের এত গুণগান শুরু করেছেন? —দীপ্তি প্রশ্ন করলো।

বাধা মরে এলে স্মৃতিটি একটু [illegible] হয়ে আসবারই কথা। হেসেই উত্তর করলো সুচিরা। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি হৃদয় আর মনের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই আজ দুটি পাখাই প্রায় সমান ভরে এসে দাঁড়িয়েছে...

স্ত্রী আর পুরুষ এক স্তরে?...

কোথায়—কি বিষয়ে? একটা ক্ষেত্রেরও নাম করতে পারেন।

—বিরোধীপক্ষ থেকে প্রশ্নের একটা ঝড় বইল।

কোথায় নয় তাই বলুন না বরং। উত্তর করল সুচিরা।

ভূপেশ বলল— বেশ একটা ক্ষেত্রের কথাই ধরা যক, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটা একেবারে মৌলিক। বিবাহই বলুন বা নিজের নিজের সঙ্গী-সঙ্গিনী বেছে নেওয়াই বলুন—রয়েছে সমান সুযোগ সমান অধিকার? কয়েকজনই সমর্থন করলো।

—ঠিক, এটা তো একেবারেই হৃদয় আর মনের ব্যাপার।

জাগর চক্ষু দুটি আবার উত্তর খুঁজতে একটু ঘুরে গেল সুচিরার হাসিটুকু আগেই মেলে এবার অল্প একটু সংকোচ। বলল—আছে বৈকি সুযোগ অধিকার দুই-ই।

মেয়েদের? ...পুরুষদের মতন? ..... কোথায়? মেয়ে হয়েও কি বলছেন আপনি! আবার বিস্মিত প্রশ্নের ঝড় উঠলো।

সুচিরা বলল—কেন, সেখানেই মেয়েরা সমস্তরে উঠে এসেছে পুরুষদের সঙ্গে—শিক্ষার উপার্জনে।

স্বইচ্ছায় নিজে হতে পেরে অর্থাৎ পুরুষ অভিভাবকের দল? প্রশ্ন করল ভূপেশ। একটু ঢোক গিলে নিয়ে বলল—যার জন্যে বেজেন্সী ম্যারেজও দরকার হয়ে পড়ছে।

সুচিরা আবার চোখ দুটিয়ে ভেবে নিয়ে বলল—যায়না নিচ্ছে না তেমনি আবার পরে মেনেও নিচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই তো দেখা যাচ্ছে এটা।

তাহলে বেজেন্সী বিবাহটা আপনি.. বাধা পড়ল। আপনারা পড়েছেন বেজেন্সী ম্যারেজ নিয়ে? বেশ মজাদার কিন্তু পাঁচটা তেইশের সময় হয়ে এসেছে, এক মাইল পথ—এর পরেই একেবারে ছটা ছেচল্লিশ।

একটু দূরে কাঁঠালগাছের তলা থেকে রাজনীতির হলটা উঠে পড়ল এরাও হৈ হৈ করে তাদের দলে চলল ভিড় স্টেশনের দিকে অগ্রসর হোলো নানা বিষয়ে মিশ্র আলোচনা করতে করতে।

সুচিরা পাঁচটা তেইশের গাড়িটা ধরতে পারল না। ওরা যাবে হাওড়ার দিকে। এর খানিকটা আগে বর্ধমানের গাড়িতে ওর বিশেষ দরকার ছিল, একটি বন্ধু ঐ গাড়িতে বেঁচি যাচ্ছে। সেখানকারই মেয়ে তাকে একটা দরকারী চিঠি দিতে হবে। গাড়িটা এই বেশ খানিকটা দেরী করে, এদের হাওড়ার গাড়িটা যখন ডিসটেন্ট সিগন্যালের কাছে এসে পড়েছে। পলে হবেও প্লাটফরমে পৌঁছতে না পৌঁছাতে ওটা ছেড়ে দিল।

একঘণ্টারও বেশী সময়। ছোট স্টেশন নির্জন প্লাটফরম, সদাই দুটো গাড়ি দুদিকে বেরিয়ে গিয়ে আরও নির্জন হয়ে গেছে সুচিরা পুলের ওপরেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটু গা-ছমছম করে বৈকি, তবে এমন আর কি? প্লাটফরম খালি হলেও স্টেশনে লোক রয়েছে। আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

পরিবেশটা বড় সুন্দর, শহরের চাষীর তার মেয়েছেলেই ধুলোভই ওর পক্ষে। পুলের ওপর থেকে বলে যেন আরও অপরূপ। সন্ধ্যাতারাটা দাঁড়িয়ে দেখল। সন্ধ্যা একটু গাঢ় হয়ে আসতে নেমে এল পুল থেকে। হাত-ঘড়িটা উল্টে দেখল আর মিনিট কুড়ি আছে গাড়ি আসতে। টিকিটটা করে নিল।

দু একজন করে জুটছে যাত্রী, তবে একেবারে পাড়াগেঁয়ে নিম্নশ্রেণীর। মেয়ে পুরুষ দুই-ই। বেরিয়ে বেড়াচ্ছে স্টেশন ঘরের কাছাকাছি, এক সময় হঠাৎ কানে গেল —আপনারও অমনিই অবস্থা দেখছি!

খানিকটা গিয়ে ফিরে আসছে পরিচিত কণ্ঠের স্বর শুনে ঘুরে দাঁড়াল ভূপেশ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। হাতে ব্রতক-

CENTRAL LIBRARY

গুলো শালুক ফুল। মুখটা এত উজ্জ্বল সুচিত্রার মনে হোলো যেন বহু প্রত্যাশিত কি একটা জিনিস বুঝি খোঁজে পেয়ে। তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললো—দাঁড়ান টিকিটটা করে আসি।

বের হয়ে এসে চারিদিকে দেখে নিয়ে বলল—'একটু বসলে কেমন হয় ঐ স্থানটায়?'

—অল্প দূরেই একটা গাছের নীচে দেখল সিমেন্টের বেঞ্চ, সেইটা দেখিয়ে।

সুচিত্রা দেখে নিয়ে বলল—আর সময় কোথায়? এটুকু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো কাটিয়ে দেওয়া যায়।'

দ্বিরুক্তিতেই যেন একটু চুপ করল ভূপেশ পরে বলল—একটু স্বার্থপরের মতো শোনায়। আমি সেইখান থেকেই আসছি ছুটে।'

'আটকে গিয়েছিলাম? কেন?'

তারপর শালুকগুলোর দিকে চেয়ে বলল—'এইগুলো সংগ্রহ করতে বুঝি? খুবে শখ তো আপনার। বেশ চলুন বসি।'

গোল বেঞ্চে অসুবিধা তারই মধ্যে একটু ব্যবধান রেখে মুখোমুখি হয়ে বসল দুজনে। সুচিত্রা একটু আড়ষ্টই।

ভূপেশ সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করে দিল সময় নেই বলে একটু যেন নার্ভাসই হয়ে পড়েছে বলল—'এত আনন্দ হচ্ছে আপনাকে দেখে। তা আপনি কি করে স্বাধীর গাড়ি ফেল করলেন?'

আমার তো লোভ এগুলোর জন্য।

শুনে বললো—তেহাৎ স্বার্থপরের মতন শোনায় তবু বলাই ভালো হয়েছে। নৈলে আপনার বন্ধু অমলা দত্তের সাহায্য নিতে হোত আমার।

বিশেষ কোন দরকার ছিল? একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করলো সুচিত্রা।

দরকার... না, সে ধরনের আর কি? আমাদের তর্কটা হঠাৎ থেমে গেল তো? তাও একেবারে আকস্মিক জায়গাটিতে এসে। মানে, তাহলে রেজিস্ট্রী বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতটা আসলে কি?'

'এই!'—একটু বিস্মিতভাবে চেয়ে একটু হেসেও ফেলল সুচিত্রা।

'না মানে দরকারটা'...

যেন অল্প সময়ে অনেক কথা সেরে নেবার তাগিদে একটু দ্রুত করেই আরম্ভ করতে যাচ্ছিল ভূপেশ, এই সময়ে একটি স্ত্রীলোক সামনে দিয়ে একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে একটু ব্যস্তভাবে হনহন করে বলতে বলতে চলে গেল—এ গাড়িও আধঘণ্টা লেট—সকাল হলে লেট হওয়া বের করতো যাচ্ছে।'

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সেই তাড়াহুড়োর ভাবটুকু যেন নামিয়ে দিয়ে ভূপেশ হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইলো সামনের দিকে। একটু অদ্ভুত বৈকি তবে মেয়েরা এ ধরনের ভাবান্তর খানিকটা বোঝে বলে সুচিত্রা চুপ করে রইল বরং এত ফুলের মধ্যে সে হয়তো নতুন জোৎস্না, এই মুক্ত বাতাস, তার সঙ্গে আরও কত উপলব্ধি করবার অবসর পেয়ে গেছে একটু।

।। নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ।।

শংকর
- যেখানে যেমন ১০·০০
- জন-অরণ্য ১২·০০
- আশা-আকাঙ্ক্ষা ৮·০০

সৈয়দ মুজতবা আলী
- তুলনাহীনা ১২·০০
- মুসাফির ৯·০০
- কত না অশ্রুজল ১৪·০০
- শবনম ৮·০০
- অবিশ্বাস্য ৬·৫০
- হিটলার ১০·০০
- ধূপছায়া ৬·০০
- দ্বন্দ্ব মধুর ৬·০০
- শহর-ইয়ার ১৪·০০

চাণক্য সেন
- অশোক উদ্ভিদ মাত্র ১০·০০
- আজ এখানে ৭·০০
- সবে শুরু ৬·০০

শচীন ভৌমিক
- বেড সাইড শচীন ভৌমিক ১৫·০০
- শের সায়রী ৬·০০

নিমাই ভট্টাচার্য
- ব্যাচেলার ৬·০০
- ডিফেন্স কলোনী ৪·০০
- মেমসাহেব ১০·০০
- ডিপ্লোম্যাট ৮·০০
- এ ডি সি ৮·০০
- রিপোর্টার ৮·০০
- প্রবেশ নিষেধ ৫·০০

কালকূট
- মন চল বনে ৮·০০
- বনের সঙ্গে খেলা ৭·০০

বিমল কর
- অলস ভ্রমণ ৯·০০
- নির্ভর ৬·০০

সমরেশ বসু
- লগ্নপতি ৬·০০
- হৈষাধ্বনি ৬·০০
- রূপায়ণ ৫·০০
- অপরিচিত ৬·০০
- বিষের স্বাদ ৫·০০
- অলকা সংবাদ ৫·০০
- অচিনপুর ৮·০০
- অগ্নিবিন্দু ৪·০০
- অন্বিত ৬·০০
- অন্ধকার গভীর গভীরতর ৪·০০
- ত্রিধারা ৪·০০

সৌরীন সেন
- অপারেশন হাইতি ১০·০০
- কঙ্গো থেকে ফেরা ১৪·০০
- চিলি ১৪·০০

রূপদর্শী
- রূপদর্শীর সমগ্র নকশা ১০·০০

চিরঞ্জীব সেন
- যুদ্ধ আর যুদ্ধ ৮·০০
- স্যাবোটাজ ৯·০০
- আমি K.G.B. এজেন্ট ৭·০০
- আমি C.I.A. -এর এজেন্ট ৬·০০
- শিরায় শিরা পাপ ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- বুকের মধ্যে আগুন ৬·০০
- হীরক দীপ্তি ৬·০০
- অচেনা মানুষ ৫·০০
- বসন্তের বাইরে ৬·০০
- মহাপৃথিবী ৫·০০
- রূপালী মানবী ৬·০০
- মন ৮·০০
- আমি কি রকম ভাবে [illegible] ৫·০০
- বন্দী [illegible] ৫·০০
- কাবাসনেট ১৫·০০
- [illegible] দেশের কবিতা ৮·৫০

নতুন পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :
বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

ওর কিছু মন্দ লাগবে না; একজন পরিচিত সঙ্গীই তো। একটু কৌতুকরস থাকায় ভালোই লাগছে বরং।

এসময় চুপেশই বলল—একটু সচকিত হয়ে—হ্যাঁ কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলাম—হ্যাঁ এই তো—বলছিলাম তাহলে রেজিস্টী বিবাহ—অর্থাৎ যখন গার্জেনদের নরম করা গেল না নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেওয়া সমর্থন আছে এতে আপনার? সূচিতা সময়ও পেয়েছে প্রশ্নবাণের পর হেসেই বললো—কি জানেন? ভদ্রলোকের ওর্ড বসে না থেকে প্রশ্ন কাটানো ওর মূল্য কি আছে? বিশেষ করে আমার মতন একটা মেয়ের মর্জি নিয়ে যখন বেরোয়।'

এই দেখুন মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে এত সচেতন হয়েও আপনি আবার এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনার মতন শিক্ষিতা একজন মেয়ে।'

কি জানেন—হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে—প্রশংসা বেড়ে যাওয়ার ভয়েই বাধা দিয়ে শুরু করল সূচিতা। বলল—'পরিস্থিতি তো অনেকরকমই হতে পারে। যেমন ধরুন যেমন বললাম এখন যেমন নিচ্ছেন তো অনেক গার্জেন। বিশেষ করে বাপ-মা যেখানে বনসারনভ অর্থাৎ হৃদয়-মনের সম্বন্ধ সেখানে সবচেয়ে বেশি।'

দাঁত দিয়ে ঘুড়ে আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে শুনছিল চুপেশ চোখ তুলে বলল—ধরুন যদি যেমন না হন?

হেসে ফেলল আবার সূচিতা বলল—প্রশ্নটা করেই আবার প্রশ্ন শুরু করে আনছেন আমার কাছে।'

একটু বিরতি দিয়ে বলল—কি জানেন? আমাদের তো ডিবেটিং সোসাইটির ওকেই এগজেক্টলি: এতো কোন একক্ষণচলতির সাম্প্রতিক বিধান দেওয়া নয়।'

সেটা শুনলাম অমলা দত্তের কাছে; বলল আপনি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির সেক্রেটারী।'

ঘরে চোখ বড় বড় করে এমনভাবে চাইল সূচিতা যাতে অল্পপরিচয়ের সঙ্গে খানিকটা কপট রাগ যেন মিশে রয়েছে। একটু লজ্জা ও একটু আত্মপ্রসাদও হয় বৈকি কেউ যেচে পরিচয় নিতে গেলে জানতে পারলে।

বলল—অমলা সব বলতে গেছে আপনার কাছে। তার সঙ্গে একগোট বোঝাপড়া করতে হবে।

এরপর যেন অনেকখানি জেনে ফেলার জন্যই বেশ সহজ হয়ে বসল সূচিতা বলল—'বেশ তাহলে আসল সেক্রেটারী হিসাবেই একটা প্রশ্ন করি আপনাকে উত্তর দিন—হঠাৎ সব ছেড়ে রেজেস্ট্রী বিবাহ নিয়ে এতটা উতলা হলেন কেন আপনি? নিজে জড়িত নন তো?'

বেশ একটু হেসে উঠল।

'সত্যি বলি তাই?'

একটু যেন ধাক্কা খেল সূচিতা যেন লঘু চাপল্যের মুখে প্রশ্নটা করে বসলেও ঠিক এই উত্তরটা আশা করেনি। সামলে গিয়ে আবার বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করল—

'কোন বাধা পাচ্ছেন তাতে?'

'পেতে পারি।' —একটু সময় নিয়ে উত্তর করল চুপেশ। একটু থতমত খেয়ে গেছে হবে বিষয়টার মাঝখানে এসে পড়ে আর পশ্চাদপদ হবে না ঠিক করে নিয়েছে।

'পেতে পারেন? ঠিক বুঝলাম না তো।' —মন্তব্য করল সূচিতা।

হয়তো শরৎ সন্ধ্যের জন্যই জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশ আর চারিদিকের শ্যামলিমার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা একবার ধীরে ধীরে বুলিয়ে নিয়ে এল চুপেশ তারপরও একটু আড়াল রেখেই বলল—ধরুন কারুর যদি ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে বিয়ের কথা বাপ-মায়ের দিক থেকেই...'

'বেশ তো'—থেমে যেতে চুপেশ সূচিতা। তাতেও উত্তর না পেয়ে সোজা প্রশ্ন করল—'অমত তাঁর নিজের—অপছন্দ?

অমত বা অপছন্দর কথা সে সে বকমের না থাকতে পারে—'

আবিষ্টভাবে ধীরে ধীরে শুরু করল চুপেশ বলে যেতে লাগল—'তবে জীবনে কখনও কখনও এমন এক একটা দিন এসে যায় যখন মনে হয় জন্ম-জন্মান্তের ধরে যার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি তাকে যেন পেয়ে—এমন একটা শুভলগ্ন এমন একটা পরিবেশ—পরিস্থিতি যদি আসে তার জীবনে সূচিতা দেবী...'

'এসেছে?' —হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠেছে পেটে তবু কণ্ঠস্বরে একটু করুণার একটু সহানুভূতির আমেজ মিশিয়েই প্রশ্ন করল সূচিতা এখনতো অনেকখানিই স্পষ্ট।

এসেছে বৈকি সূচিতা দেবী...'

সূচিতার মনে হোলো অল্প একটু ঘোর কুয়াশা আরও একটু আতুরভাবেই শুরু করতে গিয়ে সামলে নিল চুপেশ পরক্ষণেই সচকিত হয়ে বলে উঠলো—এই দেখুন হয়তো ভুলেই বসতাম। এই ফুল কটা'

বাড়িয়ে ধরল শালুকের স্তবকটা। সূচিতা একটু ঝুঁকেই দুহাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানাল।

একটু চুপচাপই কিন্তু থাকে এর পর। গেলও। একসময় চুপেশই বলল—'কৈ আমার কথাটার উত্তর পেলাম না...গাড়িটা এসে পড়বে এবার। আপনার তো চন্দননগর বেশ, ধরুন, আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি করতেন?

একটা 'আহা' উঁকি মারেই মনে তবু একটা মূঢ়তা আর এমনিই—একটা উত্তরও জোগানো হয়েছে তার মোহমুগ্ধতার ঘোরেই সে হাসিটা চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ছে সূচিতার পক্ষে। তবু সাধারণতো কণ্ঠস্বরটা সহজ সংযত রেখেই বলল—হয়তো এরকম অবস্থায় পড়লে আমাকেও নেমে পড়তে হোত। কিন্তু লক্ষ্যের তো শেষ নাই। একটার পর একটাকে তো আর আরও দুরূহের মনে হতে পারে তখন...'

'কিন্তু...' বলে আবার শুরু করতে যাচ্ছিল সূচিতা তৎক্ষণে ব্যাগটা খুলে একটা সুদৃশ্য বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রটি বের করেছে। বাড়িয়ে ধরে একটু হেসেই বলল—তার চেয়ে এই বা মন্দ কি বলুন? ...হ্যাঁ, যাবা মায়েরই ঠিক করা বৈকি। বেশ হোল অমলার জন্য এনেছিলাম গাড়িতে দিয়ে দেব বলে। আপনিই নিন।'

গাড়িটা এসে গেছে। 'আমি এই মেয়েদের গাড়িতেই উঠে পড়লাম' বলে এগিয়ে দিয়ে রঙ ধরে উঠে পড়ে ঘুরে বলল—আসবেন কিন্তু নিশ্চয়।

চিঠিতে দুটি ফটো ঠুকে দেওয়া রয়েছে। একটি সূচিতারই। দরজা আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চুপেশ, হঠাৎ সম্বিত হোল এর পরের গাড়ি একেবারে নটা পাঁচে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে যখন উঠল গাড়িটা চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

- কোন্ উপন্যাস সাহিত্য জগতে বিপ্লব এনেছে?
- কোন্ উপন্যাস পাঠকের একান্ত নিজস্ব?
- কোন্ উপন্যাস প্রত্যেক লাইব্রেরীতে রাখার মত?
- কোন্ উপন্যাস আজকের পাঠকের জন্য শ্রেষ্ঠ?

প্রণব মৌলিকের

উলঙ্গ আর্মি দাম—৮-০০

পরিবেশক—চেতনা লাইব্রেরী, ০৫এ, কলেজ স্ট্রীট কলি—৯

CENTRAL LIBRARY

বন্ধুজায়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

বন্ধুজায়ার চিঠি জীবনে কোন দিন পাই নি। এই প্রথম। হকচকিয়ে গিয়ে অন্ধুজায়ার হস্তে দিয়ে বলি, 'তুমি পড়। তোমাকেই লিখেছেন মনে হয়।'

খামখানা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে যান উনি। বলেন, না, আমাকে নয়, তোমাকেই। তবে ভদ্রতার খাতিরে আমাকেও ছেড়ে বলেছেন। নাও পড়।'

আমার বন্ধু সোমদেবের এখন এমন অবস্থা যে সে নিজের হাতে লিখতে পারে না। তাই লিখেছেন বন্ধুজায়া মজুমদারী। শুনেছিলাম বেচারা পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে। খুঁটিনাটি জানতাম না। শুধু একটা পোস্টকার্ড লিখে সমবাথা ও শুভ-কামনা জানিয়েছিলুম। তারই বিলম্বিত উত্তর এ চিঠি।

লিখেছেন ও নাকি প্রায়ই আমার নাম করে। বোধহয় কিছু বলতে চায়। আমি যদি ওরা করে একবার দেখতে আসি তো ওরা বিলক্ষণ সুখী হন। আরো সুখী হন যদি ইরা দেবীও আসেন। চিকিৎসার ত্রুটি নেই যদিও, তবুও কিছু বলা যায় না।' হেরুদণ্ডে চোট। অপারেশনের প্রস্তাব উঠেছিল। ও কিন্তু রাজি হয়নি।

কি দুঃখের কথা! ইরা হতবাক হন।

হাঁ তবে অপারেশন হলে ও হয়তো সেরে উঠবে। দেখি যদি ওকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারি। আমি আশা দিই।

অপারেশান হলে নয়, অপারেশান সফল হলে। ও কুঁকি নেবে কে? তুমি? ওসব সিদ্ধান্ত ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে এমনি একবার দেখা করে এস। কতকালের বন্ধু! ইরা কলকাতা যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু সস্ত্রীক নয়।

বন্ধু বলে বন্ধু। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করে কেউ? করলুম কার যুক্তি শুনে? কেমন অবাক হয়েছি! বলেছিল, ছেলে হলে তাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পঁচিশ বছর লাগে। মেয়ে হলে তাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে তার বিয়ে দিতে একুশ বছর লাগে। তা হলে তোমাকে এমন বয়সে বিয়ে করতে হবে যখন বিয়ে করলে তুমি ঝাড়া হাত-পা নিয়ে রিটায়ার করতে পারবে। নইলে পেনসনের টাকায় কুলাবে না। হেমন্তের মরবার স্বাধীনতা থাকবে না। ওঃ কত বড়ো একটা আর্থবিকা।'

কই এতথা তো কোনো দিনই বলনি।' ইরা শুনে অবাক।

ও কত বড়ো একজন প্রোফেট! দেশ ওকে চিনল না। কিন্তু ও যা চেয়েছিল ও তা পেয়েছে। সময়ে বিয়ে, সময়ে ছেলেমেয়ে, সময়ে তাদের প্রতিষ্ঠা ও বিবাহ। ওর এখন ঝাড়া হাত পা। বাড়ী ও করেছে কলকাতায় শ্যালীগঞ্জ অঞ্চলে। সব কল। মুখ বেচারা এই যে বেচারা এখন শয্যাশায়ী। কে জানে এটাই হয়তো শেষশয্যা। মেরুদণ্ডে চোট। হায় ভগবান!' আমি বিমর্ষ হই।

আমরা দুই বন্ধু সমবয়সী। ও যদি অকালে চলে যায় আমিও কি বেশী দিন বাঁচব। এটা তো আমাকেও নোটিশ দিয়ে বলা যে, অন্নদাশঙ্কর তোমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু মরবার স্বাধীনতা কি তোমার আছে? ছেলের চাকরি জোটে নি। মেয়ের পাত্র মেলেনি, বাড়ীও করনি যে তোমার অবর্তমানে-তোমার স্ত্রী সেখানে আশ্রয় নেবে।

অপারেশানের ভাবনায় তুমিও নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? ইরা আমাকে তাড়া দেন। যেন সমস্যাটা সোমদেবের নয় তোমার নিজের।'

সমস্যাটা কেবল সোমদেবের নয়, আমার তোমার সব মানুষের। কিন্তু কি করে বোঝাই সে কথা! মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন ছিল, হাতে আমাকে অমৃত করবে না কী করব আমি তা নিয়ে? আর আমার প্রশ্ন হলো, বেঁচে কি হবে যদি মরবার স্বাধীনতা না থাকে?

মডার্ন আসবাবে ভরা মডার্ন ডিজাইনের বড়ী, তারই একপ্রান্তে একটা খাটো ধরণের ফ্রেঞ্চের ঢালা বিছানায় শুয়ে আমার বন্ধু সোমদেব। এক কোণে একটা ক্যাম্পখাটও ছিল, সেটা ওর চিরসাথী। সেটলমেন্টের শিবিরে আমরা দুই বন্ধু যখন একই তাঁবুতে থাকতুম তখন দুজনের ছিল দুই ক্যাম্পখাট। আমি যে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি ও কিন্তু কোন দিনও ছাড়ে নি। ক্যাম্পেন্টরের কুঠীতে, কমিশনারের ভবনে যখনই হতবার ওর অতিথি হয়েছি ততবার লক্ষ্য করেছি সোমদেব শোয় ওর সেই পুরোনো ক্যাম্প-খাটে।

ঢালা বিছানার একপাশে বসে ওর একখানা হাত আমার হাতে টেনে নিয়ে বলি। বলি, সেরে উঠে তুমি ওই ক্যাম্পখাটে শোবে; দেখে আমার বুক-জোড় জুড়াবে।'

সেরে ওঠা আমার হাতে নয়, অন্নদাশ। তবে কেওড়াতলার যাবার সময় ওই ক্যাম্প-খাটটি আমার বাহন হবে।' সোমদেব বলে মমতার সঙ্গে। পুরোনো ফার্নিচারের যেমন পুরোনো ঘোড়া পুরোনো অফিসারের তেমনি পুরোনো ক্যাম্পখাট। এমনি দু-চার কথার পর আসল ব্যাপারে আসি। ঘটনাটা বলব বলে আর কি করে? এখন তো ওকে আর ঘোড়ায় চড়তে হয় না। পড়ল কিসের থেকে?

'ঘোড়ায় চড়ার পাট কি আছে যে, অন্নদাশ? সেটা ছেড়ে দিয়ে ছেলেরে

বসিয়ে দিয়েছে। সারাদিন চেয়ারে চড়ে কাটে। তারপর মোটরে চড়ে বাড়ি ফিরি। এমনি করে আমার তো বাত হবার লক্ষণ। একজন পরামর্শ দিলেন যৌগিক আসন করতে। প্রথমেই পশ্চিমোত্তান। যোগ কিছুক্ষণ শীর্ষাসন আসন করি। সব শুনলি দূরে হয়ে যায়। নবীর ভাজা থাকে। শেষে আমিই কতজনকে যৌগিক আসনের পাঠ দিই। সোমদেব গর্ব করে বলে। তার মুখে চোখে আত্মপ্রত্যয়ের আভা।

শুনেছি তুমি মাথার উপর দাঁড়াতে সিদ্ধহস্ত। না, না, সিদ্ধমস্তক। আমি ঠাট্টা করে বলি। কেমন জব্দ।

[illegible] শিখতেন এখন মাথার দাঁড়াতে শিখলেন। সেক্রেটারীরাও। এরপরে দেখবে বেয়ারা ও চাপরাশিরাও। সোমদেব কিন্তু সিরিয়াস।

গান্ধী শিক্ষা দিয়েছিলেন দেশের লোককে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। নেহেরু দিয়েছেন নিজের মাথায় দাঁড়াতে। তারপর? আমি চাই কাহিনীটা শুনতে।

মাথায় দাঁড়ানো যখন ভাল করে রপ্ত হয়ে গেল তখন আমি ভাবলুম কী, জানো? শূন্যমার্গে দাঁড়াতে যদি পারি তো হাঁটতে পারবো না কেন? সোমদেব বলে গম্ভীর-ভাবে।

সে কী! তুমি মাথায় হাঁটতে চেষ্টা করেছিলে নাকি? আমি আঁতকে উঠি।

তাই করতে গিয়ে তো এ শিক্ষা। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পতনের হেতু। বলতে বলতে সোমদেবের গলা ধরে আসে।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি যা করতে গিয়ে তোমার শিরদাঁড়া ভেঙেছে তাই করতে গিয়ে একদিন দেশেরও শিরদাঁড়া ভাঙবে।'

সোমদেবের চোখে জলের আভাস। বলে, পতন হলে উত্থান হয় এই নিয়ম। দেশ আবার উঠবে। কিন্তু আমি কি আর উঠতে পারব, অদ্রীশ!

তুমিও পারবে। বহু লোক পারছে। বিজ্ঞানের বলে কি না হয়। তোমাকে আমরা আমেরিকায় বা রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেব। এখা না পারে ওরা পারবে। করেন এক্সরেটেস দিয়ে তো জানো? সে হবে। আমি আশ্বাস দিই।

আমার জন্যে ভালো ডাক্তার যতো মূল-ভাল্কী বন্ধুরা সব আছেন। শুনে সুখী হবে যে ভিয়েনায় পাঠানোর প্রস্তাব সরকার থেকেই উঠেছিল। আমি কিন্তু সাফ বলে দিয়েছি যে মরতে হয় নিজের শ্বাসভবনে নিজের শয্যায় শুয়ে মরবো। হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে নয়। বাঁচবই তার কোনও নিশ্চয়তা যখন নেই। সোমদেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

ওর যখন এতই অনিচ্ছা তখন ওকে জোর করে অপারেশান টেবিলে নিয়ে যাওয়া চলে না। প্রকৃতি হয়তো ভাঙা হাড় আপনি জোড়া দেবে। প্রকৃতিকে সময় দিয়ে দেখা যাক। এই হলো আমার অভিমত।

ও প্রসঙ্গ থাক, ভাই অদ্রীশ। সোমদেব অনুরোধ করে। জানো তো আমার এখন বাড়া হাত-পা। মরবার স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর কিসের ভাবনা। কে আমার উপর নির্ভর।'

কেন? বন্ধুজায়া? আমি সবিস্ময়ে বলি।

দেখছ তো কত বড় সৌধ বানিয়ে দিয়েছি। আনন্দে কাটবে পান সুধা নিরবধি মানে বাড়ীভাড়া। সোমদেব রসিকতার ভান করে।

ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই। তুমিই যদি না থাক তবে সুখ কইল কোথায়। তোমাকেই তিনি চান। তোমাকেই থাকতে হবে। তাই সোমদেব।' আমি অনুনয় করি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরে সোমদেব বলে, 'অদ্রীশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল। আমি তো জীবনের দিকে তাকাবার সময় পাইনি তুমি বরং পেরেছ। সিদ্ধির জন্যে জীবনভর সাধনা করা দেখছি সিদ্ধি নয়, সিদ্ধাই।'

'সিদ্ধাই।' আমি চমকে উঠে বলি, 'কখন এরকম মনে হলো?'

এখন তো আমার হাতে কোনো কাজ নেই। সেক্রেটারিয়েট থেকে একটা ফাইল আসে না, শূন্যে শূন্যে অর্ডার দিতে কি পারতুম না? মস্তিষ্ক তো অক্ষম হয়নি। তবু পাঠাবে না। তাহলে কি নিয়ে বাঁচি? গীতা উপনিষদ নিয়ে? সব মুখস্থ হয়ে গেছে। তোতাপাখীর মতো আওড়াই। কিন্তু এক বিন্দু বুঝিনে। সংস্কৃত দুর্বোধ্য নয়। ভাবটাই দুর্বোধ্য। সন্ধ্যেবেলা একটু কীর্তন হয়। ওর মধ্যে কিছু পাই। অকপটে বলে।

বেশ তো। যাতে আনন্দ পাও তাই না পড়। আনন্দও এক প্রকার চিকিৎসা। আনন্দেও মানুষ সেরে ওঠে। তোমার সেরে ওঠা চাই, তা সে যে পদ্ধতিতেই হোক।' আমি বিধান দিই।

সেরে ওঠা এ-জীবনে হবে না, ভাই অদ্রীশ। আমি তো বুঝি আমি কি ছিলুম, কি হয়েছি। সত্তার থেকে মনও উঠে গেছে আমার। আমাকে ঠকিয়েছে।' সোমদেব ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলে।

'কে তোমাকে ঠকিয়েছে?' আমি হতভম্ব হই।

'সিদ্ধাই'। এক কথায় উত্তর দেয় সোমদেব।

আমি আর প্রশ্ন করিনে। চুপ করে শুনি। ও যা বলতে চায় [illegible]

যতই ভাবছি ভাই অদ্রীশ, ততই আমার কান্না পাচ্ছে ভেবে যে, জীবনে কত কী করবার স্বপ্ন দেখেছিলুম কিছুই করা গেল না। আমারই দোষ। রাবণের মতো আমিও সংকল্প করেছিলুম স্বর্গে যাবার জন্যে একটি সিঁড়ি গড়ে দিয়ে যাব, তা হলে মানুষকে আর মরতে হবে না; সশরীরেই সে স্বর্গারোহণ করবে।' সোমদেব চোখ বুজে আচ্ছন্ন হয়।

আমি তা শুনে চমৎকৃত হয়ে ভাবি এই দ্বৈতের কীটের লোকেরও অমন এক অবাস্তব স্বপ্ন ছিল। আক্ষরিক অর্থে স্বর্গের সিঁড়ি নয় বটেও।

কৃত্তিবাসের রাবণ বলেছিল রামকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে।

করিব এমন পথ সবে কেন উঠে
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে
থাকিব অপূর্ব কীর্তি সংসার মাঝার
ত্রিভুবনে সশরীরে ঘুষিবে আমার।
সেইক্ষণে করিতাম যদি হইলে মনে
কেনকালে কার্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে।'

যখনকার যেটা তখন যদি সেটা না করা হয় তো আর কোনকালেই করা হয় না। মুহূর্তকালে আপসোস সার হয়।

'আমার জীবনেও' সোমদেব বলে যায়, মাঝে মাঝে একটু স্বপ্ন এসেছে যা রাবণের সিঁড়ির মতো অপূর্ব। তৎক্ষণাৎ যদি কাজে হাত দিতুম তবে কবে সারা হতো। কিন্তু রাবণের মতো আমিও করছি করবো বলে শিকেয় তুলে রেখেছি। মন দিতে পারিনি। জানো তো দাসদের কাজ কেমন জড়ুনি অত জটিল। চব্বিশ ঘণ্টা টেলিগ্রাম আর টেলিফোন আসছেই। বারান্দায় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়। রাস্তায় গণমিছিল, শান্তির আশায় গ্রামে গিয়ে চাঁদা তোল। সেখানেও শত রকমের আর্জি আর নালিশ।

জানি তো? আমিও তো সমান ভুক্তভোগী। না সমান নয়। সোমদেব বলে, তোমাকে ওরা সরিয়ে দিয়ে সময় দিয়েছিল, অদ্রীশ। নইলে তুমি তোমার রাবণের সিঁড়ির সিকিভাগও গড়তে পারতে না। কিছুটা যে পেরেছ এর জন্য দুর্ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। দুর্ভাগ্যই সৌভাগ্য।

তার জন্যে কি ভীষণ মাশুল দিতে হয়েছে বন্ধুরা তা জানে না। আমি জানাই নি। বলি, সোমদেব, আমার প্রসঙ্গ আজ থাক। তোমার স্বপ্নের কথাই শুনি।

প্রথম যেদিন ওকে দেখি তখন থেকেই ও দ্বৈতের বাস্তববাদী। কত ধানে কত চাল ও ঠিক হিসেব করে বলতে পারে। ভাবালুতা বা ভাবপ্রবণতা কখনো ওকে স্পর্শ করেছে দেখিনি। ওর সঙ্গে যারা কাজ করেছেন তাদের মুখে শুনেছি ও তো মানুষ নয়, ও একটা মেশিন। ও যখন ইন্সপেকশনে যায় তখন অধীশ্বরা থরথর কাঁপে। সাজাও দেয় কঠোর হাতে। পুরোদুটির মেলে ও একটা বিস্ময়।

• ঘড়ি •
• জামা গহনা •
গ্যারান্টির ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
৫ ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

এমন যে সোমদেব তারও একটা যাবণের স্বপ্ন ছিল। কোনো দিন আমাদের কাউকে জানতে দেয়নি। পরিবারকেও না।

বলো কী হতো ভাই? কেউ বুঝত না। সবাই ঠাওরাত পাগলামি। বদনাম রটে যেত। সরকার আমাকে দায়িত্বের কাজ দিত না। কেরিয়ারটা মাটি হতো। তাই মনের বাসনা মনে গোপন রেখেই জীবনটা কেটে গেল।' সোমদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমাকে যদি বলতে আমি বলতুম পাগল ঠাওরাতুম না। কিন্তু এখনো হয়তো খুব বেশী দেরী হয়ে যায় নি। এখানে তোমার সিঁড়ি শুরু করে দেওয়া যায়. আজকেই শুরু হোক না? যদি বলসাপেক্ষ না হয়. আমি উৎসাহ দিই। আরে না! তুমিও যেমন। সোমদেব ম্লান মুখে বলে। কখনো তা আরম্ভ করো না. যা তুমি শেষ করতে পারবে না।

সেদিন ও কি সহজে মুখ ফুটে বলবে কী ওর জীবনের স্বপ্ন। অথচ ওই জনাই আমাকে ডাকা। ধৈর্য ধরি। এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গ বই। যেন বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই আমার। ওর খুশি হলে ও বলবে। নয়তো বলবে না।

কিন্তু বলবার জন্য ও আকুলি-বিকুলি করছিল। না বলে সোয়াস্তি পাচ্ছিল না। কখন এক সময় বলতে শুরু করে দেয়। আমার খেয়াল নেই।

তোমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগে আমি যখন স্কুলের ছাত্র, সোমদেব বলতে থাকে, তখনি ও স্বপ্ন দেখি। তখনকার দিনে আমি ছিলাম স্বপ্নালু বালক। গল্প-নুনার জগৎ নয়। খেলাধুলোয়ও না। ছবি আঁকতুম। গান করতুম। কবিতাও লিখেছি যদি বলি তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এর চেয়ে বড়ো কথা আমি যাত্রার পালা লিখতুম।

অবাক করল সোমদেব। যাত্রার পালা।

হ্যাঁ। রামায়ণ মহাভারত ভেঙে ভেঙে যাত্রার পালা। সেসব প্রবণতা প্রকাশো অভিনয়ের জন্য নয়। তার জন্য চাই যাত্রার দল। দল আমার কোথায়? দল থাকলেও কি সকলের সামনে দাঁড়াবার সাহস ছিল? যখন হাঁক দিয়ে বলতেন, বেত ফেটে নিয়ে আয় যে, তখন জানতুম ও আমার পিঠেই পড়বে। আমার ওসব যাত্রা আমি বেনামী করে দিতুম। হয়তো দুটো একটা সুরে কোথাও অভিনয় হতো। বড় হয়ে চাকুরিতে ঢুকে একবার এক যাত্রা দেখে আমার স্পষ্ট মনে হয়েছিল যে আমারি সোম-দেবকে সম্প্রতি। খোল আর নলচে বদল দিয়েছে।' হঠাৎ হাসিতে আমিও যোগ দিই। অবিশ্বাসা যদিও।

তারপর হঠাৎ কেমন করে আমি অন্য মানুষ হয়ে উঠি। খেলাধুলোয় ঝোঁক, লেখা-পড়াটা তেমন নয়, তবে পরিশ্রমী ছাত্র বলা যেতে পারে। ছেড়ে দিই। তাতে সময়ের প্রচুর হয়। সেই সময়টা কাজে লাগালে ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হওয়া যায়। সময়ের এই মূল্যবোধ আমাকে সচেতন করে দিয়েছে। এ যেমন সত্য তেমনি সত্য আমার স্বপ্ন ভুলিয়ে দিয়েছে। গড়তে চেয়েছিলুম আমার যাত্রার দল। যে দল আর সব দলকে হারিয়ে দিয়ে সারা দেশের সেরা দল হবে। আর রামায়ণ মহাভারতের শ্রুতে সারা দেশকে প্লাবিত করে দেবে। সোমদেব অতীতের স্বপ্নে মগ্ন হয়।

ওটা তো চিরকাল হয়ে এসেছে, সোম-দেব! এই রামায়ণ মহাভারত ভাঙিয়ে তো কত হাজার বছর খাওয়া হচ্ছে। নতুন কী তুমি দিতে যা আর কেউ কখনো দেয়নি।' দোষ কি যাত্রার দলের অভাব? না সেবা করার অভাব? আমি তর্ক করি।

তুমি ঠিক ধরতে পারবে না ভাই অরীশ। আমার অইডিয়া ছিল মামুলী যাত্রা নয়। এমন এক যাত্রা যাতে দর্শক ও শ্রোতারা অংশ নেবে। আমার দল যেখানেই যাবে সেখানেই সারা গ্রাম জমায়েত হবে। আর সারা গ্রাম হোম খেয়ে। ছেলেবেলার অবশ্য অতদূর ভাবিনি। পরে আমার চিন্তার বিকাশ হয়েছে। দর্শকরা বা শ্রোতারা প্লাবিত হবে এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য সবাইকে একটিত করে তোলা। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নগর কীর্তনের মতো। আমি অবশ্য তুচ্ছ মানুষ। তার সঙ্গে আমার তুলনা। কিন্তু আমার যাত্রার অইডিয়া ছিল ওই নগরকীর্তনের মতোন। সোমদেব উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

সারস্বতের বই

ভাষা ও সাহিত্য ॥ পরেশচন্দ্র মজুমদার : সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্রাথমিক ২৫·০০। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : মানু ভাষার ক্রমবিকাশ ২·০০। গৌরীনাথ শাস্ত্রী : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ৮·০০। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় : পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস ৮·০০। সুরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্যসন্দর্শন ও রসচন্দ্রিকা ২৭·৫০। কার্তিক লাহিড়ী : বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি ও প্রগতি ১০·০০; গল্পকথা ও বাংলা উপন্যাস ১০·০০। সতী ঘোষ : বৈষ্ণব পদকর্তাবলী ১০·০০; বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ৫·০০। অবন্তীকুমার সান্যাল : রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি ৫·০০; চৈতন্যচরিতামৃত (আদি। ৪র্থ ও মধ্য। ৮ম) ৮·০০। দেবেন্দ্রনাথ বসু : বক্তৃতামালা ৮·০০। অমিয়সূদন ভট্টাচার্য : ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-প্রসঙ্গ ৩·০০; বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনা, দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ ১২·০০। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : বাঙলার ব্রতকথা ৪·০০। তরুণ সান্যাল : আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ৮·০০। হুমায়ুন কবির : কবিতার কথা ৩·০০।

অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত : ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ২৫·০০। মুজফ্ফর আহমদ : প্রবন্ধ সংকলন ৮·০০। নির্মলকুমার বসু : বিদ্যাসাগরের বাংলা ৬·০০। নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ১০·০০। বিনয়কৃষ্ণ দত্ত : ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মরণে ১·৫০। তরুণ সান্যাল : অর্থনীতিবিদ মার্কস ২·০০। অমলেন্দু সেন : ইতিহাসচর্চার বৈজ্ঞানিক প্রণালী ১·৫০। সুকোমল চৌধুরী : বাংলাদেশে যৌথখনি ও সম্পর্কিত ১০·০০।

জীবনালেখ্য ॥ অরুণচন্দ্র সেন : অগ্নিকবি ৪·০০; মুক্তকণা ৩·০০; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩·০০। নিখিলকুমার মিত্র : গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৩·০০। সুনীল সেন : রমেশচন্দ্র দত্ত ৩·০০। অরুণাচল বসু ও সরলা বসু : রবি-তিলোত্তমা সুকান্ত ৩·৫০। ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : অন্তরঙ্গ সুকান্ত ১২·০০। অশোক ভট্টাচার্য : কবি সুকান্ত ৫·০০।

ভ্রমণ ও শিল্পকলা ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় : নাচ ও অভিনয় ৬·৫০। অরুণনাথ চৌধুরী : ভারতে-ইতিহাস উৎকোর্ণ ৫·০০।

সারস্বত লাইব্রেরী : ২০৬ বিধান সরণী; কলিকাতা—৬ ফোন : ৩৪-৫৪৯২

সেই ধারকের। সেই রামায়ণ মহাভারত। করে' আমি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিই। বড়ো ঝামেলা মনে হয়। প্রসেস ফিলেই ঝঞ্ঝাট। প্রায় আগের 'সংস্কৃত সেবা সেই আনাকোরা বস্তু। সেই মান্ধাতার প্রসবের ভীষণ অক্লান্ত রূপ সীতা। ও ফিলিস চাই না ফেলবের। তোমার প্রয়াস ব্যর্থ হবে।

বইটা বন্ধ করে পরে বোঝা হয় যে ভালো হয়নি বেমানান যাবার জন্য বাঁড়ুজ্যে বলেছে হয়ে যাওয়া তাতে লেখাতে না। তাগাড়া প্রসঙ্গটা হচ্ছে এ ধারকারের। তখন আমারও তো রামায়ণ মহাভারত প্রতিটি বিশ্বাস ছিল। তেমনি লোকেরও। কেউ কি সে সময় ভেবেছিল যে ও ফিলিস চলবে না? ওর দিন গেছে? সেসময়ে মনে হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু তা নয়। সে খুলি হয়ে এলে সাজাবে। আগের সিঁড়ি ভাঙতে বিশ্ব মতের কাজে অবহেলা করতুম। পরে হয়েরাণম করতুম ও সিঁড়ি অচল। ও পথ দিয়ে কেউ স্বর্গে যাবে না। দেখছি তা লোকের মতিগতি। ওর পরলে স্বর্গটিকে মর্তে নামিয়ে আনে। এই ধরণী হবে ওদের জন্মভূমি। আমার পক্ষে যাত্রা একটি অযাত্রা হবে অভীষ্ট।

যাত্রায় আমার আপত্তি নয় সোমদের। আমি বুঝিয়ে বলি। আমার আপত্তি ওই সব পৌরাণিক বিষয়ে। বরং না হয় একটা নতুন ধরনের যাত্রা। বিষয় নেওয়া যাক আধুনিক জীবন থেকে। নায়ক-নায়িকারাও হবে আধুনিক। তেমনি সব বীরপুরুষ

ইউবিআই-এর রেকারিং ডিপজিট স্কীমে

প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠে

কখনো না কখনো নিশ্চয়ই আপনার একসঙ্গে মোটা টাকার দরকার পড়ে।
আমাদের রেকারিং ডিপজিট স্কীমে আপনার পরিকল্পনামত সঞ্চয়ের সুবিধে আছে। পাঁচ থেকে পাঁচশ টাকার মধ্যে সাধ্যমত একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে জমাতে শুরু করুন।
আপনার পক্ষে সুবিধেজনক মেয়াদ আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন না, আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদে কেমন বেড়ে ওঠে।

অলস্থর যে টাকা থাকে না, সত্যিকার কাজেও লাগে না, সেটাই নিয়মিত জমালে আপনি একসময় মোটা টাকা পাবেন। ধরুন, ৭২ মাসের মেয়াদে প্রতি মাসে আপনি ১০ টাকা করে রেখেছেন। মেয়াদ শেষে আপনার তাহলে জমলো ৭২০ টাকা। কিন্তু ইউবিআই আপনাকে দেবে ১৮৩ টাকা। আজই ইউবিআই-তে একটা রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

মাসিক কিস্তি	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন					
টাকা	১২ মাস টাকা	২৪ মাস টাকা	৩৬ মাস টাকা	৪৮ মাস টাকা	৬০ মাস টাকা	৭২ মাস টাকা
৫	৬৩	১৩০	২০৭	২৮৯	৩৭৮	৪৯১
১০	১২৫	২৬১	৪১৪	৫৭৮	৭৫৭	১৮৩
২০	২৫১	৫২১	৮২৭	১১৫৫	১৫১৩	১৯৬৬
৫০	৬৭৬	৭৮২	১২৪১	১৭৩৩	২২৭০	২৯৪১
৪০	৫০১	১০৪৩	১৬৫৪	২৩১০	৩০২৭	৩৯৩২

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

AM-UBI-7477

তেমনি সব বীণাঙ্গনা। কুন্তী দ্রৌপদীও কি এ যুগে নেই? থাকলে কেন বাদ যাবে?

আমাকে মাফ করো ভাই অভীশ। হাত-জোড় করে সোমদেব। এ যুগের কুন্তী দ্রৌপদীদের আমি জলচল করিতে অক্ষম। জানো তো আমার নীতিবোধ কী রকম কঠোর। রামায়ণ মহাভারত আধুনিক সংস্করণ থেকে যাবতীয় দুর্নীতি বর্জন করতে হবে।

শুনে তো আমি থ। প্রতিবাদ করতেও ভরসা পাই না। মৃত্যুপথযাত্রী।

যাজ্ঞাগুলো শত প্রণাচার করে অসমর্থ। রাজীগুলো, কুলগুরু, কুলপুরোহিত বা ঋষিদের হাতে নিযুক্ত। ব্রাহ্মণদের ধরার শরীর। পরেরটিও চাই ঘরেরটিও চাই দেবতারাই বা কম কিসে। কেউ যখন বলে দেবতুল্য চরিত্র, তখন মারতে ইচ্ছে করে। কোন দেবটি দেবতুল্য শুনি? এক গণেশ ঠাকুর বোধহয়। ওটা তার চেহারার গুণে। ভাই অভীশ স্বর্গের সিঁড়ি যে আমি গড়ি নি এটা আমার জীবনের ব্যর্থতা নয়। এমন কি রাবণেরও নয়। ও সিঁড়ি দিয়ে দেবতারাই মর্তে নেমে আসত। ওদের পেলে মেয়েরাও কি আর আমাদের দিকে তাকাত? পুজো তো করছে দুবেলা ওদেরই। বললে বলতে সোমদেব অগ্নিদেব হয়ে ওঠে।

আহ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলি চুপ। চুপ

সোমদেব সামলে নিয়ে বলে না আমার মনে লেশমাত্র খেদ নেই। আমি এখন খেদহীন মন নিয়ে মরতে পারব। কোথায় যাব জানি নে। স্বর্গে যেতেও রুচি হয় না। ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য পবন কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারব না।

তাহলে তুমি যাবে কোথায়? নরকে? এমন কোনো পাপ তো তুমি করনি সোমদেব, যে নরকেই তোমার গতি হবে? আমি সহাস্যে বলি।

ও ধাঁধায় পড়ে। স্বর্গে যাবার স্পৃহা নেই, নরকে যাবার হেতু নেই, তাহলে ও যাবে কোথায়? ভাবে। ভেবে কূল পায় না।

সমস্যা হচ্ছে এই যে মানুষের নীতি-বোধ এখন দেবতাদের নীতিবোধকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই স্বর্গসুখ তার কাছে স্পৃহণীয় নয়। তার জন্য স্বর্গের সিঁড়ি গড়ে কি হবে? গড়তে হবে নতুন একটা স্বর্গ। এই বলে আমি সেদিনকার মতো উঠি।

আবার আসবে তো? ও ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি কাঁকুনি দিয়ে বলি আবার আসব। বন্ধুজায়া আমাকে এগিয়ে দেবার সময় জানতে চান, কেমন দেখলেন?

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। অপারেশান ছাড়া কেউ কি বাঁচে না? অস্ট্রিওপাথী বলে একরকম চিকিৎসা আছে। খোঁজ নিতে পারেন। আমি ভরসা দিই।

কিন্তু বন্ধুটা হা-হা করে। ও কি বেশী দিন বাঁচবে? ওই যন্ত্রণা কি বেশীদিন সহ্য হবে! আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিল বন্ধুর বিরাম ছিল না।

ভাবছিলুম ওর মতো বন্ধুর নরকের ভিতর এত ভয় ছিল। যাত্রার দল গড়ে নগর সংকীর্তনের মতো সবাইকে কাছে টেনে নেওয়া। তার বদলে যা ছোলো তা পাসেনের কাজে দাগট মেরে সবাইকে দূরে ঠেলে দেওয়া। এখন আর ফিরে যাবার পথ নেই। রাবণের সিঁড়ি গড়তে হলে স্বপন দেখার বয়সেই আরম্ভ করতে হয়। পরে পরে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। আনমনা হতে হয়।

কিন্তু গড়েই বা হতো কী। লোকে যদি স্বর্গে যেতে না চায় যদি চায় রাবণই চলে আসুক স্বর্গ ছেড়ে মর্তে। তার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি। লোকে ভুলেই গেছে।

চিন্তাকুল মন নিয়ে বাড়ি ফিরি। ইরাও জানতে চান কেমন দেখলুম।

মুক্ত পুরুষ। আমি উত্তর দিই। স্বর্গের জন্য স্পৃহা নেই, নরকের ভয় নেই। জীবনের উপর আসক্তি নেই, মরণের উপর বিরক্তি নেই। তবে যাওয়া বোধহয় সরা হয়ে এল।

কী বলতে ডেকেছিলেন? ইরা কৌতূহলী হন।

হয় সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল তার কথা। রাবণের সিঁড়ি। রাবণের স্বপন। ওরই একমাত্রের অর্থ কি আমি করুণ স্বরে বলি।

ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

উপেন্দ্রকিশোর রায় প্রতিষ্ঠিত

নববর্ষ সংখ্যা **সন্দেশ** প্রকাশিত হ'ল

সম্পাদক—লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, সত্যজিৎ রায়

সেনার কেল্লা শুটিং-এর গল্প—সত্যজিৎ রায়
সরস গল্প—লীলা মজুমদার, অন্নদা রায়
রহস্য উপন্যাস—নলিনী দাশ, শিশির মজুমদার

অ—নে—ক ছোটগল্প মুলকথা প্রবন্ধ—বিজ্ঞান ছড়া কবিতা—লিখেছেন প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিকেরা। অ—নে—ক ছবি হেঁয়ালি ও মজা

তাছাড়া —নতুন বছরে থাকবে—ছবিতে গল্প ধাঁধা, প্রতিযোগিতা আর এ বছরের শিশু সাহিত্য পরিষদের সম্বর্ধনাপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের লেখা।

ফুরিয়ে যাবার আগে গ্রাহক । এজেন্ট হয়ে যান

বার্ষিক সডাক ১৭·০০ নববর্ষের সংখ্যা হাতে নিলে ১৬·০০ সব কটি সংখ্যা হাতে নিলে ১৫·০০...

কার্যালয়—১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯, ফোন ৪৬-৪১১১।
নিউদিল্লী—এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট এক্সেট—কলি-১২।

স্মৃতি হাতড়ানো

যেমন শুনেছি ঠিক তেমনটি বলছি, বিশ্বাস করা না করা পাঠকের হাতে।

ঘটনাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ঘটেছিল। সেই পটভূমিকে স্পষ্ট করে তোলবার উদ্দেশ্যে গোটাকতক স্থূল কথা বলা আবশ্যক, কেননা ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা মানুষের স্মৃতি থেকে হটতে হটতে গিয়ে পৌঁছেছে। কোন ঘটনা ইতিহাসের সামিল হলেই লোকে তার জীবন্ত রূপটি ভুলে যায়. ঘটনাটি তখন আবদ্ধ থাকে বইয়ের মলাটের মধ্যে।

১৯৪০ সালের শীতকাল, আজ থেকে আঠাশ বছর আগেকার কথা। তখন জাপানী বোমার ভয়ে সমস্ত কলকাতা শহর অন্ধকারে কাঁথামুড়ি দিয়ে জড়সড়ো হয়ে আছে। পথে আলো জ্বলে না, ঘরের আলো বাইরে আসা নিষিদ্ধ. সন্ধ্যা হতেই শহরে নিস্তব্ধতা নামে। মানুষ আলোর জীব। রাতটা অন্ধকার বলে নানারকম আলো জেলে রাতটাকেও দিনের মতো উজ্জ্বল করে তবে সে স্বস্তি পায়। অন্ধকার রাতে মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করে, সে অন্ধকার যদি অবার কৃত্রিম হয় তবে অধিকতর অসহায় হয়ে পড়ে। তার উপরে নিয়তির জাপানী বোমার ভয়। ঘরে ঘরে সাইরেন বাজে নিষ্ঠুর চিৎকার করে উঠে সন্ত্রাসকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

বোমা হয়তো মাসে দুটিন দিন পড়লো কিন্তু ভয় তিনদিন। তাই সন্ধ্যার পরে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ ঘরের বার হয় না। ট্রামে বাসে যাত্রীর সংখ্যা কম, কাজেই ট্রাম-বাসের সংখ্যাও কম, যেগুলো বা আছে তারা আলোর ঘোলাটে টেনে কোনরকমে চলাচল করে। ট্যাকসি, রিকসা প্রভৃতি অন্য যানবাহনের সংখ্যাও অনুরূপ। মোট কথা রাত্রির কলকাতা এক প্রকার শ্মশান। সেদিনের কথা যাদের মনে আছে তারা স্বীকার করবেন বালিগঞ্জের মতো সৌখীন পাড়াতেও রাতে শিয়াল ডাকা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধটাই একমাত্র সঙ্কট নয়, যুদ্ধের তল্পিবাহক হয়ে আসে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। ১৯৪০ সালের দুর্ভিক্ষের মতো বিষম ব্যাপার বাংলাদেশে আর ঘটে নি। সরকারী হিসাবে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক, সরকারী হিসাবে কুড়ি লক্ষ লোক না খেয়ে মরেছিল। দিনের বেলায় কলকাতার পথে চোখ কান খুলে চললে মৃতদেহ আর আর্তনাদ লোকচক্ষুগোচর হতো। মৃতদেহের পূর্বকথা কঙ্কালসার মানুষের সংখ্যাও অসংখ্য। তার উপরে আছার ১৯৪০ সালের সাইক্লোন ও বন্যায় ঘরছাড়া হয়ে গ্রামাঞ্চল হাজারে হাজারে লোক এসে কলকাতায়। তাদের কতক মরলো, কতক কঙ্কালসার দেহ টেনে নিয়ে অন্নের সন্ধানে অন্যত্র গেল। মোটকথা এই যে সেই সময়টা কলকাতা শহর থেকে হাসিখুশি আনন্দ লোপ পেয়ে তাটার টানে সমাজের আশি পঙ্কের রেখা বেরিয়ে পড়েছিল। যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি তা বুঝবার পক্ষে এই পটভূমি মনে রাখা অত্যাবশ্যক।

আমরা থাকি বালিগঞ্জ পাড়ায়। পাশাপাশি তিনটার বাড়ির আমরা কজন একই অফিসে চাকরি করতাম। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি, কাজেই অফিসের কাজ সত্যই কাজ ছিল। অর্থাৎ অফিসটা বিশ্রামের বা গল্প-গুজবের স্থান ছিল না, বিশেষ জাপানী বোমার চেয়েও মারাত্মক ভারতরক্ষা আইন সর্বদা উদ্যত। ফলে অফিসের পরে কোনরকমে দেহটাকে টেনে নিয়ে বাড়িতে এসে আসাড় পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন গতি ছিল না। তবে সংসারে কোন দুঃখই নিরবচ্ছিন্ন নয় বলে শনিবার সন্ধ্যাতে একটুখানি ফুরসত পাওয়া যেত। চার সহকর্মী মিলে রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলতাম আর সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের রণনীতি যে কতো ভ্রান্ত, ব্রিটিশ নৌবহর যে সমস্তই জলতলে নিমজ্জিত (এই অংশটুকু সেই বন্ধ ঘরের মধ্যেও চাপা গলায়), জাপান যে ঢুকে পড়েছে বলবার কাগজগুলো ভারতরক্ষা আইনের ভয়ে প্রকাশ করছে না (এই অংশটুকুও চাপা গলায়) প্রভৃতি মন্তব্যের ইন্ধন প্রজ্বলিত করে মনটাকে উত্তপ্ত করে নিতাম। রাত বারোটায় আড্ডা ভাঙলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকতাম, বাড়ি যে কাছাকাছি সেতো আগেই বলেছি। কেবল মহীন্দ্রের বাড়ি আধ মাইল মতো দূরে। তার কিছু অসুবিধা ছিল, কেননা তখন এ-আর-পি অর্থাৎ বোমা পুলিসের বড় প্রতাপ। অত রাতে কলকাতায় রিকসা বড় পাওয়া যায় না, কিন্তু সে সময় পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। কারণ রিকসাওয়ালারা হয় না খেয়ে মরেছে নয় পেট ভরে খাবার আশায় দেহান্তে চলে গিয়েছে।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন মহীন্দ্র তখনও এসে পৌঁছায়নি। এদিকে আমরা তিন বন্ধুতে মিলে হিটলারের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়, রুশিয়ার অবশ্যম্ভাবী জয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতন প্রভৃতি ঘোষণা করেছি। বলা বাহুল্য সঙ্গে অনেক পেয়ালা চা ছিল। এই সব জয়-পরাজয়ের মধ্যেও তলে তলে মনে খোঁচা মারছিল মহীন্দ্রটা এখনও এসে পৌঁছাল না কেন। সপ্তাহের মাত্র এই কয়ঘণ্টা আমোদ করবার অবসর, তার মধ্যে অল্পমাত্র খেয়া গেলে পরিতাপের অন্ত থাকে না। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। যন্ত্রটা কানে তুলে শুনি যে মহীন্দ্রের কণ্ঠস্বর। সে বলছে একটা বিশেষ কাজের চাপে পার্ক সার্কাসে এসেছে, যেমন করে হোক যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব পৌঁছবে। আমরা আছি তিনকোণা পার্কের কাছে। কাজেই কোন বাহন আসতে তার কত সময় লাগবে হিসাব করতে বসে গেলাম। বাসে এলে এক ঘণ্টার কম নয়, কারণ বাস বদলাতে হবে তাছাড়া বাসের সংখ্যা অল্প। সেক্ষেত্রে ট্যাক্সি পেলে জন-পনেরো মিনিটে এসে পৌঁছতে পারবে। আর যদি নিতান্তই রিকসা জুটে যায় তবে কম করেও ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট, ছোটে আসলে পৌঁছতে পারবে না কারণ এ আর পি-তে গিয়ে রাতটা হাজতে রেখে দেবে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সাতটা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কাজেই খুব তাড়াতাড়ি চললেও সাড়ে সাতটার আগে তার এসে পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। অতএব আর একবার চা।

চা এসে পৌঁছতে এবং সেটা গলাধঃকরণ করতে বড়জোর দশ মিনিট লেগেছিল। এমন সময় বাড়ির ঠিক বাইরে ফুটপাতের উপর একটা সোরগোল শুনলাম। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে টর্চটাকে নিম্নমুখী করে নিয়ে বের হলাম। দেখলাম যে একজন মূর্ছিত লোককে ঘিরে পাঁচ-সাতজন মন্তব্য-রত হয়েছে। কেউ বলছে মাতাল, কেউ বলছে মৃত, কেউ বলছে ওসব কিছুই নয়। জাপানী গুপ্তচর ভীরুটি মেরে পড়ে আছে। বেশী কাছে যেও না, কেউ বলছে থানায় খবর পাঠিয়ে দাও। এমন কত কি পরামর্শ ও উপদেশ। লোকটা উপুড় হয়ে পড়েছিল কাজেই চিনতে পারা যাচ্ছিল না। আমাদের সন্দেহ হলো যে লোকটা এই পাড়ার কেউ হবে। তাই তাকে চিৎ করে ফেলে মুখের উপর আলো ফেলতেই দেখি মহীন্দ্র। কিন্তু সে মূর্ছিত। তখনই তাকে আমরা তিনজনে ধরাধরি করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এলাম। লোকটা মরেনি আর আমাদের পরিচিত দেখে মন্তব্যকারীগণ দুঃখিত হয়ে প্রস্থান করলো।

মহীন্দ্রকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় জল ও নাকে স্মেলিং সল্ট-এর ব্যবস্থা করলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান হলো। সে প্রথম কথাই উচ্চারণ করলো চা। চা এবং তারপর দুধের সঙ্গে ব্রান্ডি মিশিয়ে দেওয়া হলো, আধ ঘন্টার মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসলো।

তখন আমরা শুধালাম, ব্যাপার কি মহীন্দ্র। তুমি পার্ক সার্কাস থেকে ফোন করলে রওনা হচ্ছো, তারপর দশ মিনিট না যেতেই এখানে পৌঁছলে কি করে? উড়ে এলে নাকি?

সে শুধু বললো প্রায়।

আমি বললাম, এখন ঠাট্টা রাখো, কি হয়েছিল এখন খুলে বলো তো। নিশ্চয় তুমি কাছাকাছি কোথাও ছিলে আমাদের বিরক্ত করবার জন্য ফোনে বলেছিলে পার্ক সার্কাসে আছো।

মহীন্দ্র বললো, পার্কসার্কাসেই ছিলাম এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই এসেছি।

তবে কি ট্যাক্সি পেয়েছিলে? আর তা যদি পেয়ে থাকো সে ট্যাক্সিই বা গেলো কোথায় আর মূর্ছিতই বা হলে কেন?

মহীন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে বললো, সমস্তই খুলে বলতে পারি, কিন্তু ভয় হয় পাছে বিশ্বাস না করো।

আমি বললাম, আমাদের বিশ্বাসের জোর তো তোমার অজানা নয়।

মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে ইংরাজের জহুর উপর বিশ্বাস করেই যে, বেঁচে আছি। কি হয়েছিলো খুলে বলো।

—তবে শোন, বলে মহীন্দ্র আরম্ভ করলো। পার্কসার্কাসেই ছিলাম, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে বাইরে এসে দেখি ঘোর অন্ধকার, তার উপর কোথাও কোন যানবাহন নেই। তখন আমি হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলাম, চারিদিকের নিষ্প্রদীপের ঘোর অন্ধকার, তার উপর মেঘলা আকাশ। নিজের হাতটা অবধি দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া এ আর পি-র দৌরাত্ম্য তো আছেই। যে কোন একটা লোককে সন্দেহের বশে চালান করে দিতে কতক্ষণ? যাই হোক আমীর আলি এ্যাভিনিউ-এর মোড় থেকে সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম সার্কুলার রোডের দিকে। ওইখানে ট্রামগুলো ডিপো থেকে বেরিয়ে দাঁড়ায়। ভাবলাম এক-আধখানা ট্যাক্সি বা রিকসা থাকতে পারে।

মহীন্দ্র ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছে, আমরা নিশ্বাস রোধ করে শুনছি। কৌতূহল এমন উগ্র যে চা ফরমাস করতেও ভুলে গিয়েছি।

মহীন্দ্র বলছে, ডিপোতে গিয়ে শুনলাম আজ সন্ধ্যাতেই ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন পকেট থেকে ছোমটা-পরা ছোট টর্চটি বের করে সাবধানে আলো ফেলছি। না কোথাও কিছু নেই। দোকানপাট নিষ্প্রদীপ করেই বন্ধ কি খোলা বোঝা যায় না। একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল তাকে শুধাই কবে মহাত্মার জন্মবার সাহেব সম্ভাষণ করে শুধোলাম, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি? সে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে বলল, বড় ভীষণ নাই, পয়লা নম্বর বাইরে। পয়লা নম্বর তিন নম্বর পার্ক পর্যন্ত হেঁটে যাবো এই অন্ধকারে। না বাপু তা হতেই পারে না। তখন আমার আলোর ফলক দিয়ে পড়লো একটা রিকসার পিছন দিকে। নম্বরটা পড়ে ফেলে, ছুটে কাছে গিয়ে দেখি রিকশর পাদানীতে একটা লোক আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে আছে। আমি বললাম, তিনকোণা পার্কে যাবে? সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। আট আনার বেশী পাবে না কিন্তু। লোকটা আপত্তি না করে উঠে দাঁড়াল। আমি আর বাক্যব্যয় না করে চেপে বসলাম। হাঁ, একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আলো নেই কেন? তখনই মনে পড়লো নিষ্প্রদীপে আলো জ্বালা নিষেধ।

রিকস চলল। কিন্তু সে তো চলা নয়, উড়ে চলা। কোথায় লাগে ট্যাক্সি বাস তার কাছে। আমি মৃদু বলি, আরে অত জোরে নয়, আস্তে চলো, পড়ে মরবে যে। কে কার কথা শোনে? ঝড়ের বেগে ছুটেছে রিকসা। মুহূর্তে পেরিয়ে গেলাম গড়পারের মস্ত রোডের মোড়। আর এক মুহূর্ত যেতে না যেতেই এসে পড়ল গুড বালিগঞ্জ পোস্ট-অফিস। একবার আলোয় হাতঘড়িটা দেখে নিলাম তিনডিপো থেকে রওনা হয়েছি মিনিট দেড়েক। এ কীরে বাবা, ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি? যতক্ষণ ঘড়ি দেখছি ও চালাচ্ছে তার মধ্যে রাজ্যের রেডের মোড় ঝড়ের মতো পেরিয়ে মাণ্ডেভিলা গার্ডেনে এসে পড়েছি। ভাবলাম কোথায় যাচ্ছি, কার গাড়ীতে চেপে যাচ্ছি। সমস্তই অস্পষ্ট; চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ, ঘোরান্ধকার। তারপর কখন যে গঙ্গাবিহারী এভিনিউতে ঢুকে তিন কোণা-পার্কের মুখে চলতে শুরু করেছি বোঝাই যায় নি। যতই বলে চলছি আস্তে তুমি

বেনারসী শাড়ী
খ্রিস্টিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

আরো জোরে ছুটছে। রিকসাওয়ালার উদ্দেশ্যে বললাম, এবার ডাইনে ফিরে পাঁড়েজিয়াদে ঢুকতে হবে। মোড় ঘুরতেই বললাম, এবার বাঁয়ে ঘুরে অশ্বিনী দত্ত রোডে, আর একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বুঝলাম ঠিক পাঁচ মিনিট লেগেছে। আরে রোখকে রোখকে। কোঠী আ গিয়া। আচমকা ধাক্কা দিয়ে রিকসাটা দাঁড়িয়ে গেল। আমি মাটিতে নেমে পকেট থেকে টাকা পয়সা বার করে টর্চের আলোয় একটা আধুলি নিয়ে বললাম, এই নাও। লোকটা নিঃশব্দে হাত পাতল তখনও টর্চ জ্বলছে, দেখলাম হাত কোথায়? অশ্বিনীর পাঁচটা আঙুলে মাত্র। তখনও মনে ভয় প্রকাশ করিনি। ভাবলাম, দুর্ভিক্ষের কল্যাণে এমনটি ঘটেছে। দুর্ভিক্ষের চিহ্ন ভাল করে দেখবার উদ্দেশ্যে টর্চের আলোটা ফেললাম তার মুখের উপর। মুখ কোথায়! রক্তমাংস-হীন চক্ষু নাসিকাহীন শুষ্ক সাদা কঙ্কাল-মুখ! তারপরে আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হলো, দেখি ডেমরা অমাকে ঘিরে ঘরের মধ্যে বসে আছে।

মহীন্দ্র থামল। আমরাও থেমে রইলাম। ভাবলাম আরও কিছু বলবে। না, তার আর কিছু বলবার নেই।

এতক্ষণ পরে তাকে বললাম, নাও কিছু খেয়ে নাও। সে বলল, ভাই আমার বাড়ীতে ফোন করে জানিয়ে দাও আজকের রাতটা এইখানেই থাকব।

।। ২ ।।

ভূত-প্রেত কোনকালে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু মহীন্দ্রকেও অবিশ্বাস করি না। তার বর্ণিত ঘটনার একটিমাত্র প্রমাণ দেখতে পেয়েছি, সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে রিকসা বা রিকসাওয়ালা কাউকে দেখিনি। মহীন্দ্র যখন ফোন করে জানিয়েছিল তার পরে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সে এসে পড়েছে, এ কথা সত্য। ধাপ্পা দিয়েছে, এ-কথা বলতে পারি নে। কারণ অজ্ঞান হয়ে পড়াটা তো মিথ্যে নয়। স্থির করলাম, রহস্যটার মূলে কিছু আছে কিনা দেখতে হবে। পরদিন সকালে মহীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, রিকসার গায়ে যখন আলো ফেলে-ছিলে নম্বরটা খেয়াল করেছিলে কি?

সে বলল, হাঁ, একেবারে নম্বরের উপরেই আলোর ছটা পড়েছিল। এই বলে নম্বরটা সে জানায়। তখন বললাম এসো আমার সঙ্গে। তখন থানায় গিয়ে খোঁজ করতে করতে দয়াপরবশ হয়ে এক অফিসার-বন্ধু জানালেন, যে হ্যাঁ, এই নম্বরের রিকসা আমাদের এখানেই রেজিস্ট্রি হয়েছে বটে। এই বলে তিনি অনেক পুরোনো খাতাপত্র ঘেঁটে মালিকের নাম ও ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। মালিকের বাড়ি কাছেই ছিল আর সেটা রবিবার হওয়াতে বাড়িতে গিয়ে তাকে পেলাম। প্রবীণ মোটাসোটা ভদ্রলোক সকাল-বেলা বসে সংবাদপত্র পড়ছিলেন। এমন সময়ে দুজন অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেখে, কেমন সচকিত হয়ে উঠলেন। আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যে বললাম, মশাই, আমরা সরকারী লোক নই, ছদ্মবেশী গোয়েন্দাও নই নিতান্ত কৌতূহলের বশে আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি ভরসা পেয়ে বললেন আসুন, আসুন, বসুন না আমি এসব কিছুই ভাবিনি। করে কিনা আজকালকার দিন খুঁজতেই তো পাচ্ছেন।

আমাদের আসবার কারণ বিবৃত করা-মাত্র শান্ত ভদ্রলোক হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন। বললেন বেটা বুধন সিং যেমন নেমকহারাম তেমনি হারামজাদা। তেমনি আক্কেলও হয়েছে মশায়। আমরা শুধোলাম, কি ব্যাপার বলুন তো?

তিনি বললেন, ব্যাপার আমার সর্বনাশ। কয়েক মাস আগে ব্যাটা এসে বলল, হুজুর খেতে পাই না, আপনার রিকসাখানা দিন। খেটে খাব। দিনান্তে আপনার পাওনা ঠিক পাবেন। ভাবলাম কথাটা মিথ্যে নয়। দুর্ভিক্ষের বছর, গরীব লোক, বিনা জামিনে ওকে রিকসাখানা চালাতে দিলাম। মাস দুই নির্বামাত ভাড়া দিয়ে যেত।

তারপরে একদিন এসে বলল, হুজুর শুধু দিনের বেলা চালিয়ে আর পেটের ভাত ওঠে না, রাত্তে চালাব। তবে রাতের পয়সাটা আর নেবেন না। আমি একটু ভেবে বললাম, আচ্ছা তাই হোক। সেই যে গেল পনের-কুড়ি দিনের মধ্যে আর সাক্ষাৎ নেই। থানায় খবর দিলাম। পাঁচ-সাত দিন পর থানা থেকে একজন জমাদার এসে জানাল, পার্কসার্কাস ট্রামস্টপের কাছে একখানা রিকসার উপরে একটা লোক মরে পড়ে আছে। আপনার কি না গিয়ে দেখে আসুন। তখনই ছুটলাম। পৌঁছে দেখি আমারই রিকসা। আর পাদানির উপর বেটা বুধন সিং-এর কঙ্কালসার মৃতদেহ। না খেতে পেয়ে মরেছে। আমি সনাক্ত করার পর লাসটা নিয়ে গেল থানায় না শ্মশানে ভগবান জানে।

আমি শুধোলাম, রিকসাখানা কি করলেন?

চারিদিকে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, আবার খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠে

গিয়েছিল। তাই ও বিকল্প অন্য কেউ চালাতে রাজী হল না। বিক্রী করাও গেল না। ওখানেই পড়ে থেকে রোদে বৃষ্টিতে পচে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আপনাদের কি প্রয়োজন এই সামান্য ঘটনার বর্ণনে শুনে?

কি বলব, আগেই স্থির ছিল। জানালার দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটা রেসরকারী তদন্ত কমিটি হয়েছে জানেন তো। তাই কে কোথা থেকে আমরা খোঁজ নিতে এসেছি।

আর সব মতে শেষ হয়ে গেল, এতদিনে [illegible] কেমনে মশাই আমরা নাম-ধাম শুনে আপনাদের নথিপত্র না ওঠে। ওই ছাপার প্রুফরকে আমি বড় ভয় করি মশায়।

আমরা তাকে অভয় দিয়ে বিদায় নিলাম।

মহাত্মার ঘটনা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকে না। লোকে গেল বাঘা বুধন সিং এখনও ভূত হয়ে বিকল্প ট্রেনে বেড়াচ্ছে। মানুষ না হয় মরার পরে ভূত হয়ে কখনও কখনও এমন কাণ্ড করে শোনা যায়। কিন্তু বিকল্পযানার কী হল? সেটাও কি ভৌতিক সত্তা পেলে নাকি? কখনও কখনও দেখা যায়, কখনও লোপ পায়।

ঘটনা পূর্বেও যেমন ছিল, শেষেও তেমনি থাকল। কোন মীমাংসা পাওয়া গেল না। তাই গোড়াতেই বলেছিলাম, রেলটি লাইনই তুলনি নিরুদ্দেশ, নিরুদ্দেশ করা না হল পাঠকের হাতে।

CENTRAL LIBRARY

মৃত্যুর আগে

রুদ্রদেব বসু

খৃষ্টাব্দ উনিশ-শো পঁয়ষট্টিতে কলকাতার পঞ্চেলাল কার্শানি হাসপাতালের এক কামরায়, পঁচাত্তর বছর বয়সে, রোজ আর বৃষ্টিতে ভেজা এক জন্মুয়ার দিনে শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছেন দেবকীদাস ভট্টাচার্য।

বাইরে, কামরার সামনে করিডরে, অথবা কোন বারান্দায় কিংবা হাসপাতালের বাগানে ঘুরে-ফিরে অপেক্ষা করছে তাঁর পুত্র কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ (সকলেই প্রৌঢ় সকলেই ক্লান্ত), আর কাছাকাছি বিবিধ আত্মীয় স্বজন, যারা অপেক্ষোন্টের ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছে। বেলা দশটায় এসেছে তারা, এখন প্রায় চারটে; ডাক্তার বাইটিচি এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

কামরার ভিতরে দুজন নার্স, দক্ষ ও স্নেহবসনা একটি যুবক ডাক্তার রোগীর শিয়রে উপবিষ্ট, মাঝে মাঝে একজন বিশারদ এসে দেখে যাচ্ছেন, টেবিলে বিবিধ যন্ত্রপাতি ওষুধে ইনজেকশন সাজানো। এরা আরোগ্যের আশা আর রাখেন না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন মৃত্যু যাতে যন্ত্রণাহীন হয়।

আর মুখে দেবকীদাস, তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো হাত দুটি কোমরের উপর ভাঁজ করা, ঠোঁট ঈষৎ উন্মুক্ত, টান হয়ে শুয়ে নিশ্বাস নিচ্ছেন নিরবচ্ছিন্ন ছন্দে, যেন অতীব সহজভাবে যুমন্ত। মৃত্যু বলতে যে সব ভয়াবহ ছবি আমাদের মনে জাগে তার কোন চিহ্ন তাঁর মুখে নেই; হাসপাতালের মারাত্মিকপাতী বিপ্লাব ও দুর্ভাবনা তাঁর চেহারার কোনো হানি ঘটাতে পেরেনি, পাকা দাড়া চুলের তলায় তাঁর চিন্তাকৃতি কপালটি এখনো সুন্দর; তাঁর টিকোলো নাক ও পাতলা ঠোঁট নিয়ে তাঁর যৌবনের ডাকসাইটে রূপ দেখে এখনো ঠিক ধারণা করা যায় না যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু তাকে ছায়াচ্ছন্নিপ্ত করে ফেলবে।

সুখে মারা যাচ্ছেন দেবকীদাস, গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন, কিন্তু স্বপ্নহীনভাবে নয়। ধরা পড়া যায়, তাঁরই মুখে তাঁর বন্ধু বেরে যাবার পরে তিনি যে এতক্ষণ ধরে, জীবিত আছেন, তার কারণই স্বপ্নের থাকর্ষণ।

স্বপ্নে একটি জন্তুকে দেখেছেন তিনি, কোনো চেনা নেশ জন্তু, অস্পষ্ট, অন্ধকারের সুড়ঙ্গ-পথে সঞ্চরমান, নিঃশব্দে, কিন্তু তার গন্ধ ছড়িয়ে স্পষ্টতর। কিন্তু দেখেছেন কথাটা সঙ্গত নয় এখানে। কেননা জীবিত মানুষের স্বপ্নে যেমন সব কর্তৃবাচ্য ভাববাচ্য অন্তর্হিত হয়ে যায়, এই মুহূর্তেও তাই হচ্ছে। তার নিজের আর কৃত্য কিছু নেই, এখন এক অজ্ঞাত শক্তির তিনি অধীন — এক চিন্তাহীন, চেষ্টাহীন, অধিকৃত অবস্থায় এই শেষ মুহূর্তগুলি মসৃণভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর উপর দিয়ে। বলা বাহুল্য এটা তাঁর মরণশীলতার শেষ দশা, এর আগে অনা কয়েকটা পর্যায় তাঁকে পেরোতে হয়েছিলো।

অধিকাংশ মানুষের মতো দেবকীদাসেরও অনেকটা সময় লেগেছিল তাঁর মৃত্যুর সীমারেখা বুঝে নিতে ও মেনে নিতে। একদিন হঠাৎ বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা উঠলো, অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হলো হাসপাতালে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাঁর প্রথম কথা : আমি বাড়ি যাবো, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তিন বছর আগে তিনি সংহিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, নানা অবান্তর কারণে অনেকের দেরি এসেছিল। আর তাঁর বহুকালের পরিকল্পিত রোমাঞ্চি ভাষার পঞ্চতন্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ এতদিনে সেটাতে সবেমাত্র হাত দিতে পেরেছেন। কী সেই নিগূঢ় ঐতিহাসিক সোত, যার কলে তথাকথিত ফিলোলজের মনে — কেন বাংলাদেশে যা স্পেনে না আরবদেশে — এখনো বহু লক্ষ লোক যা অধিকার ভাবে আধুনিক বাংলা : এই বিষয়টি তাঁর আলোচ্য। প্রশ্নটি কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এ মুহূর্তে পৃথিবীতে কেউ তা নিয়ে ভাবছে না— হাইডেলবার্গে ডক্টর শুলৎস ও কলকাতায় তিনি ছাড়া। অত্র পিশাচ সংহিতা সেই মনোমুগ্ধকর বিরল পুঁথি (খুব সম্ভব সপ্তদশ শতকের) যাকে বলা যায় মনসংহিতার একটি তান্ত্রিক বাপ্পা-নাকৃতি, বর্ণিলভাবে আদিরসাত্মক, যার ব্যাকরণে পানিনির মুণ্ড চর্বিত ও সনাতন ধর্ম ছিন্নিত হয়েছে সেটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ (লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ফটোস্টাট কপি পাবার পরে) প্রকাশ করার উদ্যোগ তিনি গোপন করেছিলেন। এইসব প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে তাকে নিবৃত্ত করবে তুচ্ছ কোন শারীরিক বৈকল্য, তা দেবকীদাস কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হাসপাতালে প্রথম কয়েকটা দিন এই কারণে বড়ো অশান্ত ছিল তাঁর মন।

পুত্রকন্যা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেনি, সব প্রাপ্তনীয় চিকিৎসক ও সেবাযত্ন তিনি পাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাকে সংবাদপত্র ছাড়া আর কোন পাঠ্যবস্তু দেয়া হচ্ছিল না, তাই দিনমানব্যাপী অবকাশ ও মৌহিক বিশ্রাম তাঁর মনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো অনুষঙ্গিক অন্য দু-একটি দুশ্চিন্তায়, এমনকি অনেক আক্ষেপ ও অনেক অগে ফুলে যাওয়া এক আক্ষেপে। মেঝে থেকে তাঁর মনে পড়ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকুরীজীবন। তাকে ডেকে এনেছিলেন সার নিবলচন্দ্র (তখন দেবকীদাস সামান্য স্কুল মাস্টার, মহামিবীমন্ত্র বিষয়ে একটি পুস্তিকা মাত্র প্রকাশ করেছেন।) কিন্তু সেই বিদ্যোৎসাহী উদারচেতা পুরুষের অকস্মাৎ মৃত্যু হলো; আর তারপর পনেরো বছরেও দেবকীদাসের পদোন্নতি হল না। তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠলো যে তিনি বিশেষজ্ঞ নন, পরশ্রোহী, তাঁর কৌতূহল বড় বেশী ব্যাপক : 'ধ্বনি ও রসের ভূমিকা লেখার দুবছর পরে প্রকাশ করেন কবিরাজ পানের সংকলন (তাও সব অশ্লীলতা অবলুপ্ত রেখে) তারপর স্কটী সাহেবের বাৎপত্তি নির্দেশে একুশটি ভুল

[illegible] প্রকাশ করেন (আর একই সময়ে কিছু অল্প-ভদ্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সমর্থন করেন যাঁর-তাঁরা ভাষাতেই স্বরলিপি একটি প্রবন্ধ)। এবং যার স্বরচিত 'এ কম্পারেটিভ স্টাডি অব বেঙ্গলি ওড়িয়া অ্যান্ড আসামীজ ফোনেটিক্স' এ অনেক সিদ্ধান্ত অনুমানমাত্র—তাকে কি করে সরলা বলা যায়? তিনি সে উৎসাহ প্রবল, কোনো-না-কোনো বিষয় নিয়ে সর্বদা ছটফটানি এটাই তার অসাধারণত্বের প্রমাণ বলে কথিত হলো; কালক্রমে চারুবাসক্ষেত্রে তাকে অবিস্মরণীয় করে গেছেন এমন কেউ কেউ, যাঁরা ছাত্রজীবনের অবসরের পরে আর সময় কাল-ক্ষেপের ধার ভোঁতা করেন নি কিন্তু নিয়মিত-ভাবে কর্তৃপক্ষকে জ্বালিয়ে খেয়েছেন। কেউ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন হেমন্তবাসিনী তাকে ডাকা—সরলা অন্তরঙ্গতার তাকে উপকৃত করেছিলেন, তাকে শিখেছিলেন স্বকর্মের জন্য অকুণ্ঠ আত্মনির্ভরতা ও সুবোধ—কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তা যেন একটি নিজস্ব স্থান ছাড়িয়ে দিল তার মনের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের নির্জন্ধ কামরায় শুয়ে-শুয়ে তার মনে পড়ছিলো তার লাইব্রেরী-ঘরটি বহু বৎসর ধরে বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে অর্জিত তার পুস্তক-ভাণ্ডার। নানা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অভিধান। সংস্কৃত, পালি, বাংলা, ইংরেজি ও জার্মান পুস্তক তিব্বতি ও নেপালি পুঁথি; কিছু ঘটতলা; সেকেণ্ডহ্যাণ্ডে ভালো খরচে পাওয়া কিছু বিরল বই। সর্দিজ্বরের পরে এক একটি রাত্রি ভোর হয় আর যত বইয়ের কিচ্ছেন বেদনা তার মনে আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ওদের নিয়ে ওদের মধ্যেই জীবন কেটেছে তাঁর এবং কাটবে বলে ধরে নিয়ে-ছিলেন তাহলে কেমন করে এটা হতে পারছে যে সারাদিনে একবারও তার দেখা হচ্ছে না ওদের সঙ্গে? আর তাছাড়া অন্য এক প্রশ্ন... কী হবে বইগুলোর, তিনি যখন গত হবেন! এ যাত্রায় না হয় সেরে উঠছেন, কিন্তু ঘটনাটি তো অনিবার্য। কতবার ভেবেছেন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দানপত্র লিখে রাখবেন। কিন্তু আলস্য ওঁকে বাধা দিয়েছে। এদিকে তার পরে আত্মীয়রা বিভাগের প্রতি-কর্তব্য, যেমন তো চক্ষু চিকিৎসক, নার্সিংয়ে শিক্ষা পেয়েছে ডাক্তারিতে বা পদার্থতত্ত্বে বা বলবিদ্যায়। নার্সিংয়ের জন্যও ঐ ধরনের কথা খোঁজা হয়েছে এবং হবে। তাঁর কোন নিকট আত্মীয়ের পক্ষে ও সব বই কখনো ব্যবহার হবে, এমন সম্ভাবনা আপেক্ষিক, ওরা বিব্রত হবে; হয়তো এখন দিন অসহ্য যখন খুশি সুবিধামতো সেগুলোর কোনো ব্যবস্থা করতে চাইবে ওরা; আর তখন মৃত্যুর কয়েকমাস বা বছর পরে কোনো অর্থ লোভী ব্যবসায়ী কিনে নেবে তার সমস্ত বই যার যত্নকাল একসঙ্গে ছিল এবং যারা একত্রীকরণের মূলে ছিলো তারই রচিত একটি সামঞ্জস্য তার বিচ্ছিন্ন হয়ে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়বে—এই চিন্তা যখনই তাঁর মনে জাগে তখনই সর্বাঙ্গ যেন বরফ হয়ে যায়। এও ভিন্ন তার এক মনোকষ্টের কারণ - হাসপাতালের প্রথম দশবারো দিন।

কিন্তু এর পরে তার মনোবল আবার একটিন দুরাচারী হলো, আর সেই ধাক্কা থেকে সামলে ওঠার পর তিনি মুমূর্ষুতার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলেন।

আমি মরে যাচ্ছি: এই মার্তা এবার তাঁর মস্তিষ্কে পৌঁছালো, কিন্তু তা থেকে তাঁর মনে কোনো ত্রাস বা বস্তুপুর সঞ্চার হলো না হয়তো তার কারণ এই যে পরিণতি আক্ষরিক সাথে তিনি ঠিক মেলাতে পারছেন না নিজেকে, তাঁর অতি পরিচিত দেহকোষের কার্যাচার্যকে। ঐ 'আমির' মৃত্যুর একটা নির্দ-ভুল তথ্য যা সংবাদপত্রে লেখকদিগের চোখে পড়বে—এমনি মনে হচ্ছিলো তাঁর। কিন্তু একই সঙ্গে তার চেতনা সেই লেখকদ্বয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে-ছিল: এতদিন যিনি ছিলেন পণ্ডিত; গ্রন্থ-কার যাঁর কিছুটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে বলে দাবী করা যায়: তিনি অকস্মাৎ হয়ে উঠলেন এক বাসনা সিক্ত রক্তমাংসের মানুষ। শরীর থেকে মরা চামড়ার মতো তার মন থেকে খসে পড়লো তার কর্মজীবন সংক্রান্ত সব খেদ ও দুশ্চিন্তা। সমুদ্রের মধ্যে লোহার মতো ডুবে গেলো সেই বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে তিনি এক যুগের অতীতে কর্ম করতেন। পিশাচ-সংস্কৃতির অনুবাদ বোমানি ভাষা বিষয়ে তাঁর সন্দর্ভ: এগুলো সমাপ্ত হলো না বলে এখন আর তিনি পরিতপ্ত নন সন্ত্রাকুল নন তার প্রত্যাগামী ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদল বানরকে টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দিলে তারা দশ লক্ষ বছরেও হয়তো শেক্সপীয়রের সব নাটক লিখে উঠতে পারবে, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয় রচনা করবে বোমানি ভাষা বিষয়ে ঠিক সেই নিবন্ধ যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, কারো না কারো উদ্যোগে পিশাচ-সংস্কৃতির অনুবাদ প্রকাশিত হবে। তাহলে: কি এসে যায়? আর তাঁর সংগৃহীত বইগুলি নিয়ে তাঁর মনে একটি নতুন চিন্তার উদয় হলো: তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বইগুলিরও মৃত্যু হবে, কেননা তিনি তাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন তা ছিলো তাঁরই ব্যক্তিগত সৃষ্টি বহু বৎসর ধরে তা বিকশিত হয়েছিল। সেই সম্বন্ধটি একবার অন্তর্হিত হলে, আকারে প্রকারে অস্তিত্ব থাকলেও তার ব্যবহৃত একটি বইও থাকবে না, তার পঠিত কোনো একটি বই আর কেউ পড়বে না কোনোদিন। অতএব ছাপা কাগজের ও বাঁধাই সম্বলিত যে বস্তু-গুলিকে তিনি জানতেন বলে মনে করতেন (যা আদৌ কোন পরিবর্তনশীল অন্তঃ-সারের আধার নয়) তা হস্তান্তরিত বা উপেক্ষিত বা বিনষ্ট হলে: কী এসে যায়? এই অর্থহীন চিন্তা তাকে সান্ত্বনা দিলো, কিন্তু তা অনুধাবন করতে গিয়ে তিনি ক্লান্তিবোধ করলেন, তাঁর দুর্বল হয়ে আসা মননশক্তি এক বৈরাগ্যের অস্ত্রে ঝাঁঝরা হলো। দু-একটি নার্সিংমূর্তি উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর সমীপে।

লেখকদ্বয়ের বয়স যখন তেইশ পিতা মাতার নির্বন্ধে ও আয়োজনে একটি সাধারণ ঘরোয়া সমারোহে কলার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার যুবক-চিত্তে ঈষৎ চাঞ্চল্য জেগে-ছিলো অন্য একজনের জন্য— ভাটপাড়ার তাদেরই প্রতিবেশিনী এক বিধবার কিন্তু পিতার মতে বিধবা বিবাহ গর্হিত জেনে সে দিকে অগ্রসর হতে সাহস পায়নি। এবং একটি সুবিধাবাদী তদবীরে সংস্কৃতীয়ে পরবর্তী পরে অনায়াসেই ফুলোছিলেন। সংস্কৃতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন সাফল্যের সঙ্গে: একটি পুত্র ও একটি কন্যার মুখ দেখে-ছিলেন: আর তারপর বিবাহের মাত্র পাঁচ বছর পরে, তখনকার দিনে অবিভক্ত টাই-ফয়েড রোগে পত্নীর মৃত্যু হলো। বাবার তার যৌবন তখন পূর্ণ, তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব সাড়ম্বরে প্রত্যাখ্যান করলেন। সুকুমার, সারদা, পরবর্তী কালে রচনা করে নিজের ভাষা উপাদানে তৈরি করা কল্পনাময়ী; মন থেকে মুছে দিলেন নারীসুলভ কল্পনা ও অনুধ্যান। এমনি করেই এক এক স্তরে স্তরে হয়েছে তাঁর কর্মময় আত্ম-প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধিকের [illegible] যদি না

দিয়ে ভালো দেখা হয়ে যেতো তার প্রথম যৌবনে, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে।

অনাদেশ, অন্য পরিবেশ, অন্য লোকচারণ। তিনি এসেছেন লণ্ডনে প্রাচ্যবিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য আমন্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে। তীব্র শীত, অনুচ্চিকর খাদ্য, সূর্যমন্দিরা বা কীটজ্যোতি, বিজলবাতি লোহিতবর্ণ কর্মতৎপর জনতা। সহকর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, অবশিষ্ট সময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ম নিয়মিত স্নান। কিন্তু সেই ঘুরানের পরাচ্ছাদ সেই ধোঁয়া মেঘ কুয়াশা আস্তরণ— তারই তলায় প্রচ্ছন্ন ছিলো ইন্দুমতী, তিনি জানতেন না। একদিন, অবশ্যের প্রথম উত্তরণেও যখন গ্রীষ্ম উঁকি দিলো, আর সেলে ফেরার তিনমাস মাত্র বাকী, তখন লণ্ডনবাসী বাঙালীদের এক প্রীতি সম্মেলনে দেখা হয়ে গেলো।

চোখে চোখে দেখা দুএকটি প্রাথমিক ঝঙ্কারবিন্দুর, হঠাৎ যেন বিদ্যুতের উদ্ভাস, কোনো অন্তর্নিহিত অন্তরিক্ষ উজ্জ্বল অক্ষরে আঁকা পরিচয়—তারপর সব সাধিত হলো অতি সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। গৃহকর্ত্রী হয়েছিলো ইন্দুমতী, কলকাতার একটি ধনী-পুত্রের প্রস্তাবনার গোপনে তাকে বিয়ে করে চলে এসেছিলো লণ্ডনে, কিন্তু সে বিয়ে দু-বছর পরেই ভেঙে যায়, তার বর্তমান ইংরেজ স্বামীর সঙ্গেও তার সম্বন্ধ শিথিল। স্বামী কর্ম করেন কার্ডিফের এক কারখানায়, সপ্তাহান্তে স্ত্রী কন্যার কাছে লণ্ডনে আসেন বা আসেন না। এই পর্যন্ত ইতিহাস, দেবকী বসুর বাংলাদেশ রক্ষণশীলতা যাতে প্রতিহত হতে পারতো—তা হারিয়ে উঠলো অবলম্বনীয় এক আহ্বান এক উষ্ণ সজীব ও যৌবনের অতিরঞ্জিত উপস্থিতি। ইন্দুমতী যে পরস্ত্রী ও মাতা, দেবকীদাসের পারিবারিক আদর্শ অনুসারে কর্তব্যজ্ঞানী ও একনিষ্ঠ স্ত্রৈরিণী— এই সব সম্ভবপর দুর্বল বিধিকে চূর্ণ করে দিয়ে বেজে উঠলো তার প্রৌঢ়শোণিতে শঙ্খধ্বনি; চোদ্দ বছর ধরে যে স্রোত ছিল অবরুদ্ধ তা উদ্দাম বেগে শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়লো। তার দিক থেকে ছিলো ভীরুতা ও সংশয় কিন্তু তাকে হরণ করে নিল ঐ কান্তিময়ী সাহসিকা অনায়াসে। কোনো কথা না বলে শুধু স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে শুধু ঠোঁটজোড়ায় মায় ঘরে ডেকে একবার। গলায় শিরায় সব রাত্রি আমন্ত্রণের অপেক্ষায় পুনরাবৃত্তি দুজনেরই অভিধির উচ্চারণ—যেন স্মরণাতীত সময় থেকে এই জন্য অপেক্ষা করে-ছিলো দুজনেই। নায়িকা তাকে হাত ধরে নিয়ে গেলো জীবনের অন্য এক স্তরে; অন্য এক জগৎ উন্মোচিত করে দিলো তার জন্য; দীক্ষা দিলো এমন সব স্বপ্নের অভিজ্ঞতায় যার অস্তিত্ব তার জানা ছিলো না। দেবকীদাস আহরণ করলেন এমন কোনো কোনো জ্ঞান যা পুস্তকে বা পাণ্ডুলিপিতে সঞ্চিত নেই : তিনি অশ্রুপাত করলেন নাট্যশালায়; চিত্র-শালায় কোনো নগ্নাকে দেখে প্রতিমার সামনে ভক্তের মতো দাঁড়ালেন; প্রীত হলেন পল্লী অঞ্চলে কোনো তিনশো বছরের পুরোনো সরাইখানায় রাত্রি কাটিয়ে; স্নিগ্ধ লঘু শ্যাম্পেনমদিরার আস্বাদ নিলেন-আবিষ্কার করলেন ঐ হিমাহত অমিত দ্বীপে এক গ্রীষ্মকালীন মনোমুগ্ধকর শান্তিময়; এতদিনে ইংলণ্ড দেশটা তার অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবিষ্ট হলো। এক বিপুল হৃদয়-মন্থনকারী জাগরণ যেন; এই উপহার, ইন্দুমতীর। কিন্তু যখন দেবকীদাসের মনে হচ্ছে তার জীবন সবেমাত্র আরম্ভ হলো তখনই একদিন জাহাজঘাটায় জলের বাঁধন বেড়ে চললো দুজনের মধ্যে। তিনি বন্দরের ভিড়ে হারিয়ে ফেললেন সেই দেহলীকে; তার মেঘদণ্ড বাঁকিয়ে দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রী ছিন্নভিন্ন করে স্মৃতি ছাড়া অন্য সব কিছু কেড়ে নিয়ে অত্যাচারী কান্না নেমে এলো। আ—সেই কষ্ট সেই দ্বিখণ্ডিত হবার যন্ত্রণা।

দেবকীদাস তার বর্তমান বয়স ভুলে গেলেন; কিংবা হয়তো প্রাণশক্তি ফাঁকিবাজ বলে তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে এলো যৌবন ও বার্ধক্যের ভেদ। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রথাসম্মত বিচ্ছেদরেখা। যেন লণ্ডনের সেই দিনগুলিতে প্রত্যাবর্তে তিনি—এমনি মনে হলো তাঁর—আবার ইন্দুমতীর স্বাস্থ্য লাবণ্যে : সব সুবাস সব উচ্ছ্বাস সব আত্মবিস্মৃতি ও আত্মসমর্পণ নিয়ে আবার সেই রাত্রি, উষা, অপরাহ্ণগুলি। আর তার-পর সেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। ফেরার পথে জাহাজে এতগুলি দিন—কী কঠিন চেষ্টায় রুদ্ধ রেখেছেন আর্তনাদ সহ্য করেছেন প্রতি মুহূর্তে সেই অনুপস্থিত উপস্থিতি। তাকে আবৃত করে আছে ইন্দুমতী; তাঁর গালে তার গালের স্পর্শ, কাঁধের উপর তার আদরণীয় কোমল কেশভার, তার প্রতি রোমকূপে তার স্তনাগ্রচূড়ার শিহরণ; তার কর্ণকুহরে সেই কণ্ঠস্বর ছাড়া শব্দ নেই, শুধু হাসি আর দৃষ্টির জন্য তিনি চক্ষুষ্মান। পুনরায় জাগ্রত হলে স্নায়ুদেবতা মৃত্যুকে কাঁপিয়ে দিয়ে তাঁর ধমনীর মধ্যে; তার বেগ সহ্য করার জন্য তিনি পাঁচ আঙুলে আঁকড়ে ধরলেন বিছানার চাদর, দাঁত বসিয়ে দিলেন বালিশে (যেমন করে-ছিলেন তিরিশ বছর আগে এক ভারত-গামী জাহাজের কেবিনে), নিঃশব্দ চিৎকারে উচ্চারণ করলেন একটি নাম; আর এক আকস্মিক স্বচ্ছ মুহূর্তে বর্তমানে ফিরে এসে অবলম্বন : কিন্তু এই যন্ত্রণাতেই সুখ, এই বেদনাতেই আনন্দ। যেসব বই পড়েছি তাতে নয়। যেসব বই লিখেছি তাতেও নয়, আমার জীবন যদি কখনো কোনো সার্থকতা পেয়ে থাকে তা এখানে—এই হৃৎস্পন্দনে, অনুকম্পনে। কিন্তু এই আবেগের চাপ তার দুর্বল দেহ সহ্য করতে পারলো না: তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলো, তিনি আবিষ্ট হলেন সেই মূর্ছায়, যা থেকে আর জাগরণ নেই। তার মরণ-পরতার উপান্তে দশা উপস্থিত হলো। আজ তার শেষ মূর্ছার তৃতীয় দিন।

প্রথম দুদিন কিছুটা উদভ্রান্ত ছিলেন তিনি। অনেক দৃশ্য ভেসে উঠছে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে—অসংলগ্ন অনিশ্চিত, অর্থ-হীন : কোনো-কোনো মুখ, কোনো কোন স্থান, রাস্তা, পার্ক হোটেলের ঘর—কে কোথায় কোন তার স্থিরতা নেই, এক পরিচালকহীন, বিরক্তিকর ঘূর্ণন যেন : আর এইসব ফাঁকে ফাঁকে, মধ্য দিয়ে যেন কোনো গোপন রুদ্ধ পথ রচনা করে নিয়ে, এক মূর্তি বা পরিবেশ বা আভাসমাত্র। যেন তারই জন্য আবির্ভূত তাকে ডাকছে, কোন দুর্বোধ সাংকেতিক ভাষায় বার্তা পাঠাচ্ছে তারই জন্য। এই কি তাহলে মৃত্যু? না কি বহুবিস্তৃত ভগবান? কি আমি বহু-কাল যাকে ভুলে ছিলাম, যে? যার বিচ্ছেদে বিদীর্ণ হয়েছিলাম, সে? আমাদের সারা জীবনের চেষ্টা কি শুধু তারই কাছে ফিরে যাওয়া—আমরা যার নাম দিয়েছি ভগবান, অথবা মৃত্যু অথবা...ভালবাসা। অবশিষ্ট ক্ষীণতম চৈতন্য দিয়ে তিনি আঁকড়ে ধরলেন এই তিনটি শব্দকে—মর্তলোকের সঙ্গে শেষ যোগসূত্র তাঁর; আর তাও যখন ছিন্ন হলো, তখনই তিনি প্রবেশ করলেন তার মরণশীলতার ক্ষণ-স্থায়ী অন্তিম পর্যায়ে।

আজ সকাল থেকে সব অবান্তর চলা অন্তর্হিত হয়েছে; এখন তার অন্ধকার যেন সুনির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ, তাই আরাম-দায়ক। কোনো রোমাঞ্চ জন্তু, নৈশ অস্পষ্ট, অন্ধকারে সুড়ঙ্গ পথে সন্তরমান নিঃশব্দে কিন্তু তীব্র গন্ধ স্পর্শময়। দুর্বোধ্য স্পর্শ শ্যাওলার কলম্বের, ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোটো ছোটো চোরকাঁটার; আর গন্ধ—এক উষ্ণ, সজীব, উন্মাদক ঘ্রাণ, অন্ধকারে আশা ছড়িয়ে এক বিপুল অচিন্তা নব-জাগরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সারাদিন ধরে খেলা চললো তার সঙ্গে ঐ অস্পষ্ট সম্ভাব তারপর আহ্নিক আকাশে সূর্য অস্ত যায়, দেবকীদাস সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলেন ঐ কোমল, রোমশ, জন্মান্তকারী স্পর্শ, প্রতিরোমকূপে তার শিহরণ, তার স্পন্দন, তার প্রচুর—এক অনির্বচনীয় আনন্দে ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয়ে। কিন্তু সেই জন্তুর নাম ভালবাসা না ভগবান, না মৃত্যু, তা বোঝার ক্ষমতা তার ছিলো না, পৃথিবীর সব ভাষা, সব নাম, সব চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছিলো সেই অমেয় অনুভূতির মধ্যে। সূর্যাস্তের আগেই ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

CENTRAL LIBRARY

রাণী দর্শন

মনোজ বসু

নামও শোনেননি? তা কেন শুনবেন। ডাকসাইটে সুন্দরী বলতে আপনারা পদ্মিনী নুরজাহান ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি জেনে আছেন। রানী তিলোত্তমা এখনো রঙ্গেমাংসে বর্তমান পড়শিরাজ্য বাংলাদেশে। পঁচিশটা বছর আগে একই দেশ ছিল—হারাতে হয়, সেই আমলে কেন দেখলাম না। মনে মনে নিজের গাল চড়াই। সেই ত্রুটি এতদিনে মেরামত করে এলাম। শুনুন। ডি সি সাহেব খাতির করে একটা চীপ দিয়ে দিলেন: যে কটা দিন আছেন ইচ্ছেমত ঘোরাঘুরি করবেন। তিনকড়ি প্রস্তাব দিল: তবে চলুন নরসিংগড়—রানী তিলোত্তমা যেখানে। অনেকদিন ওখানে কাজ করেছি সমস্ত চেনা-জানা। বাংলা একখানি সনে কুমার বাহাদুর দেহ রাখলেন, ইস্তফা দিয়ে আমি ছিলুমখানে সরে পড়লাম।

সন্ধ্যায় পৌঁছলাম। গড়ের পাঁচিল অন্ধকারের মত কালো। বিধাতা যেদিন পৃথিবী গড়লেন, নরসিংগড়ও সম্ভবত সেই দিনের গড়া। অনাদিকাল থেকেই বড়-ঝাপটা খেয়ে খেয়ে কালো চেহারা দাঁড়িয়েছে। অতিকায় দৈত্য দিগন্ত জুড়ে হাত-পা মেলে আকাশ অবধি মাথা তুলে আছে এমনি মনে হয়। ফটকের সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ—বড় বড় অশ্বত্থ কাউগাছ এখানে-ওখানে। ধারণা ছিল অগ্নিকাণ্ডের পর এই দশা।

তিনকড়ি বলে জাঁকের বাজার এদেশে-সেদেশে জুড়ে নাম। নদীর কিনারা ধরে সারবন্দী মহাজনী গদি—

এদিক-ওদিক তাকাই কোথায়? তিনকড়ি হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়: যান দেখতে পাচ্ছেন ঐখানটা ছিল খরস্রোতা নদী—নৌকোয় নৌকোয় হয়লাপ। বিলাস-কামেন্দ জন্য নামটা বেশি ছড়িয়েছিল। বিশেষ করে হাতির দাঁতের কাজ, সুক্ষ্মশী আর আবলুশ কাঠের কাজ, বেতের কাজ, গালা আর সোনার কাজ, তুলট কাগজে আঁকা পটের ছবি। পাইকেরের মধ্যে কোথাও অমন জিনিস মিলত না। শৌখিন লোকে দোকানে দোকানে ঘুরে পছন্দ করত। পাইকারে লাট ধরে কিনে নৌকোয় চালান দিত। রক্ষার কোপে রাত্রের মধ্যে পড়ে সমস্ত ছাই।

বিস্তর চমকাল। মাথার ওপর চেয়ে দেখি অবস্থা খারাপ। ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে। বেশ একচোট ঢালবে। বেশি দেরিও নেই তার। তাড়াতাড়ি কোথাও ঢুকে পড়া দরকার। তেমন অতিথিশালা আছে। ঢুকলেই হল। তিনকড়ি চেঁচামেচি লাগিয়েছে: চাটুজ্জেমশায় কোথা, কোন কামরা আমাদের দিচ্ছেন? তিনজনে খাব—কামরা এই দুখান আর ভাইভার। তিনকড়ির ধাতিরে ভাল কামরাই মিলল। কামরার আবার তড়বাপোছ। নীলকমল চাটুজ্জের নিজস্ব জিনিস। অতিথিসৎকারে নিয়ে আজকের রাতটা সে মেজের দড়াবো। সেখানে এখন ঘোরতর ব্যস্ত। বৃষ্টি নামবার আগেই বাঁধাবাড়া শেষ করতে হবে, অতিথির পেটে নয় তো ঝটিকাটেন। সে কামরায় বসে আছি, হাত পড়ে আওড়ুর দরুন উপায়টা খোলসাটাল ছাউনি—হাত মোটামুটি নিশ্চিন্ত ঠেকায়। কিন্তু রামাকুটুরিতে প্রাচীন জাত

হজায় থাকায় ফলে বাইরে ফোটা ফোটা পড়তে শুরু হলেই ভেতরে নাকি মুষলধারে পড়বে। কেন পড়ে ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বরের উপর যাবতীয় দায় চাপিয়ে চাটুজ্জে দুত রান্নাকুঠুরিতে গিয়ে উনুনের মুখে মোটা মোটা কাঠ ঠাসতে লাগল। ভাত যাতে তাড়াতাড়ি ফোটে।

দুজনে তক্তাপোষে ঠেসে বসেছি। তিনকড়ি আর আমি। হেরিকেন টিমটিম করছে। জানলা দিয়ে মাঠে তাকাই। প্রাচীন বনস্পতিরা এক-এক বোঝা জমাট অন্ধকার যেন। ঝুপ-ঝাপ পদ্মা জোনাকি তাদের গায়ে।

তিনকড়ি বলে, ঐসব গাছগাছলার মধ্যে ভূতপেতিন! কিলবিল করে বেড়ায়। একশ টাকা বাজি ধরলেও আমরা এদিকটা মাড়াতাম না। জমজমাট বাজার কত লোকের ঘরবসতি কাজকর্ম সেদের নির্ভাবনায় সব শুয়ে পড়েছে—সকালবেলা ছাই আর পোড়া কয়লা ছিন্ন অন্য কিছু নেই। বেঁচেছিল সাহানাই।

বাতাস বন্ধ, গাছের পাতাটি নড়ে না। বৃষ্টি নামল বলে। চরাচর স্তম্ভিত। মাঝেমধ্যে তক্ষক ডেকে ডেকে উঠছে। তাছাড়া কোনদিকে কোন রকম শব্দ নেই। দম আটকে আসে, বিশাল অট্টালিকা, ইট-কাঠের বোঝা নিয়ে বুকের উপরে চেপে বসেছে। তবু একা তিনকড়ি অবিরত বক-বক করে যাচ্ছে পাশটিতে বসে।

নিশিরাতে আগুন। দোলপাতায় ছাওয়া চৌরি ও বাংলা ঘর বেশির ভাগ। টিনের ঘরও শখানেক হবে। আগুন দেখে যত-দিকের যত বাতাস যেন্নে এসে পড়েছে চতুর্দিকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে লালঘোড়া দাবড়ালে বলে না—ওর চেয়ে ভাল বর্ণনা আর হয় না। অদৃশ্য সওয়ারেরা এক লাখ দু লাখ রক্তবরণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে অন্তরীক্ষে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, লাফিয়ে পড়ছে এ-ঘরের চাল থেকে ও-ঘরের চালে। আগুনের গতিক দেখে মনে হবে তাই। আকাশ রাঙা—আকাশেও বুঝি আগুন ধরে গেছে।

তখন তুমি ছিলে নরসিংগড়ে? নিজের দেখেছ?

হি-হি করে হেসে তিনকড়ি বলল, মুখে মুখে শোনা, জন্মই হয়নি তখন আমার। সেকি আজকের কথা?

নীলকমল চাটুজ্জে এই সময় ঢুকল। বাবলি এঁটে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে এসেছে কোণের দিকে সাবধানে করে রাখল। বৃষ্টি-বাদলার উপর ফেলে গেছে : ভদ্রলোকেরা এলেন একখানা দুখানা তরকারি রাঁধাব—তা একটুখানি সবুর সইল না—মুড়ি-গুড়ি আরম্ভ করে দিল। রাঁধা ভাত শেষটা জলে ভাসবে—হাঁড়ির মুখে তাড়া-তাড়ি সরা চাপা দিয়ে সরিয়ে আনলাম। তবু ভাগ্যিস ভাতের মধ্যে কলা বেগুন কুমড়ো ছেড়েছিলুম। ভাতে ভাতই শুধু, তার উপরে কিছু বলতে দিল না।

খাসা হবে—। বলে চাটুজ্জেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি : বিনি মশলায় সিদ্ধ তরকারিতে ভিটামিন ষোল আনা থেকে যায়। শরীরের পক্ষে ভাল।

তিনকড়ির মাথায় অগ্নিকাণ্ড ঘুরছে। বলে চাক্ষুস দেখেছিলেন এই চাটুজ্জে-মশায়। অন্যেরা ফোত। অন্তত নরসিং-গড়ে কেউ নেই। নীলকমল প্রতিবাদ করে ওঠে : কেন বানী তিলোত্তমা? আসল জনকেই বাদ দিচ্ছ। আগুন লেগে সকলের সর্বস্ব গেল, কপাল খুলল কেবল সুরেন সিংহের মেয়ের। তিনু সিংহ হয়ে দাঁড়ালেন বানী তিলোত্তমা।

রোমাঞ্চের গন্ধ পাচ্ছি, জমে আসছে। তক্তাপোষে পাশের জায়গা দেখিয়ে বসি দাঁড়িয়ে কেন চাটুজ্জেমশাই বসুন। বসতে বসতে নীলকমল পরিচয় দিচ্ছে। সুরেন সিংহ মস্ত দরের কারিগর হাতির দাঁতের জিনিস গড়তেন। এ-তল্লাটের মানুষ নন—সুরেনের ঠাকুরদাদা, কোন পাহাড় অঞ্চল থেকে নেমে নরসিংগড়ে দোকান ফেঁদে-ছিলেন নাকি। কথাবার্তায় কিছু মালুম পাবেন না, তবে রংটা অতিরিক্ত ফর্সা আর মেয়েদের কড়ারকমের পর্দা।

নীলকমলের বাপ বিশ্বম্ভর তখন রান্না-বাড়ির প্রধান—রতগুলো পাচক ছিল সকলের মাথার উপরে। স্বহস্তে দুখানা-তিনখানা তরকারি রাঁধতেন—একেবারে অমৃত। কুমার বাহাদুর বড্ড পেয়ার করতেন তাঁকে। ছেলেমানুষ নীলকমল বাপের কাছে থাকত। রাতদুপুরে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে হাত ধরে বাপ হেঁচকা টান দিলেন : আগুন, আগুন, ছুটে ফাকর চলে যা। সদা ঘুম ভাঙা বালক, নিরাপদ দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখেছে সম্বিত আছে কিংবা নেই—কুমার বাহাদুর পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছেন। শত শত পিতলের কলসি এনেছে, আগুনের আক্রোশ বিফলিত হচ্ছে। মেটে কলসি এবং তাও অজস্র। নদী থেকে জল ভরে একদল অন্য দলের হাতে দিচ্ছে, এবং তাদের হাতেও খালি কলসি নিয়ে ছোটে আবার নদীর দিকে। ভরা কলসি এ-দল থেকে ও-দলে—লোকের হাতে হাতে চলে কলসির জল অবশেষে আগুনে গিয়ে পড়ে। রোখা যাচ্ছে না আগুন। খুঁটি পুড়ে গিয়ে চালগুলো একের পর এক ভূমির মুখে থুবড়ে পড়ছে। প্রচণ্ড বাতাসে ফুলকি উড়ছে। চারদিকে অগ্নিবৃষ্টির মতো দেখায়। বুক চাপড়াচ্ছে মানুষে পাগলের মতন আর্তনাদ করছে। গেল গেল সব গেল আমার—ছুটে লোকটা আগুনের মধ্যে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে চায়। পাঁচ-সাতজনে গিয়ে জাপটে ধরেছে—কিন্তু সিংহসিংহে মেয়ে যেন অসুরের বল—ধরে রাখতে ওরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কান্না কোলাহল আগুন ও বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে কুমার বাহাদুরের হুকুমহাকম-গুলো স্পষ্ট সকলের কানে আসছে। বয়স ষাটের ওপর, তবু যেন সিংহ হয়ে গর্জাচ্ছেন এদিক-সেদিক।

কী হল হঠাৎ—মানুষের কান্নাকাটি, বুক চাপড়ানি, কলসি নিয়ে শতেক জনের ছুটোছুটি কুমার বাহাদুরের গর্জন লহমার স্তব্ধ—যে-যেখানে যেমন অবস্থায় ছিল মন্ত্রাপিতবৎ সেইখানে সে রইল। কিসে কি হল, কয়েক সেকেণ্ড কেউ বুঝতে পারে না। তারপর মালুম হল। সতর-আঠার বছরে মেয়েটা সুরেন কারিগরের মেয়ে তিনু, ঘুম ভেঙে স্বল্প-বসনে অলুথালু অবস্থায় প্রলয়াগ্নির ভিতর কোনরকমে প্রাণ নিয়ে বেরিয়েছে—চতুর্দিকে চেয়ে দেখে তারপর তীরবেগে কুমার বাহাদুরের কাছে গিয়ে আর্তনাদ করে পড়ল : ঘরবাড়ী জ্বলছে বাবা মা আটকে পড়ে গেছে আমরা পথের ভিখারি হলাম। কুমার বাহাদুরও কেমন হতভম্ব। কী অবস্থায় কেন যে নদীকূলে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল যেন নিস্পৃহ হয়ে রইলেন। যত মানুষ দেখছে, সবারই এই দশা। আধবুড়ো একজনের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে ঝিড়িং মিড়িং করে লাফাচ্ছে আর একজন তাড়ের জল ছিটোচ্ছে কাপড়ের আগুনে—সর্বনেশে ব্যাপার। জল ছিটোনো বন্ধ এবং মানুষটার দাপাদাপিও। ছুটো-ছুটির মধ্যে একটুকু দাঁড়িয়ে পড়ে—বলতে গেলে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণ তাঁর ভিতরেও মেয়েটাকে এক নজর না দেখে পারে না। অসম্ভব রূপসী—কুমার বাহাদুর বলতেন রূপসী প্রলয়ঙ্করী। দর্শনেই রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাপ-মা ও গজদন্তের কারবার ছেড়ে ছাই। মেয়েটাও যে ক্ষতম্ব হবে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াবে, কুমার বাহাদুর তা স্বপ্নে ভাবেন না। তিনুকে বুকের ভিতর নিয়ে তুললেন। নিয়ে করবেন না, মাটে পৌঁছোনোর পর বুকে নিয়েছেন বিশ্বাস বিস্তর। নিরাশ হয়ে ঐ কর্মে পাকাপাকি ইস্তফা দিয়েছেন। সারা জন্ম হিসেব করে এসেছেন। কতগুলো কাঁচা কাজ বন্ধ যাবে না—হিসেব করে দেখতে হয়।

শুভবিবাহে
• বেনারসী
• পিওর সিল্ক
এবং
• তাঁতের
শাড়ীর
নূতনতম ডিজাইনগুলি
আমাদের নিকট উচিত মূল্যে
কিনুন
হরলালকা
টেক্সটাইলস্
গড়িয়া হাট জংশন

বৌশর ভাগই আগেভাগে স্বর্গে গিয়ে সতীলোক আলো করে আছে। সে আমলে লোকে দশ-বারো বছরে কন্যাদান করত, বিয়ের পরে তখন বছর দশেক সময় দিয়ে পরের বিয়ের বসতেন। তারপর কনে ক্রমশ থুবড়ো আরও থুবড়ো পাওয়া যাচ্ছে—ষোল আঠারো বিশ বাইশ। কুমার বাহাদুরের বয়সও বেড়ে যাচ্ছে—এ বিয়ে আর পরের বিয়ের মাঝে ফাঁক দশ বছর থেকে কমতে কমতে শেষটা তিন চারে এসে ঠেকল। ঘাট পেরিয়ে এসে কুমার বাহাদুর দুঃখ করে বলতেন আমার কসুর নেই—পিতৃ-পুরুষেরা উপর থেকে দেখছেন। পিণ্ডলোপ না হয়, জীবনভোর আমি চেষ্টা করে এসেছি। লাভ হল না ক্ষেপে ক্ষেপে তোপর পরই সার।

আর বিয়ে নয়, কুমার বাহাদুরের প্রতিজ্ঞা। রইলেনও ছটা বছর চোখকান বন্ধ করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হল। লোকজনদের বললেন, আয়োজনে লেগে যাও উপায় নেই। খুব তাড়াতাড়ি। আড়ালে আবডালে লোকে রসরসিকতা করে : শেষ-মেষ উপযুক্ত রাণী বাছাই হল। দরাজ মন দরাজ মেজাজ। আমলা গোমস্তা ইস্কুলের মাস্টার প্রজা পাটক আত্মীয়কুটুম্ব কুমার বাহাদুরের সবাই হিতাকাঙ্খী—তাঁর সাথ পুরুষে কেউ পিছপাও হবে না। ছেলের মুখ দেখেই তিনি চোখ বুজতে পারেন। এরপর কেউ টিপ্পনী কাটে চোখ বোজার আগে নাও যদি দেখেন, পরলোক থেকে পরে ঠিক ছেলে দেখতে পাবেন। কিন্তু ছেলের মুখ দেখার আশায় বিয়ে নয় এবারে।

তিনকড়ি হাসতে হাসতে নীলকমল চাটুজ্জের দিকে তাকাল : চুপচাপ কেন চাটুজ্জে মশায়, এতদিনের ব্যাপার তো আপনারই চোখের উপর। এখন আর বলতে কি বলুন না সারদে।

কুমার বাহাদুর থাকতে গড়ে মানুষ বিলবিল করত। রান্নাঘর ভোজনঘরও সেই অনুপাতে—পাশাপাশি দুই প্রকাণ্ড কোঠা-ঘর। বিশ্বম্ভর বুড়ো হয়ে যাওয়ায় তার কাজটা ক্রমশ এই নীলকমলে বর্তাল। ভোরের বেলা একসঙ্গে ছটা উনুনে আগুন পড়ত। পাচকেরা রাঁধত ধবধবে পৈতের গোছা গলায় ঝুলিয়ে নীলকমল তদারক করত ঘুরত। খুন্তি দিয়ে এই উনুনের তরকারি একটু তুলে দেখল, ঐ উনুনের মাংস টিপে দেখল সিদ্ধ হয়েছে কিনা। মাছের কালিয়ার একটুখানি হাতের তেলোয় ঢেলে সোঁ করে মুখে টেনে নুন ঝালের পরখ করল। ছ-ছটা উনুনে রাবণের চিতার মতো আগুন দাউ দাউ জ্বলছে, তার মাঝখান দিয়ে অবিরাম ঘোরাঘুরি—মাংস-মাছ সিদ্ধ হয়েছে এবং নীলকমল নিজেও অনেক সিদ্ধ। চুকেবুকে যেতে রাত দুপুর। সারাক্ষণ রাঁধাবাড়া ঝাড়কর্ম, পাতা পেড়ে দলে দলে খাওয়া ও দেওয়া ধোওয়া—সমস্ত শেষ আলো নিভেছে। বিশাল গহ্বর সারি সারি নিভন্ত উনুনের উপর হয়তো বা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়ল। রান্নাঘর ভোজনঘর নির্জনতায় থমথম করছে। এমনি এক নিশিরাত্রে নীলকমল বিশেষ একটু কাজে আবার রান্নাঘরে এসেছে। কাজটা বলেই ফেলল না। সুখদা কবে মরে গেছে এখন আর বলতে বাধা কি? বয়সের ধর্ম সুখদা দাসীর সঙ্গে নীলকমলের একটু ইস মতন হয়েছিল। বিধবা সুখদা লোকনিন্দার ভয়ে প্রকাশ্যে মাছ খেত না, অথচ মাছে বড় লোভ। নীলকমল ভাল গলদা চিংড়ি কি রুইয়ের মুড়ো সুযোগ মতো উনুনের পাশে লুকিয়ে রাখত গোপনে চুপিসারে গিয়ে খাওয়াত। আজও সেই বাবদে চোরের মত পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসেছে।

বিশাল ভোজনঘরে সহসা খলখল হাসির শব্দ। চুলুটের আগুনও দেখা যায়। জ্যোৎস্না রাত্রি, এবং একেবারে পাশের ঘর। সন্তর্পণে করে নীলকমল উনুনের অলিন্দের ভিতরে গিয়ে বসে পড়লেন। রাত্রির শেষযামে কুমার বাহাদুর গিরিবালা আমিনকে নিয়ে এই নির্জনে কোন কাজে এসেছেন, না দেখে যাওয়া যায় না।

দেখবার বস্তু বটে। জায়গাটা জনহীন ভাবা গিয়েছিল, তা নয়। ভোঠাঘরের শেষ প্রান্তে পরোপকারের মত বাস করে তিন ভোকরা। নতুন ইস্কুল হয়েছে তার শিক্ষকদের একজন,

প্রকাশিত হয়েছে

কথাসরিৎসাগর আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস

হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা ১০·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সব ফুল কিনে নাও ৮·০০ — **ফেরারী অতীত** ৭·০০

বীরেন্দ্রনাথ সরকার — সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

গৌরী গঙ্গা ১·০০ — **একক প্রদর্শনী** ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুখের আড়াল ৫·৫০ — **ঘরের পথ** ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার নীল লোহিতের চোখের সামনে

৪·০০ — ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবী

ভালবাসার মুখ ৬·০০ — **তরঙ্গহীন** ৫·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত — শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

মন জানে না ৬·০০ — **সরমা ও নীলকান্ত** ৬·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একবোন পারুল ৬·০০ — **বনকরবী** ৬·৫০

চিরঞ্জীব সেন — অনিল রায়

রাশিয়ান রুবির রহস্য ৭·০০ — **সোনার পাতায় রক্ত** ৭·০০

সাহিত্য সংস্থা ॥ ১৮সি টেমার লেন ॥ কলি:—৯

অপর দুটি কাছারির কর্মচারী। দড়ি খুলে একটিকে গিরিধর কুমার বাহাদুরের কাছাকাছি আনলেন। কুস্তিগির মানুষ তিনি—সদালাপী সদাহাস্যমুখ, চেন টেনে জায়গা ছাড়িয়ে করে বেড়ান। গোপন রন্ধ্রে মানুষের হুকুমে দানব হয়ে উঠেছেন তিনি এখন। হাতে বেড়েক লম্বা দড়ির চাবুককে ছোকরাকে বেশ পেটাচ্ছেন। পেটানোর পদ্ধতিও রীতিমত চমৎকার—সর্বশক্তিতে প্রহারের পর তরঙ্গে তরঙ্গে হাসছেন কুমার বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে। পরক্ষণে গম্ভীর। অন্য একটিকে এসে ধরলেন এবার। ঐ একই ধরনে প্রহার একই চঙে হাসি ও গাম্ভীর্য। তারপরে দুইজনে। সে ছোকরার উপর যথাবিধি প্রয়োগ সমাধা করে অমিন প্রথমটিকে নিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে তার কিছু বিশ্রাম হয়ে গেছে, বলবার কিছু নেই। একেবারে হিসাব করা—মনে হয় মারের সময় চাবুক কতবড় চলল সঠিক ওঁরা গুনে যাচ্ছেন। এক কিস্তি হয়ে যাবার পর তরঙ্গিত হাসি এবং পরবর্তী গম্ভীর্য-টুকুও মিনিটের হিসাবে মাপা রয়েছে। আরও মজা, এত মার খেয়েও টুঁ শব্দটি নেই কারো মুখে।

চলছে একাদিক্রমে অকস্মাৎ কুমার বাহাদুর হুকুম দিলেন গম্ভীর চাপা গলায় বন্ধ করো। চাবুক সবেগে উঁচানো তখন—গিরিধর অমিন কোন গতিকে সামলে নিলেন। ধনুকের মতো হয়ে গেছেন। মার আধখানা বেশি হয়ে গেছে, কুমার বাহাদুরের নয়তো ওরকম কণ্ঠস্বর কেন? কুমার বাহাদুর বললেন তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ অমিন মশাই। ঘোরতর অন্যায়। শাস্তির ব্যাপারে তোমার উপরে নির্ভর করা চলবে না। তোমারই বরঞ্চ শাস্তি হওয়া উচিত।

একটানে গিরিধর-এর হাতের চাবুক ছিনিয়ে নিলেন। অমিন ঘাড় নিচু করলেন। চাবুক এবার যদি তাঁর উপরেই পড়ে। তা পড়বে না সঠিক জানেন নীলকমল—কুমার বাহাদুর আজাআজি কিছু করেন না। যথোচিত তোল করে দেখে তবে শাস্তির হুকুম হয়।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে কুমার বাহাদুর বললেন তোমার কল ডাকব অমিন মশায়। বাকিটুকু সেরে ওদের বিদেয় করে দাও। হাতের চাবুক নিয়ে নিয়েছেন—এর পরের কাজটা কি, নীলকমল তাকিয়ে পড়ে দেখছেন। তিন ছোকরাই থুতনির নিচে গিরিধর ধরা দিলেন, তারা হাঁ করে পড়ল। দুটো আঙুল গালের ভিতর ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে আগাগোড়া কাপড়ের বল বের করে আনলেন—একে একে তিনজনেরই। ন্যাকড়া জড়িয়ে বলের মতন করে তাদের মুখবিবরে ঢোকানো ছিল। নিঃশব্দে মার খাওয়ার অর্থ বোঝা যাচ্ছে এবার—আওয়াজ বেরুনোর উপায় ছিল না। মুখে সেই মার খালি হয়ে যাওয়া, তাগড়া তাগড়া জোয়ান ছেলে কুকুরছানার মতো কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে কুমার বাহাদুরের করুণা উদ্রেক করে।

কুমার বাহাদুর বললেন, দিনমানে খাটের মধ্যে মনের সুখে ঘুমোবে। তা নয়, রাতদুপুরে তিলুর জানলার ফোঁক ফোঁক করে বেড়ানো, দিনমানে কাছারির হাত বাকসর সামনে বসে বসে চুলুনি—সামান্য যোগটা বিয়োগটাও নির্ভুল হয় না।

ছোকরারা নির্বাক। জানো তিলোত্তমা কে?

আজ্ঞে, সুরেন সিংহি মশায়ের মেয়ে।

ছিল তাই। হবে নরসিংগড়ের ছোট রাণী। আমি বিয়ে করব। গজর গজর করছেন খানিকটা আপন মনে :

ভেবেছিলাম চিরজীবনের মতো এই কর্ম ইতি। হতে দেব তাই? সং ছেলে খুঁজে খুঁজে এনে এস্টেটের কাজে লাগালাম, শিক্ষিত ছেলে খুঁজে খুঁজে ইস্কুলের কাজে বসালাম—কাজে মন নেই, তিলোত্তমার ঘরের অলাচে কানাচে ঘোরাফেরা। আজকের তিনটে নিয়ে কতর দাঁড়াল অমিন মশায়?

গিরিধরের হাজির জবাব : সাতচল্লিশ হুজুর।

আরে সর্বনাশ! কুমার বাহাদুর শিউরে উঠলেন : দেরি করলে লোক আর একটা জুটবে না। সকাল থেকেই লেগে যাও। শেষ কাজ আমার আয়োজনে কোনরকম খামতি না থাকে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলেন লোকের বাড়ি কত রকমের মচ্ছব—অন্নপ্রাশন উপনয়ন ছেলেমেয়ের বিয়ে। আমার সারা জীবনে একই মচ্ছব—শুধু নিজের বিয়ে। এ ছাড়া দানুবজন খাওয়ানোর আর কোন উপলক্ষ নেই।

বিয়ে অবশ্য জাঁকজমকের হয়েছিল। বিরাট ভোজ—তল্লাটের বুড়ো মানুষদের মুখে এই বিশ পঁচিশ বছর আগেও বর্ণনা পাওয়া যেত। এখন তাঁরা সব ফৌত হয়ে গেছেন। যখন কুমার বাহাদুর ছিলেন রাণী তিলোত্তমা ছিলেন অতিশয় তোয়াজে—

মেঘ ঘনঘন করছে আকাশ অন্ধকার। বাঘ ডাকছে এদিকে সেদিকে। তিনকড়ি জানালা দিয়ে মাঠের পানে চেয়ে আছে। বলে এই ঘরেই শুয়েছিলাম একদিন। রাত দুপুরে। মেঘ ডাকছে বিস্তর চমকাচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়। ঘুম ভেঙে গেল আমার। বিদ্যুৎ-এর ঝিলিকে কালো কালো ছায়া-মূর্তি দেখলাম। মাঠ জুড়ে ছুটোছুটি করছে। আগুনে অনেক লোক পুড়ে মরেছিল অপঘাতে মরে ভূত-প্রেত হয়ে মাঠে তারা আস্তানা গড়েছেন লোকে বলত। গা শিরশির করে উঠল জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছি—ঠাহর পেলাম হাতে লাঠি লোকগুলোর। ভূত না হয়ে মানে জাকাতও হতে পারে। ছুটোছুটি করে দমাদম কপাট লাথি মেরে ভাঙছে। পরের দিন জিনিসটা পরিষ্কার হল—কুমার বাহাদুরের মাইনে করা বরকন্দাজ তারা সব। বাঘের ডাকে রাণী তিলোত্তমার পায়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে সারা রাত তারা বাঘ তাড়িয়ে বেড়ায়। কুমার বাহাদুর বর্তমানে এত বাহুর ছিল রাণী তিলোত্তমার।

সকালবেলা নীলকমলের বারান্দায় দুজনের দু-কাপ চা-ও মিলেছে। তিনকড়ি বলল, কটা বাজল দেখুন তো। হ্যাঁ রাণী এইবার দরবারে বসবেন। দেখা হবে, উঠুন।

এ-বারান্দা সে বারান্দা এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছি। তিনকড়ি বলে গোলকধাঁধা। গোপীবল্লভ ঠিক—একই পথ ধরে যাব ধরে বসেন তো মুশকিল। আমি তো পারিনি কখনো। দরদালান। আটা দেয়াল দুদিকে—হাঁটছি তো হাঁটছিই। দিনমানেও এখন ঘোর অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে মাঝে মাঝে পথ দেখে নিচ্ছি। আলো দেখতে পেয়ে চামচিকে অমনি চতুর্দিকে ঝটপট করে ওড়ে। গায়ে না পড়ে—তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলি। চামচিকে ওড়াও বন্ধ কড়িকাঠে পা এঁটে নিম্নমুখে যথাপূর্ব ঝুলছে। পিছনে তাকাই জমাট অন্ধকার। সামনে তাকাই কোন কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে দুজনে আমরা সাঁতার কেটে এগুচ্ছি।

ঈষৎ আলো অবশেষে রাত পোহাবার সময়কার ভাব। তখন মালুম হল দরদালান ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড হল ঘরে এসে পড়েছি। খোলা দরজা অপর প্রান্তে দিনের আলো ঢোকার পথ পেয়েছে। নীলকমল চাটুয্যের সহসা আবির্ভাব। কোন সংকীর্ণ পথে অন্ধকারের ইঁদুরের মতন সুড় সুড় করে আমাদের আগে এসে পড়েছে। বলে, মোহর আছে তো? মোহর কেন? রাণী-দর্শনে নজরানা। নিতান্ত হবে বলে, রাণী-দর্শন তবে হবে না। আগে বলেন না কেন তিনকড়ি এতখানি পথ ঝাঁট করে তা হলে আসতাম না।

নীলকমল বলে নজরানা সম্পূর্ণ আবার পেয়ে যাবেন। সমস্তে জিনিস ফিরে ঢেউয়ের সঙ্গে সব আবার ফেরত নিয়ে দেয়। রাণীও তেমন। হাতে করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত।

তা হলেও পাচ্ছি কোথা মোহর? সেকালে মাঝে মধ্যে দেখতে পেতাম। তিরিশ বছরের মধ্যে ও বস্তু চোখেই তো পড়েনি।

নীলকমল এক গাল হেসে বলল, দর্শনে এসে বিফল হয়ে যাবেন—আমরা তবে কি জন্যে আছি? ঐ বরেই তো ছুটে এলাম। মোহর আসবাই রাশি আসল রামচন্দ্রী মোহর। হাসি আমলের বন্দি জিনিস রাণীর হাতে তুলে দেবেন কেমন করে?

হাত পেতে দাঁড়ান : আড়াই টাকা—পাঁচখান আড়াই টাকা—আট আনা করে মোহর?

কেন হবে না! আবার তো ফেরত আসছে। আমাদের জিনিস আমাদেরই থাকবে।

ধরুন এলো না ফেরত। রাণী তিলোত্তমা রেখে দিলেন। চাইতে পারবেন না। আহা রাখুন না তাই। নীলকমল গদগদ হয়ে উঠল : রাণী প্রতিগ্রহ করবেন চাট্টিখানি কথা। অত বড় ভাগ্য কারো হয় না। সড়াৎ করে সে বেরিয়ে গেল। এবং পলকের মধ্যে বকবকে মালা রেকাবির উপর রামচন্দ্রী মোহর এনে হাজির করল। রাজা রামচন্দ্র কলিযুগের নন দ্বাপরের নন তাও আগে ত্রেতা যুগের। হায়রে হায় কালে কালে কী হয়ে যায়—সোনার মোহর কটকটে কালো পাথরে কষলারও অধম। মোহরের গায়ে হিজিবিজি কিছু রয়েছে। হেতাষ্টলোপি হরফ রপ্ত না থাকায়—কি করব ওসব সঙ্গে সায় দিতে হল সেখানে বাদেরই প্রসঙ্গ। সে যাই হোক ধাতু বিশেষের গোলাকার চাকতি এবং গুণগতিতে পাঁচখণ্ড—এ দুটি ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রতিগ্রহ ব্যাপারে কেন রাণী নিস্পৃহ—জিনিসটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। রাণী তো রাণী সামান্য ভাপোষা লোক হলেও এইমাত্র মূল্য স্বরূপ আড়াই টাকা দিলাম ও মোহর আমার পকেটে ফেলতে এলেও আমি তো ছিটকে গিয়ে পড়ব।

যাকগে কথা না বাড়িয়ে রেকাবি দুহাতে ধরে চলেছি। কিছু দূরে বহুদকার চেয়ারের উপর স্তূপাকার পদার্থ—তাই করা কাপড়-চোপড়। কাছাকাছি হয়ে চেয়ারের অপরূপ কারুকর্ম দেখতে পাচ্ছি—চেয়ার বলায় গুণাহ হয়েছে পুরোদস্তুর সিংহাসন। সিংহাসনে কাপড়ের গাদা ভাবছিলাম—তিনকড়ি ফিসফিসিয়ে বলে দিল কাপড়ের মধ্যে রাণী। দূর! ধাপ্পা দিচ্ছে ধাপ্পা দিয়ে আমায় বেকুব বানাতে চায়। ও হরি কাপড় যে নড়ে চড়ে—কাপড় ভেদ করে দুটো হাত কমল উঁচু হয়ে উঠল। এবং হাতের খানিকটা উপরে দেখতে পেলাম জ্বলন্ত চোখ এক জোড়া। অন্ধকারে বাঘের চোখ জ্বলে—এখানটা ঘোর-অন্ধকার বলে চক্ষুস্বয় সত্যিই দুটো আগুনের ফুলকির মতন দেখাচ্ছে।

এগিয়ে যান একেবারে সামনে—। হাত বাড়িয়ে নীলকমল দেখিয়ে দেয়। ডাইনে বাঁয়ে এক সঙ্গে ফপ্ করে দুটো মশা জ্বলে উঠল। পরিষ্কার স্নিগ্ধ আলো ঘরের। ভিতরে কোন কিছুই আর দৃষ্টির অগোচর নেই। সিংহাসনের পিছন দিকে অয়েল-পেন্টিং ঝুলছে—একটি হাস্যমুখ সুন্দরী মেয়ে। ডাকসাইটে সুন্দরী—কিছুমাত্র সেটা অতিশয়োক্তি নয়।

তিনকড়ি কানে কানে বলে ইনিই—মধুকণ্ঠে বললাম—ছবিতেও কী চমৎকার এসেছে।

তিনকড়ি পুনশ্চ বলল সিংহাসনে এঁর কথা বলছি আমি। রেকাবি সুদ্ধ রাণীর হাতে দিয়ে দিন।

স্তম্ভিত হয়ে গেছি। কুৎসিত ঐ মাংস-পিণ্ডটা নাকি রাণী তিলোত্তমা যার উপমা পদ্মিনী নুরজাহান ক্লিওপেট্রা। তিনকড়ি চকচক করে : কালে কালে কী হয়ে যায়। নবসিংগড়ে আসতে যে দেরি করে ফেললেন। রামসেবক অন্তত চল্লিশটা বছর আগে—ছবির সঙ্গে ইঞ্চি ধরে রাণী মিলিয়ে নিতেন।

রাণী দর্শন হল। পাপ মনে কিন্তু সন্দেহ রয়ে গেছে রামচন্দ্রী মোহর ও রাণী তিলোত্তমা কোনটাই খাঁটি নয়। কাল ধরে আমি যে দুটো টাকা ও এক আধুলি দিয়েছিলাম তাই কেবল খাঁটি ছিল।

কলকাতায় স্টেট বাসের ভাড়া কি বেশী ?

গন্তব্যস্থল	কলকাতার হারে ভাড়া	বোম্বাইয়ের হারে ভাড়া	মাদ্রাজের হারে ভাড়া
গড়িয়াহাট-হাজরা রোড জং পার্ক স্ট্রীট / সুরাওয়ার্দি এভিনিউ	১০ পয়সা	২০ পয়সা	২০ পয়সা
এসপ্ল্যানেড - রাসবিহারী এ্যাভিনিউ / এস পি মুখার্জী রোড জং	১৫ ”	৩০ ”	২৫ ”
নিউ আলিপুর-এসপ্ল্যানেড	২০ ”	৪০ ”	৪০ ”
শ্যামবাজার—খিদিরপুর	২৫ ”	৫০ ”	৫০ ”
যাদবপুর—হাওড়া ব্রীজ পূঃ	৩০ ”	৫৫ ”	৫৫ ”
বেহালা—বেঙ্গল কেমিক্যাল	৩৫ ”	৬০ ”	৬০ ”
কাঁকুড়গাছি—ঠাকুরপুকুর	৪০ ”	৬৫ ”	৭০ ”

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা।

পরাভূত মৃত্যু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সন্ধেসন্ধি অফিস থেকে ফিরেই হরিতোষ টের পেলেন কে যেন হঠাৎ এসেছে বাড়ির মধ্যে। সবাই হঠাৎ চুপ করে গিয়েছে।

কে এল? এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আগন্তুককে যেন আগে কেউ কোনোদিন দেখেনি। চেনে না কেউ। নাম জানে না।

গণ্যমান্য কেউ? নাকি উটকো লোক? নাকি চোর ডাকাত।

সদর খুলে দিল কে?

সদর খোলা ছিল। সন্ধেরাতেই কে বাড়ির দরজা দেয়? কখন থেকে কত লোকের চলাচল দরজা বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না।

তবু আগন্তুক লোক অন্যের বাড়িতে ঢুকবে কলিং বেল টিপবে না? সাড়া নাড়বে না? কেউ শুনেছে শব্দ?

কেউ শোনেনি।

তবে কি লোডশেডিং হয়েছিল? অন্ধকারের সুবিধে পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে? না লোডশেডিং হল কখন? জলজ্যান্ত আলো জ্বলছে চোখের ওপর। এবং বাড়িতে কত-কত আলো। বারান্দায় সিঁড়িতে চাতালে কম্পাউন্ডে।

এত আলোতেও আগন্তুককে চিহ্নিত করতে পারছ না? ভিড়ের মধ্যে থেকে কী করে গা-ঢাকা দিল? লুকোল কোথায়? কোন ঘরে?

রাজেশ কোথায়?

সে ঘুমুচ্ছে।

এত আগেই ঘুমিয়েছে?

খাইয়ে-দাইয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছে।

তার দিকে তার ঘরের দিকে নজর রেখো।

তা আর বলতে হবে না।

ডাক্তার মুখ গম্ভীর করে বললে হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে। ইমার্জেন্সিতে।

তবে আর কথা কী।

দ্রুত ব্যবস্থা হল। ঠিকঠাক চলে এল এম্বুলেন্স। ঠিকঠাক স্ট্রেচারে তুলে শর্মিতাকে নিয়ে গেল হাসপাতাল।

ঘুমুতে যাবার আগে রাজেশ জিজ্ঞেস করল বাবা কোথায় গেল মা?

ঠাকুমাকে মা বলে রাজেশ।

ঠাকুমা বললেন, হাসপাতালে। সেখান থেকে বাবা ভালো হয়ে আসবে। তুমি ভালো হয়ে ঘুমোও।

ভালো ছাড়া আর যেন কিছু হবার নেই। ছোট পাশ-বালিশ জড়িয়ে রাজেশ পাশ ফিরে শুল। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

এ বাড়িতে চেঁচামেচি হচ্ছে না এমন মুহূর্ত বুঝি ভাবা যায় না। কোনো-না-কোনো হই-চই বা হুড়-হুল্লা লেগেই আছে। হয় হাসাহাসি দাপাদাপি নয় তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি নয়তো দাবড়াদাবড়ি—কামাই নেই কোলাহলের। কিন্তু এখন যেন হঠাৎ সব কাপসা হয়ে গেল।

চলা-বলা কমে গেল। আলোও অনেক নিভে গেল, এখানে-ওখানে। কথাবার্তা সব যেন এখন অস্ফুট, সংক্ষেপে। কারু হাত থেকে একটা বাসনও পড়ছে না মেঝের ওপর। শব্দের রেশন হয়েছে বুঝি। রেশনেও এখন আবার কাট। হাঁচি-কাশিও সব নির্বাসনে গিয়েছে।

একি বাঙ্ক হোল্ড আপ নাকি? দুর্ধর্ষ ডাকাত কি বুকের ওপর গুলিভরা রিভলবার তাক করেছে? সবাই কি সমর্পণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে হাত তুলে?

ঊর্ধ্বে কে আছে যে হাত তুলেছে?

আশ্চর্য এই ডাকাতটাকে কেউ মুখতে পারে না? পারে না পরাস্ত করতে?

কারু যেন কোনো ভাষা জানা নেই কাউকে প্রতিবাদ করবে আপত্তি জানাবে। শুধু যার যেটুকু কাজ সেই নীরবে করে যাচ্ছে। কোথাও কোনো আদল নেই বাদানুবাদ নেই। পরস্পর পরস্পরকে মেনে নিচ্ছে মানিয়ে নিচ্ছে। বাড়িতে ডাকাত।

শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে টেলিফোন বেজেছে। তার মধ্যে মামুলিই বেশি। দু-লাচেই শেষ। একটা বন্ধ রং-নাম্বার।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনও বন্ধ হয়েছে। স্তব্ধতা ক্রমশই জমাট বাঁধছে। রিভলবারের মুখটা হৃৎপিণ্ডের আরো কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে।

এ স্তব্ধতা অপেক্ষা করে আছে কতক্ষণে আর্ত ও তীক্ষ্ণ চিৎকারে তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

এই চিৎকারের জন্যেই রিভলবার।

রিভলবার দেখিয়ে লোকে বলে চুপ করো। এ রিভলবার দেখিয়ে বলছে কাঁদো আর্তনাদ করো। দেয়ালে মাথা কোটো।

চেঁচাবার প্রতীক্ষায় দম বন্ধ করে বসে আছে সকলে।

এম্বুলেন্সের সঙ্গে কেউ কেউ গিয়েছে হাসপাতালে।

মাঝরাতের দিকে একটা ফোন আসতে আরো অনেকে গেল।

হরিতোষ গেলেন না। তিনি ঘুমুচ্ছেন এই বিশ্বাসে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে চাইল না। শর্মিতার মা-ই বিশেষ করে বারণ করলেন। একে বুড়ো হয়েছেন তায় ভগ্ন-স্বাস্থ্য। টাল সামলাতে পারবেন না।

গাড়ি বেরিয়ে যাবার শব্দ শুনে হরিতোষ বিছানায় উঠে বসলেন। খোঁজ নিলেন, রাজেশ এখন কার কাছে আছে। খবর পেলেন, ছোট পিসি পারুলের কাছে আছে। কোনো ভয় নেই—ঘুমুচ্ছে রাজেশ।

ফোন আর আসছে না ঠিক কিন্তু একটা করতে দোষ কী? এখন তো আর নৈর্ব্যক্তিক। কেউ শুনবে না বুঝবেও না কার সঙ্গে কথা কইছেন।

সন্ধ্যেবেলাই একবার ফোন করেছিলেন অনিতাকে, তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল মৃন্ময়ের এই ক্ষুদ্র তিথিতে গোড়ালি লাল ওদের আবার একবার শুভদৃষ্টি হোক।

তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল এই শুভ-দৃষ্টিতেই একটা অঘটন ঘটে যাবে। শমিত ভালো হয়ে উঠবে।

আসলে সবটাই তো ভুল বোঝাবুঝি। ক্ষুদ্র সন্দেহ বৃহৎ প্রতিবাদ। তারপরে জেদ, ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, কর্তৃত্বের বিকার। সঙ্গে সঙ্গে কথা। কথার মত পাজি আর কিছু নেই। কথার ছোঁকা কথার বিছুটি কথার চাবুক। কথা না চণ্ডাল। শেষ কথা মান-নাশ।

শেষ পর্যন্ত শমিত বললে, ও ছেলে আমার নয়। যার ছেলে তাকে দাও গে যাও।

নার্সিং হোম থেকে শ্বশুরবাড়ী এসে স্বাস্থ্যের মজুহাতে মাসখানেক ছিল অনিতা। তারপর একদিন ছেলেকে রেখে চলে গেল।

বলে গেল: যার ছেলে তাকে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি। জানি বড় করলেও ছেলেকে আমি পাব না, আইনে বাপই অধিকারী হবে। তাই সেধে মা খাবার জন্যে মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই।

এতো প্রায় চার বছর হল। এতদিনেও কি রাগ পড়েনি অনিতার?

মেইন সুইচ বোর্ডে কোন দুটো তারের সংযোগ কেটে গিয়েছে। তাই সমস্ত প্রাসাদ—বিরাট প্রাসাদ অন্ধকার। যদি হাতড়ে-হাতড়ে পাওয়া যেত সেই সুইচ বোর্ড টর্চ জেলে সেই খোঁড়া তার। আর সে দুটোর সূক্ষ্ম মুখে ক্ষণিক একটা সংযোগ ঘটাতে পারত তাহলে চকিত আলোয় সমস্ত প্রাসাদ ঝলমল করে উঠত।

সে কাজের জন্যে হাতে ছোট একটা টর্চ নিলেন হরিতোষ। রাজেশই সেই ছোট টর্চ। যদি তার সঙ্গে কথা বলে সেই সংযোগ-বিন্দুটির খোঁজ মেলে।

যে মেসে অনিতা আছে অনেক চেষ্টা করে তার হদিস পেয়েছেন হরিতোষ। টেলি-ফোন করে কনেকশনও পেয়েছিলেন, পরোক্ষে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ও জেনে নিয়েছিলেন কিন্তু খোদ অনিতাকে ধরতে পারেননি। প্রথমবার শুনেছিলেন বাড়ি নেই। দ্বিতীয়-বার রিং হচ্ছে শুনতে পেলেন কিন্তু কেউ ধরল না।

এখন মধ্যরাতে টেলিফোন করতে গিয়ে দেখলেন ডায়াল সাউন্ড নেই।

নির্যাতনও বুঝি এই চরিত্র। ডায়াল সাউন্ড নেই।

হরিতোষ খোলা জানালায় এসে খানিক-ক্ষণ দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। আকাশ দেখলেন তারপর ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন তারপর আলো নিবিয়ে আবার শুলেন বিছানায়।

কিন্তু কান খাড়া করে রাখলেন কখন ফোন বাজে; কিংবা কলিং বেল কিংবা দরজার ধাক্কা।

একটা পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক মাঝারি-গোছা শিক্ষিত বিত্তবান। বাপের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বড় চাকুরে। নিজের নির্বাচনে শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছে একটি সুন্দর শিশু এসেছে সংসারে। কিন্তু কী নিয়তি। কত আকাঙ্ক্ষা কত অহঙ্কার, কত আধিপত্য। কিন্তু নিয়তি তবে একটা কাঁটাবনের উপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে এনে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দুয়ারে।

তবু হরিতোষের বিশ্বাস অনিতা যদি আসত ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়াত এক পাশে আর ওদের দিকে এক পলক দৃষ্টি পড়ত শমিতের তবে কী জানি নিয়তিও নিয়ম মেনে যবনিকার বাইরে গিয়ে দাঁড়াত রঙ্গমঞ্চে শুরু হত নতুন নাটক জীবনের নাটক।

শেষ ফোনটা এল সকালবেলায়।

সকালবেলায় অর্থ হরিতোষের চা-টোস্ট খাবার পর। রাজেশের দুধ খাবার পর।

হ্যালো।

উত্তরে শুধু একটি মাত্র কথা: নেই।

রিসিভারটা দৃঢ় হাতে আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন হরিতোষ।

তারপর কী ভেবে অনিতার মেসে আবার ফোন করলেন।

'আছে? বলুন তার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন করছে।'

বোঝা গেল শ্বশুরবাড়ি শুনেই অনিতা এগুচ্ছে না।

উত্তর এল: কী বলবার আছে বলুন।

বলবেন তার স্বামী আজ সকালে হাসপাতালে মারা গেছে। যদি পারে তো যেন একবার আসে।'

পারলে ডাকলেন বাজেশ কী করছে?

'বাগানায় বল নিয়ে খেলছে।'

ইচ্ছে হল একবার দেখবেন হরিতোষ: পাশের বাড়ীর ছেলে সমবয়সী সুজনের সঙ্গে খেলায় মেতেছে।

ঠাকুমার কথা জিজ্ঞেস করেনি?

করেছিল—মা কোথায়? বললাম, হাস-পাতাল থেকে ভালো করে তোমার বাবাকে আনতে গেছে। তাই মেনে নিয়েছে।'

ভালো হওয়াটাই বুঝি একমাত্র মানবার মত:

ছোট হাতে একেকটা বল ছুঁড়ছে রাজেশ তা তার অভীষ্ট দূরত্বে যেতে পারছে না তবু আনন্দে সে হাততালি দিচ্ছে। পারছে না তবুও তার আনন্দ।

দেয়াল ধরে নিজেকে সামলালেন হরিতোষ।

সত্যিই একটা বল ছুঁড়ল রাজেশ ধরতে পারল না। তবুও তার খিলখিল হাসি। ধরতে পারুক কি না পারুক আনন্দ তার চোখ-মুখে হাতের মুঠোর মধ্যে। পড়ে যাচ্ছে তবুও তার হাসি। সবটাই তো খেলা।

কাঁদবার মানে নেই।

দেয়ালের দিকে মুখ করে আস্তে হরিতোষ বললেন ছেলেটা অনাথ হয়ে গেল।

পারুল বুঝি শুনতে পেল কথাটা। তার বুক ভেঙে দু চোখ ছাপিয়ে কান্না উথলে উঠতে চাইল। কিন্তু না কাঁদবার উপায় নেই। কাঁদলেই রাজেশ কৌতূহলী হবে আর কৌতূহলই বিপদ বাধাবে। নিজেকে তাই সামলাল পারুল। স্বয়ং রাজেশের সঙ্গে খেলায় মেতে সেও হাসল এক ফোঁটা

মৌসুমী প্রকাশনী থেকে

কালকূট রচনা সমগ্র

প্রকাশিত হচ্ছে

সম্পাদনা: শান্তিময় ঘোষ বিশেষ সূচিপত্র। অঙ্কন: সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

'কালকূট'-এর এযাবৎ প্রকাশিত যাবতীয় রচনা আনুমানিক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা দশ টাকা করে জমা দিয়ে গ্রাহক হতে পারেন। গ্রাহকরা শতকরা কুড়ি ভাগ কমিশন পাবেন। প্রতিটি খণ্ডের আনুমানিক মূল্য হবে কুড়ি টাকা। এক একটি খণ্ড প্রকাশিত হলে, গ্রাহকরা বাকি টাকায় খণ্ডটি সংগ্রহ করতে পারবেন। শেষ খণ্ড জমা দেওয়া টাকাটি ফেরৎ পাবেন—অর্থাৎ শেষ খণ্ডটি গ্রাহকরা পাবেন মাত্র দু'টাকায়। যে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রাহক নেওয়া হবে। পুস্তক ব্যবসায়ীরা বিশেষ সুবিধার জন্য যোগাযোগ করুন।

মৌসুমী প্রকাশনী
১০।২এ কলেজ রো। কলকাতা ৯

এজেন্ট। নবারুণ
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ৭৩

ঘরে এসে খবরের কাগজে চোখ বুলোলেন হরিতোষ। দাড়ি কামালেন। তারপর বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়েও একবার খুঁজলেন উৎসুক হয়ে।

না, অনিতা আসেনি।

কিন্তু আইনত সে তো এখনও শমিতের স্ত্রী। তাদের বিয়ের তো আইনত কোনো ছেদ হয়নি। স্ত্রী হিসেবে তার তো ধর্মীয় কৃত্যও কিছু করবার আছে।

মানতে বয়ে গেছে তার।

হরিতোষ ধুতি ছেড়ে সুট পরতে শুরু করলেন।

'এ পোশাক যাবা?' পারুল এসে দাঁড়াল।

জুতোয় ফিতে আঁটতে আঁটতে নিচুই বাঁধলেন হরিতোষ। চকিত দিয়ে তাকালেন। বললেন, 'অফিস আছে।'

'অফিস কী যাবা।'

'সাড়ে দশটায় জরুরি মিটিং। না গেলেই নয়।'

'সে কী হাসপাতালে যাবে না?'

কী হবে গিয়ে?' গলার কাছে টাইটা একবার টেনে হরিতোষ বললেন, 'কাঁদবার সময় নেই।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু দূর এগিয়ে আবার ফিরলেন হরিতোষ। গাড়ি অবশ্য হাসপাতাল সেজন্যে নয় টাকসি করেই যাবেন। পারুলকে একটা কথা ভালো করে বলে যাওয়া দরকার। সে আর কিছুই নয় রাজেনকে চোখে-চোখে রাখিস। সে আর বলার দরকার আছে কি? রাজেনকে দেখবার জন্যে একটা আয়া একটা চাকর—আর পিসিদের তো সে চোখের মণি। বলার দরকার দেখি না।

আবার রাস্তায় নেমে পড়লেন হরিতোষ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার বাড়িটা। দেখলেন যে দুর্ধর্ষ প্রাতিহায়ী বলয় নিয়ে বাড়িটা আক্রমণ করেছিল সে পরাজিত হয়ে চলে গিয়েছে। কেউ কাঁদছে না।

কাঁদবার মানে নেই। কাঁদবার উপায় নেই। কাঁদবার সময় নেই।

যখন অনিতা এল তখন দুপুর প্রায় বারোটা।

ভেবেছিল একটা বিরাট জনতা দেখবে। বড়লোকের শোকও তো দেখবার মত দেখবার মত—কত না জানি গাড়ি কত না জানি মালা কত না জানি ফটোগ্রাফার। কত না জানি কৌতূহলী পথের মানুষ।

ভেবেছিল ভিড়ের মাথা গা-ঢাকা দিয়ে উঁকি মেরে এক নজর দেখে নেবে। ঘটা করে শোকের বিজ্ঞাপন দিতে একবার তাকে ফোন করা হয়েছে। মজাটা একবারটি দেখে আসা মন্দ কী।

অনিতা কল্পনাও করতে পারেনি এমনটি দেখতে পাবে।

লোক নেই জন নেই সাড়া নেই হাহাকার নেই—একেবারে একটা স্তব্ধ পুরী। কে বলবে এ বাড়ীর বড় ছেলে সুস্থ-সমর্থ কবেক ঘণ্টা আগে যার আত্মীয় সে আজ সকালবেলায়ই মারা গেছে।

বাইরে চাকর-বাকি যারা আছে সব নতুন মুখ। সাহস করে একজনকে জিজ্ঞেস করল অনিতা: 'এ বাড়ির বড় ছেলে মারা গেছে না?'

'হ্যাঁ বড় দাদাবাবু। কী যা বরেস!'

'কোথায় মারা গেছে?'

'হাসপাতালে। পি-জিতে।'

'ডেড বডি বাড়িতে আনা হবে না?'

'নাই।'

'কেন?'

'দাদাবাবুর ছোট একটা ছেলে আছে সে ডেড বডি দেখলে কান্নাকাটি শুরুলে দারুণ ভড়কে যাবে তাই জন্যে।'

'ও।'

একটি প্রৌঢ়া সি বিষয়টিকে আরও প্রাঞ্জল করল: ছেলেটার মা নেই, মামার বাড়ী নেই, কোথায় সবাবে বলুন, তাই এই ব্যবস্থা। হাসপাতাল থেকেই সোজা শ্মশানে যাবে।'

অনিতার বুকের ভিতরটা যন্ত্রণায় টন-টন করে উঠল। কিন্তু যন্ত্রণা নিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। সেই যন্ত্রণাই তাকে বাইরে টেনে এনে রাস্তায় ঠেলে দিল ছুটিয়ে দিল।

ট্রামে করে সোজা চলে এল সে দীপকের অফিসে।

স্লিপ পাঠাতেই। স্লিপে নাম ইংরিজিতে লিখল না বাংলায় লিখল তার নামের বানান করল ন-এ দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে অনীতা।

ঘরে ঢুকতেই দীপক আনন্দে উথলে উঠল: তুমি? হঠাৎ? নামের এই নতুন বানান?'

উজ্জ্বল কণ্ঠে অনিতা বলল, 'আমি আগে দুটো ই-কার ছিলাম—অনিতা মানে যে গত হয়নি, যে এখনো বর্তমান—এখন আমি গত হয়েছি অতীত হয়েছি—তাই আমি দীর্ঘ ই-কারের অনীতা—মানে যাকে আনা-কর্তব্য সে নিজের থেকে এসেছে।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার—শত্রুনিপাত হয়েছে।'

'শত্রুনিপাত!' চমকে উঠল দীপক: 'তার মানে?'

'শমিত চক্রবর্তী আজ সকালে মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ পত্তর পেয়েছে। আজ আমি শাপ-মুক্ত। কালকেই আমাদের বিয়ে হতে পারে। ভালিড বৈধ বিয়ে।'

'তাই বুঝি বানান মত ন-এ দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে মুকুট পরেছ। কিন্তু দীপকের চোখে যেন আনা রকম সুর বাজল 'ভদ্রলোক আজ সকালে মারা গিয়েছে জানলে কী করে?'

'ওদের বাড়ি থেকে ঠাট করে আমাকে জানিয়েছে হাসপাতালে মারা গেছে।'

'হাসপাতালে গিয়েছিলে?'

'দূর! হাসপাতালে যাব কেন? রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়িটা একটু দেখে এলাম।'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম শূন্য বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। ঐ বাড়ি থেকে আমাকে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল—এখন দেখ ভাগ্যের প্রতিশোধ কি বেরিয়ে গেল ঐ বাড়ি থেকে।'

'ওর মৃত্যুতে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই হচ্ছে। তোমার হচ্ছে না? কত বড় শত্রু। ও আমাকে কত মেরেছে। শারীরিক কত পীড়ন করেছে গায়ের সব দাগ তো তুমি দেখনি—মানসিক কত ভোগান্তি কত যন্ত্রণা দিয়েছি—'

'শত্রু-শত্রু তো নিশ্চয়ই। তবু শত হলেও একটা মানুষ তো।'

'মানুষ? একটা ঘৃণ্য কীট। আমাকে নষ্ট বলছে অথচ ডিভোর্স করছে না আমার-তোমার বিয়ের পথে পাঁচিল তুলে দিয়েছে। সে বাধা দূর হয়ে গেল আনন্দ হবে না?'

সবই সত্য কথা। তবু আজকের দিনে এ মুহূর্তে এসব কথা না তোলাই ভালো নয় কি? মনে-মনে মানসেটা হারেছে।'

অনিতা হঠাৎ চুপ করে গেল।

তাকে কেমন যে অন্যমনস্ক শঙ্কাতুর মনে হল দীপকের। ক্ষণ না থাক একটু দয়া থাকতে দোষ কী। তাহলে বুঝি দীপকের মৃত্যুতেও শোক করবে না।

'তাই বলে আজই একেবারে অফিসে? আসবার কী হয়েছিল?' দীপক কী রকম যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল: 'দুদিন পর বাড়িতে এসেও বলা যেত।'

অনিতা উজ্জ্বল মুখে বলল 'সুখবরটা যত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় তাই তোমায় অফিসেই ছুটে এলাম।'

'সুখবর! তোমার একটুও কাঁদতে ইচ্ছে করল না?'

'কাঁদব?'

'শত হলেও এক কালের কাছের লোক চোখের সামনে সদা-সদা মরে গেল একটু কাঁদবে না?'

'কাঁদব! কাঁদব কোথায়?' চোখ ছেড়ে উঠে পড়ল অনিতা দরজার দিকে এগোলো। বলল, 'কাঁদবার জায়গা নেই।'

CENTRAL LIBRARY

তোষামোদের রস

তুষারকান্তি ঘোষ

তোষামোদের চেয়ে মিষ্টি রস আর কি আছে? সেই জন্যে আগেকার বড়লোকেরা মোসাহেব পুষতেন। যদিও মোসাহেবদের পেশা ছিল মনিবের খুশমত জল উঁচু জল নিচু বলা, কিন্তু এই কাজ যোকর মত করা চলত না। খোশামোদেরও একটা ধরা আছে। যে মোসাহেব এই ধারা মেনে চলতেন তিনি কৃতকার্য হতেন। মনিবের মন যোগাতে হবে—এবং সে-কাজ বুদ্ধিমানের মত করা চাই। একেবারে খোলাখুলিভাবে তোষামোদ করতে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। এক বড়লোকের জন্য গোপাল ভাঁড়ের 'মোসাহেব বাছাই' বোধহয় সকলেরই জানা আছে। গোপাল ভাঁড় একজন উমেদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন হে, তুমি এ-কাজ পারবে?' সে বলল, 'কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব।' গোপাল ভাঁড় বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন পারবে না।' তাতে মোসাহেবীর উমেদার বললে, 'সে কি মশাই, আমি পারব না তো পারবে কে? এই দেখুন আমার কত সার্টিফিকেট রয়েছে।' গোপাল ভাঁড় তাকে বাদ দিলেন এবং পরের উমেদারটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। পরের মোসাহেবটিকে যখন বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, তুমি বোধহয় পারবে না।' সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। বোধহয় পারব না।' গোপাল : পারবেই না না কেন? আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। মোসাহেব : আজ্ঞে, সে তো ঠিক কথা, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? চেষ্টা করলে পারবই না কেন? বলা বাহুল্য, গোপাল ভাঁড় একেই মনোনীত করেছিলেন।

এই সম্বন্ধে আমার এক মামার কথা মনে পড়ে। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন এবং আমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলতেন যে শুনলে মনে হবে যে, আমার মত বিদ্বান-বুদ্ধিমান ও ভালো ছেলে পৃথিবীতে আর নেই। আমি তখন বয়সে যুবক মাত্র। সত্যি বলব, আমার এসব কথা শুনতে ভালোই লাগত। তবে এক এক সময় এমন নির্জলা মিষ্টি কথা বলতেন যে আমার শুনতে লজ্জা করত। একদিন বেকায় মত এক কাজ করে বসেছি। মামা এসে আমার মুখের ওপর বলতে লাগলেন, 'বাবাজী, কাজটি তো ভালোই ম্যানেজ করেছ বলতে হবে।' আমি : বলো কি মামা? সবাই তো বলছেন, আমি অকাট-মূর্খের মত কাজ করেছি—আর সে-কথা আমি নিজেও তো জানি। মামা : তুমি সে বাটাদের বিশ্বাস কর? তুমি এই শক্ত কাজটা যেভাবে করেছ তা কেউ করতে পারত না। তুমি কেরকম বিদ্বান-বুদ্ধিমান—

আমি : তোমার খোসামোদের জ্বালায় আর বাঁচি না। আমার মুখের ওপর এসব কথা বলতে লজ্জা করে না?

মামা : কেন বাবা, লজ্জা করবে কিসের জন্যে? খোসামোদ করব, মুখের ওপর করব। কোনো বাটাকে কি তোয়াজ করি? মনিবকে চুমরে দেওয়াও আর এক রকমের তোষামোদ। যাকে চুমরে দেওয়া হল, তিনি অহঙ্কারের গরমে অনেক সময় এমন কাজ করে বসেন যাতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

হাটখোলা নতুনবাড়ির এক নিকট-আত্মীয় একবার গরমে ভিন্ন বিপদে পড়েছিলেন। একটা কথা এখানে বলে রাখি যে এইসব

বন্ধুলোকেরা সবাই যে সেক্ষ খুবই ছিলেন কিংবা নির্বোধ ছিলেন তা নয়। তবে তোষণের পরম্ভ অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসতেন। অবশ্য সেটা শুধু অহঙ্কারের ফল।

একদিন তিনি friend-দের নিয়ে বৈঠকখানায় বসে গল্প করছেন। friend'রা মানে শুধু বন্ধু নয় তার ভেতরে মোসাহেব আছেন, সাহায্যপ্রার্থী আছেন, উমেদারও আছেন। তাঁরা যেকোই বর্তা-বন্ধুর মন জুগিয়ে কথা বলেন। কেউ সেদিন সন্ধ্যেবেলা কোন সাবজেক্ট থাকে পাঞ্চেন না যার ওপরে দুটো মন-জোগানো কথা বলতে পারেন। এমন সময় মুদিকের আগমন হল।

একজন গাকর কতকগুলি পান ও একটু চুন দিয়ে গেল। কর্তাবাবু দুই খেকে দুটি পান মুখে দিয়ে আঙুলে করে একটু চুন নিয়ে দাঁতে কষলেন। তৎক্ষণাৎ একজন বলে উঠলেন, 'বাঃ, কর্তাবাবু তো বেশ চুন খেতে পারেন।' কর্তাবাবু শুনে চাকরকে চিৎকার করে ডাকলেন, 'হরে—'

হরে ছুটে এসে বলল 'আজ্ঞে কি চাই?'

কর্তা : যা দিকিন, খানিকটা চুন নিয়ে আয়। চলে দৌড়ে গিয়ে খানিকটা চুন এনে পানের বাটায় রাখল।

কর্তাবাবু চটেই লাল : 'এইটুকু চুন নিয়ে এসি যে সভা। তোকে চুন বাড়তে কে বলেছে? তোর বাবার চুন বাড়?'

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেঁকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষীরাজ বংশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর সেকাল একাল থেকে)

কলকাতা/রাজনারায়ণের কলমে

রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ার। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাড়ী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্থর। দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল। তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের মুঠি। এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

MJ

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

হয়ে ছুটে গিয়ে বেশ খানিকটা চুন এনে দিলে। কর্তাবাবু সমস্তটা চুন মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে, আঙুল চাটতে চাটতে সেই মোসাহেবটিকে বললেন, 'এটা তুমি ঠিক বলেছ আমি একটু চুন বেশী খাই বটে। এর ফলে কি হয়েছিল সে-কথা না লিখলেও চলে। সেই রাত্রেই ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল এবং তিন মাস মুখের ঘায়ের জন্যে খাওয়া-দাওয়া একরকম বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

আর এক রকমের মোসাহেবী দেখেছি, তাতে কিন্তু মোসাহেবের চেয়ে বড়-লোকটিরই credit বেশী ছিল। তিনি বেন জেদ করে তাঁর মনের কথা মোসাহেবদের মুখ থেকে টেনে বার করতেন। এটা তাঁর স্বভাবগত আর্ট ছিল। তিনি হয়তো অজ্ঞাতসারেই এই কর্মটি করতেন। বড়-লোকটি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকাকে অনেক ব্যাপারে সাহায্য করতেন। আমার কাকা মতিবাবুর কথায় আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি, তিনি বেশ দরবার করে বসে আছেন, নানারকম মোসাহেবী গল্প চলছে। আমি যেতেই তিনি খুব আদর করে আমায় বসালেন এবং আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগলেন। তাঁর গল্প করবার বেশ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলুম যে তিনি কোন কথা শেষ করেন না। কোনো একটা আলোচনার শেষে এসে তিনি তাঁর হাত দুটি নেড়ে নেড়ে চোখের এমন একটা ভঙ্গী করেন, যাতে তাঁর বন্ধুদের বলতেই হয়, 'আজ্ঞে, সে তো বটেই।' তখন থেকে আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম যে আলোচনাই হোক—তিনি যখন তাঁর কথা শেষ করে আনেন, হাত ও চোখের ভঙ্গীতে যেন জিজ্ঞাসা করেন, আমি ঠিক বলছি কিনা? সেই ভদ্রলোকদের তখন বলে উঠতেই হয়, 'আজ্ঞে সে তো ঠিকই; আপনি তো ঠিক কথাই বলছেন।' একটা উদাহরণ দিয়ে বলি।

একবার কথা উঠল, কোন জল শরীরের পক্ষে সবচেয়ে ভালো—কলের জল, পুকুরের জল নদীর জল, না কুয়োর জল? নানা জনে নানা মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু জমিদারবাবুই সব বিষয়ে ফাইনাল মতের কর্তা। তিনি নানারকম জলের উপকারিতা বর্ণনা করে শেষে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'যাই হোক, আমরা হিন্দু, আমাদের কাছে গঙ্গাজলই—বলে হাত ও চোখের ভঙ্গী করে যেন জিজ্ঞাসা করলেন গঙ্গাজলই সব জলের চেয়ে ভালো, না?'

আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলুম, 'আজ্ঞে সে তো বটেই।' তিনি কিন্তু আমাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করেননি যে, গঙ্গাজল ভালো কিনা। এর পরে আরও যে কতবারই আলোচনা হল তিনি শেষে আমার দিকে হাত ও চোখের ভঙ্গী করে যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আর আমি বলতে লাগলুম, 'আজ্ঞে, সে তো ঠিক কথা...এতে আপনি সত্যি কথাই বলছেন।...এর ওপরে আর কি কথা আছে?' ইত্যাদি। একটু বাদেই আমার চমক ভাঙল। আমি তো বেশ মোসাহেব বনে গেছি। আমিও তো অন্যের মতো তাঁর প্রত্যেকটি কথা সমর্থন করছি। তিনি তো কোন কথা শেষ করছেন না। তিনি তো চোখ দিয়েই জিজ্ঞাসা করছেন আর আমি বলে উঠছি, 'আজ্ঞে সে তো ঠিকই বটে।'

মনে মনে ভাবলুম, আমি এ কি করছি। আমি স্থির করলুম যে, এর পর তিনি যতই আমাকে চোখের আবেদন জানান, আমি চুপ করে থাকব। তারপরের গল্পটুকু শেষে যখন তিনি আমাকে হাত নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন বলুন?' আমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলুম। আমার কাছে সমর্থনা না পেয়ে তাঁর উচিত ছিল মন্তব্যটা নিজেই শেষ করে দেওয়া। কিন্তু তাঁর ব্যারাম তো মজ্জাগত। তাই কথার শেষে অন্য লোকে হ্যাঁ, হ্যাঁ—হ্যা তো বটেই' না বললে চলে কি করে? তিনি তখন করলেন কি—ঐ বর্ণনা আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করলেন এবং শেষে বললেন, 'কেমন ঠিক বলছি কিনা?' এবারও আমি কোন জবাব না দিয়ে শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। তিনি এইভাবে দু-তিনবার চেষ্টা করে আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে অবশেষে প্রসঙ্গটা পরিত্যাগ করলেন। অবশ্য আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমার একদিনের 'ওষুধে' তাঁর এ-ব্যারাম সারেনি। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, এই ভদ্রলোকটি অত্যন্ত উদার ও আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন। এবং মানুষ হিসাবেও অতি উত্তম ছিলেন। এর কিছুদিন পরে এই ভদ্রলোক তাঁর বাগানবাড়ীতে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। বিকেলবেলা সেখানে গিয়ে দেখি যে চায়ের টেবলে বসে আছেন এবং সামনে একটা পেতলের গামলায় অনেক বড় বড় রসগোল্লা রসে ভাসছে। আমি যেতেই আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। সেখানে আগে থেকেই সিঙ্গাড়া, কেক, নিমকি ইত্যাদি সাজানো ছিল। তিনি আমায় বললেন আপনি এসব খান—কিন্তু আপনি বাগবাজারের লোক আপনাকে এমন জিনিস খাওয়াব যে আপনি তারিফ না করে পারবেন না। তারপর চা দেবে।'

আমার নোনতা খাওয়া শেষ হতেই তিনি আমার পাতে দুটি রসগোল্লা দিলেন। এ-রসগোল্লা সেকালের বাগবাজারের নবীন ময়রার বিখ্যাত রসগোল্লা। এ-রসগোল্লা যে না খেয়েছে, কিছুতেই সে এর আস্বাদ বুঝতে পারবে না। আমি রসগোল্লা খাচ্ছি, এবং তিনিও গামলা থেকে রসগোল্লা তুলে তুলে মুখে দিচ্ছেন। আমার বেশ মনে আছে, আমি তিনটির বেশী রসগোল্লা খেতে পারিনি। কিন্তু দেখলুম তিনি অন্য-মনস্কভাবে সব রসগোল্লা খেয়ে ফেললেন। এবং শেষকালে গামলার যেটুকু রস পড়ে-ছিল, সেটাও চুমুক দিয়ে খেলেন। এই সময়ে চাকরে চায়ের জিনিসপত্র নিয়ে এল—অর্থাৎ টী-পট, দুধের জগ এবং চিনির পাত্র। আমি আপনমনে নিজের জন্যে চা ঢেলে নিচ্ছি, এমন সময় জমিদারবাবুর চিৎকার। চাকরকে বললেন 'বদমাস, আমাকে খুন করবি? আমার সাকারিন কই? জানিস না ব্যাটা, আমি ডাইবিটিস-এ ভুগছি, চায়ের সঙ্গে সাকারিন খাই।'

চাকর তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাকারিন এনে দিলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাকারিন তাঁকে বাঁচাতে পারেনি কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার আরও বিচিত্র কাহিনীতে আমি মামাতো ভাই বেদানার কাহিনী

কালীপদ সরকার

কৃষ্ণকথা চিরন্তনী

(১২-০০)

'...কৃষ্ণলীলা কাহিনী পুরাতন হলেও বর্ণনা সৌকর্যে এবং ভাষালালিত্যে বইখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনকে আকৃষ্ট করে রাখে। ধর্মগ্রন্থ হলেও উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য এবং ঘটনাবিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বজনীন প্রকৃতিটি সর্বত্র পরিস্ফুট। বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই বইখানি আমার কাছে ভাল লেগেছে এবং আমি এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।'

শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী

রূপা কলকাতা-৭০০ ০১২

লিখেছি। বৈদ্যনাথ অত্যন্ত সরল ও গোঁয়ার ছিল, তাকেও বৈদ্যনাথ তুমি ছাড় এ-কাজ আর কেউ পারবে না—' বললে সে যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারত।

আমাদের গ্রামের পুকুরে একবার আমি কটা হাঁস মারি। পুকুরটা শালুকে ভরা ছিল এবং তাতে অনেক বিষধর সাপ থাকত। তেমনই মরা-হাঁস আনতে চায় না। আমি বৈদ্যনাথকে বললুম, কি হে, তুমিও ভয় পাচ্ছ? তোমার মত সাহসী ছেলে এ-গ্রামে আর কে আছে? তারপর বৈদ্যনাথ সেই পুকুরে সন্ধ্যেবেলায় নেমে কিভাবে সাপের মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছিল সে-কথা বিস্তৃতভাবে ঐ কাহিনীতে লেখা আছে। শীত গ্রামে খুঁজলেই এমন লোক পাওয়া যাবে, যাঁকে চুমুক দিলে তিনি যমেরও সম্মুখীন হতে পারেন। এইসব লোকের একমাত্র বাসনা হচ্ছে এই যে, লোকে তাদের বাহাদুর বলবে। এরা কিছুই চান না একমাত্র বাহবা ছাড়া। এই বাহবাটুকুর জন্যে তাঁরা কি না করতে পারেন। বহুদিন আগে 'কঙ্কাবতী'র লেখক স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এইরূপ স্বভাবের এক ভদ্রলোক ছিলেন। সব লোকে তাঁকে 'কর্তা' বলত। বয়স বছর চল্লিশ, মুখ গম্ভীর—অহংকারে মটমট করছে। চুমকে দিলে তিনি না পারেন এমন কাজ নেই। একবার পৌষ মাসে গ্রামে ভয়ানক শীত পড়েছে; সবাই হি-হি করে কাঁপছে। গ্রামের ছেলেরা একদিন রাত আটটা-নটার সময়ে এক ভদ্রলোকের দাওয়ায় বসে গল্প করছে এবং সামনে একগাদা আগুন রেখে সবাই তাপ নিচ্ছে। কিন্তু শীত এমন প্রচণ্ড যে গাদার আগুনেও কারুর শীত ভাঙছে না। এমন সময়ে কর্তা সেখানে উপস্থিত হলেন। কর্তাকে দেখে ছেলেরা কর্তার জন্যে জায়গা করে দিলে যাতে তিনি সেখানে বসে আগুন পোয়াতে পারেন। কর্তা আগুন পোয়াচ্ছেন, এমন সময় একটি ছেলে বলে উঠল 'দেখ ভাই, আমরা সকলেই শীতে কাঁপছি কিন্তু কর্তার শীত নেই। কর্তা যদি মনে করেন, তাহলে এখনই ঐ নামানের পানা পুকুরটাতে ডুব দিয়ে আসতে পারেন।' কর্তাকে ফুলিয়ে দিলেই তিনি সব কাজ করতে প্রস্তুত। ছেলেদের কথা শুনে কর্তা হাকথাই সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গামছা আছে?'

ছেলেরা বললে, 'আছে বইকি!' তখন সেই বাড়ির একটি ছেলে দৌড়ে বাড়ির ভিতর থেকে গামছা নিয়ে এল।

কর্তা গামছা নিয়ে পুকুরের দিকে চললেন। পুকুরঘাটে গিয়ে গামছাটি পরে পানাপুকুরে তিনটি ডুব দিলেন। ছেলেরা হাততালি দিয়ে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগল। কর্তা ঘাটে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা করেও কাঁপুনিটাকে নিবারণ করতে পারলেন না। পাছে ছেলেদের কাছে বাহাদুরিটুকু যায়—তাই বললেন, দেখ, এ কাঁপে, কিন্তু শীত করে না।'

আর একদিন কর্তা গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, দেখলেন ছেলেরা একটা মৌচাক ভাঙতে চেষ্টা করছে। পাকাটি জেলে, শুকনো খড়ে আগুন ধরিয়ে, ধোঁয়া দিয়ে ছেলেরা কত করে মৌমাছি তাড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মৌমাছিরা তাদের বাসা ছাড়বে কেন? তারা উড়ে[illegible], বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে না। এমন[illegible] কর্তার আগমন। কর্তাকে দেখে একটা ছেলে বলে উঠল, দেখ ভাই, আমরা এত কাণ্ড করেও মৌমাছি তাড়াতে পারছি না। কিন্তু কর্তা যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে এখন পাঁচিলে উঠে হাত দিলে চাকটি ভেঙে আনতে পারেন।'

গম্ভীর আওয়াজে কর্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'মই আছে?'

ছেলেরা বলে উঠল, 'আজ্ঞে আছে বইকি।' অমনি একজন ছেলে দৌড়ে বাড়ি থেকে একটা মই নিয়ে এল। কর্তা মই দিয়ে পাঁচিলে উঠলেন, হাত দিয়ে চাক ভাঙলেন। তারপর চাকটি হাতে করে আস্তে আস্তে নেমে আসলেন। চাক ভাঙার সময়ে মৌমাছিরা তাঁকে ছেঁকে ধরেছিল ও সর্বশরীরে হুল ফুটিয়ে জর্জরিত করে দিয়েছিল। ভীষণ জ্বলুনি, কিন্তু কর্তার মুখে রা নেই। ভাবটা এমন যেন শরীরে কোন জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। কর্তার মুখে অহংকারে ফুলে উঠেছে। ছেলেরা সব কর্তাকে ঘিরে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হল এই, মৌমাছির হুলে কর্তার সর্বশরীর দাগড়া-দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল। কর্তা দেখলেন, সর্বনাশ, বাহাদুরি তো যায়! যন্ত্রণা চেপে রেখেছেন কিন্তু ফুলো ঢাকবেন কি করে? কাজেই নিজের শরীরের দিকে চেয়ে কর্তাকে ছেলেদের বুদ্ধিমান দিতে হল, 'এ ফোলে, কিন্তু জ্বলে না।'

কথাশিল্প সম্ভারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	।। ১৪-০০ ।।	রবীন্দ্রসৌন্ডব কাব্য
জীবেন্দ্র সিংহরায়	।। ১৫-০০ ।।	কল্লোলের কাল
বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী	।। ১৬-০০ ।।	ভারতীয় সঙ্গীতকোষ
কানাই সামান্ত	।। ৬-৫০ ।।	শ্রীনন্দলাল বসু
রণজিৎ সিংহ	।। ৪-৫০ ।।	ন্ গুয়েন ভান বয় (অনুঃ)
অরুন্ধতী সান্যাল	।। ৬-০০ ।।	ভিয়েতনামের স্পন্দন (অনুঃ)
সাধন ভট্টাচার্য	।। ৬-০০ ।।	আনাড়ী এক হাতি শিকারী
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	।। ৬-০০ ।।	নগ্ন ঈশ্বর
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	।। ৮-৫০ ।।	কিংবদন্তীর নায়ক
কমলকুমার মজুমদার	।। ৫-৫০ ।।	অন্তর্জলী যাত্রা
কমলকুমার মজুমদার	।। ৩-৫০ ।।	নিম অন্নপূর্ণা
অসীম রায়	।। ৫০০ ।।	রক্তের হাওয়া
বিজন ভট্টাচার্য	।। ৫-৫০ ।।	সোনালী মাছ
নীলমণিকুমার ভদ্র	।। ৪-৫০ ।।	আরণ্য প্রেমকথা
প্রশান্ত দেব	।। ৪-৫০ ।।	কখনো মেঘ
প্রশান্ত দেব	।। -০০ ।।	নায়িকা সংবাদ
নীহারিন সেন (নব সংস্করণ) (যন্ত্রস্থ)	।।	নিষিদ্ধ দেশের ঘুম ভাঙছে

কথাশিল্প ।। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ট্যাকসো

বিমল মিত্র

সকলের শেষে বদ্রীদাস আগরওয়ালার ডাক পড়লো। হাকিম সাহেব তাকেও ডেকে পাঠালেন। বদ্রীদাস আগরওয়ালা কারবারী লোক বাজারের পূর্ব কোণে বদ্রীদাসজীর কারবার। মস্ত বড় গুদাম। গুদামের ভেতরে টন টন ছোলা তিসি গম চাল সরষের বস্তা সাজানো। ওয়াগন থেকে রেলের সাইডিং-এ মাল আনলোড করে তার গুদামে এসে গাদা হয়। তারপর মাল গুনে হিসেব নিকেশ করে গুদামে ঘরের দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে চাবিটা কোমরের ঘুনসিতে ঝুলিয়ে দেয়। তখন হাসি বেরোয় বদ্রীদাস আগরওয়ালার মুখে। তারপর হাসি দেখে কেউ কেউ অবাক হয়। বলে—কী ব্যাপার শেঠজী হাসছেন কেন হঠাৎ। বদ্রীদাসজী বলে—শালা ব্যাওসার বারোটা বাজিয়ে গেল—। কেন? বারোটা বাজলো কেন শেঠজী? বদ্রীদাস আসলে প্রাণখোলা লোক। বলে—বারোটা বাজবে না তো কি ছটা বাজবে মোশায়? শালা ট্যাকসো দিতে দিতে জান নিকলে গেলে ব্যাওসা কী রকম চলবে? শালা রেলের-বাহুরা ট্যাকসো নেবে গাড়ির গাড়োয়ান ট্যাকসো নেবে কুলি-মজদুর ভি ট্যাকসো নেবে। এত টাকা নিলে বারোটা বাজবে না? সত্যিই প্রাণখোলা মানুষ বদ্রীদাস আগরওয়ালা। মুখে কিছু আটকায় না বটে, কিন্তু কথাগুলো খাটি কথা জানবেন—তা বটে এই জেলায় আরো কারবারী আছে। বদ্রীদাসজী তাদের মত নয়। বাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে রুস্তমজীর পেট্রল ডিপো আছে বোস কোম্পানীর অয়েল মিল আছে হনুমান পোদ্দারজীর রাইস মিল আছে মনোহর সিং-এর মোটর ওয়ার্কশপ আছে। ছয়েকরকমের কারবার ছড়ানো আছে সারা শহরে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয় বছরে। কিন্তু বদ্রীদাসজীর মত খাটি কথা বলে না। এক-একজন বছরে বছরে নতুন নতুন গাড়ি কিনছে আর পরের বছরেই গাড়ি বদলাচ্ছে। এক-একজনের নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে—হাল ফ্যাশানের কনক্রীটের বাড়ী। ড্যাম্প-প্রুফ আর্থকোয়েক-প্রুফ বাড়ি সব। বোস কোম্পানীর প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাড়িটা তো এবার কন্ডিশন্ড করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। প্রাণকৃষ্ণ বসুর মেয়ের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে ডিনার-সেট কিনে আনা হলো বরকে দেবার জন্যে। সেই প্রাণকৃষ্ণ বাবুই কথায় কথায় বলেন—না মশাই এবার বিজনেস গুটিয়ে ফেলতে হবে—কিছু প্রফিট থাকে না আজকাল—হনুমান পোদ্দারজীর ছ মাস পরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বিকেলের দিকে দুই ওঠে ঘি খেলে অম্বল হয়। শেষকালে তিনি সুইজারল্যান্ডে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এলেন। আর সুইটজারল্যান্ডে যখন একবার খরচপত্র করে যাওয়া তখন কাছাকাছি দেশগুলোও দেখে আসতে হয়। সুতরাং লন্ডন নিউইয়র্ক রোম বার্লিন প্যারিস—কিছুই আর বাদ দিতে পারেন নি। এখন আবার দেশে ফিরে এসে সব থাকছেন আর হুজুর করছেন। কিন্তু তাঁরও মুখ ভার। বলেন—না সার, গভর্নমেন্টের জ্বালায় আর ব্যবসা করা দেখছি হয়ে উঠবে না। আর রুস্তমজী? রুস্তমজী এই সেদিন পেট্রল ডিপোটা খুললেন পাঁচ বছরও হয়নি। এরই মধ্যে একটা ফরেস্ট কিনে ফেলেছেন সি-পেতে। দরকার হলেই প্লেনে করে যান সেখান আর পরদিনই ফিরে আসেন। বলেন—ট্যাকস দিতে দিতেই গেলাম মশাই। এরা দেখছি আর ভদ্রলোকদের বিজনেস করতে দেবে না—এই যুদ্ধের আগেও এ শহরের চেহারা এমন ছিল না। বৃটিশ আমলে টাকায় আট সের দুধ বেচেছে গয়লারা। মাছ পাঁচসিকে সের। চালের দর তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় চড়েছিল বটে কিন্তু আবার নেমে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ভোল পালটে গেল শহরের। মনোহর সিং এসে মোটর ওয়ার্কশপ খুলল। রুস্তমজী পেট্রল ডিপো খুললো। বোস কোম্পানীর অয়েল মিল চলতে লাগলো। হনুমান পোদ্দারজীর রাইস মিলও চললো। কিন্তু বদ্রীদাস সেই বদ্রীদাস অগরওয়ালাই রয়ে গেল। বদ্রীদাসের সেই খাটো নল-মরলা ধুতি সেই চুলভর্তি খালি গা সেই টিনের গুদাম ঘর। বদ্রীদাস সব দেখে চোখ মেলে আর বলে—শালা কত বাড়বি বাড় আমি সকলকে এক চোট দেখে নেব। শালা কারবারের বারোটাই বাজবে আর একটাই বাজবে আমি সকলকে দেখে নেব একচোট—বদ্রীদাসের ছোট হাতের ক্যাশ বাক্সটা সামনে থাকে আর চাবির গোছাটা থাকে কোমরের ঘুনসিতে। আর কিছুর দরকার নেই। বদ্রীদাসের কনক্রীটের এয়ার কন্ডিশন্ড বাড়িও দরকার হয় না হাল মডেলের গাড়িও দরকার হয় না। বদ্রীদাসের মেয়ের ফ্রান্স থেকে বরের জন্যে ডিনার সেটও আনতে হয় না। বদ্রীদাস ঘি খেলেও হজম করতে পারে। সুইটজারল্যান্ডে গিয়ে চিকিৎসা করাতেও হয় না। অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ করে রিকসায় চড়ে নিজের কাঁচা গিয়ে ঢালঢোটি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। তা এই বদ্রীদাসের একদিন ডাক পড়লো। ডাক পড়লো সকলের শেষে। হাকিম-সাহেব বদ্রীদাসজীকেও ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে। হাকিম-সাহেবের বাংলোর সামনে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল বদ্রীদাস আগরওয়ালা। সেদিন বদ্রীদাস গায়ে পিরান চড়িয়েছে পায়ে চটি গলিয়েছে ধুতিটা কুল করে পরেছে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে অনেকবার গণেশজীকে নমস্কার করেছে। —জয় বাবা গণেশজী জয় বাবা সিদ্ধিনাথজী—তারপর যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে—আজ্ঞা,

হাকিম-সাহেব আমাকে বেলিলেছে কেন বলুন তো? কে জানে কেন ডেকেছে হাকিম-সাহেব। কেউই বলতে পারে নি। কার এত মাথা ব্যথা। হাকিম-সাহেবের আর্দালীকেও জিজ্ঞেস করেছে —আরে ছেইয়া হাকিম-সাহেব আমাকে তলব দিয়েছে কেন? আর্দালী মুখ নিচু করে বলেছে চাদা—। —চাঁদা? বহীদাস আসমান থেকে দম হাত পেড়িয়ে এসেছে মনে। চাঁদা! কিসের চাঁদা হে। জোর করে ভয় দেখিয়ে হাকিম-সাহেব টাকসো আদায় করে নেবে নাকি। আবার বহীদাস আর্দালীকে জিজ্ঞেস করলে—টাকসো? আর্দালী বললে—না হুজুর—চাঁদা তবু ভয় গেল না বহীদাসজীর মন থেকে। যার নাম চাঁদা তার নামই তো টাকসো। টাকসো দিতে দিতেই তো জান বেরিয়ে গেল। কেরোসিনওয়ালার টাকসো গাড়ির গাড়োয়ানদের টাকসো কুলি-মজদুরদের ভি টাকসো—টাকসোর কি হিসেব-কিতাব? ইংরাজ জমানাতে টাকসো ছিল কিন্তু সে এমন নয়। আজকাল যে টাকসো মারছে—কথায় কথায় টাকসো উঠতে বসতে টাকসো। খানিক পরেই ডাক পড়লো ভেতরে। বহীদাসজী উঠলো। উঠে ইষ্ট দেবতাকে একবার স্মরণ করে নিল উর্ধ্বলোক হয়ে। তারপর বললে—চলিয়ে আর্দালী-সাহাব চলিয়ে—কিতনা দেরী আপকো। হাকিম-সাহেবের খাস কামরা। প্রথমে ঘর ঢুকে হাকিম-সাহেবকে দেখাই গেল না। এত বড় একটা টেবিল। টেবিলের এক কোণে বসেছিলেন তিনি। বললেন—এসো বহীদাসজী, এই দিকে এসো —এতক্ষণে হাকিম-সাহেবের হদিস পেয়ে বহীদাসজী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। বললে—গুড মর্নিং স্যার। —এসো এসো এইখানে বোস। বহীদাসজী আস্তে সন্তর্পণে গিয়ে বসলো একটা ছোট চেয়ারে। হাকিম-সাহেব বললেন—ওটাতে কেন এদিকে এই গদি-আঁটা বড় চেয়ারটায় বোস না। বহীদাসজী বিনয়ে নম্র হয়ে বললে—আমি ছোট জাতের আমি এখানেই বসি হুজুর। —না না তুমি ছোট জাতের কে বললে? তুমি এত বড় একজন হোলসেল মার্চেন্ট এখানকার। বহীদাস বললে—না হুজুর আমি তো হুজুরের কাছে ছোট বেওসাদার আছি। আজকাল কত বড় বড় বেওসাদার এসেছে এখানে। হনুমান পোদ্দারজী আছেন সুন্দরলাল আছেন মনোহর সিংজী আছেন বোস কোম্পানী আছে—আমি তো তাদের কাছে কি হুজুর? হাকিম-সাহেব বললেন —তারা অবশ্য বড়ই কিন্তু তুমিও ছোট নও বহীদাসজী। আমি শুনেছি সব—শুনেছি তোমার অনেক বড় কারবার। বাইসের স্ট্রান্ডরোড মার্কেট নয় ভাল তিন সরবে গ্রাউন্ডনাটেরও হোলসেল মার্চেন্ট তুমি। বহীদাস বললে—হুজুর সব ঠিক বাত আছে। হাকিম-সাহেব বললেন কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কথা বলতে ডেকেছি বহীদাসজী। তুমি শুনেছো বোধ হয় এ বছর রবীন্দ্রনাথ সেন্টিনারী হবে লোকাল কমিটি হয়েছে—শুনেছ তুমি নিশ্চয়ই? বহীদাস বুঝতে পারলে না ঠিক কিছুতেই করলে —কী বললেন হুজুর? হাকিম-সাহেব এবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বললেন—বর্তমান সেন্টিনারি রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী। বহীদাসজী তবু বুঝতে পারলে না। বললে ও কেয়া হায় হুজুর? হাকিম-সাহেব বললেন—তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোননি? —উও কৌন থা হুজুর? হাকিম-সাহেব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন তিনি একজন মস্ত কবি ছিলেন। যেমন তুলসীদাসজী যেমন—। এতক্ষণে বুঝতে পারলে বহীদাসজী বললে —সন্ত তুলসীদাস? হাকিম-সাহেব বললেন—হাঁ হাঁ ঠিক ধরেছ তুমি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি মস্ত বড় একজন কবি। সারা পৃথিবীতে তাঁর সেন্টিনারি উৎসব হচ্ছে—জার্মানী ফ্রান্সে ইংল্যান্ড আমেরিকা—সব জায়গায়। দিল্লীতে হচ্ছে বোম্বাইতে হচ্ছে কলকাতাতেও হচ্ছে—আমাদের এই শহরেও আমরা করছি। আমার কাছে গভর্নমেন্ট চিঠি লিখেছে এখানেও সেলিব্রেশন করতে হবে। বহীদাস বললে—তা আমি কি করবো হুজুর, আমি তো লিখতে ভি জানি না পড়তে ভি জানি না। হাকিম-সাহেব বললে—না তোমাকে লিখতে পড়তে কিছুই করতে হবে না, ওসব করবার অনেক লোক আছে—তোমায় শুধু চাঁদা দিতে হবে। বহীদাসজীর বুকে ছাঁৎ করে যেন একটা আঘাত লাগলো। বললো—টাকসো? হাকিম-সাহেব একটু হাসলেন। বললেন—না না টাকস নয়—চাঁদা, ডোনেশন। বহীদাস বললে, ও তো একই বাত হলো হুজুর। বাংলায় যার নাম চাঁদা হিন্দীতে তারই নাম টাকসো হুজুর, আমরা যারা বেওসা করি তারা একে টাকসো বলি হুজুর। আচ্ছা না হয় টাকসোই হলো তোমার কথা হইলই এখন সেটা দিতে হবে তোমাকে। বহীদাসজীর এ ধরনের অবস্থা সহ্য করা অভ্যাস আছে। এত বছর ধরে টাকসো দিয়ে কারবার করে আসছে সেই তারা জানে। কোথায় ওয়েলফেয়ার দেখতে গেলে কাকে টাকসো দিতে হয় কোথায় পার্মিট দেখতে গেলে কাকে টাকসো দিতে হয় কোথায় সেলস টাকসো ভরা দিতে গেলে কাকে টাকসো দিতে হয় কোথায় পার্মিট দেখতে গেলে কাকে টাকসো দিতে হয়—সব নখদর্পণে। টাকসো দিতে দিতে বুড়ো হয়ে গেল বহীদাস আগরওয়ালা। ইংরেজ রাজত্বেও টাকসো দিয়েছে এখন স্বদেশী জমানাতেও টাকসো দিতে হচ্ছে সুতরাং টাকসো দিতে ভয় পাবার কথা নয় বহীদাসজীর। বহীদাসজী বললে—কত টাকসো দিতে হবে হুজুর? হাকিম-সাহেব বললেন—কলিশটা ছোকরায় মিলিয়ে দশ সদস্য কমিটী। তুমি মুখিয়ান কারবারী লোক তুমি বুঝবে। আমাদের কনসেপ্সান হচ্ছে এখন ছেলের হাতে রবীন্দ্র সেন্টিনারী করবো। সেই উপলক্ষে এখানে একটা রবীন্দ্র-ভবন হবে। ভবনটা তৈরী করতে

নিউ স্ক্রিপ্টের বই

জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস
মালাবীপ। ১০-০০ ॥
জীবনানন্দ দাশের চিরায়িতের কবিতা বেলা, অবেলা, কালবেলা। ৪·০০ ॥

কিশোর সাহিত্য

প্রত্যেকটি পুস্তক সুনির্বাচিত নিরক্ষরতে ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া যায়।
বহুমুখীর শ্রেষ্ঠ পুস্তক হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত

সন্তোষকুমার ঘোষ	ছোটদের গল্প।	৭·০০ ॥
লীলা মজুমদার	টুনটুনির গোয়া।	৪·০০ ॥
১৩৭৮-৭৯র ছোটদের সর্বশ্রেষ্ঠ বই হিসাবে শিশুসাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত		
সবিতা ঘোষ	পুষ্প হতে পৌষ পর্যন্ত।	৪·০০ ॥
লীলা মজুমদার	হাসা ও রহস্যের গল্প।	৪·০০ ॥
মলিনী বাগ	হাসা ও রহস্যের গল্প।	৪·০০ ॥
অপর্ণা দেবী অনুবাদ	চিত্তরঞ্জন (রঙ্গ নিরক্ষরিত)	৩·০০ ॥
পুণালতা চক্রবর্তী	ছোটদের বিদ্যাসাগর।	৫·০০ ॥
	ছোট ছোট গল্প।	৮·০০ ॥
লীলা মজুমদার	গল্প।	৫·৫০ ॥
শিবরাম চক্রবর্তী	পৌষমাসে সোনাদহ।	২·৫০ ॥

অনুবাদ সাহিত্য

কুলদারঞ্জন রায়—রবিনসন ক্রুসোর রহস্যময় দ্বীপ নামের রহস্য যা of the Island	দ্বীপের রহস্য (নিজস্ব সংস্করণ) The Mystery অমৃত দ্বীপ (২য় খণ্ড)।	৬·০০ ॥
অপরাজিতা—বিশ্ববিখ্যাত লুইস আলকটের Little women এর অনুবাদ	ছিলোরী কন্যা।	৮·০০ ॥

নিউস্ক্রিপ্ট : ৫-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

অনেক টাকা খরচ হবে। ইঁট দেবে এখানকার জমিদার চৌধুরীবাবু। চৌধুরীবাবুকে চেন তো? এ বছরে যিনি পঞ্চায়ী হয়েছেন। বদ্রীদাসজী উত্তর দিলে না। চুপ করে শুধু শুনতে লাগলো। আর সিমেণ্ট সুরকী লোহা আর যত কাঠ লাগবে সব দেবে হনুমান পোদ্দারজী। বদ্রীদাস বললে— আচ্ছা হুজুর হনুমান পোদ্দারজী এখনও পঞ্চায়ী হচ্ছেন না কেন? হাকিম-সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—আর জমিটা দিচ্ছে আমাদের বোস কোম্পানীর প্রাণকৃষ্ণ বসু, দু কিত্তে জমি —এই যা'র অয়েল মিল আছে .....তা যাকগে এসব কথা। আমরা মোট-মাট হিসেব করে দেখেছি—সব শুদ্ধ আমাদের খরচ হবে এক লাখ টাকা—স্টোটাল এক লাখ টাকার বাজেট হাফজি—তা তুমি কত দিতে পারবে এখন বলো? বদ্রীদাস কী বলবে ভেবে পেল না। হাকিম-সাহেব একটা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন—এই দেখ, এই লিস্ট দেখ, আমি তোমার নামে পাঁচ হাজার টাকা ধরেছি—পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে দিতে হবে—বদ্রীদাসজী হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলে। বললে—হুজুর আমি মরে যাবো হুজুর বে-ফিকির মরে যাবো। হাকিম-সাহেব বললেন এটা তোমার বাড়াবাড়ি বদ্রীদাসজী। পাঁচ হাজার টাকা তোমার কিছু না—। না হুজুর, আজকাল টাকসো দিতে দিতে কারবারের বারোটা বেজে গেছে হুজুর। আমি মারা যাবো হুজুর বে-ফিকির মারা যাবে। কিছু কমতি করিয়ে দিন হুজুর—হাকিম-সাহেব গলবার পাত্র নন। বললেন—আমি তো তোমাকে কমতি করেই ধরেছি বদ্রীদাসজী, আর সকলের অনেক বেশি বেশি ধরেছি তোমার জন্যে কম করেই পাঁচ হাজার টাকা ধরেছি। —পাঁচ হাজার রুপেয়া কেমন করে দেব হুজুর? আমি বে-ফিকির মারা যাবো। আপনি তার চেয়ে আমার গলাটা কাটিয়ে দেন হুজুর। হাকিম-সাহেব বললেন—আঃ তুমি দেখছি হাসালে বদ্রীদাসজী? লোকে শুনলে বলবে কী বলো তো। পাঁচ হাজার টাকা দিতে তুমি মরে যাবে, এ কেউ বিশ্বাস করবে? —না হুজুর আমার কথা বিশ্বোয়াস করুন। আমি একদম মারা যাবো আমি বে-ফিকির মারা যাবো, আপনি বিশ্বোয়াস করুন—। হাকিম-সাহেব এবার আরো কাগজপত্র সাফ করলেন। বললেন তবে দেখ, এই লিস্টটা পড়ে দেখ—বলে লিস্টটা বদ্রীদাসজীর দিকে এগিয়ে দিলেন। বদ্রীদাসজী বললে—এ দেখে আমি কী করবো হুজুর? আমি কী লিখি পড়ি জানি? —তবে শোন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। বলে হাকিম-সাহেব লিস্টটা নিজেই পড়ে শোনাতে লাগলেন। বললেন—হনুমান পোদ্দার—দশ হাজার টাকা এবং ইঁট কাঠ সিমেণ্ট লোহা সি পি মুক্তরজী—পনেরো হাজার টাকা। প্রাণকৃষ্ণ বসু—দশ হাজার। মনোহর সিং আট হাজার। রহিমার এন চৌধুরী পঞ্চায়ী পাঁচ হাজার। তারপর বদ্রীদাসজীর দিকে তাকিয়ে হাকিম-সাহেব বললেন —দেখলে তো বদ্রীদাসজী তোমার কত কম ধরেছি—বদ্রীদাস কিছু কথা বললে না। হাকিম-সাহেব আবার বলতে লাগলেন—সকলের কত বেশী বেশী ধরেছি আর তোমার কত কম ধরেছি—দেখলে তো? বদ্রীদাসজী এবার মাথা তুললো। বললে—না হুজুর, আমি পাঁচ হাজার দেব না।—কেন? পাঁচ হাজার কি তোমার পক্ষে বেশী হলো? —আজ্ঞে না হুজুর তা নয় আমি বিশ হাজার দেব। আপনি লিখে নিন আমি কাল এসে আপনাকে বিশ হাজার টাকা টাকসো দিয়ে যাব। হাকিম-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন বদ্রীদাসজীর মুখের চেহারা দেখে। বদ্রীদাসের মুখের চেহারা বড় কঠিন হয়ে উঠেছে। —আপনি লিখে নিন। হাকিম-সাহেব বললেন—কেন বদ্রীদাসজী তোমাকে তো আমি বিশ হাজার দিতে বলিনি তুমি ওদের থেকে ছোট কারবারী তোমাকে পাঁচ হাজারের বেশী দিতে হবে না পাঁচ হাজার দিলেই আমাদের চলে যাবে। বদ্রীদাস বললে—না হুজুর আপনি লিখে নিন আমার নামে বিশ হাজার। —কেন বদ্রীদাসজী? তুমি অত বেড়ে যাচ্ছো কেন? বদ্রীদাসজী বললে—না হুজুর আগের কথা বলিনি আমি বিশ হাজারই দেব। যত টাকসো চাইবে সরকার তত দেব। চাইবে। —কিন্তু তুমি ভুল করছো বদ্রীদাসজী, রবীন্দ্র সেণ্টেনারি তো সরকারী ব্যাপার নয়। এ তো এখানকার কমিটির ব্যাপার। আমি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বলছি। বদ্রীদাসজী হঠাৎ মাথেড়-খাপ্পা। বললে—রবীন্দ্রনাথের নাম আমি জানি না হুজুর রবীন্দ্রনাথের জীবনীও আমি পড়িনি আমি আপনাকে চিনি। আপনি আমার সরকার—আপনি যত টাকসো চাইবেন তত টাকসো দেব। আপনি লিখে নিন—।

সেদিন গদীতে ফিরে এসে বদ্রীদাসজীর আর খাওয়া হলো না। বিশ্রাম হলো না। মুনিম মুহুরী যত কর্মচারী আছে সকলকে ডাকলে। চাল দাল ডাল সরষে তিসি সব জিনিসের হিসেব হতে লাগলো। অনেক রাত পর্যন্ত খাতাপত্র নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগলো গদীবাড়ী ভেতরে। বদ্রীদাসজী নিজে লেখাপড়া জানে না। কিন্তু লেখাপড়া হিসেব-পত্র করবার জন্য লোকজন আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মালের দরদস্তুর যাচাই হলো। কিছু মাল সরিয়ে রাখা হলো আলাদা করে কিছু মাল সামনে। সেদিন সমস্ত রাত ধরে সমস্ত গদীবাড়ি ওলোট-পালোট হয়ে গেল একেবারে। বদ্রীদাসজী জিজ্ঞেস করলে বোস কোম্পানীর গদীর কী খবর মুনিম? মুনিম বললে—ওদের ডি মাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে হুজুর। —আর হনুমান পোদ্দারজী? —ওদের ডী। তারপর রাত যখন দুটো তখন সবাই ছুটি পেলে। সেই রাত দুটোর সময় বদ্রীদাসজী গদী থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। পরের সপ্তাহে বাড়-সমাচার পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদ-সূত্রে একটি খবর প্রকাশিত হলো। খবরটি এই : সম্প্রতি এই জেলায় কয়েকটি গ্রামে বন্যার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত অর্থ কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছে। চাল ডাল, তেল, সরিষা, ঘৃত, চিনি, চিনা-বাদাম প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যাদির সব যে-হাল হইয়াছে তাহাতে এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। জেলার হাকিম-সাহেব এই অগ্নি-মূল্য নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই নিজে ইহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন বলিয়া আমাদের প্রতিনিধিকে আশ্বাস দেন।

নিউ এজ

॥ প্রকাশিত হল ॥

নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা

বিভাস রায়চৌধুরী : ১৬,

[নাটক যাঁরা পড়েন, নাটক যাঁরা দেখেন, যা লেখেন, বা নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাদের সকলের পক্ষেই বইটি অপরিহার্য। বইটিতে নাটক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রয়েছে। যথা নাটকের আঙ্গিক, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতিসহ সমস্ত কলা-কৌশল। আর রয়েছে বাংলা নাটকের আদি হতে আধুনিক ইতিহাস।]

॥ উপহার দেবার মত বই ॥

বিশ্বের প্রবাস : ইবনে ইমাম : ১০,

[বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য বই। বইটিতে রয়েছে বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে ভাল ভাল প্রবাসগুলির এক সমাবেশ। বিদেশী প্রবাসগুলির স্বাদ ও পরিচয় পেতে হলে, সেই সঙ্গে নিজেদের আসরকে সমৃদ্ধ করতে হলে এই বইটি অবশ্যই পড়ার মত বই, রাখার মত বই ও দেবার মত বই। বইটিতে এইসঙ্গে রয়েছে বহু সুন্দর সুন্দর ছবি যা প্রবাসগুলিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। সুন্দর ছাপা ও সুন্দর প্রচ্ছদে বইটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।] ভারতীয় সমাজ ও

বিবাহ ও নৃতেন্দ্র গোস্বামী : ১২·০০; কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু : ৫·০০; রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য : বুদ্ধদেব বসু : ৫·০০; রাজভন্ত্র সাহিত্য ও তৎকালীন সমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী : ১০·০০; বাঙালীর ইতিহাস : [সংক্ষিপ্ত] নীহার-রঞ্জন রায় : ৬·০০; রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায় : ৪০·০০; ঔপনিবেশিক সমাজ ও সংস্কৃতি : নৃতেন্দ্র গোস্বামী : ১৫·০০; প্রাচীন বঙ্গের ধর্ম ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ১৫·০০; লোককথা : প্রাচীন বঙ্গোপসাগর :

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

অতঃপর

আশাপূর্ণা দেবী

খোকার জন্মকালে ওর সঙ্গে কোনো ঝুলিটুলি দেখা যায়নি। পৃথিবীর আর সমস্ত শিশুর মতই পৃথিবীর কোন এক বাবা-মার ঘরে অবতীর্ণ হয়েছিলো শুধু করতল দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে। শিশুর ওই মুষ্টিবদ্ধ হাতের নানারকম কারিকা ব্যাখ্যা করতে পারা গেলেও আসলে যে মাতৃজঠরে স্থান সংকুলানের অভাবেই শিশুকে মুঠো পাকিয়ে গুটিয়ে থাকতে হয় তাতে সন্দেহ নেই। এটাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোনো প্রতিজ্ঞা টতিজ্ঞার ব্যাপার নয় তাহলে পৃথিবীতে এসেই মুঠো হাত ছাড়িয়ে বসবে কেন?

আমাদের এই খোকাটিও কোনো প্রতিজ্ঞা নিয়ে না আসুক নিয়ে এসেছিলো প্রশ্ন। রাশি রাশি, অফুরন্ত অকারণ সব প্রশ্ন। এই প্রশ্নের ঝুলিটা সে জন্মকালে সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয় কিন্তু কোথায় যে ছিলো... হয়তো জগতের অন্য অনেক অলৌকিক ব্যাপারের মত অলৌকিক নিয়মে ঝুলিটা অদৃশ্য ছিলো। আর যতদিন না তার মুখে বুলি ফুটলো ততদিন অদৃশ্যই থাকলো। বুলি ফুটতেই চালিয়ে যাচ্ছিল। ছোট্ট ছোট্ট সব পদ্মের মতো নরম আঙুলের পরীক্ষা, মা বাবা দাদুর হঠাৎ কোনো এক মহা-মুহূর্তে সেই ঝুলিটার ছায়া দেখা গেলো। চোখে মুখে আলোর ঝিলিক ফুটিয়ে খোকা বাবার মুখটা ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে মুঠো খোলা হাতের তর্জনী তুলে বলে উঠলো বাবা, ওতো কি? বাবা আহ্লাদে বিগলিত হলো। হবেই, কারণ এই প্রথম সে তার খোকার মুখ থেকে পুরো একটা সেনটেনস শুনতে পেলো। বাবা বলল ওটা? ওটা পাখী বাবা। সেদিন পুরো দিনটাই প্রায় খোকা বারান্দা থেকে না নড়ে পাখী দেখতে লাগলো এবং কক শলিখ চড়াই যা দেখতে পেলো তাতেই খুশী হয়ে যাকে বলে মহোল্লাসে হাততালি দিয়ে বলে উঠতে লাগলো, পাখি পাখি। পরদিনই খোকার শব্দ ভান্ডারে একটি নতুন সংযোজনা দেখা দিলো। রেলিঙের ধার দিয়ে একটা বেড়ালছানাকে যেতে দেখে খোকা চেঁচিয়ে বলে উঠল—বাবা ওতো পাখি নয়। সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মুখ ধরে ঘোরাতে চেষ্টা করলো। খোকার বাবা ঘাড় কয়াচ্ছিলো, নড়ে গিয়ে গালটা একটু কেটে গেলো, তবুও উচ্ছ্বসিত গলায় হাঁক পাড়লো—এই শুনছো, কী ছাই রান্না নিয়ে বসলে! শুনে যাও খোকা কী বলছে। খোকার না সামনে থেকেই চেঁচিয়ে বললো, খোকার কথা শুনেই পেট ভরিয়ে অফিস যাবে? খোকার বাবা টেবিল থেকে তোয়ালেটা তুলে তার কোণ দিয়ে গাল চেপে ধরে মুহূর্তে মুহূর্তে চেঁচিয়ে বললো, তুমি না একটি হোপলেস। আবার খোকার বাবা সন্ধ্যার সময় কুলায়ে ফিরে এলে খোকা মা সারাদিনের ফিরিস্তি দেয়, আজ কি বলেছে জানো? নুন খাবো না তা খাবো—হি হি করে হেসে কথা শেষ করে, তার মানে তোমার মত চা-তাল হবে আর কি। চা-তাল হওয়া মোটেই নয়, বাবা হেসে বলে মামার মত মাতাল না হলেই হলো। দাদা মোটেই মাতাল নয়। একটু ড্রিঙ্ক করলেই তাকে মাতাল বলে না। খোকার বাবা হেসে বলে, শুধু একটু চা বেশী খেলেই ওকে চাতাল বলে কেমন? ঠিক আছে বলেই যখন তখন ডবল কাপ সাপ্লাই করতে হবে। কিন্তু ইতাবসরে খোকার ঝুলি থেকে আর এক প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, বাবা তুমি কি খাও? আমি? আমি খাচ্ছি একে বলে, কাটলেট। আমি তাহলেও খাবো। না বাবা, এটা ছোট ছেলেদের খেতে নেই। আবার প্রশ্ন ছিটকে বেরিয়ে আসে 'ভাতো খেতে নেই?' এটা না, বিচ্ছিরি— তুমি বিরিনি খাও কেন? মা বিরিনি খাস্তে ভাতো? খোকার মা মুখ টিপে হাসি চেপে বলে 'নাও এখন খোকাও ছেলেকে, কেন খাচ্ছো। ওর মনের মত জবাব দিতে না পারলে কিন্তু কাল থেকে ওর সঙ্গে চায়ের সঙ্গে শুধু বিস্কিট। খোকার বাবা অবশ্য খোকার মনের মতোটা বুঝে উঠতে পারে না, নিজেই বুদ্ধি মতোটাই বলে আমরা বড় হয়েছি কিনা? বল হলে বিরিনি খেতে হয়? খোকার বাবা এখন আর পুলকিত গলায় বলে ওঠে না শুনছো? খোকা কি বলছে? এখন তাড়াতাড়ি চাপা দেওয়ার সুরে বলে, হ্যাঁ বাবা হয়। আমি বলো হলে বিরিনি খাবো? খোকার বাবা হতাশ গলায় বলে হোপলেস। খোকার মা বলে তোমার যেমন বোঝানো... ওটা বিচ্ছিরি নয় খোকন, ওটা কাল। ছোটরা কাল খায় না, বড়রা কাল খায়। ছোতোলা খাল খেলে তি হয়? কষ্ট হয় বাবু। তত্ত হলে তি হয়? খোকার বাবা কাতর গলায় বলে 'এই শুনছো, ওকি এই রকমই চালিয়ে যাবে? খোকার মা আশীর্বাদী, তাই সংক্ষেপে বলে নিজে বুঝতে শিখলে চালাবে না। কিন্তু কমলই দেখা যায় খোকার মার আশাটা কি ভুয়ো। খোকার ঝুলির মালের ফাঁসটা যেন ক্রমেই বেশী করে খুলে পড়ছে। বাবা ক'-টা 'খ'-এর মতন নয় কেন? খোকার মা চেঁচিয়ে বলে তোর কানটা নাকের মত নয় কেন বল? বল কেন? খোকা অবাক গলায় বলে, বাবা তুমি রাগ করছো? কেন? কিন্তু খোকার মনে বাবার রাগের স্মৃতি পরদিন থাকে না। খোকা গম্ভীর প্রশ্ন করে বাবা, সকালবেলা আমি টোস্ট ডিম কলা মাখন দুধ চকোলেট এতোসব খাই, আর তুমি শুধু মুটি খাও কেন?

খোকার বাবার ছেলে এত রকম খায় আর বাসনমাজা ঝিয়ের ছেলেটা কেন শুধু রুটি খায়, প্রশ্নের উত্তর দিতে খোকার বাবা ক্ষেপে গিয়ে রেগে উঠে খোকার মা-কে ডেকে বলে অদ্ভুত শুধু রুটি খায় কেন? খোকার মা একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেই পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে বলে শুধু রুটি খেতে যাবে কেন? গায়ে ডুবিয়ে খায়। বাবা আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলে, তা একটু গুড়টুড় দিলে তো হয়। খোকার মা অপাঙ্গে একটু ললিত দৃষ্টি হেনে প্রসঙ্গের চিন্তাটুকু হাপিস করে দিয়ে বলল ছেলের কাছ থেকে জিজ্ঞাসার চিহ্ন আমদানী করছ বুঝি? চিহ্নটা দেখতে ঠিক খাঁড়ার মতো খেয়াল আছে তো? পিতাপুত্রে দুজনে উর্ধ্বচরে এলে, গিন্নীকে পালাতে হবে। গুড়ের কিলো পৌনে চার টাকা বুঝলে? খোকার বাবা ঐ এক কথাতেই না বোঝবার বোঝে কিন্তু খোকা বোঝে না। খোকা তার চেনার জগৎটাকে বাড়িয়েই চলতে চায়। বারান্দা থেকে রাস্তায় তাকিয়ে বলে বাবা ওই বিচ্ছিরি নোংরা ভূতের মতন লোকটা তোমায় 'বাবা' বললো কেন? খোকার বাবা হেসে ওঠে ওর বাবা শুধু আমাকেই নয়, ও সবাইকে বাবা বলে। খোকা হতাশ প্রশ্ন করে সব্বাইকে? কেন? ওর বুঝি বাবা নেই? উঁহু ও ওরকম নোংরা কেন বাবা? সাবান মাখতে পারে না? ফর্সা জামা পরতে পারে না? বাবা ছেলের মনের মধ্যে করুণার বীজ বপণ করতেই বোধহয় কণ্ঠস্বর করুণ করে বলে কোথায় ওসব পাবে বাবা, ও যে ভিখিরি। ওদের কিছু থাকে না? না বাবু, ভিখিরিদের কিছু থাকে না। খোকা মুখের মধ্যে আঙুল পুরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুড়ো ভিখিরিটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে করতে বলে ওঠে, তোমার টাকাগুলো ওকে দিয়ে দাও না কেন বাবা? খোকার বাবা অনেক দিনের পর আবার হেসে উঠে হাঁক পাড়ে, এই শুনছো, তোমার ছেলে কি বলছে শুনে যাও। খোকার মা কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এসে ভ্রূকুটি করে বলে, খুব পাকা পাকা কথা বলছে তো? দারুন। পৃথিবীর পঞ্চমতম পাকা কথা? ভিখিরিটার যখন কিছু নেই, তখন আমার টাকাগুলো ওকে দিয়ে দিচ্ছি না কেন? ওঃ এই, ও আরো যা-সব নিদারুন প্রশ্ন করে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। কান ঝাঁ ঝাঁ করে... খোকন ভিখিরিটাকে যদি তোমার বাবা সব টাকা দিয়ে দেয়, বাবার কিছু থাকবে না। নিজেই ভিখিরি হয়ে যাবে। খোকা অবাক গলায় প্রশ্ন করে, ভিখিরিরাও কি আগে আমাদের মতই মানুষ থাকে বাবা? খোকার মা খোকার বাবার পকেট মারা বাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে পাগল। ওরা ওই রকমই জন্মেছিলো বাবুসোনা। একেবারে ওই রকম? ওই রকম নোংরা বিচ্ছিরি? খোকার ভঙ্গীতে বেশ উত্তেজনা। খোকার মা গম্ভীর দৃষ্টিতে একবার খোকার বাবার সাদা দৃষ্টি বিনিময় করে বলে, হ্যাঁ সোনা। নোংরা বিচ্ছিরি বলেই তো—খোকা অধিক-

ডায়াবিটিস্ রোগীদের জন্য

দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন

ডায়াবিটিক ব্যক্তিদিগের গ্রহণযোগ্য দুগ্ধজাত মিষ্টান্নের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

তাঁদের এসপ্ল্যানেডের দোকানে নিম্নোক্ত মিষ্টান্নাদি সর্বদা প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করেছেন—

রসগোল্লা **রসোমালাই**

সন্দেশ **ছানার পায়েস**

চিনি মিশ্রিত সাধারণ মিষ্টান্ন থেকে পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে মিষ্টান্নগুলিকে খাদ্য-পর্যায়ভুক্ত হালকা সবুজ রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে। এই সব মিষ্টান্নে চিনি স্যাকারিণ বা সাইক্লামেট ব্যবহৃত হয় নি।

কে. সি. দাশ. প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা—৭০০০০১ ফোন : ২৩-৫৯২০

ওর উত্তেজিত হয়। ওদের তাহলে কে তৈরী করেছে? ওই তৈরী হৈরীর প্রশ্নে আর কি এসে যায়। মা প্রশ্নের গলে তাড়াতাড়ি বলে, ভগবানই করেছেন। খোকা কিছু একটা ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করে, কেন ভগবান? পাজী ভগবান? ছি খোকন ও-কথা বলতে নেই। ভগবান পাজী হন না। ভগবান শুধু একজনই। তিনি খুব ভালো। তিনিই সবাইকে তৈরী করেন। তবে ওকে তিরিখি করে তৈরী করেছেন কেন? খোকার বাবা নেল-কাটার টিপে টিপে নখ কাটতে লেগে-ছিল, হাত ঝাঁকিয়ে খোকার মার দিকে তাকিয়ে বলে পূর্বজন্ম পরজন্মের গল্প তৈরী হয়েছিলো কেন বুঝতে পারছো? পারছি। ও বাবা। বল না। ভগবান ওকে তিরিখি করে তৈরী করেছেন কেন? বাবা পূর্বজন্ম পরজন্মের জটিল ধাঁধায় না গিয়ে বলে, জানি না বাবা, ভগবানকে জিজ্ঞেস করে বলবো। তুমি ভগবানের বাড়ি চেনো? খোকা প্রায় স্ফীতির মত ছিটকে ওঠে, সেই কাঁকনিতে অনেকগুলো প্রশ্ন করবারিয়ে করে পড়ে, ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে পারো? আমায় তাহলে নিয়ে যাওনা কেন? আমি ভগবানের বাড়ী যাবো বাবা। খোকার মা একটা জলন্ত অঙ্গারকে শিউরে উঠে বলে, খোকন, বাজে কথা রাখো। পড়াটা তৈরী করে নেবে এসো। আজ অঙ্ক আছে। বাঃ, আজকে তো ছুটি। ছুটির দিনেও পড়তে হয় বুঝি? তাহলে বাবা ছুটির দিনে অফিসের খাতা নিয়ে এসে লিখলে তুমি রাগ কর কেন মা? খোকার বাবা দুষ্টু হাসি হেসে বলে, জবাবটা ছেলের জোর যাও। দিচ্ছি—খোকার মা জোরে জোরে বলে, রাগ করি আমার খুশি। হলো? খোকা তুমি যাবে কিনা? সারাদিন এই বারান্দাটায় বসে। আর রাস্তায় যা দেখবে তাই নিয়েই বড়ো কখনো চায় কাল থেকে সকালবেলা শম্ভুর মার বাসন মাজার কাছে বসে থাকবি। কেন? কেন? উঁ। জন্মবধি কেন ভূতের ভয় করে রেখেছে ছেলেকে। খোকার মা বাবা খোকাকে রাস্তার ধারের বারান্দায় আসতে বারণ করে। কিন্তু রাস্তায় তো নমাতেই হয়। খোকাকে নিয়ে বেড়াতে না গিয়ে উপায় আছে? খোকার জামা জুতো কিনতে বেরোতে হয় না? এমনিই কুটকুটে ছেলে-টাকে সাজিয়ে গুজিয়ে সঙ্গে করে হাতে হয় না? এতো মিষ্টি দেখতে ছেলেটা পাড়ার লোক ফিরে ফিরে দেখে যায়। মা-বাবার আনন্দ। মা-বাপের গৌরব। শুধু যদি খোকা তার জন্মকালে ওই অদৃশ্য কুলিটি নিয়ে না জাগতো। ওরেই ছবিন মহানিন্দা করে দিচ্ছে। বলা, রাস্তায় এত দোকান কেন? বাঃ দোকান থাকবে না? লোকে জিনিসপত্র কিনবে না? এত জিনিস কে কেনে বাবা? আঃ বেশী বকবক করিস না তো। কে আবার কেনে? মানুষরা কেনে? এতো জিনিস কিনতে পারে? পারে বাবা পারে। কতো গাদা গাদা মানুষ আছে, তার ঠিক আছে? খোকা তৎক্ষণাৎ নতুন চিন্তায় চলে যায়, এতো গাদা গাদা মানুষ কেন বাবা? খোকার মা-বাবা একটু রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে। খোকার বাবা বলে, এবার দাও উত্তর। খোকার মা মুচকি হেসে বলে, গাদা গাদা লোক না থাকলে পৃথিবীর এতো কাজ কে করবে বাবা? কী কাজ করবে? এই এই অফিসে যাবে, বাজার করবে, রান্না করবে জিনিষ বিক্রী করবে, জিনিষ কিনবে, রেলগাড়ী চালাবে, আরো কত কী কাজ আছে। সবাই কাজ করে? বাবা ছেলেকে একটা মহৎ শিক্ষা দিতে পারছে ভেবে মহোৎসাহে বলে, করেই তো, সবাই কাজ করে। করতেই হয়। খোকা কিন্তু কেবল মাত্র পঠন-পাঠনের শিক্ষাতেই নিশ্চিন্ত হয় না, খোকা দৃষ্টান্ত চায়। খুব চিন্তিতভাবে বলে তবে বিজুদা মন্টুদা দীপুদা কানাইদারা কিছু কাজ করে না কেন? খোকার বাবা মাথায় হাত দিয়ে বলে, এরা আবার কারা? এই দাদেরা? আমের গলায় কোপ দেবার জন্যে কেন সোকুলে বাড়াচ্ছিলো? খোকার মা মুচকি হেসে বলে ওমা ওদের চেনো না? ভুজঙ্গবাবুর এক কথা আলো বসে উদয়াস্ত রাজা উজির মারে। দেখেনি কোনদিন? দেখে থাকবো। হয়ত রোজই দেখি কিন্তু ওরা হঠাৎ দাদা হলো কোন সূত্রে? খোকার মা গভীর রহস্যের হাসি হেসে বলে, তোমার ছাদনাকে জিজ্ঞেস করো। খোকার বাবা বিরক্ত হয়ে আর কথা বলে না। গট গট করে এগিয়ে যায়। কিন্তু খোকা হচ্ছে ভবিষ্যৎ ছেলে সংস্করণ। খোকাও মনের আনন্দে ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলে, ওরা কেন কাজ করে না বাবা? বাবা জেগে উঠে বলে, কে বললে কাজ করে না। বাড়িতে করে। খোকা আচ্ছন্ন গলায় বলে, না, বাড়িতেও করে না। ভুলুর দিদা বলেছে, কাজ নেই কিছু নেই, শুধু গপ্পের আড্ডা। লজ্জা নেই ছেলেগুলোর। আড্ডা মানে কি বাবা? উঃ বাবারে। খোকা তুই চুপ করবি? আড্ডা মানে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করা। যাদের ছেলেরা আড্ডা দেয়। খোকা বাবার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থাকে। তাছাড়া তার হাফ-প্যান্টের বেল্টটা ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল। সেটা সামলানোর কাজে কিছুটা সময় ব্যয় করে। সেটাকে ঠিক করে নিয়ে যেতে চলতে বলে ওঠে, বাবা, বিজুদা মন্টুদা দীপুদা কানাইদা বাকে ছেলে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর তুই না তার চাইতেও—হ্যাঁ, ওরা খুব বাজে ছেলে। উঃ মাথা জ্বলে গেলো আমার খোকা। কিন্তু বাবার মাথার ব্যাপারে চিন্তা মাত্র না করে বলে ওঠে, কেন বাজে ছেলে? কী জন্যে বাজে ছেলে? খোকার বাবা হতাশ গলায় বলে, তুই-ই আমায় পাগল করবি খোকা।

যারা অফিস-টফিস যায় না, তারা বাজে ছেলে। লোকে তাদের নিন্দে করে। খোকার মা একটা শাড়ির দোকানের শো-কেসে রাখা অপূর্ব এক সবনরঙী শাড়ীপরা সুন্দরী ডামি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছিয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হতে ছুটে ছুটে এসে ওদের কাছে একটা লেভ-এর নীচে দাঁড়িয়ে পড়েই খোকার হাতের বন্ধুরা বাকুল এবং উত্তেজিত প্রশ্ন শুনতে পেলো, তুমি যদি ওদের তোমার সঙ্গে অফিসে নিয়ে যাও তাহলেও ওদের নিন্দে হবে বাবা? হ্যাঁ হবে। বাবা রেগে বলে। খোকা কিন্তু রাগে না—শান্ত গলায় বলে তাহলেও কেন? তোমার ছেলেকে নিয়ে আর আমি রাস্তায় বেরোবো না বলে রাখছি—খোকার বাবা বলে ওঠে, ওর ওই রামগরুড়ের ছানাকে অফিসে নিয়ে যেতে হবে বুঝলে? যাতে আর ওরা নিন্দনীয় না থাকেন। মা হেসে ফেলে। বাবা রেগে উঠে বলে হাসছো? আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। অহরহ ওর মনের মধ্যে কোন ভূতের খেলা চলে ভগবান জানেন। কেন, কেন, কেন। বৈরাগী হয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। আহা। এইটুকুতেই এই? আর আমার যে সারাদিন জ্বালায়। তোমার কাছে এতো সাহস পায় না...না, সাহস পায় না। মা, শম্ভুর মা কেন রোজ বাসন মাজে? রবিবারে ছুটি হয় না কেন? মা শম্ভু এত বড়ো ছেলে ইস্কুল যায় না কেন?—বলতে বসলে ফিরিস্তি ফুরোবে না। কিন্তু ফিরিস্তি কেন ফুরোবে? পৃথিবীর এই বাতাসে জগতের যত কথা, যত ঘটনা, যত চোখের খেলা সব কিছু নির্বাস গিয়ে মিশে খোকাদের চেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না? তবে? ফিরিস্তি তো বেড়েই চলবে। খোকা কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছে তাদের বাড়ীতে আজকাল মামা আসছে হরদম। কোথায় যেন কী আয়োজন চলছে। মামার সঙ্গে আরো সব লোক আসছে, তাদের জন্য খাবার আসছে, চা বানানো হচ্ছে, কত কথা কত চুপি চুপি পরামর্শ। খোকা সেখানে গিয়ে পড়লেই তাকে তাড়া দেওয়া হচ্ছে। তুই এখানে কেন? তুই পালা বাবা! খোকাকে ক্রমশঃ বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু মার কাছেই কি ঠাঁই পাচ্ছে? মা-ও যেন ওদের নিয়েই দারুন ব্যস্ত। আর খোকাও তো ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। খোকাকে তার ঘর থেকে বারান্দা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, স্কুল, স্কুলের পড়া, মাস্টার মশাই। খোকার খেলা-পাতির একটা জগৎ ছিলো সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। আর খোকা কেমন করেই যেন জেনে ফেলেছে, বাবা তার অফিসটা ছেড়ে দিয়েছে, মামার সঙ্গে মিলে কিছু একটা করছে। বাবাকে মামা নাকি মস্ত বড় কী একটা করে দেবে। কিন্তু খোকাকে কেউ কিছু বলতে রাজী হয় না কেন? খোকা একবার ফাঁক পেয়ে মার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মা মামা রোজ রোজ আসে কেন? মা হেসে ফেলে বলে কেন জানিস? তোর বাবাকে মন্ত্রী করে দেবে বলে। আর মামা? মামা রাজা হবে? খোকার মা হেসে ওঠে। অনেক দিন পরে হাসতে হাসতে গিয়ে বলে, এই শুনছো, খোকন কী বলছে। দাদা তুমি না রাজা হবে, তোমার ভাগ্নের ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এই হাসি-খুশী আমাদের হাওয়ার মাঝখানে একটা ভারের তার এসে চাপলো। এর আগে এমন ঘটনা এ পাড়ায় ঘটেনি। বাবা আর কদিন বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে না, বাবা কেবল সিগারেট খাচ্ছে বসে বসে। অনেক দিন পরে

বাবাকে এক বসে থাকতে দেখে খোকা সাহসে ভর করে বাবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। খোকার মনে হয়, বাবা যেন খোকার কাছ থেকে অনেক দূরে বসে আছে। বাবা একমনে সিগারেট টানছে তো টানছেই। খোকা টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ এক সময় বাবার চোখ পড়ে কী ভেবে বলে, 'আয় খোকা। মাস্টার আসেনি আজ? না আজ শনিবার। খোকার মনে হয় বাবা যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। আগে বাবা 'মাস্টারমশাই' বলতো। স্কুলে কেমন লেখাপড়া হচ্ছে। বাবা জিজ্ঞেস করে। আর খোকার হঠাৎ মনে হয়, যেন বাবা নয়, একটা অন্য বাড়ীর লোক কথা কইছে। খোকা তবু বাবা ভেবেই প্রশ্ন করে বসে, 'বাবা আরে ফেলা মানে খুন করা? শুনে বাবা সোজা হয়ে বসে। বলে, এসব কথা তোকে কে বলেছে? শম্ভুর মা বলছিলো, গোবিন্দবাবু খুন হয়েছেন। বাবা খুব রেগে উঠে বলে, শম্ভুর মা? শম্ভুর মার কথা শুনতে যাও কেন তুমি? কিছু জানে না, ভুল কথা বলে। খবরের কাগজেও ভুল কথা লেখা থাকে বাবা? বাবা কেমন মিইয়ে যায়, বলে খবর-এর কাগজে কী লেখা আছে জানিস তুই? পড়িস? পড়তে পারিস? খোকা ঘাড় কাত করে। ভালো ভালো! খুব ভালো অভ্যাস! কাগজ পড়ার মধ্যে থেকে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে—কিন্তু ভবি এতে ভোলে না। বাবা, মানুষ মানুষকে মেরে ফেলে কেন? বাবা গম্ভীর হাসি হেসে বলে, পৃথিবীর জটিলতম প্রশ্ন। রাগ হলে মেরে ফেলে বাবা। খুব রাগ হলে। বাবা, মামা যদি একদিন খুন হয়ে যায়? বাবা চমকে উঠে কঠিন দৃষ্টি হেনে বলে, এ আবার কী অলক্ষ্যে কথা? খোকা, তোমার মাথার মধ্যে যে কী আছে, আজ পর্যন্ত বুঝলাম না। খবরদার যেন আর কখনও তোমার মুখে একথা শুনি না। বলবে আর কোন-দিন আর এমন কথা? বল? বলবে? খোকা অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, না। বাবা একটা সিগারেট ধরায়। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় না। অন্য কিছু ভেবে কে জানে, একটু নরম গলায় বলে, ছোট-ছেলেদের সব কথায় মাথা দিতে নেই বুঝলে? লেখাপড়া করবে, খেলাধুলো করবে, বাস। খবরের কাগজ যে পড়িস বললি, যুক্তাক্ষর পড়তে পারিস? খোকা ঘাড় কাত করে। বাবা একটু হেসে বলে, তা হলে আন ওই কাগজটা—পড় এখানটা। খোকা একটু খালি চোখ বুলিয়েই অবাক হয়ে বলে, বাবা পৃথিবীতে প্রদীপকুমার বসু আরোও আছে? বাবা হেসে ফেলে বলে, কেন? এই যে কাগজে লেখা রয়েছে, স্বতন্ত্রপ্রার্থী প্রদীপকুমার বসু—বাবার মুখের রংটা আলো আলো হয়ে যায়। আরে পাগলা এটাতো আমারই নাম! খোকার কাছেও আমারই বলতে বেশ গৌরব বোধ করে বাবা। তোমার নাম? তোমার নাম ছেপেছে? কী মজা! খোকা যুক্তাক্ষর পড়তে পারে, কিন্তু মানে বুঝতে পারে না। বলে, বাবা স্বতন্ত্র মানে কি? স্বতন্ত্র মানে? মানে আলাদা একা আলাদা প্রার্থী মানে কী? বাবা বাক্যের সূত্র দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে ছেলেকে, যে প্রার্থনা করে তাকে বলে প্রার্থী। খোকা কথাটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতেই বোধহয় তার পাঠ্যপুস্তকের একটা লাইন আওড়ায়। ভিক্ষুক ভিক্ষা প্রার্থনা করে। খোকা মলিন মুখে বলে, বাবা তুমি প্রার্থনা করবে? ভিখিরি হয়ে গেছো? বাবা হেসে বলে, আরে না। আমি কি টাকা পয়সা প্রার্থনা করতে যাচ্ছি? আমি যা প্রার্থনা করছি—তার নাম ভোট। ভোট মানে কি বাবা! 'ওসব এখন তুমি বুঝবে না খোকা ছোটদের বোঝবার নয়। তুমি বুঝিয়ে দাওনা বাবা! ভোট কী? সেটা নিয়ে তুমি কি করবে? আঃ খোকা, তোর এই প্রশ্ন করা অভ্যেস আর গেলো না। ভোট পেলে আমি দেশের একজন লোক হবো। আমরা দেশের লোক নই বাবা? বাবা রেগে উঠে বলে, সব্বাই দেশের লোক, কিন্তু সব্বাই কি দেশের কাজ করতে পারে? তুমি পারবে বাবা? বাবা চড়া গলায় বলে, পারবই তো পারাবার জন্যেই তো—দেশের কাজ মানে কী বাবা? উঃ। পাগল করে দিলো। কী লক্ষণেই জন্মেছিলো এ ছেলে। দেশের কাজ হলে সকলের ভালো করা হলো? কিন্তু কই আর হয়? খোকার বাবার এই খোকার মত লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের অভ্যেস সহজে হয় না। খোকা সেই নির্বোধ একগুঁয়ে গলায় বলে, সকলের কী ভালো করবে? বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। নিজের চুল নিজেই ছিঁড়ে চীৎকার করে বলে, এই বিদঘুটে লক্ষ্মীছাড়াটা কেন জন্মেছিলো আমার ঘরে? কেন? আমায় পাগল করবার জন্যে? তুমি বাজে বকছো কেন বাবা, তুমি বুঝিয়ে দিচ্ছো না কেন? বাবা ছেড়ে এসে ছেলের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বলে, কী ভালো করব জানিস? এই! আর চাস বুঝতে? খোকার মুখটা লাল হয়ে ওঠে, খোকার চোখটা জলে ভরে আসে। খোকা বাবার ঘর ছেড়ে চলে যায়। আর কিছু বুঝতে পারে না খোকা। বা বোঝবার খোকা হয়ে গেছে। এখন থেকে খোকা আর তার সেই প্রশ্নের স্বাক্ষীটার মুখে খুলবে না, ফাঁস টেনে পিঠ পড়িতে রেখে দেবে। আর পৃথিবীর দিকে ঔদাসীন্যের দৃষ্টি ফেলে ঘুরে বেড়াবে।

প্রকাশিত হল :

ফোটা পদ্মের গভীরে ১৪·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

কামনার সুখ দুঃখ ৬·৫০

"শঙ্খ বিষ" নামে সিনেমায় রূপায়িত হচ্ছে

প্রলয় সেনের

সীমাস্বর্গ ৮·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন ভুবন ৫·০০

চিরঞ্জীব সেনের

অপরিচিতা রূপসী ৪·৫০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চুপি চুপি আঁধারে ৫·০০

সুধাংশু রঞ্জন ঘোষের

রামায়ণী প্রেমকথা ৬·৫০

আসন্ন প্রকাশ : গোয়েন্দা কর্ণেল ৬·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রকাশ গ্রন্থাগার : ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

CENTRAL LIBRARY

মাথা

শক্তিকান্ত গুহ

আমি চিরকুমার। এবং চিরদিনের একাকীত্বে, ইউক্লিড ও কৌমিনির মতো নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্গতম। সুতরাং আমার সংসার বলতে কিছু নেই। এছাড়া আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল নিতান্ত স্নেহবশে আমার নামে কয়েক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে বিশেষ করে যেহেতু কাজে আমার গোড়াবেলা থেকেই প্রবল আপত্তি, আমার ভবঘুরে হবার পথে কেন বাধাই রইল না। বাধা হয়ে দাঁড়াল আমার চরিত্রগত আলস্য। ভবঘুরে হতে গেলে উঠে বসতে হয়, বাকল-পেটরা গোছাতে হয় ভেবে আমার হৃৎকম্প হত। আমার আলস্যে অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যাতে কেউ অনর্থক সন্দেহ পোষণ না করেন ঘোড়ায়ই বলে নেওয়া ভাল আমার বয়েস চল্লিশ, দেখে মনে হয় তিরিশ। এতেও আমার পক্ষে দুষ্কৃতঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। তার একমাত্র কারণ আলস্য, অটিলতা অদ্ভুতপূর্ব আলস্য। যাঁরা আমার এ-উক্তি পরিহাস জ্ঞান করে হাসবেন, তাঁরা আমার চৌবাচ্চার মা দিকের ছয়ারের তরুণীদের ও তরুণীভার্যাপ্রাপ্ত প্রৌঢ়দের চিঠির তাড়াগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। প্রাণীজগতে আমি অমন তুলনা খুঁজে পাই না। অবশ্য নাম্বের সে জীবটির কথা এ প্রসঙ্গে কারো কারো মনে আসতে পারে, তার সম্বন্ধে অমার বিশেষ আপত্তি। পাতা খেতে তাকে পাশ ফিরতে হয়: দেহকুণ্ডল, না অন্তিহাস, জানি না। তবু পাশ ফিরে উঠে সে আলস্যের প্রাথমিক নিয়ম ভঙ্গ করে। হয়তো বিশেষ জরুরী এবং দ্বিতীয় উপায় না থাকায়। কিন্তু যেহেতু নাম্বের আচরণ সন্দেহমুক্ত নয় তাকে সমগোত্র হিসেবে মেনে নিতে আমার সংস্কার ও বিবেকে বাধে। স্বীকৃত ইতিহাসে আমি অনন্য। মহাকাব্যের যুগের কুম্ভকর্ণের কথা অবশ্য থেকে-থেকেই মনে হয়। তবুও, কুম্ভকর্ণেরও পদস্খলন হয়েছিল। তিনিও একদিন, যে কারণেই হোক, লঙ্কাযুদ্ধে বিলক্ষণ দাপাদাপি করে লণ্ডভণ্ড বাধিয়েছিলেন। যাঁরা আমাকে সজীব জড়পিণ্ড ভেবে মানুষের হিসেবের খাতা থেকে মনুষ্য নামটা বাদ দেবার পক্ষপাতী তাঁরা শুনে বিস্মিত হবেন যে, আমি একটি গভীর অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখিদের কাল্পনিক তপস্যা নয়। জীবনের সুগভীর স্তরে সঞ্চারী মনের অনন্ত যাত্রা। এ যে কি এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, তা খানিকটা বোঝান সম্ভব। যাঁরা অন্ততঃ চোদ্দ আনা অলস, সেই মুষ্টিমেয় মানুষরাই আমার উক্তির তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝবেন। জীবনধারণের প্রয়োজনে কয়েকটি খুঁটিনাটি কাজে যেহেতু নিয়োগপ্রাপ্ত হতেই হয়। ঐ গৌণ ভূমিকায় দেহকে ব্যস্ত রেখে মন আঁকড়ে পড়ে থাকা এবং মানুষের জীবনের সবকটা ফাঁকে উঁকি দিয়ে গুপ্ত তথা উদ্ঘাটন করা যে কি এক রোমাঞ্চকর কাজ তা শুধু আমার মতো নিরলস-অলস মনুষ্যরাই জানেন। এ প্রসঙ্গে স্থান-মাহাত্ম্য বিষয় উল্লেখ না করলে এ-আলোচনা অনেকটা অবাস্তব মনগড় ঠেকবে। অনেকের মতে প্যারী যেমন ভবঘুরেদের রাজধানী, আমার মতে কলকাতা হচ্ছে কুঁড়েদের স্বর্গ। এ-শহরে সাধারণ জীবনযাত্রার বাঁধাধরে যত অব্যবস্থাই থাক না কেন, চারদিকে কুঁড়েমির অপরিমিত অবকাশ। এখানে কাজ করতে করতে মানুষ আর অজ্ঞাতসারে কুঁড়েমির ডাকে সাড়া দেয়। কান পাতলে শোনা যায় কে যেন কয়েকটা পর্দার আড়ালে নীচু পর্দায় অথচ গভীর স্বরে বলে চলেছে 'এসো এসো। কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে আমার পথে এসো।' এই কলকাতা শহরে নির্জ্ঞাটে আমি বছরের পর বছর কাটাচ্ছি। সমাজ কুঁড়েমিকে গাল দেয়, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কুঁড়েকে মাথায় করে নাচে। তার কারণ, বাইরে থেকে অনেক কুঁড়েকেই বিশেষ ব্যস্ত লোক বলে মনে হয়। কাজের ফলাফলে যার কিছুই আসে-যায় না, তার পক্ষে একাধিক কাজে জড়িত হতে বাধা কী? যে-কুঁড়ের অর্থবল আছে, সে যদি বাগ্‌যন্ত্র না হয় এবং বাহ্য জগতে সমাজের মন জুগিয়ে চলতে পারে, সমাজ তাকে মাথায় করে নাচতে দ্বিধা করে না। আমার এত কথা বলে ভনিতা করার অর্থ এই যে আমি একটি বিশেষ শ্রেণীর কুঁড়ে। শহরে নানা অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি। কাগজে এখানে-সেখানে মাঝারি ও ছোট হরফে আমার নাম উল্লেখ করা হয়। কাগজান্তরে আমার ছবিও ছাপা হয়। আমার মেসার ভাঙলে কখনো-সখনো ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কান ঝালাপালা

হয়। এর অর্থ এই নয় যে, আমি সমাজকে প্রতারিত করছি। কাগজে যা ছাপা হয় এবং লোকমুখে যা শোনা যায়, যদি বিশ্বাস করেন তাহলে না মেনে উপায় থাকে না যে, সমাজ আমার কাছ থেকে চতুর্বর্গ ফল পাচ্ছে। অদৃষ্ট তবুও একদিন আমাকে জীবনের ঘাসজমিতে টেনে নিয়ে এক কুটির পাকে ফেলে দিল। তারপর কি হল, একথা বলার সময় এখনও নয়। কারণ এই মুহূর্তে আমি সেই পাকে পড়ে মরে হবার চেষ্টা করছি। আমি বিপন্ন। আমার কুঁড়েমির ইতিহাসে মহাসংকট উপস্থিত। সন্ধ্যাটা আমি গঙ্গার ঘাটেই কাটাতাম। যেদিন বেঞ্চ স্থানাভাব হত, কোন একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান বেছে নিয়ে কাগজ বিছিয়ে বসতাম। যখন যে কাগজের উপর আক্রোশ থাকত, তাতেই একটা ফর্দ পেতে চেপে বসতাম। শত্রুমর্দন করছি ভেবে বেশ একটা তৃপ্তি পেতাম। বাড়ীর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ হত না। আমি নিজেকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতাম। গঙ্গার ঘাটের পৃথিবীটা মাতৃকণ্ঠের বলে মনে হত। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজেকে একটি ঈষৎ স্পন্দিত ভ্রূণ কল্পনা করতে ইচ্ছা বা যুক্তির দিক থেকে কোন বাধা পেতাম না। আমি সেখানে সচরাচর বসতাম তারই বাঁদিকে খানিকটা তফাতে একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে কোনদিকে দৃকপাত না করে সোজা নিজের জায়গায় এসে বসতাম। লক্ষ্যই করিনি যে, বাড়ি তৈরী শেষ হয়ে গিয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় ওদিকে চোখ পড়তে দেখলাম বাড়িটা শুধু শেষ হয়নি, জেগে উঠেছে। টানা কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে দোতলার ছোট হলঘরটা দেখলাম। আলোয় ঝলমল। আরামে আলেসা এ-ধারে ও-ধারে একদল মানুষ। বুঝলাম ওখানে সভা জীবনের এক পরিচিত কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। চা ও কফির রেস্তোরাটা একেবারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে উঠেছিল। তখন থেকে ঐ রেস্তোরাঁয় আমি আসতে শুরু করলাম। প্রায় প্রতিদিনই আসতাম। কাঁচং ন মাসে ছ' মাসে একদিন, এই ঘটনের বাতিক্রম ঘটত। গঙ্গার ধারে জানলা ঘেঁসে একটা টেবিলে বসতাম। আমি জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পাড়ের ধারে স্রোতের মুখে ছোট-ছোট মাছের খেলা দেখতাম। দেখতাম নৌকো স্টিমার ও জাহাজের পৃথিবীটার ও-ধারে আর একটা জগৎ জেগে উঠছে। দিনের ছাওড়া-শিবপুর কখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত! দিনের আলোয় সে মানচিত্র সত্য বলে মনে হত, সন্ধ্যায় মনে হত তার চেয়ে বড় মিথ্যে আর নেই। আকাশে একে একে তারা ফুটত। আমার মনে একটা স্বপ্ন শুরু হয়ে যেত—ঐ যে দূর আকাশ ও কি আমাদের ঘরের দূর না বাইরের সুদূর? রেস্তোরাঁ কখনো বেশ ফাঁকা থাকত। কখনো সেখানে ভিড় জমত। আমি কিন্তু আমার টেবিলে আমার কুঁড়েমির তত্ত্ব আঁকড়ে আত্মিকী মেজাজে বসে থাকতাম। মাঝে-মধ্যে ভদ্র হত কেউ এসে টেবিলে মুখোমুখি না বসে পড়ে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই, অন্য কোন টেবিলে জায়গা না থাকলেও আমার টেবিলে সচরাচর এতিহ্য চলত। শুনেছি জন্তু জানোয়ার, বিশেষ করে শেয়াল মানুষের মনের কথা টের পায়। আমার নতুন বিশ্বাস এমন একটি মনুষ্যের একরম কোন ক্ষমতা না থাকলেও মানুষের ভিড়ে এই ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের ভিতর এসে যায়। অন্য কোন টেবিলে স্থান না পেয়ে আমার টেবিলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার মুহূর্তে হঠাৎ কারো চোখে চোখ পড়লে স্পষ্ট বুঝতাম সে নিঃশব্দে বলছে, নিজেকে নিয়ে তুমি সুখে থাকো। তোমাকে ঘাটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।' রেস্তোরাঁর মালিকের থেকে শুরু করে স্টুয়ার্ড, বয়, বেয়ারা সকলেই আমাকে চিনে নিয়েছিল। আমার টেবিলের কাছে এসেই তাদের চলার গতি মন্থর হয়ে যেত। কথা বলতে গিয়ে তারা গলা নামিয়ে নিত। রেস্তোরাঁয় যত ভিড়ই হোক না কেন সন্ধ্যায় গিয়ে আমার টেবিল খালি পেতাম। শীত তখনও পড়েনি। কিন্তু হাওয়া ঈষৎ ধারালো হয়ে উঠেছে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব মাঝে-মাঝে নিঃশব্দে নরম দাঁতের মতো চামড়া কেটে বসছে। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণা এই মধুর আক্রমণে সাড়া দিচ্ছে। আমিও কুঁড়েমির সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে গঙ্গার ঘাটের পৃথিবীর উপর কৃপাকটাক্ষপাত করছি। রেস্তোরাঁয় তখনও তেমন ভিড় জমেনি। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কুঁড়েমির স্বর্গে অনুপ্রবেশ ঘটল। কফির পেয়ালা সম্মুখে নিয়ে কয়েকটা উড়ো চিন্তায় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল। অনুভূতির কোথাও একটা সূক্ষ্ম সংকেতে সজাগ হয়ে পড়লাম। পরমুহূর্তে টের পেলাম আমার টেবিলের একাংশে অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। আমি মুখ তুলে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তে অমর উভয়েই যেন চমকে উঠলাম। আগন্তুক আমার ভিতর কী লক্ষ্য করেছেন বলা কঠিন, কিন্তু তাঁর ভিতর আমি আমার মনের শিকড় ধরে নাড়া দেবার মতো একটি বাস্তবের প্রত্যক্ষ করলাম। আগন্তুক যুবতী। সুবেশা, সুরূপা। মুখের প্রতিটি রেখায় দৃঢ় চরিত্রের ছাপ। আগন্তুক যেন অন্ত-পৌরের মানুষ নন। দেহের ছন্দ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি কণ্ঠস্বর, চক্ষের চাহনি, সব কিছুই যেন উচ্চ মার্জিত জীবনের ছকে ফেলে রেখে দেওয়া। রেস্তোরাঁয় স্থানাভাব হয়নি, আমার টেবিলে হানা দেবার কোন কারণ ঘটেনি এই ইঙ্গিত প্রবল চেষ্টায় আমি একবার এদিকে সেদিকে তাকালাম। আগন্তুক অপ্রস্তুত হলেন। হয়তো অপ্রস্তুত হয়েছেন এই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই একটু বসি।' নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম 'আপনি স্বচ্ছন্দে বসতে পারেন।' হেসে বললেন, 'জনলার ধারে চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছেন। বাইরে থেকে দেখেই লোভ হয়েছিল।' আমি উত্তরে হাসলাম। আগন্তুক বললেন, 'কাজটা বোধ হয় পরের মতো হল। কিছু না বলে মনে করলেন।' সোজনোর খাতিরে বললাম, 'কিছুই মনে করিনি। মনে করব কী আছে?' আগন্তুক বললেন 'আমি হলে তো কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতাম।' আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'কেন বলুন তো?' আগন্তুক হাসতে-হাসতে বললেন, 'নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যের চিন্তায় তন্ময় হয়ে বসেছিলেন। সেই সময়ে এসে উৎপাত করছি। ধ্যান-ভঙ্গ করেছি। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা তো এসব ক্ষেত্রে শাপ দিয়ে বসতেন।' বললাম, 'এই রকম ধ্যান চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর আমার কোন ছুটা চব্বিশ ভোগে গেলে অনায়াসে জোড়া দেওয়া যায়।' আগন্তুক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কী? ধ্যানী মানুষ, বিশেষ করে তাঁর প্রশান্ত মুখে নিমীলিত চক্ষু, আমার জীবনের স্বপ্ন।' সাধে কি আপনার টেবিল দেখে লোভ হচ্ছিল। বয় এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াতে আগন্তুক দু-কাপ কফি ফ্রেঞ্চ ধানে বলে-ছিলেন। নির্ঘাৎ জুড়িয়ে গিয়েছে। তারপর ঈষৎ হেসে বললেন, 'হঠাৎ চড়াও হয়ে আপনার টেবিলে বেডাবে জাঁকিয়ে বসেছি। যদি ভাবেন কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছি—বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কী কথা!' আগন্তুক বললেন 'আশ্বস্ত হলাম। এখন পরিচয় দিয়ে আপনার সন্দেহ খানিকটা নিরসন করি। আমার নাম মহারানী দেবী। এ শহরে নতুন। মাস ছয়েক এসেছি। কত-দিন থাকব ঠিক করিনি। উত্তর মুলুকে থাকি। সত্যি কথা বলতে কোথাও বেশী দিন থাকি না। দেশ থেকে দেশে, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াই।' পরিহাস ছলে বললাম, 'অর্থাৎ ভবঘুরে।' মহারানী যেন আমার টিপ্পনীর ভিতর একটি নতুন সত্য

আবিষ্কার করলেন। অপ্রস্তুত মুখচোখ করে বললেন, 'আমার মনের কথাটা ধরে ফেলেছেন। ভবঘুরের কথাটা শুনতে কেমন লাগে। কিন্তু কয়েকটা বছর তো এই কাজই করে বেড়াচ্ছি।' কিছুক্ষণ পর বললেন, যে কাজে হাত দিয়েছি, ভবঘুরে না হয়ে উপায় কী? আমার মনে হল একটা অস্বস্তিকর চিন্তা যেন তাঁর মুখে ছায়া ফেলল। বিষয়টা হাল্কা করে নেওয়ার জন্যই বললাম, 'আপনাকে তো ভবঘুরে বলে মনে হচ্ছে না। এখন নিজের সম্বন্ধে কী বলবেন?' মহারানী সকৌতূহলে আমাকে দেখতে লাগলেন। বললাম, 'আমি এ-শহরের সবচেয়ে নরম ও ঘটি কুড়ো সম্প্রতি চাকরিতে ঢুকেছি। আজ পর্যন্ত এক ইঞ্চিও কাজ করিনি।' মহারানীর মুখে কৌতূহল ও কৌতুকের মিশ্রিত হল—আমি বললাম কাজ করিনি। কিন্তু হাজরা ছাড়া এক মুহূর্ত অপচয় করিনি।' মহারানী মুখে কৌতূহল ও কৌতুক অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকাশ্যে গভীর বিস্ময় বললেন, 'অদ্ভুতনির্দিষ্ট চিন্তা করেছি।' চিন্তা-সমস্তে আমি যে পঁয়ত্রিশ সাতার সিদ্ধান্ত বা পৃথিবীর যে কোন লোকের সাতাত্তরের রেকর্ড মহারানী সভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এত চিন্তা করেন! কিসের চিন্তা?' সাহঙ্কারে বললাম, 'তুচ্ছ কাজ-কারবারের চিন্তা নয়। সঙ্কীর্ণ জীবনের বলাবলের পাপ-পুণ্যের চিন্তা নয়। বিশ্বের নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ চিন্তা। আমার চিন্তার সুবিধের মতো দেখলে এক্ষুণি রসাতলে যাওয়া যায় সেদিকেও ওজা চলে। মহারানী গাঢ়স্বরে বললেন, কোথাও যেতে চাই না। এখানেও

না, বসাতেও না। অপলক মতো একটি পলক ফেলে চিন্তাসমুদ্রের পারে বসে সময়টা কিন কাটাতে চাই।' আমি দেখলাম মহারানীর দুটি চোখ অলক্ষিত এক অকালের শিশিরে ভিজে ছলছল করছে। বয়স কমে গিয়েছিল। একটা দেয়ালায় তিনি হেলিয়ে মহারানী সম্বন্ধে আমার সম্মুখে এগিয়ে দিলেন। হেসে বললেন, 'চেখে দেখুন। এক বৃষ্টি কম-বেশী নয়। চিনির ব্যাপারে আমার অভ্রান্ত বিচার। কখনো ভুল হয়েছে মনে পড়ে না। তাঁর কথায় আমার মনের একটা নৈসর্গিক সাড়া নিতে উন্মুখ হল। আত্ম-সমর্থন করব আগেই বলে ফেললাম, 'চিনির ক্ষেত্রে শুধু নয়। মনে হয় তাঁর চেয়ে অনেক দামী জিনিসের বেলায় ও' মহারানী তাঁর দেয়ালায় চিনি মেলাচ্ছিলেন। আমার কথায় সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাত কেঁপে গেল। 'কয়েকটা বস্তি ছলকে পিরিচের উপর পড়ল। আমি পিরিচটা সাফ করার জন্য হাত বাড়াতে মহারানী বাধা দিতে গেলেন। আমার হাতের উপর হাত পড়তে সঙ্কোচে নিলেন। কিন্তু সরাতে গিয়ে দু-তিন সেকেণ্ড বিলম্ব হল। মহারানীর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল। মহারানী চোখ নামিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর মহারানী হেসে বললেন, 'আপনার ভবঘুরে কথাটা আমার মন থেকে সরাতে চাইছি না। থেকে-থেকে আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। আর কেউ এভাবে পিরিচে বস্তি ফেললে আমি আহত উঠতাম।' স্পষ্ট বুঝলাম মহারানী চিনির প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। বললাম, ভবঘুরে হবার একটা লোভ চিরকালই আমার ছিল। কিন্তু কুড়োর সঙ্গে ভবঘুরের আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক। সেজন্য যে কুড়ো সে কুড়োই থেকে গিয়েছে। তবে আপনার কাছে ভবঘুরের কথাটা খাটে না। আপনি বিশেষ কাজে কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে-ছেন, আপনাকে ভবঘুরে বলা কী করে?' কথা বলতে গিয়ে মহারানী থেমে গেলেন। তারপর নিবিড় দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, ঠিক বোঝাতে পারব না। বাধা আছে। কিন্তু আপনার চিন্তার সঙ্গে আমার কাজের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। মানুষ মাথা দিয়ে চিন্তা করে। মাথার কী দাম আপনাকে বলে বোঝাতে হবে না: ঐ মাথা, চিন্তার উৎস ও আধার মানুষের মুকুট ঐ মাথা, আমাকে ঘরছাড়া করে দেশ-বিদেশান্তরে ঘুরিয়ে মারছে।' মানুষের দৃষ্টি কোথায় চলে গেল? জীবনের কোন নীরন্ধ্র অন্ধকারে? সভ্যতার আদি যুগের কোন অরণ্যে? আমি বললাম, 'এতক্ষণে ছেঁয়াসি পরিষ্কার হল। আপনি তাহলে একজন নৃতত্ত্ববিদ।' মহারানী তৎক্ষণাৎ হাঁ না বললেন না কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার চিন্তার মতো আমারও কাজের শেষ নেই। কেন নেই এই মুহূর্তে বোঝানোর উপায় নেই।' মহারানীর মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটল। চেয়ারের পাশ থেকে তাঁর বিরাট ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে চলতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। ফোন রেখে নীচের তলায় নমস্কার মুহূর্তে সিঁড়ির প্রান্তে তিনি একবার থমকে দাঁড়ালেন। দেখলাম তাঁর সুচিক্কণ ট্রলি বেস্তরাঁর সবকিছু দু পাশে সরিয়ে রেখে আমার উপর পড়েছে। পরদিন রেস্তরাঁয় গিয়ে আমি স্তম্ভিত হলাম। মহারানী আমার টেবিলে আমার উল্টো দিকের চেয়ারটায় বসে আছেন। পিছন থেকে দেখে বুঝলাম তিনি চিন্তা-মগ্ন। তাঁর দেহ নিশ্চল। কোন সাড়া নেই। আমি টেবিলে পৌঁছে বসতে গিয়ে আমার চেয়ারটা ধরে টান দিতে চমকে উঠলেন। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, কী আশ্চর্য! আপনি এসেছেন টেরই পাইনি। বসুন। বসুন।' আমি রসিকতা করে বললাম, 'অবশ্য আশ্চর্যের ব্যাপার, আগে-আপাতুনে আপনি আমাকে অতিথি বানিয়ে ছাড়লেন। কাল এসে হয়তো দেখব আপনার হুকুমে আমার টেবিলে আমার বসা নিষেধ হয়ে গিয়েছে।' মহারানী হেসে উঠলেন। খর-তীব্র নয়, কিশোরীর তরল হাসি। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে একটা কথা বার-বার মনে হচ্ছে যে, সত্যি-সত্যি কাজ এড়াতে পারলে, ফাঁকি দিতে পারলে একটা সহজ সুখের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। কাজ হচ্ছে জীবনের গ্রহণ। ঐ গ্রহণমুক্ত হতে গিয়ে মানুষকে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করতে হয়। সে বড় হয়, ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লেখে। কিন্তু সুখ? কাজের পৃথিবীতে সুখ কোথায়? কাজের গা জুড়ে ছোট বড় অসংখ্য ফাটল। ঐ ফাটল দিয়ে অতৃপ্তি, ব্যর্থতা এসে ঢোকে। সুখ-দুঃখের জোড় হিসাবে দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে। দুঃখের বোঝা কাঁধে বয়ে মানুষ যখন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তখন পৃথিবীর চোখে হয়তো নিজের চোখেও সে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বড় হওয়া আর সুখী হওয়া তো এক জিনিস নয়। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মহারানী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন কিন্তু মুস্কিল কাজ যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায়। তখন কাজের পিছনে মানুষ ছুটে মরে। প্রতি মুহূর্তে কাজের হাতে ছিবড়ে হচ্ছে জেনেও। উদ্দেশ্য আদর্শ হচ্ছে বড়র কথা। অথচ করুণ হচ্ছে নেশা। ঐ নেশাই কাজের পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখে।' মহারানীর কাজ সম্বন্ধে এই খেদোক্তি আত্ম-বিশ্লেষণের মতো শোনাল। নিশ্চয়ই কোন কারণে তাঁর মন-মন ক্লান্ত। আমি বললাম, 'ক্ষয় হতে হতে মরতে মরতে মানুষ কাজের চিতায় দিয়ে কীর্তি রেখে যায়।' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আমি বললাম, ব্যক্তিগত কারণে আমি কুঁড়ে। কুঁড়েমির বদনাম বলেও অস্বীকার করা হবে না। কিন্তু অদৃষ্ট কুঁড়েদের হাতে মানুষের ইতিহাস বা ভবিষ্যৎ তৈরী করার ভার দেয়নি। সে দায়িত্ব কাজের মানুষদের। বিশেষ করে কাজের নেশাখোরদের। আমার কথায় কান না দিয়ে মহারানী বললেন, কাজের বোঝা আরো ভারী ওঠে যখন

আপনার?' আমি শিউরে উঠলাম। মহারানী তাঁর ধারালো তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করে বললেন, যখন কাজ মানুষের চোখের আড়ালে করতে হয়। যখন কাজের অর্থ এত সূক্ষ্ম এত জটিল যে খুলে বলা চলে না। কাজ গোপনে শুরু হয়ে গোপনে শেষ হয় বলে কীর্তির বা খ্যাতির প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র পুরস্কার আত্মপ্রসাদ।' আমি বললাম, আপনার কাজ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত হবে না। বুঝতে পারছি। সম্রাগোপন আপনি নৃতত্ত্বের একটা কঠিন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।' মহারানী তিক্তকণ্ঠে বললেন, নৃতত্ত্ব বলতে সভ্যতার বা বোঝায় তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ফাঁকা মাথার খুলি নিয়ে গবেষণা হু সাকর নয়, কুৎসিত।' আমি বললাম, আপনি কি মাথার ফটো তুলে নেন না কুমোর বা ভাস্করকে দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরী করান?' আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মহারানী বললেন, 'আমার কাছে মানুষের নীচের দিকটার কোন দাম নেই। এমন কি হৃদয়েরও তেমন দাম নেই। গোটা মানুষের হৃদয়েরও তেমন দাম নেই। গোটা মানুষের ইতিহাস বা তত্ত্ব লিখতে গেলে সব কিছুরই কম-বেশী দাম ধরতে হয়। কিন্তু আমি গোটা মানুষের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার লক্ষ্যস্থল হচ্ছে তার মাথা। মাথার তত্ত্ব নয়। মাথার কবিতা। সারি-সারি অজস্র সুন্দর মাথার একটা পৃথিবী গড়ে তোলার নেশায় আমি পাগল। এখন আমার ছত্রিশ বছর চলছে। বাইশ বছর বয়সে এই আশ্চর্য কল্পনা আমার মাথায় আসে। তারপর চোদ্দ বছর দেশ-দেশান্তরে লোক-চক্ষের আড়ালে কঠোর পরিশ্রমে তিলে-তিলে কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছি। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিনি। বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্য করিনি।' কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি বললাম, 'আপনি নিজেই হয়তো স্কালপ্টর। সেজন্যই হয়তো একা গোপনে কাজ করতে পারছেন।' মহারানী আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'অনেকটা তাই। মাথার ব্যাপারে কারো উপর নির্ভর চলে না।' আমি বললাম, 'আমার কুঁড়েমির ঝঞ্ঝাট না থাকলে আমি আপনার কাজে লেগে যেতাম। আমার উপর আপনি অনায়াসে নির্ভর করতে পারতেন।' মহারানী গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'যদি জানতেম আপনাকে দিয়ে আমার কী প্রয়োজন!' আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। আমি কিছুটা অভিভূত হয়েই বললাম, 'আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারলে সুখী হব।' মহারানীর দুটি চোখ মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে নিভে গেল। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন 'একটা বড় প্রব্লেমের বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে। তবু আপনাকে আমার কাজে লাগাতেই হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিসের বাধা?' মহারানীর মুখে একটা ম্লান হাসির আভাস দেখলাম। ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে দেখলে বোধ-বার গোটা মানুষটার কথা মনে পড়ে। শুধু মাথার

বিজ্ঞান ভারতী

(বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান) মূল্য—১৬-৫০

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সংকলিত।

বিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষার্থী লেখক পাঠক ও সাধারণ জ্ঞাতার্থী মাত্রেরই নিত্য ব্যবহার্য তথ্যপুস্তক ও বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক বই।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী ৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

Eminent Historian Dr. R. C. MAJUMDAR'S

Latest works

(1) HISTORY OF ANCIENT BENGAL : 52.00

(2) HISTORY OF MEDIAEVAL BENGAL : 35.00

হিন্দুযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক কহ্লণ বিরচিত ও বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত

রাজতরঙ্গিণী ২০·০০

—অসামান্য গ্রন্থাবলী—

আশাপূর্ণাদেবীর রচনা সম্ভার

প্রথম খণ্ড ২০·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ২০·০০

অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত

ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল ১২·০০

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ২২·০০

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বনফুলের

পিতামহ ১১·০০ সপ্তর্ষি ৭·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র-এর সর্বাধুনিক উপন্যাস

বড়, ছোট এবং মাঝারি ১২·০০

জি, ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং ২২-এ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

Interpub/BB/65/15 Ben

কথা ভাবতে গিয়ে বাধা পাই, বাধা পাই। অথচ আমার কাজে আপনার চিহ্ন থাকবে না ভাবতেই পারি না। মহারানী উঠতে গিয়ে বসে পড়লেন। কী একটা কথা ভেবে তাঁর মুখ হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠল। বললেন, 'আজই কাজ ছোট রকমের একটা হোঁচট খেতে বসেছিলাম। একটি শিশুকে নিয়ে মুস্কিলে পড়েছিলাম। এ রকম সুন্দর মুখ ও নিখুঁত মাথা সচরাচর চোখে পড়ে না। র‍্যাফেল বটিচেলীর ছবির শিশু। কলকাতার বস্তিতে এ শিশু গোবরে পদ্মফুল। কিন্তু হঠাৎ বাধা এসে গেল। মা বলে ডেকে হাসতে লাগল। আমিও আত্মবিস্মৃতে হয়ে তাকে আদর করতে লাগলাম। তারপর—মহারানী একটু থেমে বললেন, কোন রকমে কাজ শেষ হল।' আমি বললাম, 'আপনার মুখে বর্ণনা শুনে এই শিশুকে দেখতে লোভ হয়।' মহারানী একটা চাপা উত্তেজনায় যেন কাঁপতে লাগলেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে ভারী জানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে ফিসফাস করে বললেন, 'দেখবেন?' আমি বললাম পাথরে খোদাই করার আগে স্কাল্পটার অব প্যারিসরা তুলে নিয়েছেন বুঝি!' মহারানী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দু হাতে শক্ত করে ভ্যানিটি ব্যাগটা ধরে ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। তাই। তবে—আমার যে কী হয়েছে! কী বলতে কী বলি! কোথায় মাথা আর কোথায় আমি।' বলে মহারানী ঈষৎ হাসলেন। কিন্তু সে হাসি তাঁকে একেবারেই মানাল না। সে সন্ধ্যায় আলোচনা আর বেশী দূর এগোল না। কোন কারণে সম্ভবত ক্লান্তিবশত মহারানী স্বল্পভাষী হয়ে পড়লেন। আমরা যে যার গাড়ীতে উঠলাম। একবার মহারানী বললেন, আপনার বাড়ীটা দেখে গেলে ভাল হত। আপনাকে যখন কাজে লাগাবার সঙ্কল্প করেছি আপনারও আপত্তি নেই, এ অবস্থায় যে কোন সময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার হতে পারে।' তারপর কী ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ থাক। আজ বড় রকমের ধকল গিয়েছে। চোদ্দ বছরের বিরাট কাণ্ড পণ্ড হতে বসেছিল। এ কাজের এই হচ্ছে মুস্কিল। কখন কোথা দিয়ে বিপদ আসে বোঝা শক্ত। কোন রকমে দুকূল রক্ষা করেছি। যা হোক কাল দেখা হবে।' মহারানীর গাড়ী কয়েক মুহূর্তে অন্ধকারে অদৃশ্য হল। বাড়ী ফিরে এসে সাত তাড়াতাড়ি পেটে কিছু দিয়ে আমি শয্যা নিলাম। তারপর মহারানীর সঙ্গে আমার দু দিনের আলোচনার একটা খতিয়ান মনে-মনে খসড়া করতে লাগলাম। আমার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মহারানীর তুলনা খুঁজে পেলাম না। কূটনের বাদশা হলেও পড়াশোনা আমার নেহাৎ কম ছিল না। ইতিহাস কাহিনী-কিংবদন্তীতে শিল্পীদের সম্বন্ধে বিশেষ করে ভাস্কর্য কুমার পটুয়াদের নিয়ে লেখকদের কল্পনায় অতিরঞ্জিত অনেক আশ্চর্য-আশ্চর্য কাহিনী পড়েছি। কিন্তু মহারানীকে কোন একটা ছকে ফেলা সম্ভব হল না। তাঁকে আগাগোড়া একটা রহস্য বলে মনে হল। হয়তো তাঁর মনের ক্রিয়া এত সূক্ষ্ম ও জটিল, উদ্দেশ্য এত অসাধারণ যে সাধারণ মানুষের কাছে তার সাধনের কোন মূল্যই নেই। অকিঞ্চিৎকর এমন কি হাস্যকর মনে হতে পারে। হয়ত এমন একটা মস্তিষ্ক নিয়ে মহারানী জন্মেছেন যে তাঁর বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের সংস্কার ও বিবেচনার মিল হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তবু বার-বার মনের অতল থেকে প্রশ্ন উঠতে লাগল, কাজটা কী? যে শিল্পীদের ভাস্কর-কুমারদের চিনি-বুঝি, যত বড়, যত প্রতিভাবান ও কীর্তিমান হোন না কেন, যাঁদের কারো কারো সাধনা মানব-জাতির চিরকালের বিস্ময়, তাঁদের সঙ্গে মহারানীর তফাৎ কী? যে কাজ যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন, হয়তো আগাগোড়া গোপনেই করতে হয়। কিন্তু বিপদ? মহারানীর কাজে বিপদ কোন পথে আসে? কেন আসে? তাঁর আসল চেহারাটা কি রকম? ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মহারানীকে নিয়ে একটা অর্থহীন স্বপ্নও দেখেছিলাম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম মহারানীর চিন্তায় মাথা আধ মণ ভারী হয়ে আছে। ভোর হতে না-হতে উঠে পড়লাম। দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে অল্প একদিন কুড়েমির জন্য তৈরী হলাম বেস্তরাঁয়। সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলাম। উপলক্ষ্য মহারানী। কিন্তু সেই সূত্র ধরে চিন্তা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। পরিচিত তত্ত্বগুলো এক-একটা নতুন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল। জানলার পাশে গলার ঘাটের সন্ধ্যা প্রতিদিনের মতো অপেক্ষায় রইল। কিন্তু তার দিকে নজর দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। মনটা কলায়-কলায় রহস্যে ভরপুর হয়ে পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো অস্থির উত্তাল হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা অজ্ঞাত কারণে মনে হল একবার সিঁড়ির দিকে তাকালে কি রকম হয়। তাকালাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। দেখলাম মহারানী সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। আমি মুখ নামিয়ে আড়চোখে তাঁকে দেখতে লাগলাম। মহারানী সিঁড়ির দু-তিনটে ধাপ বাকী থাকতে দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্নিমেষে আমাকে দেখতে থাকলেন। তিনি যেন কোন আশ্চর্য দৃশ্য দেখছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অনন্ত ক্ষুধা, দেখে-দেখে তাঁর যেন ক্ষুধা মিটছে না। এভাবে আজ পর্যন্ত কোন নারী আমাকে দেখে নি। এ দৃষ্টিপাত নয়। দৃষ্টিসহবাস পূর্ণোচ্ছ্বাস। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি রক্তকণা সাড়া দিয়ে উঠল। এভাবে হার মেনে লাভ কী? সাহস সঞ্চয় করে সম্মুখে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তে মহারানী একটু চমকে উঠলেন। তারপর হাসতে-হাসতে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'এথেন্সে প্রাচীন যুগের কবিরা কী চোখে সূর্যকে দেখেছিলেন বোধহয় তোমাকে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে এই রকম একটা মহূর্তে সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে আপনাকে দেখতে হয়। দেয়াল থেকে আলো এসে আপনার মুখের উপর পড়েছে। যদি নিজেকে দেখতে পেতেন বুঝতেন চোখ ফেরাতে কতখানি আপত্তি আজ কী একটা আশ্চর্য ঘটনা! আমার মনে হচ্ছিল কয়েক যুগ আগের গ্রীসে ফিরে গিয়েছি। সিংহদরজার ওপর থেকে সূর্যোদয় দেখছি। চেম্বার টেলর বসতে-বসতে বললেন, দেখতে দেখতে ভোরটা জেগে ওঠে। অসহ্য আনন্দে কোন মানে হয়। ঐ কান্নাই তো গান। স্বপ্ন কাল বিস্মৃত হয়ে মহারানী নীচু পর্দায় গান ধরলেন। আশ্চর্য কণ্ঠে আশ্চর্য তান। সূর্যের মন্দিরের উজ্জ্বল। মেঝেটা মনে হওয়া-চওয়ার পুকুর হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য।

প্রকাশিত হচ্ছে !

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর

নতুন উপন্যাস

তোমার বসন্তের দিনে

সাহিত্য সংস্থা ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

স্থির হয়ে উৎকর্ণ হয়ে সবাই শুনলো। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন। অর্ধপথে থমকে গেলেন। আর সকলের মতো স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। গান শেষ হতে চারদিক হাততালির শব্দে মুখর হল। ম্যানেজার এগিয়ে এসে ইষৎ মাথা নুইয়ে বললেন, মাডাম! ইওর মিউজিক হাজ এনলেবলড মাই রেস্তোরাঁ। ইউ হ্যাভ গিভন আস এফিউ মোমেন্টস অব রিয়াল হ্যাপিনেস। উই অল আর মোস্ট গ্রেটফুল টু ইউ। মহারানী মাথা নুইয়ে অভিবাদন গ্রহণ করলেন। মনে হল বিগত যুগের এক ঐ এতাস্তিক চিত্র থেকে তিনি বার হয়ে এসেছেন। মুগ্ধ হৃদয়ের অভিবাদন গ্রহণ করছেন তাঁর কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। তারপর ধীরে-ধীরে আমার চোখের সম্মুখে বাস্তবের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল। দেখলাম আমার পরিচিত মহারানী আমাকে দৃষ্টিবিদ্ধ করে করে আমার সম্মুখে এসে বসেছেন। তবু আজ তাঁকে একটু স্বতন্ত্র মনে হল। তিনি যেন একটা সংকল্প করে এসেছেন। এবং এক মনে সে বিষয়ে চিন্তা করছেন। তাঁর মুখে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার আভাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সংকল্প দৃঢ় ও কঠোর। আমি কম্পিত কলেবরে করতে 'ধন্যবাদ' দেখলাম। খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললেন, এখনই উঠতে হবে। সময় নেই। সস্নেহস্মিত তাঁর দিকে তাকাতে বললেন আসুন। আজ আমাদের অনেক কাজ। মহারানী তাঁর গাড়ীতে আমাকে টেনে তুললেন। আমার গাড়ী ফেরত চলে গেল। মহারানী নিজে ড্রাইভ করবেন। স্টিয়ারিং ধরে বসলেন, আমি পাশে বসলাম। সেদিন সন্ধ্যারাই জমাট অন্ধকার, পথঘাট নির্জন। গঙ্গার ঘাট থেকে যে রাস্তাগুলো শহরে গিয়েছে কোনটাতেই জনমানব নেই। গাড়ী আস্তে আস্তে চলল। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, কোন তাড়া নেই। কাজতো নেই। অনেক কাজ বলে মহারানী আমাকে টেনে নিয়ে এলেন কিন্তু অনেক কাজের সঙ্গে গাড়ীর অলস গতির কোন মিল নেই। মহারানী অন্যমনস্কভাবে অনুমান করে বললেন আজ মন বেঁধে ফেলেছি। আজ রাতেই আপনি আমার কাছে লাগবেন। ভাবি নি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে। কিন্তু এই কদিন যা হবার নয় বলে ধরণা হয়েছিল হঠাৎ দেখছি তা না হয়ে পারে না। আমার কাছে আপনার ঠিক না থেকে পারে? মহারানীর পাশে গাড়ীতে বসে তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি নিজের ভিতর বিশেষ রকমের একটা পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। আমার মন আশঙ্কা ও উদ্বেগে বার-বার দুলে উঠেছিল। কিন্তু মহারানীর কাছ থেকে সরে যাবার কোন ইচ্ছাই নিজের ভিতর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মহারানী যেরাণী অন্তর্যামিনী হতে পারেন, এ রকম একটা যুক্তি আমার পক্ষে খণ্ডন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ আমারই ভিতর কে আমাকে বার-বার মহারানীর দিকে ঠেলে-ঠেলে টেনে আনছিল। মহারানী বললেন বুঝতে পারি কখনো-কখনো আমার মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে আপনি সন্দিহান হয়ে পড়েন। সেটা স্বাভাবিক। কারণ আমার কথাগুলো একান্ত আমার। আমার আগে এই কথা কেউ বলেছে কিনা জানি না, কিন্তু একথা ঠিক আমার মত করে কেউ বলে নি। আমি বললাম অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় আপনার কথাগুলো সম্পূর্ণ নতুন। মহারানী বললেন, 'এতদিন শুধু শুনেছেন। কাজে হাত দেবার আগে কথাগুলোর ভিতর ঢুকতে হবে। অর্থ বুঝতে হবে। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কেন মাথা নিয়ে আমার এত মাথা-ব্যথা পরোপুরি বোঝবার চেষ্টা করেছেন?' আমি একটা জবাব দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিলাম। আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মহারানী বললেন, 'একবার সৃষ্টির চারিত্রিক তাৎপর্যটা বুঝতে পারবেন। সবাই মাথা নিয়ে ব্যস্ত। সবাই মাথা তুলতে চায়। মানুষের কথা বাদ দিন। কে কতো মাথা তুলতে পারে নিজেকে জাহির করতে হয় মাথা তুলে দাঁড়ায়। হাতী শুঁড় তোলে, সিংহ কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়। যে সাপ মাটিতে বুকে হাঁটে, সেও আস্ফালন করতে গিয়ে ফণা তোলে। আমি বললাম, আশ্চর্য! মহারানী বললেন, 'প্রাণীজগতের কথা ছেড়ে জড়জগতে আসুন। দেখুন পাহাড় তার চূড়োয় মাথা তুলে সমুদ্র ঢেউয়ে, গাছ উঁচু ডালে। যার মাথা নেই সেও কোন-না-কোন কৌশলে মাথা তোলে। কেন জানেন? আমি একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। মহারানী বললেন, 'তাঁরের ফলার মাথা হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের তীক্ষ্ণতম প্রকাশ। সৃষ্টির আড়ালে যে সত্তা যে শক্তি, তারই স্থূল রূপ হচ্ছে মাথা। মাথাই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বত্র। সর্বভূতে। সেদিক থেকে প্রতিটি ধূলিকণা ঈশ্বর। কিন্তু মাথা হচ্ছে পূর্ণতম ঈশ্বর। ঈশ্বরের পরিপূর্ণ প্রকাশ। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। অন্ধকারে ঠিক তাঁর পাশে বসে মহারানীর কথাগুলি অমোঘ সত্য বলে মনে হচ্ছিল। মহারানী বললেন, মর্ত্যের হাতে সেই মাথার লাঞ্ছনা দেখুন। মানুষের মৃত্যুর পর তার মাথা হয় কবরের তলায় পোকার খাদ্য নয় শ্মশানে শেয়াল-কুকুর নিয়ে খেলা করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা যাই হোক, আমার একার শক্তিতে যেটুকু সম্ভব করে যাবো। মাথাকে জীবনের উঁচু বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে যাবো। আজ আমি আপনাকে পেয়েছি, আমার আনন্দের সীমা নেই। আজ আমি ধন্য। আপনিও ধন্য। আমার ভিতরে হঠাৎ কোথাও একটা কপাট খুলে গিয়েছিল। যে একটা ভয় ও সংশয় এতদিন চাপা পড়েছিল নিছক অন্যমনস্ক মনে করে যে ভয় ও সংশয়কে দেখেও দেখি নি সেই মুহূর্তে খোলা কপাট দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। গাড়ী ইতিমধ্যে রাস্তার এক পাশে থেকে গিয়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কে আমার দেহ-মন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। আমি চেঁচাতে গেলাম। অন্যমনস্ক না থেকে আক্রমণ করতে গেলাম। পারলাম না। আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। সেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তাতে অনুভব করলাম মুখের উষ্ণ রুমাল, তীব্র গন্ধ, হাতের চাপ। জ্ঞান সম্পূর্ণ হারানোর মুহূর্তে অনুভব করলাম কণ্ঠদেশে নরম হাত ও লালিত ইস্পাত। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম একটা কুয়োর পড়ে গিয়েছি। কিছুতেই উঠতে পারছি না। পিছল দেওয়াল ধরতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছি। চেঁচাতে গিয়ে কথা আটকে যাচ্ছে। এই সময়ে হঠাৎ দুঃস্বপ্নের জগৎটা একটা ঝাঁকের আওয়াজে ভেঙ্গে গেল। আমি এক অবসাদের গহ্বর থেকে ধীরে-ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম। জ্ঞান ফিরে পাবার মুহূর্তে বুঝলাম অবসাদের চেয়েও আমাকে বেশী অভিভূত করছে ভয়। প্রথমেই দুটি প্রশ্ন মনে এল, আমি কোথায়? মহারানী কোথায়? কলকাতার ময়দানে একাধিক মাতাল রাত্রিবাস করে বাড়ি ফেরে। তাদের একজন না হয়েও তাদেরই মতো সে মতে বাড়ি ফিরে এলাম। হাত-মুখ ধুয়ে শুতে যাবার আগে যে কারণেই হোক পকেটে হাত দিয়েছিলাম। একটা ভাঁজ-করা কাগজে হাত পড়েছিল। বার করে ভাঁজ খুলতে দেখলাম মহারানীর চিঠি। লিখেছেন : গোটা মানুষটাকে বেশী ভাল লেগে গেলে বিপদ। তখন মানুষ থেকে মাথা আলাদা করা চলে না। এই ভাল লাগার ব্যাপারটা ছাড়া আজ আর কোন বাধাই ছিল না। আপনাকে যেমনটি পেয়েছিলাম তেমনটি রেখে গেলাম। আপনার মাথার কথা চিরকাল মনে থাকবে। যদি কোনদিন গোটা মানুষটার চেয়ে আপনার মাথাকে বেশী ভাল লাগা সম্ভব হয়, আবার দেখা হবে। আপাতত বিদায়। পরদিন যথা-সময়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমার টেবিলে বসলাম। ম্যানেজার ঘরের এক কোণ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। এগিয়ে এসে অভিবাদন করলেন, মহারানী যে চেয়ারে বসতেন সেদিকে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উইল দিস ডিশ্রেইন এমপটি?' আমি কান্ত-হাসি হেসে বললাম, 'ইয়েস। শী ইজ আওয়ার।' ম্যানেজার কী ভেবে বললেন, 'গড ব্লেস হার।' ম্যানেজারের এ কথায় চমকে উঠলাম। সারাটা দিন যে চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই মুহূর্তে এই কঠিন প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হল। মাথার ঈশ্বরের মহিমা দেখে তাকে পেতে গিয়ে মহারানী কোন যুক্তিতে কোন পথে চলেছেন? আমি সত্যের দুটি মুখ আলো ও অন্ধকার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। মহারানীর দিকে সেই সত্য কি শুধু তার ভয়ংকর অন্ধকার মুখ তুলে ধরেছে? মহারানী আলোয় ফিরে আসুন, আমার মনের এই নিভৃত প্রার্থনা যেন শুনতে পেলাম। হয়ত একদিন আমাকে কুণ্ডলিনির ইতিহাস শেষ করে মহারানীর সন্ধানে স্বয়ংবরের ভূমিকায় নামতে হবে।

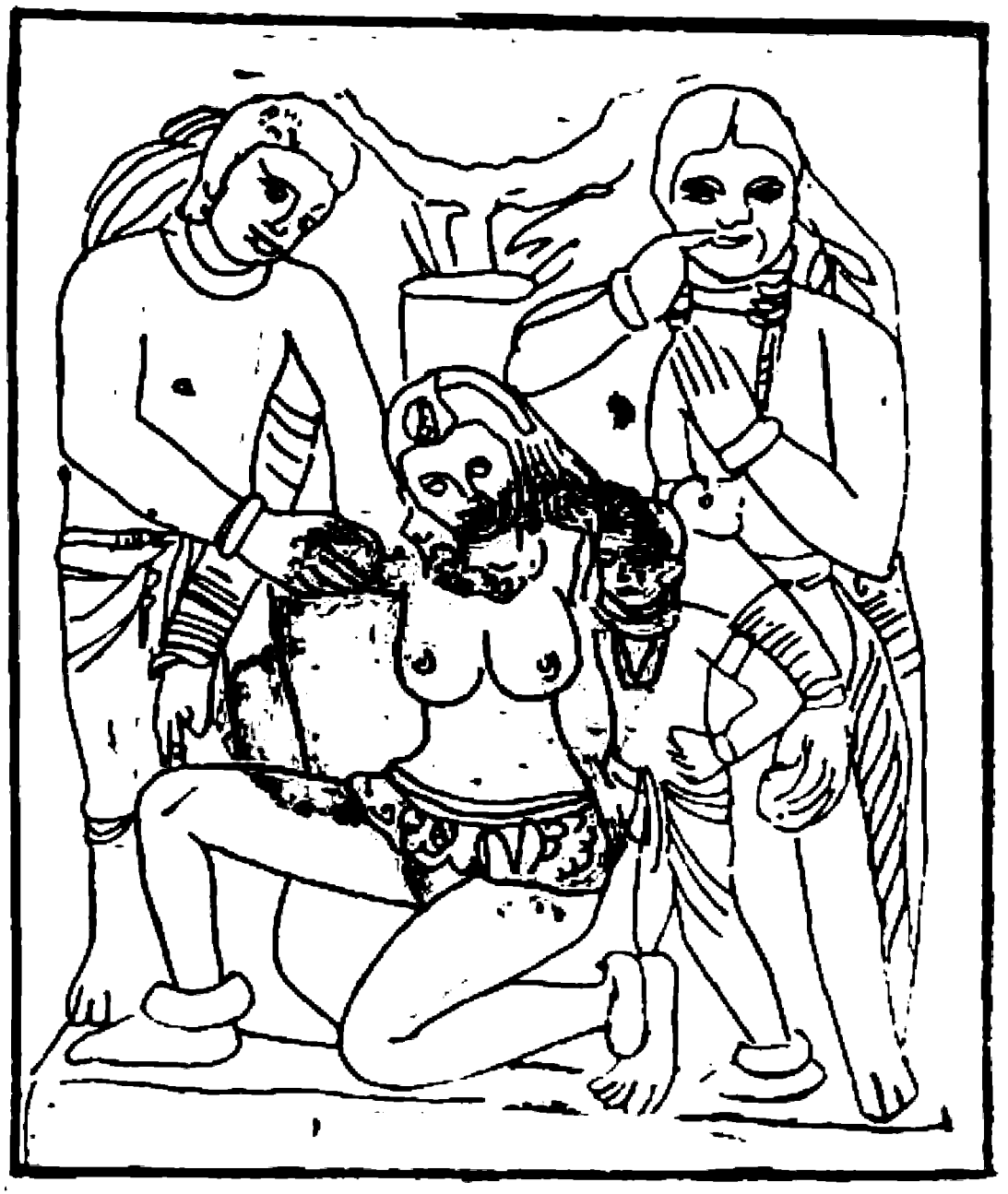

এক আধুনিক চোরের গল্প

পরিমল গোস্বামী

সেদিন চায়ের দোকানের আড্ডায় চুরির গল্প আরম্ভ হয়েছিল।

গিরিশ দত্ত, গোবর্ধন রায়, আর তারাপদ সেন। পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও চায়ের দোকানে অনেক মিলনে আলাপ। তিনজনেই সন্ধ্যার পর চার পাঁচ পেয়ালা চা খান এক আসরে বসে। ঘন্টা দুই সময় বেশ নিশ্চিন্তে কেটে যায়। নিরাপদেও বটে, কারণ বাড়ীতে ঘনঘন চা তৈরীতে কিছু অশান্তির কারণ আছে সবারই। সেদিন প্রথম পেয়ালায় চুমুক দিতেই দোকানের বাইরে হঠাৎ শোনা গেল চিৎকার উঠে দ্রুত মিলিয়ে গেল। শহরের পথে এ রকম প্রায়ই ঘটে।

এরা তিনজন সচকিত হলেন। অনেকে বাইরে বেরিয়ে গেল মজা দেখতে। কিন্তু খুব যে একটা মজা দেখা গেল এমন মনে হল না। হয়ত ছোট ছেলেরা হেলাফেলায় ঐ রকম চেঁচিয়ে থাকবে। কিন্তু সেদিন এই উপলক্ষে এদের তিনজনের মধ্যে চোরের প্রসঙ্গটা বড় হয়ে দেখা দিল। পাড়ায় চুরি বেড়ে গেছে—সবই ছিঁচকে চোর। জানালা দিয়ে কাপড়টা জামাটা নিয়ে পালায়, দূরে সরিয়ে রেখেও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। তারাপদবাবু ভিন্ন অপর দুজনই একতলার বাসিন্দা। একমাত্র তারাপদ বাবুই চোরের হাত থেকে অনেকটা নিরাপদ কারণ তিনি তিনতলায় থাকেন। গিরিশবাবু বললেন, 'সপ্তাহ তিনেক আগে তাঁর ঘরে লম্বা এক বাঁশ ঢুকিয়ে দুখানা ধুতি নিয়ে গেছে। আর জানেন রাত তখন মাত্র এগারোটা।

গোবর্ধনবাবু বললেন, সপ্তাহ তিনেক আগে? মানে পুজোর দুতিন দিন আগে। তা তো হবেই। ঐ সময়টা চোরের মরশুম। পুজোয় নতুন জামাকাপড় জোগাড়ের ব্যাপার আর কি। আহা, বেচারাদের ছেলে-মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে, আরও অনেককে হয়তো পালন করতে হয়।

গিরিশ বাবু মনে মনে ভাবলেন, ভদ্রলোক কমিউনিস্ট। বললেন, 'সে তো মশায় সবারই আছে। তাই বলে চুরি করতে হবে?' ঠিক তা বলিনি। আমি বলছি কি ওদেরও তো শখ আছে, অথচ কিনতে পারে না। এই তো সেদিন আমার বাড়ীতে জানালার কাঠি ঢুকিয়ে বেছে বেছে নতুন জমা আর শাড়ী নিয়ে গেছে। আরও নিত, কিন্তু মশারিতে আটকে গিয়ে এমন টান লেগেছিল যে মশারিটা খুলে পড়ে গিয়েছিল আমার ঘাড়ে, একেবারে ফ্রেমসুদ্ধ।' 'কিন্তু আপনার কি তাতে খুব আনন্দ হয়েছে?'—একটু বাঁকা সুরে বললেন গিরিশবাবু। 'আজ্ঞে না। থানায় খবর দিয়েছি।' গিরিশবাবু নিশ্চিন্ত হলেন, তা হলে ভদ্রলোক কমিউনিস্ট নন। গোবর্ধনবাবু আরও বললেন, 'থানায় খবর দিয়েছি বটে কিন্তু চুরি আজো কেন করে তাও মাঝে মাঝে ভাবি।'

এ-কথায় গিরিশবাবুর আবার ভ্রূকুঞ্চন ঘটল। বললেন, 'আমরা মশায় ওসব ভাবি না, চুরি চুরিই- মানে চুরি ইজ নাথিং বাট চুরি—ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি চুরি করা পাপ—

তারাপদবাবু এতক্ষণ নির্বিষ্ট মনে চা খাচ্ছিলেন, কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, চুরির নীতি নিয়ে তর্ক আরম্ভ করলে ওর শেষ পাবেন না। চুরি লোকে কেন করে তার উত্তর দিতে গেলে মানুষের আবির্ভাব কাল থেকে তার সমাজের বিবর্তন পর্যন্ত কথা তুলতে হয়। তার জন্য দু-চার মিনিট সময় যথেষ্ট নয়, দু-চার মাস লাগতে পারে। অতএব ও প্রসঙ্গে থাক। তবে হ্যাঁ কয়েক দিন আগে আমার বাড়ীতে সে একটি ইন্টারেস্টিং চুরি হয়ে গেছে তার কথা শুনুন। সে এক [illegible]। আর সে চুরির কথায় আপনাদের কথার উত্তরও পেয়ে যাবেন হয়তো।'

কি, আপনার বাড়ীতে চুরি? আপনি তো আমাদের মতো একতলায় থাকেন না, তিন তলায় থাকেন।—বললেন গোবর্ধনবাবু। 'তাহলে বোধ হয় চাকরের কীর্তি' বললেন গিরিশবাবু। 'হুঁকার ঘা না দিলে স্বীকার করবে না।' গোবর্ধনবাবু বললেন ওকে ধরেও তাকে আমরা মারি এবং মনে করি তাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিলাম, কিন্তু চোরকে আমরা কি শিক্ষা দেব। হাজার হাজার বছর ধরে শিক্ষা দিচ্ছি। কিছুই ফল হয় না ওতে' —বললেন তারাপদবাবু। আমার কাহিনীটি শুনুন। অবশ্য আপনাদের ধৈর্যের উপর খানিকটা জুলুম হবে'—না না কিছু না চুরির মতো মনোহর প্রসঙ্গে বিরক্ত হব না, সময় নষ্ট হচ্ছে বলেও মনে করব না, আপনি বলুন।' —বললেন গিরিশবাবু। তারাপদবাবু গল্প আরম্ভ করলেন। 'শুনুন লক্ষ্মীপুজো গেল আপনার কবে—২০শে অক্টোবর—না?' 'বলে যান, এসব তারিখ কি আর মনে থাকে?'—বললেন গোবর্ধনবাবু। 'যাই হোক লক্ষ্মীপুজোর ঠিক দু দিন পরের ঘটনা। রাত তখন হবে প্রায় একটা। বাইরে চাঁদের আলোয় রহস্য। আমার বাড়ী হয়ত দেখে থাকবেন, নতুন স্টাইলের বাড়ি, ঝকঝকে নতুন। ফ্ল্যাটের ফ্ল্যাটে থাকি। কি ভীষণ ভাড়া। কিন্তু ভাড়া

প্রসঙ্গ এখানে একেবারেই অবান্তর—অথচ বাড়ির কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে খোঁচা দিয়ে ওঠে কথাটা। তিন তলায় থাকি, ছাদে প্রবেশের প্রধান দরজাটি বন্ধ করে শুই—অন্য দরজা বন্ধ করার দরকার হয় না। সেদিন আমরা—স্ত্রী আর ছোট ছেলে-মেয়ে—সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। এমন সময় কি একটা শব্দে হঠাৎ জেগে উঠেই দেখি এক চোর আমাদের বড় টানা-হাতপাখার বাইরে সরু বারান্দার উপর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় তার চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দেখতে অভদ্রলোকের মতো. মানে চোর বলতে আমরা সাধারণত যেমন বুঝি ঠিক তেমন নয়। কিন্তু এসব চিন্তা করে স্থির করতে হয়নি, বিদ্যুৎ চমকানোর মতো মনে আপনা থেকেই তার ছাপ পড়ে তেমন আর কি। এবং চোর দেখা মাত্র কে?' বলে যে মর্মভেদী চিৎকারটি মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেও ভেবেচিন্তে নয়। আমার চিৎকার শোনা মাত্র চোর পকেট থেকে পিস্তল বার করে আমার নাক বরাবর লক্ষ্য করল। বলল, প্যান্ট নিয়েছি, ওতে হয়ত কাপড় চোপড় আছে, এখন নগদ টাকা কিছু চাই। খেলনা পিস্তল হয়তো. কিন্তু সে কথা কি আর তখন ভাববার সময় ছিল?' হ্যাঁ তা হতে পারে বললেন গিরিশবাবু। তারপর কি হলো?' তারাপদবাবু বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রী চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠেই সব ব্যাপারটা চকিতে বুঝতে পেরে—অজ্ঞান হলেন বুঝি?—স্ত্রীলোকের ঐ একটি বাধি। বললেন গোবর্ধনবাবু। না অজ্ঞান হননি তো। তার মাথা অনেকটা নীচু, সে ছুটে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় অথচ চোর স্পষ্ট শুনতে পায় এমনিভাবে বলল, ওগো, ও লোকটা মাসের শেষে এসেছে কেন ওকে মাসের গোড়ায় আসতে বল।—বুঝলেন মশায় এমন বিপদেও স্ত্রীর হিসাব ঠিক আছে, অর্থ জলজ্যান্ত একটা চোর সামনে নিয়ে মাথা ঠিক রাখা কি সোজা কথা? তার উপর আবার তার হাতে এক পিস্তল। কিন্তু সে কথা থাক। পিস্তল দেখে আমিই যে বেশী ভয় পেয়েছিলাম সে কথা বলা বাহুল্য। প্রাণের মমতাটাই তখন বড় হয়ে উঠেছিল, তাই চেষ্টাকৃত কোন রকমে কাঁপা গলায় বললাম, 'একটু দাঁড়াও, সাঁচ্চা ক টাকা আছে।' মশায় বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, চোর আমার কথা বিশ্বাস করল। তার প্রমাণ তখন পেলাম—সে হাত থেকে পিস্তলটা পকেটে রাখল। আমি বললাম—হতভাগা অমন ভয়টা কেটে যেতে— বললাম—একটু বেশী হয়ে টাকা খুঁজতে চুরি হতভাগা সে টানটে টেনে বার করে আনল উপরে বল। আমি মুখ ফুটলেন একটু ভাবুক। অবাক হলেন গিরিশবাবু। তারাপদবাবু বললেন মশাই প্রাণের ভয়ে কি যে না করা যায় তাই ভাবি: যাই হোক টাকা খোঁজার নামে কিছু টাকা সরিয়ে রেখে কিছু টাকা বার করলাম। চারশো টাকা মতন। মানে ঐ টাকা-টাই তাকে দেব ঠিক করলাম। কিন্তু তার হাতে দিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে গেল। তাই টাকাটা হাতে না দিয়ে টাকের উপর রাখলাম এবং যথেষ্ট সাহসের ভান করে তাকে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা গলে বললাম এতখানি ঝুঁকি নিয়ে চুরি করতে এসে কি লাভ? কি মেহনতই না হয়েছে তোমার এতদূর উঠে আসায়। চোর আমাকে অবাক করে বলল কিছু না, মেহনত হত আগে, যখন পাইপ বেয়ে উঠতে হত। এখন সব হুল ফ্যাশানের বাড়ী সব জানালার উপরে সিঁড়ি লাগানো আছে— সান-শেড না স্রেন-শেড বলে ওকে। ও সব তো আমা-দের সুবিধের জন্যই তৈরী, সিঁড়ি বেয়ে ওঠার আবার মেহনত কোথায়? ঝুঁকিই বা কোথায়? আমি মশায় স্তম্ভিত চোরের মুখে এমন ভাষা শুনে। বললাম তোমাকে তো বেশ শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। চোর বলল, কলেজে পড়েছিলাম বটে, পাসও করেছি কিন্তু বলুন তো এ বাজারে এর কি দাম আছে? বলে চুপ করল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল বলে মনে হল। আলোচনা এ পথে চালালে অনেক কথা উঠবে, অনেক দেরী হবে তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে আগের কথায় ফিরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম এ কাজে অন্য ঝুঁকি নেই? চোর বলল মনে তো হয় না। পুরনো পাইপ-বাওয়া রীতির সঙ্গে তুলনা করুন না? তখন ধরা পড়ার ভয় বেশি ছিল। কিন্তু এখন সে ভয় অনেক কম গেছে। তা ছাড়া আপনি অযথা অসতর্কতার জন্য শাস্তি হওয়ার কথা বলেছেন। নইলে একটু সাবধানে মাঝরাত্তির সরালে কজন জাগে? ওঃ! আগের মানে সেই ওস্তাদ মেথরকে বুকে বয়ে নেত, গা ঘেমে উঠে হাঁফাতে হত। এখন আপনাদের ইঞ্জিনিয়াররা সে অসুবিধা দূর করেছেন। আমি বললাম শুধু উপরে ওঠার ঝুঁকির কথা বলিনি। ধরা পড়লে কি হবে সেই কথাই বলেছি। চোর বলল এর উত্তরে মাত্র একটা কথাই বলতে চাই—এই ঝুঁকিকে আমি ব্যবসা হিসাবে নিয়েছি। বাঙালী ব্যবসা করতে ভয় পায়। বাঙালীর সেই কলঙ্ক আমি ঘোচাচ্ছি এইভাবে। 'ব্যবসা!' আমি চমকে উঠলাম একথা শুনে। এমন একটা দুর্ভিক্ষের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল এতক্ষণের আলোচনাটা মাঠে মারা গেল, একটা বাজে লোকের সঙ্গে বাজে তর্কে মেতেছি। বললাম ব্যবসা তো এক পক্ষে হয় না দুটি পক্ষ দরকার। এক জন যেচে একজন কেনে। যে যেচে বেচাটা তারও দরকার আছে তাকে কিনে মুনাফা করে। কিন্তু চুরিতে শুধু একপক্ষের সবটাই লাভ অন্যপক্ষের সবটাই ক্ষতি। যার জিনিস চুরি করা হয়, চুরি তার দরকার নেই, সে চায় না চুরি কাজেই ব্যবসার সঙ্গে তুলনা চলে না। বিশ্বাস করবেন না মশায় চোর আমাকেই বাজে লোক বানিয়ে ছাড়ল। আমার কথায় সে একটুখানি হেসে বলে কিনা আপনি ভুল করছেন মশায়। চুরিতে একজন লোভ বা একটি পরিবার বা যে-কোন এক পক্ষ এখন-তখন কিছু হারায় একথা ঠিক কিন্তু সমস্ত সমাজ এতে অনেক লাভ করে। গিরিশবাবু স্বগতোক্তি করলেন 'সে আবার কেমন কথা!' গোবর্ধনবাবু বললেন 'না ভেবে কিছুই বলা ঠিক নয়, চোর হয়ত ঠিক কথাই বলেছে।' তারাপদবাবু বললেন, 'আমি তো মশায়, প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম সে আবার কি? নতুন কথা শুনছ যে! চোর একটা হাই তুলে বলল মোটেই না নতুন ঠেকছে আপনার কিন্তু কথাটা নতুন নয়। প্রথমেই ধরুন না হাজার হাজার পুলিশ পালিত হচ্ছে শুধু আমাদের জন্য। সংসার থেকে চোর উচ্ছেদ করে দেখুন না হাজার হাজার পুলিশ বেকার, বহু পরিবার না খেয়ে মরবে। আমি তো মশায় স্তম্ভিত। এমন কথা আগে ভাবিনি। কিন্তু আমার সম্বন্ধীর কল্পনা-শক্তিকে ছেলে ফিরার করে দেওয়ার জন্যই যেন তার আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন। সে বলতে লাগল, আর শুধু পুলিশ কেন, ধরুন দেশে যদি একটি চোরও না থাকে ছিঁচকে সিঁদেল পকেটমার বাক্সভাঙা জানালাতে কেন্দ্রানীওয়ালা ছিনতাইওয়ালা বোমাবন্দুকওয়ালা—কেউ যদি না থাকে তাহলে বাড়িকে নিরাপদ করার জন্য যেসব প্রাচীর তৈরী হয় সব উচ্ছেদ হয়ে যাবে, এসব যারা তৈরী করে তারা বেকার হবে বাড়ীর ডিজাইন বদলে যাবে সিন্দুক বাক্স তৈরীর কাজ কমে যাবে। ব্যাঙ্কের কাজ বাড়ে আনা কমে যাবে লেক ডিপোজিট ভল্ট লকার ইত্যাদি কিছুই দরকার হবে না। তবু এ আর কি? এর চেয়ে বড় এবং সমস্ত নারী-জাতিকে হাতে রাখার প্রধান উপায় অলঙ্কার-শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম অলঙ্কার শিল্পও কি চোরের জন্য টিকে আছে?' চোর বলল অবশ্যই। চোর না থাকলে কোন মেয়ে গয়না পরতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ।' তার মানে?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে চোর বলল যে গয়নার চুরি-মূল্য নেই তা পরে কোন সুখও নেই। চুরি-মূল্য নেই কাচের চুড়ির। যেখানে সেখানে যেকোন রাস্তার কেউ সেদিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু শুধু সোনার গয়না বা

পাথর-বসানো সোনার গয়না পরে থাকে। তুমি থাক, চোরেরা নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যের বাড়ীতে ঢুকে চুরি করে। কিন্তু যদি ঐসব গয়না যেখানে সেখানে পড়ে থাকলেও কেউ তার দিকে ফিরেও চাইত না চোরেরা পথ চলতে পায়ে বিঁধবে বলে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিত তাহলে সে গয়না কোনো মেয়ে পরত কি? পরত না। তা হলে বুঝে দেখ, গয়নার যা কিছু আকর্ষণ তা শুধু চোরের জন্য। আমি মশায় ক্রমে পরাজিত এবং অবসন্ন বোধ করছিলাম চোরের কাছে। নিজেকে বড্ড ছোট বোধ হচ্ছিল। এমন সময় চোরের সমর্থন করে আমার স্ত্রীও দরজার আড়াল থেকে বলে উঠল 'তোমা ও ঠিক কথাই বলেছে খুব ঠিক কথা।' স্ত্রীর সমর্থন পেয়ে চোর একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। আমি বললাম, 'তবে ইন্টারেস্টিং লাগছে ভাই তোমার কথা। তুমি ভিতরে এসে বস, আলোয় তোমার মুখ দেখে কথা শুনি, আরও ভাল লাগবে। স্ত্রীকে বললাম হাঁটারে চা কর, তবে এখন দুষ্টো, ভালই লাগবে। 'পাশের ঘরেই ব্যবস্থা ছিল। আমরা ভিতরে এসে বসলাম। চোরকে ভাল করে দেখলাম এবারে, লম্বা মুখ ঠোঁট পাতলা দাড়ি গোঁফ কামানো চোখ দুটি ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দু-তিন দিন মুখে ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি। ভদ্রলোকের ছেলেই বটে। পাশের ঘরে চা তৈরী হচ্ছিল, স্ত্রী আমাকে ডাকল। আমি যেতেই মশায় এক অদ্ভুত প্রস্তাব। স্ত্রী চাপা স্বরে বলল, 'আমি চোরকে ভাল করে দেখেছি, ওর নাম ঠিকানা জেনে নাও।' 'কেন?' জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রী কোমল সুরে বলল, 'আছে দরকার। ছেলেটিকে আমার ভারী পছন্দ এখন তো জাত বিচার উঠেই গেছে। আমার বোনের সঙ্গে বেশ মানাবে। আমি এই প্রস্তাবকে নিরুৎসাহ করে এ-ঘরে চলে এলাম। মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি কবে যে হবে।' গোবর্ধনবাবু বললেন 'মেয়েরা খুব প্র্যাকটিক্যাল, দেখলেন না প্রথমেই চোর দেখে বলেছেন মাসের শেষে এসেছে কেন?' তারাপদবাবু বললেন, 'প্র্যাকটিক্যাল না হাতী। চোরের সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিতে চায়--এর নাম প্র্যাকটিক্যাল। কিন্তু শুনুন। স্ত্রী চা এনে দিল। একটু-খানি খেয়েই চোর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলল খুব খুশী হয়েছি আপনাদের বোঝাতে পেরে। কৃতজ্ঞও হয়েছি এবং প্রতি-দানস্বরূপ আমি এ ট্রাংকটি আর নেব না।' আমি বললাম, 'না না ওটা তোমাকে নিতেই হবে। তুমি এত ঝুঁকি নিয়ে ওটাকে টেনে... চোর একটু উত্তেজিত সুরে বলে উঠল, 'কার ঝুঁকির কথা বলছেন কেন? কোন ব্যবসায় ঝুঁকি নেই? ঝুঁকি আছে বলেই কত রাজা ফকির হচ্ছে কত ফকির রাজা হচ্ছে। ব্যবসায় ঝুঁকি থাকবে না, বলেন কি? ঝুঁকি না থাকলে কি ব্যবসা চলে? ভেবেছিলাম আমি আমার কথা সব বোঝাতে পেরেছি কিন্তু এখনও অনেকখানি বাকি আছে দেখছি। স্ত্রী বলে উঠল 'না না তুমি ঠিকই বলছ ভাই। আমরা বুঝতে পেরেছি। তুমি সাবসটি নিয়ে যাও। কিন্তু তার কিছুতেই রাজি হল না। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, কি করে এত বড় ট্রাংক নীচে নামাবে ভাই? চোর হেসে বলল এসব নিয়ে সবাইকে ভাবতে নেই বুদ্ধি খাটাতে হয়। সঙ্গে বাড় আছে, বোধ নীচে নামিয়ে নিতাম। তা হলে আসি আজ? আচ্ছা এসো—বললাম অবশ্য সঙ্গেসঙ্গেই তারপর চোর বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতে উঠে দাঁড়াতে এসেছিল সেইভাবেই নামাতে উদ্যত হয়ে বলল, চুরি করতে এসে একেবারে খালি হাতে ফিরে যাওয়া আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ। আপনারা টের পান নি, ইতিমধ্যে আপনারা দুজনেই যখন পাশের ঘরে গিয়েছিলেন তখন আপনার বাথা চারটে টাকা থেকে একটি নিয়েছি সেজন্য কিছু মনে করবেন না। না না বেশ কাজ সারিলুম।ও নিলে ভাল করতে। কিন্তু সে একটু এদিকে এসো তো ভাই চোর দু পা এগিয়ে আসতে তাকে জড়িয়ে ধরে বিছানার কোলাকুলিটা সেরে নিলাম বিদেশ বিভূঁয়ে পরে এসেছ কিনা, তাই ওটা আর বাদ রাখি কেন। চোর খুশী হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর চৌকাঠে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। গিরিশবাবু স্ত্রীর পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়েই বললেন এ সে একেবারে রূপকথা শোনালেন মশায় গোবর্ধনবাবু বললেন তার চেয়েও অসম্ভব শিক্ষিত অথচ কিপ্লেক্স চোর? তারাপদবাবু বললেন আগে বিশ্বাস করতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি। মানে শিক্ষিতেরা তো এখন দলে দলে ব্যবসায় নেমে পড়েছে। আপনি আমি চাকরী করি বলেই খেয়াল রাখি না। তা ছাড়া চুরি এখন সব জায়গাতেই বড় ব্যবসা হিসাবে চলছে। চোর ঠিকই বলেছে আর সব ব্যবসায়ে যেমন ঝুঁকি আছে এতেও তেমনি ঝুঁকি আছে তবে এতে এমন একটি সুবিধাও আছে যা অন্য কোন ব্যবসায়ে নেই। কি সেটা? —সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন। এতে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না। গিরিশবাবু বললেন, তা মানছি, অনেক শিক্ষিত ছেলে তো চুরিকে ব্যবসা বানায় নি। গোবর্ধনবাবু বললেন ব্যবসার নামে চুরি করছে—ঐ একই কথা। তবে আপনার বাড়ীতে যে চোর ঢুকেছিল তার কথায় যুক্তি থাকলেও কলেজে-পড়া সিক্সথ ক্লাস এই প্রশ্ন। গিরিশবাবু বললেন আমার তো মশায় বিশ্বাস হচ্ছে। যাপনি সম্ভবত স্বপ্ন দেখে থাকবেন। চায়ের দোকানে অনেকেই চা খাচ্ছিল। একটি যুবক এদের পিছনেই বসে এদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনছিল। সে এই সময় তাড়াতাড়ি এক খণ্ড কাগজে কি যেন লিখল এবং সেটি ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় করে এগিয়ে এসে গিরিশবাবুর দিকে চেয়ে বলল মাপ করবেন আমি একটি কথা বলতে চাই। হ্যাঁ বলুন। তারাপদবাবুর বাড়ীতে যে চুরি হয়েছে সেই সত্য ঘটনা। আমি আপনাদের সমস্ত কথাই শুনেছি। অবিশ্বাস করবেন না, কারণ আমি সেই চোর। বলেই চোর হাতের মুঠোয় ভাঁজ করা কাগজখানা তারাপদবাবুর হাতে দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই স্তম্ভিত। মিনিট খানেক কারও মুখে কথা নেই। একটু আশ্বস্থ হয়ে তারাপদবাবু বললেন, এখন মনে হচ্ছে বটে, যাতে সেদিন এই ছোকরার সঙ্গেই আলাপ করেছি। দাড়ি গোঁফ ভাল করে কামানো থাকাতে হঠাৎ চিনতে পারি নি। তারপর হাতের কাগজখানা খুলে পড়ে দেখেন তাতে লেখা আছে আমার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (বৈদ্য) এম-এ ঠিকানা ০০০ রোবাজার স্ট্রীট। তারাপদবাবু ইঙ্গিতটা সহজেই বুঝলেন। ছেলেটি বিয়ে করতে চায় তাঁর শালীকেই। কিছুক্ষণ চোখ বুজে কি ভাবলেন। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে করতে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

নতুন বই

চিত্রবিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা

ও

রসমধুর কাহিনী সমারোহ। দাম : সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মোহ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

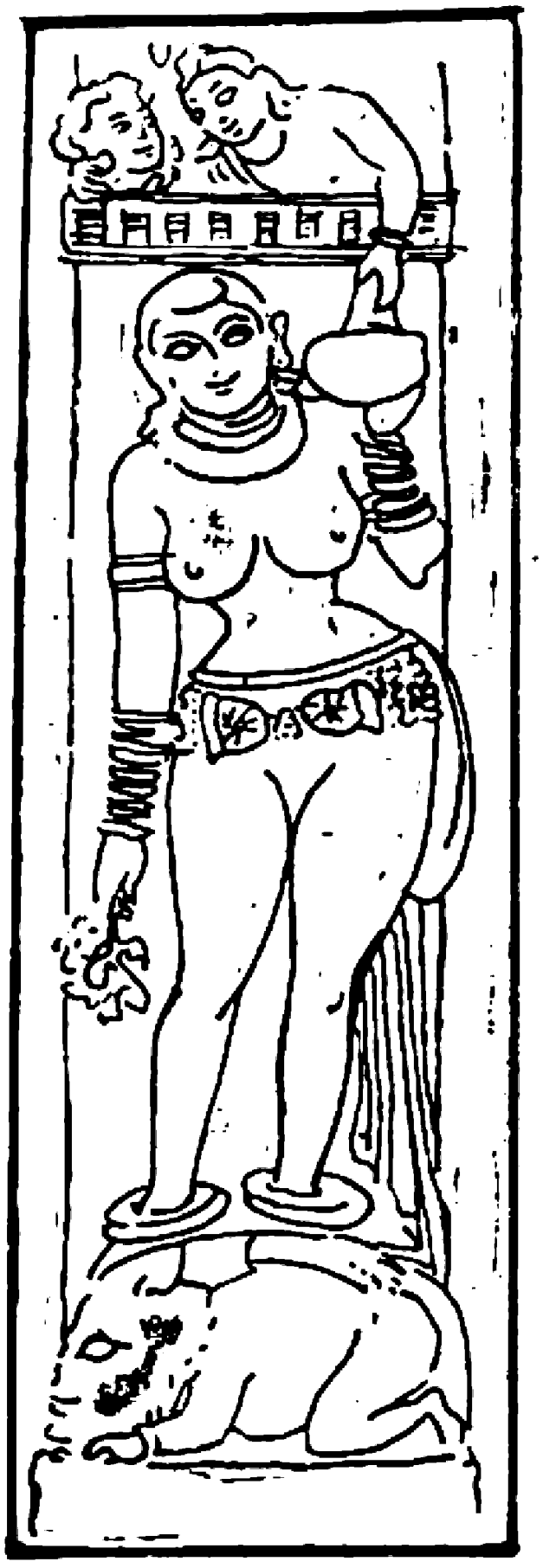

আজকেও অজিত মিত্র লোহার পুলটার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্ধকার ঝুঁকে পড়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা ছেড়ে দিলে নিচে কানালের কালো জলের ভেতর। আর বাঁহাত অগ্নিবিন্দুটা কুঁড়ে ফেলে বড়ো বড়ো পাথরের ভেতর দিয়ে খাওয়ার আগেই পেছনের অনেকখানি ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে হাসপাতালের ঘণ্টার আওয়াজ আসতে আরম্ভ করল।

ঠং-ঠং-ঠং-ঠং শেষ ঠংটা বারোবার বাজল। রাত এগারোটা। এবং প্রত্যেক দিনের মতো আজও অজিত মিত্রের মনে হল, ওটা যেন কাকের ছুটির ঘণ্টা। মানুষের সজাগ চোখ আর বুদ্ধির শাসনে যারা বন্দী ছিল—এই যারে বাইরে বেরিয়ে এলো তারা। অজিত মিত্র যদি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে পশ্চিমের আকাশে কালপুরুষ অস্ত যেতে যাওয়া পর্যন্ত—তা হলে দু চোখ ভরে এক অপূর্ব নাটকের অভিনয়ও বুঝি সে দেখতে পায়।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ানো চলে না। ঘন ঘন করে শীতের হাওয়া আসে, ওভারকোটের কলার তুলে দিয়েও দুটো কানের ভেতর একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাকে ঠেকানো যায় না; ক্লান্তিতে মেরুদণ্ডটা দমভাঙ্গা হয়ে আসতে চায়, চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে নেমে আসে। তখন সিগারেটে একটা শেষ টান দিয়ে অজিত মিত্র মধ্যমাকে ধনুকের ছিলার মতো করে সিগারেটটা ছুঁড়ে দেয়—একটা লাল আর জলন্ত আকাঙ্ক্ষা আলেয়ার মেঘের মতো অর্ধচন্দ্রাকারে আকাশের দিকে উঠে নিচের পিচ্ছিল কালো জলের ভেতরে হারিয়ে যায় সেটা। তখন নির্জন পথে ভারী জুতোটার সংঘর্ষে পথের খোয়ায় অকর্কশ আওয়াজ তুলে পুল থেকে নেমে হাঁটতে থাকে অজিত মিত্র, মধ্যমাকে ধনুকের ছিলার থেকে যেন একটা কুয়াশার আবরণ সরে যায়, কাজ সমাজের পুরোনো বাড়ীটার সামনে প্রতিদিনের মতো কুকুর ডাকতে থাকে—কখনো বা কার ছেলে ক্লারিওনেটের আওয়াজ কানে আসে। অজিত মিত্রের গলা জ্বালা করে। কিছুদিন থেকেই এই সময়টাতে এই জ্বালাটা সে টের পায়, মনে হয় অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার জন্যই একসময় হয়েছে।

অজিত মিত্র রোমান্টিক নয়। অন্তত এইখানে আসবার আগে যে নয় ছিল না। এল আই সির চাকরি নিয়ে এখানে সে এসেছে মাত্র মাস ছয়েক হল। আর এই লোহার পুলটাকে আবিষ্কার করেছে কেবল মাস-দেড়েক আগে। চল্লিশ বছরে পা দিয়েও সে এখনো ব্যাচেলার। এতদিন বিয়ে না করার পেছনে কোন কঠিন প্রতিজ্ঞা নেই, প্রথম যৌবনের কোন মনোভঙ্গও নয়। সুযোগ হয়েছে তো সময় হয়নি, আবার সময় যখন পাওয়া গেছে তখন যোগাযোগ আর ঘটে ওঠেনি। এখন ব্যাচেলারের জীবনটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, চল্লিশ বছর পেরিয়ে সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটাতে আর প্রবৃত্তি নেই, হয়তো সাহসও হয় না। বেশ ছিল অজিত মিত্র। মন দিয়ে চাকরি করা ভালো ছাত্র হিসেবে, বিদেশি উপন্যাস পড়া, এই বয়সেও স্টিক নিয়ে কখনো কখনো হাকির মাঠে নেমে পড়া, আর মেসের দায়িত্বহীন দিনগুলোকে একটার পর একটা নিরুদ্বেগে পার করে নেওয়া। এখানেও তার ঠিক এই ভেবেই কাটছিল। স্টেশনের কাছে হেড ক্লার্কের বাড়ীতে রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা পর্যন্ত তাস খেলা তারপর ওভার কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিয়ে, নির্জন পথের খোয়ায় জুতোর আওয়াজ শুনতে শুনতে নিঃসঙ্গ লাইট-পোস্টগুলির তলায় নিজের নানা আকারের ছায়ায় শোভাযাত্রা তৈরী করে, এই লোহার পুলটা পার হয়ে মেসে ফিরে যাওয়া।

এর মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করে বসল: এত রাতে কানালের পুল পেরিয়ে একা যান? ভয় করে না?

—কিসের ভয়?

—জায়গাটার বদনাম আছে জানেন না?

—ভূতের কথা বলছেন?

—ভূত কিনা জানি না। বছর তিনেক আগে বিপ্লবীরা এখানে একজন আই-বি অফিসারকে খুন করে ডেডবডিটা নীচের কানালের জলে ফেলে দেয়। তারপর থেকে তিনেক সুইসাইড হয়েছে ওখানে, দুটি পুরুষ একটি মেয়ে। জলে পড়বার আগে তারা খেয়েছে বড়ো বড়ো পাথরে মাথার খুলি চুরমার হয়েছে, হাত-পা ভেঙেছে। সেই থেকে—

—আর একজন সমস্ত জিনিসটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললে আরে রাখো ওসব। একটা বনেদী জমিদার বাড়ীর তিন বছরের স্ট্যাটিস্টিকস নাও ওরকম অনেক সুইসাইড আর মার্ডারের খবর পাবে। আসলে

জায়গাটা একটু অন্যরকম মনেই এ সব সন্দেহ হয়নি, আসা তো কতবার রাস্তা দেখিয়ে দুটোয় ওই পথে পৌঁছনো আসা যাওয়া করেছি, কোনদিন তো কোনো ভূত-পেত্নী এসে ঘেঁষে বলেনি—এসো, সুইসাইড করো এখানে।

হেড ক্লার্ক আশুবাবু বললেন মানে জায়গাটা এমন নিরিবিলি আর ফাঁকিয়ে পড়তে এত সুবিধে যে কেউ আর কষ্ট করে দড়ির ফাঁস দড়ি কাঠে লাগাতে যায় না। কিংবা যেন লাইন পর্যন্ত আসতে চায় না। সেই জাপানের সুইসাইড ক্লবের ব্যাপার আর কি।

আলোচনা হল এই পর্যন্ত। আর সেই রাত্রেই তাকে ফেরবার সময়—অজিত মিত্র প্রথম সচেতন ভাবে এই লোহার পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম অনুভব করল এই জায়গাটা একটা আলাদা—চেনা পৃথিবী আর অচেনা মহাশূন্যের একটা সীমান্ত-বিন্দুর মতো নিঃসঙ্গ রহস্য দিয়ে ঘেরা।

এতদিন পরে অজিত মিত্র দেখতে পেলো, এই পুলটার ধারে কাছে অনেক দূর পর্যন্ত কোন বসতি নেই, এ যেন শহরটাকে দুটো রাস্তার মতো দুভাগে আলাদা করে রেখেছে, মাঝখানে অনেকটা জুড়ে খালি নো-ম্যানস ল্যান্ড। শীতের কুয়াশা মাখানো অন্ধদশীর জ্যোৎস্নায় পেছনে হাসপাতালের হলদে বাড়ীটা প্রায় মুছে গেছে, শুধু তার দোতলার কয়েকটা উজ্জ্বল জানালা তৌতিক চোখের মত জ্বলছে: অনেকখানি সামনে তিনকোণা চুড়োওয়ালা ব্রাহ্ম সমাজের পুরোনো বাড়ীটাকে একটা বিরাট কবরের মতো দেখা যায়। বাঁদিকে একটু বাঁক নিয়েই খালটা খানিক এলোমেলো জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, ডাইনে শহরের আবর্জনা ফেলা একটা নোংরা রাস্তা অনেক দূরে পর্যন্ত ছড়ানো, তার ওপরে শীতের কুয়াশা ঘনিয়েছে শ্মশানের ধোঁয়ার মতো। আর সেই ধোঁয়ার ভেতর একটা করোগেটেড টিনের চাল চকচিক করছে—ওটা লাশকাটাঘর। উটের পিঠের মতো রুক্ষ থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে ওঠা এই পুলটা যেন একটা অবজার্ভেটরি টাওয়ার—এইখানে দাঁড়িয়ে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যদি চোখের দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

পুলটার দুধারে কাঠমল্লিকা আর রাধাচূড়ার জালে উত্তরের বাতাস সাড়া দিয়ে উঠল চারিদিকের স্তব্ধতা ভেঙে কারা যেন ঘন ঘন শব্দ করে এগিয়ে এল অজিত মিত্রের দিকে। একটা অদ্ভুত উগ্র প্রতীক্ষায় স্নায়ুগুলো চকিত হয়ে অজিত মিত্রের—তার দু চোখে সন্ধানী আলো জ্বলে উঠল, সারা শরীরে শীতের্ত শিহরণ জাগল রক্তিকণার কোষে কোষে একটা বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। লোহার রেলিংটা দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আবার বাতাস এল, আবার কুয়াশা ছড়ানো জ্যোৎস্নার পুলের দুধারে কাঠ-মল্লিকা আর রাধাচূড়োর ছায়ায় ঢেউ উঠল আবার ঘন ঘন শব্দে। ভয় উঠল চারদিক। না কিছুই ঘটল না। অজিত মিত্র বুঝল, শীতের পাখা ঝড়ছে—এ তারই দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। নীচে অকারহীন কতগুলো বড়ো বড়ো পাথরের স্তূপের ভেতর দিয়ে পঙ্কিল কালো জলের স্রোত চলেছে একটা পচা জন্তুর দুর্গন্ধ উঠছে সেখান থেকে। মরা বেড়াল-কুকুর হয়তো। অথবা পাথরের তলায় আত্মহত্যা করা কোন একটা নতুনের পড়ো হয়ে যাওয়া মাথাটা থেকে চাপ চাপ কালো রক্ত পাথরের ফাঁকে—

ঠং-ঠং-ঠং-ঠং।

হাসপাতালের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। আর একবার শিউরে উঠল অজিত মিত্র, মনে হল ও যেন কোনো নতুন নাটকের যবনিকা ওঠবার সংকেত। আর একটু যদি অপেক্ষা করা যায়, তাহলে এখানে কী ঘটবে আর কী যে ঘটবে না, তা অজিত মিত্র কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু উত্তরের হাওয়ায় শীত করতে লাগল, কোটের কলার তুলে দিয়েও কানের কনকনানি বন্ধ করা গেল না। তখন যেন অজিত মিত্রের মনে হল, এখানে যে অভিনয়টা এখানে আরম্ভ হতে যাচ্ছে, তার প্রবেশপত্র সে পায়নি, আর তার অনধিকার চর্চা চলে না। একটা অদ্ভুত নৈরাশ্য নিয়ে সে নেমে এল পুল থেকে, অনমনস্ক জুতোর সঙ্গে উঁচু কয়া ওঠা নুড়ির সংঘর্ষে পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর্তনাদ করে উঠল। আর ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীটার সামনে জমে-ওঠা দুটো কুকুরের ডাক তাকে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল।

একদিন-দুদিন-তিনদিন নয় আজ ছ মাস ধরে অজিত মিত্র এক অদ্ভুত রক্তমাংসের সাক্ষাৎ এসে দাঁড়াচ্ছে আর অনধিকারের লজ্জা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। মাঝখানে এই শীতের ভেতরেও প্রবল ঘামাচিবর্ষণ নেমেছিল একদিন, সারা রাত তার বিরাম ঘটেনি, সন্ধ্যার পর ঘোর থেকে বেরুতে পারেনি সে। আর রক্তজল একটা অদ্ভুত মানসিক চঞ্চলতার মধ্যে কাটিয়েছে মনে হয়েছে কিসের একটা বার্থ আহ্বান বৃষ্টি আর বাতাসে ভর করে এসে ঘা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সকালের আলোয় সে লজ্জা পায়। দিনের বেলায় ওই পুলটায় কোনো কুকুর ঘাসে না—খালের পচা জল, শহরের আবর্জনার স্তূপ হাসপাতালের ছাপা এলাহেলের পান, টুকরো টুকরো ন্যাকড়ার ঝাণ্ডাগুলো ঝুলো কাপড়ের দিকে তাকিয়ে গা ঘিন ঘিন করে। দুচারটি ছিপধারী ছেলেবেলে খালের জল থেকে চুনো মাছ ধরবার চেষ্টা করছে সে সবও চোখে পড়ে—টিনের চাল দেওয়া লাশ-কাটা ঘরটাও তখন ওদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তখন মনে হয়, ডিউনিসিপ্যালিটির ভেতরে এমন একটা নোংরা জায়গা থেকে অতলান্ত-রহস্যময় এই খালটাকেও বুজিয়ে দেওয়া উচিত—এই জলো মহুয়ে এত মশার উপদ্রব। কিন্তু রাত্রে—জ্যোৎস্নায়, যেন ঢাকা ঘন অন্ধকারে অথবা আকাশস্পর্শী তারার আলোয় সব অন্যরকম হয়ে যায়। অসংখ্য অলক্ষ্য শিরা থেকে রোমাঞ্চের লাল শীতের কুয়াশা হয়ে এখানে জমাট বাঁধে উত্তরের হাওয়ায় পাতা ঝরায়। কাঁধাচুড়ো আর কাঠমল্লিকার গায় থেকে থেকে যেন পূর্বোদ্ভাসের কথা বলে। অজিত মিত্র অপেক্ষা করে, সিগারেট ধরায়। পুলের নীচে আকারহীন কালো কালো, পাথরগুলো আর সরীসৃপ জলের রেখা কেমন-না-দেখা লাশকাটা ঘরটার সঙ্গে একটা সুরে বাঁধা পড়ে যায় মনে হয় এইখানে যে খুন হয়েছে চন্দ্রাকে যারা আত্মহত্যায় করেছে তারা সবাই ওই লাশকাটা ঘরের টেবিলে শিয়র পেতেছে—যেমনভাবে নাটকের চরিত্রকে এক দৃশ্য থেকে আর এক দৃশ্যের মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু তারপর তৃতীয় দৃশ্য? চতুর্থ? পঞ্চম? উদ্ভট একটা কল্পনা বিস্ময় করে অজিত মিত্র তাদের দেখতে চেষ্টা করে—অনুমানের প্রয়াস পায়। কিন্তু হাসপাতালে রাত এগারোটার ঘণ্টা বাজলেই তৃতীয় দৃশ্যের পট ওঠবার সময় হলেই—আর সে দাঁড়াতে পারে না উত্তরের হীম বাতাসটাই যেন নিষেধের মত তাকে ঠেলে নামিয়ে দেয় পুলের ওপর থেকে, খালের জলে ফেলে দেওয়া সিগারেটটার শেষ জ্বালা জুড়তে থাকে তার গলায়—তখন তাই অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষার মতো তাকে মেসের দিকে ফিরে যেতে হয়। না অজিত মিত্র কোনদিনই রোমান্টিক ছিল না। সে চিরকাল সাদা চোখ দিয়ে জীবনটাকে দেখেছে, নিজেকে জেনেছে কাজের মানুষ বলে। কোনোদিন কবিতা লেখেনি কলেজের পরীক্ষা পাসের জন্যে যে কটি কবিতা পড়তে হয়েছে তার বাইরে সাধারণতো সে কখনো ছায়নি। তাহলে এমন কেন ঘটল? দিনের বেলায় সমস্ত ব্যাপারটাই তার হাস্যকর মনে হয়। এমনকি প্রত্যহ রাতে পুলের ওপর দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবার অভ্যাসটা পর্যন্ত অবাস্তব বোধ হতে থাকে। তখন যুক্তি বলে ও আর কিছু নয়—অনেকখানি পথ হাঁটতে হাঁটতে ওখানে একটু জিরিয়ে নেয় সে—যেদিন যুক্তি পুলটার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে নিজের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এই মানসিক প্রশ্নটা চলে রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা পর্যন্ত—ভাসের শেষ বাজী মিটে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর ঘণ্টা পান বিড়ির দোকান ছাড়িয়ে চৌমাথার বটগাছ আর স্টোর রুমের পেছনে ফেলে সদর হাসপাতালের সীমানা পার হলেই—দুধারে রাধাচূড়ো আর কাঠমল্লিকা ছায়া দুলিয়ে দুলিয়ে ভাক পাঠায়: দূরে হয় শহরের নো ম্যানস ল্যান্ড, নুড়িওঠা পথটা উটের পিঠের মতো উঁচু হতে থাকে এবং আরম্ভ—

কোন সাইকোলজিক্যাল থিওরি? দ্বৈত মানসিক বিকার? কিন্তু ডাক্তার ডিসপেন্সারি করা ও ধরনের কোন রোগ ছিল বলে অজিত

CENTRAL LIBRARY

হিসের জানা নেই। তাদের স্পোর্টসম্যান পরিবার। বাবা নামকরা হকি খেলোয়াড় ছিলেন, কাকা প্রথম জীবনে ফুটবলার ছিলেন—এখন টেনিস খেলেন, কাটে কাছাকাছি এসেও তাঁর প্রচণ্ড ড্রাইভ কামানের গোলার মতো ছোটে। খেলোয়াড় হিসেবে অজিত মিত্রেরও যে কিছু নাম ছিল না তা নয়, তাহলে?

দিনের বেলায় কিছুই বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাত তাকে ক্রমশ নিজের ভেতরে টেনে আনতে থাকে, তার আত্মবিশ্বাস আর হাঁটু তার স্পোর্টসম্যান সত্তাকে একটা ভাঙ্কিনী মন্ত্রে যেন ঘুম পাড়িয়ে ফেলে। হাসপাতাল পার হওয়ার সময় পর্যন্ত হয়তো সে ভেবেছে আজ আর কোনোমতে দাঁড়াবে না—আজ মাঝা সোজা রেখে সুন্দরের জাগাগুলি বড়ো বড়ো পা ফেলে পুলটা পার হয়ে যাবে। কিন্তু নিজের অজান্তেই কখন তার পা ঠিক সোহাগ পুলে উঠতে থেমে দাঁড়িয়েছে। বসন্তের পাতা ঝরা শেষ ডুডি ফুটে নীচ থেকে খালের কালো পাঁকমাখা জলের মৃদু কলধ্বনিতে, চিতার ধোঁয়ার মতো কুয়াশার রাত এগারোটার ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত একটা দুর্বোধ উত্তেজনার—দূরের দেখা-না-দেখা লালকাটা ঘরটার দিকে চোখ রেখে সে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মনে মনে মনে হয় ওই এগারোটার ঘণ্টা যদি কোনো দিন না শোনা যায় যদি হাসপাতালের ঘড়িগুলো বাজতে ভুলে যায় ওটা—তাহলে কী হতে পারে? আসলে ওই ঘণ্টাটা যেন অপূর্ব নাটকের সূচনা নয়—ও যেন তাকে চেনা-জানা মানুষের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার একটা অবাঞ্ছিত ঘোষণা। যদি ওটা কোনদিন না বাজে তাহলে একটা মিষ্টিরুস নানা যেমন করে ধীরে ধীরে জলের ভেতরে গলে মিশে যায় তেমনি করে অজিত মিত্রও এই শীতের কুয়াশার ভেতরে এই স্তব্ধ রাত্রিতে কখন কখন সেই রহস্যময় জগতের মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারে এই সাঁকো থেকে শুরু করে—ওই লালকাটা ঘর ছাড়িয়ে যে নাটক এগিয়ে চলেছে—কখন গিয়ে বসতে পারে তার দর্শকের ভূমিকায়।

আজ হঠাৎ মনে হল সেই অজানা জগতের দরজাটা কিছুতেই খুলবে না—কারু নিজের হাতে তা সে খুলতে না পারে। কুয়াশার ভেতরে এক টুকরো চাঁদ লাল হয়ে জ্বলে যাচ্ছে—নীচে খালের জলেও তার রক্তিম ছায়া পড়ল। তখন খসখস আওয়াজ তুলে কে যেন স্পষ্ট ভাষায় তাকে ফিসফিস করে বলে গেল, পারো—এই মুহূর্তেই পারো তুমি।

কী পারি? কী পারি?

দুবার—তিনবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করল অজিত মিত্র, কিন্তু তার দরকার ছিল না। উত্তরটা অনেক আগেই তার মনের ভেতরে পৌঁছে গিয়েছিল। তার আগে আরো তিনজন তা পেরেছে। দুটি পুরুষ, একটি মেয়ে। রেলিং ডিঙ্গে আর একটু এগিয়ে ওঠো, মাথাটাকে কাঁকিয়ে নাও সামনে পা দুটো ছুঁড়ে নিয়ে এইবারে শরীরটাকে আলগোছে সাদা কুয়াশার ওপর ছড়িয়ে দাও। তারপর—

মুহূর্তে সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্তি পেলো অজিত মিত্র—সকালের আলোয় যেমন করে বোঁটা থেকে শিউলি উঠে আসে। একটু জোর লাগল না—এক ফিকু ব্যথা বাজল না, কোথাও তার এতটুকু দায় আছে বলে মনে হল না। অজিত মিত্র হেরো হল। তার মাথার ভেতরটা বাইরের কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেল তার সমস্ত চেতনাকে একাকার করে কাঠমল্লিকা আর রাধাচূড়োর ফুরোপাতা কথা হইতে লাগল তার সমস্ত বোধগুলো নীচে অবাস্তব কালো সরীসৃপ জলস্রোতের সঙ্গে বইতে লাগল এক ধারায়। আর দেরী করা নয়। আর দেরী করবার দরকার নেই। এই লম্বা কুয়াশায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হলে বাকিটুকু চট করে সব করিয়ে দিতে হবে। অজিত মিত্র গায়ের ওভারকোটটা খুলে রেলিংয়ের ওপর রাখল তারপর যখন পায়ের জুতোটাও খুলতে যাচ্ছে তখন—

—কী করছেন বাবু এখানে?

যেন পিঠের ওপর সাপের ছোবল পড়েছে এমনি একটা চমক লেগে অজিত মিত্র ফিরে তাকালো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝরঝরে করে কেঁপে উঠল তার। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একজন পুলিশ কনস্টেবল আর দুজন কুলি। কুলিরা একটা স্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে চলেছে। তাদের স্ট্রেচারের সঙ্গে লণ্ঠন আর তার আলোতে দেখা যাচ্ছে একটা রক্তমাখা পিণ্ডকার শব। উত্তরের হাওয়ায় তার আবরণটা সরে গেছে খানিকটা মাংসের স্তূপে ভেতর থেকে দুটো ঠিকরে বেরুনো চোখের দৃষ্টি তাকিয়ে আছে যেন অজিত মিত্রের দিকেই। পাহারাওলা আবার সন্দিগ্ধ গলায় বললে এখানে এত রাতে কী করছেন বাবু?

এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

দাঁড়াবেন না, এসব জায়গা ভালো নয়। চারদিকে জনমানুষ নেই—কোথাকার কী গুন্ডামি হতে পারে বাড়ী চলে যান।

—যাচ্ছি। কিন্তু ওটা কী স্ট্রেচারে?

—ও একটা বডী। সন্ধেবেলায় রেলে কাটা পড়েছে। মর্গে নিয়ে যাচ্ছি। স্ট্রেচারটা এগিয়ে চলল। আর লোমখাওয়া লণ্ঠনের আলোয় সেই বিকৃত মাংসপিণ্ড থেকে দুটো ঠিকরে বেরুনো চোখ যেন একভাবে তাকিয়ে রইল অজিত মিত্রের দিকে। সেই চোখের দৃষ্টি দুটো ছুরির ফলার মতো ঝিকতে লাগল তার বুকে।

অ্যানেসথেসিয়ার প্রভাব কেটে গেলে যেমন অপারেশনের যন্ত্রণা সমস্ত শরীরকে নাড়া দিয়ে তোলে তেমনি করে জেগে উঠল অজিত মিত্র। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবার যন্ত্রণা করে উঠল তার—ঝড়ের মোহকে ছাপিয়ে জাগল ভয়। সেই মুহূর্তে ভয়ের তাড়নায় অজিত মিত্র ওভারকোটটাকে কাঁধের ওপর ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল—জামাটাকে গায়ে পরবার মতো সাহসও সে আর খুঁজে পেল না।

আজ থেকে এই পুলটাকে ভয় পাবে অজিত মিত্র। তাসের শেষ বাজী মিটে গেলে, আরো আধ মাইল ঘুরে বাজারের পথ দিয়ে সে মেসে ফিরে আসবে—কিন্তু রাত এগারোটার ঘণ্টা শোনবার জন্যে এইখানে আর কোনোদিন সে আসবে না। ওই লিভার রক্তমাখা শরীর থেকে চোখদুটো বেরিয়ে এসে প্রহরীর মতো পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে—স্পোর্টসম্যান অজিত মিত্রেরও এতো বড়ো সাহস নেই যে সেই স্থির ঠিকরে আসা দুটো অস্বাভাবিক চোখের দিকে দ্বিতীয়বার সে তাকাতে পারে। অজিত মিত্র ছুটল। প্রাণপণে পালিয়ে চলল।

আর উত্তরের বাতাস উঠল রাধাচূড়ো কাঠমল্লিকার ডালে চিতার ধোঁয়ার মতো কুয়াশার আবরণটা কাঁপতে লাগল। বাতাসের শব্দে পাতার আওয়াজে অজিত মিত্রের মনে হল একটা চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় অসহায় ক্রোধে কারা যেন চারদিকে হাহাকার করে উঠছে।

নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

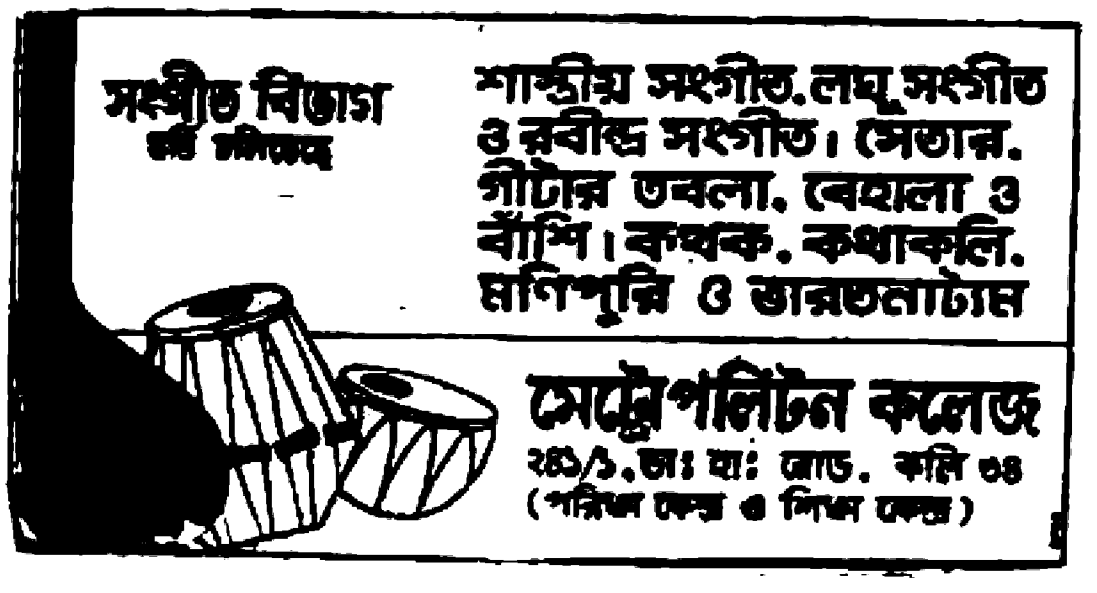

CENTRAL LIBRARY

মই

লীলা মজুমদার

আমাদের অফিসের বিপিনদাকে দেখে বোঝা যায় না উনি কি রকম দুর্দান্ত লোক। রোগা লিকলিকে, ছোট ছোট কদমাধিপাকা চুলগুলো ছাঁটা, অজস্র পান খেয়ে খয়ে ঠোঁট কালো, দাঁত লাল। শনি-মঙ্গলবার মানেন, বৃহস্পতিবারে কথা করেন না, বেরুবার সময় টিকটিকি টিক-টিক করলে আবার বসে পড়েন; কেউ কচ্ছপ বললে তখুনি হাতের কাজ ছেড়ে যেন, অথচ বেপরোয়া অভিযাত্রী। কোথায় না গেছেন, কি না দেখেছেন! রাতে মাঝে মাঝে কাজ কম থাকলে সেসব কথা আমাদের বলেন, শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। রক্ত টলবগ করে ফোটে। ও রকম অভিজ্ঞতার বিষয়ে আমরা ভাবতেই পারি না। আহরণ করা দূরের কথা। আর পড়াশুনোই বা কত! যেখানে গেছেন সেখানকার ইতিবৃত্ত কিংবদন্তী নখে আগায় করে ফিরেছেন। এমন লোক আমাদের কাগজের সহ-সম্পাদক হয়ে না তো হবেটা কে? আমরা ওঁর অধীনে কাজ করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করি।

এই পুজোর ঠিক আগে বেজায় কাজের ভিড়, কেউ নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছে না। তার ওপর মাথার ওপরকার বড় আলোটার বাল্বের তার কেটে গেল। আমাদের রিপোর্টার তারিণীও তেমনি তৎপর পত্রপাঠ লম্বা হই এনে তরতর করে উঠে পড়ল। ঠিক সেই সময় বিপিনদা ঘরে ঢুকে মইয়ের তলা দিয়ে প্রায় চলেই এসেছিলেন, দুঃখের বিষয় শেষ মুহূর্তে খেয়াল হওয়াতে বেই না পাশ ফিরেছেন মইয়েও পড়েছে টান, তারিণীর অধঃপতন, নতুন বাল্ব ভাঙ্গল কাটাছড়া চ্যাচামেচি, জল-পট্টি আইডিন।

তারপর সব আবার ঠান্ডা হলে, আমি আরেকটা বাল্ব এনে মই বেয়ে উঠে লাগিয়ে দিলাম। বিপিনদা তারিণীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তারিণী কিছু মনে করিস নে, বাপ। তুই একটু সুস্থ হলেই এরা তোকে চপ-কাটলেট খাওয়াবে। জানিস তো বুধবারে আমি ওসব ছুঁই না। আর মইয়ের কথা আর কি বলব তোকে। বিশ্বাস কর আমার মনে কোনো কুসংস্কার নেই, কিন্তু একবার এমন সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে মইয়ের নিচে দিয়ে আমার পক্ষে হাঁটা অসম্ভব।

তারিণী উঠে বসে চিঁ চিঁ করে বলল কেন কি হয়েছিল? বিপিনদা বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ব্যাপার। তোরা কেউ কেউ জন্মাস নি বাকিরা বোমার ভয়ে বাড়গ্রাম গেছিস আর আমি তখন অতি-গোপনীয় সংবাদের ধান্দায় মধ্য ইয়োরোপের মরুভূমি অঞ্চলে। আশেপাশে তখনো যুদ্ধ চলেছে, তবে ঠিক ঐ জায়গাটাতে মানুষ বিশেষ নেই, তো যুদ্ধ!

তারিণী বলল, কোন জায়গাটা?

বিপিনবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন বলছি তো বাইবেল বর্ণিত মধ্য ইয়োরোপে যেখানে ইয়োরোপ এশিয়ার মিলন হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস সেখানে জীবন্ত। দেখলে তোদের চোখ ট্যারা হয়ে যেত। আর সে কি গরম! তার খানিকটা জায়গা হল পৃথিবীর নিম্নতম স্থান ডেড সী যেমন। বাইবেলের প্রথম অংশের অকুস্থল যে-সব বীশুও তাদের কাছে ছেলেমানুষ। এইসব জায়গা দিয়েই চার হাজার বছর আগে মুসা মিশর থেকে বন্দী ইহুদীদের পথ দেখিয়ে কেনা-জানে নিয়ে এসেছিলেন।

অতি দুর্গম জায়গা, মরুভূমির পাথুরে পাহাড়, উঁচুনিচু পথ—তাকে কোনোমতেই পথ বলা যায় না। মানুষের জন্য তৈরি নয় এক ছাগল বা উটই যেতে পারে। এরই কাছে ডেড-সীর ধারে গুহার মধ্যে আড়াই হাজার বছরের পুরনো ডেড-সী স্ক্রোল পাওয়া গেছিল। যা নিয়ে তারিণী ফলাও করে লিখে খুব নাম কিনেছিল। আমি সে জায়গা স্বচক্ষে দেখে এসেছিলাম।

অনেকগুলো গুহা; কয়েকটা এত উঁচুতে যে নাগাল পাওয়া মুস্কিল। তারি একটাতে একটা ছাগল ঢুকে গেছিল, তাকে বের করার জন্য যেই না রাখাল ঢিল ছুঁড়েছে, অমনি হুড়মুড় করে কি সব ভেঙ্গে পড়ল। গিয়ে দেখি হাঁড়ার ভরা ছাগল-ভেড়ার চামড়ায় লেখা আড়াই হাজার বছরের পুরনো সব পান্ডুলিপি। কতকগুলো তামার পাতলা ফলকে আঁচড় কেটে লেখা। হেনাতেনা কত কি লিখেছিল তারিণী। সে তো সবাই জানে।

নিজের চোখে দেখে এলাম ওরই কাছে প্রাক-খৃষ্টীয় যুগের মঠের ধ্বংসাবশেষ। বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ মঠের সাধুরাই পান্ডুলিপিগুলো তৈরি করেছিলেন। এমনি একটা কুটিরও দেখলাম, সম্ভবতঃ সেইখানে বসেই লেখা হয়েছিল। দুটো কালির দোয়াত পর্যন্ত সেখানে পাওয়া গিয়েছিল। যীশু তখনো জন্মান নি

CENTRAL LIBRARY

তখন থেকেই রোমক সৈন্যের সে কি অত্যাচার। তাঁদের ভয়েই মঠের সাধুরা পাণ্ডুলিপিগুলোকে দুশো চল্লিশ হাতের মাটির হাঁড়িতে ভরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। রোমক সৈন্যরা মঠ ভেঙে তাঁদের উৎখাত করে ছেড়েছিল। পাণ্ডুলিপির কথা কেউ টেরও পায়নি। তাই হাজার বছর পরম নিরাপদে রক্ষিত ছিল হালে আবিষ্কার হয়েছে!

তারিণী বলল মইয়ের কথা বললেন না?

বিপিনদা চটে গেলেন, আহা ও জায়গাতো আর আমার গন্তব্যস্থল ছিল না যে মইয়ের কথা উঠবে। পথে যেতে ঐ-সব চোখে পড়েছিল তাই বলছিলাম, আমি যাচ্ছিলাম, এখন যেসব অঞ্চলকে জর্দান বলে সেখানে।'

জর্দান নদীর তীরে নাকি?

'জর্দানকে নদী বলিস না। আরে ছোঃ কাদাজলে ভরা একটা নালা ছাড়া কিছু নয়। যাই হক সেখানে আমার এক সঙ্গী জুটে গেল। তার নাম বলল ইজাক, স্থানীয় লোক। ভাবলাম গুপ্তচর নয়তো? আমার গোপন অভিসন্ধির কথা জানতে পারলেই তো হয়ে গেল। যাই হোক জর্দানস-ই তো সহজে আমি ভয় খাই না। বরং সে থাকতে আমার খাওয়া-দাওয়ার অনেক সুবিধাও হয়ে গেল, বিনা পয়সায় একটা গাইড পাওয়া গেল।

কথার কথায় ইজাক বলল, এতদূরেই যখন এলেন পেট্রা না দেখেই ফিরে যাবেন? মাথা কাটা গিয়ে। মুখে বললাম পেট্রা আবার কি?' ইজাক আকাশ থেকে পড়ল। পেট্রার নাম শোনেন নি? পাথরের গোলাপ পেট্রা-নগর। আড়াই হাজার বছর আগে নবতীয় দস্যুরা ঐ আস্তানা গেড়েছিল। তাদেরই শহর পেট্রা। পাথুরে পাহাড়ের গোপন কন্দরে তাদের ঘাঁটি ছিল। পাহাড়ের পাশ দিয়ে সারি সারি উট বোঝাই রেশম, কিংখাব বহুমূল্য গালচে মণি মাণিক্য সুগন্ধী দ্রব্য নিয়ে বণিকরা যেত। তাদের কাছ থেকে নবতীয়রা পারানি আদায় করত। না দিলে সব কেড়ে-কুড়ে নিত। এমনি করে তারা দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে গেছিল।'

তারিণী বলল কোন ভাষায় এত কথা বলল সে?'

বিপিনবাবু এবার বাঁকচোখে তাকিয়ে বলল, ইংরিজিতে। ওখানে অনেকেই ইংরিজি বলে তাও জানিস না? তোদের মতো নয়। সে যাই হক, ইজাক বলল, যেতে পারেন আমার সংসারে। সারাজীবন মনে রাখার মতো জায়গা। কাছেই মুসার দাদা আমলের কবর আছে। সেখানে অনেকে পাঁঠা-বলি দেয়। আপনাদের দেশেও তো পাঁঠা বলির নিয়ম আছে। আমি বললাম পাঁঠা খেলে আমার গায়ে চাকা-চাকা বেরোয়। বলাই বাহুল্য পেট্রাই আমার গন্তব্য স্থল। যদিও তার বিষয়ে এত কথা জানতাম না। সেখানে এক সরাইখানা আছে সেই সরাইখানার একজন গুপ্তচর আমাকে একটা চিরকুট দেবে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। কাজেই ইজাকের কথায় হাতে চাঁদ পেলাম। কোথায় যেতাম একা একা?

কিন্তু পথ বড় খারাপ। এতটুকু সমান জায়গা নেই যে পা ফেলব। একটু অসাবধান হলেই পা হড়কে যায়। তবু বাইবেল বর্ণিত সব স্থান তাদের একটা মহিমা থাকবেই, সে আমি হিঁদুই হই আর যাই হই, হাজার হক মানবজাতির জন্ম ওখানে।

তারিণী বলল, 'কে বলেছে?'

ইজাকই বলল, নইলে আমি জানব কোত্থেকে? এখন শোন তো। খানিকটা এবড়ো থেবড়ো জমি, খানিকটা খাড়াই, তারপর মরুভূমি, তার মধ্যে একটা মরুদ্যান। ইজাক বলল চার হাজার বছর আগে মিশর থেকে বাবার পথে মুসার দলের লোকরা এই অবধি এসে খিদে তেষ্টায় বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিল। তখন এখানে মরুদ্যান ছিল না, শুধু ধু-ধু বালি। মুসা দৈব-বাণী শুনে একটা প্রশান্ত শুকনো পাথরে লাঠির বাড়ি দিতেই পাথরের বুক থেকে গলগল করে বেরিয়ে এল ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। সে জলের ধারা আজ পর্যন্ত শুকোয় নি। ঐ দেখুন মুসার ঝরনা।

দেখলাম, বাস্তবিকই তাই। সেই জল খেলাম পর্যন্ত। ইজাক বলল, তারপর খিদে মেটাবার জন্য আকাশ থেকে মিষ্টি রুটির বৃষ্টি হল। সে রকম বৃষ্টি বেদুইনরা এখনো বানায় চেখে দেখবেন নাকি?'

আমি বললাম, 'উঁহু, বেজায় শক্ত।' ইজাক বলল 'নেবেন নাকি এক শিশি মুসা-ওয়াডির পবিত্র জল। পেটের বামোর অব্যর্থ ওষুধ। সামান্য দাম। আমি জোগাড় করে দেব।'

বললাম 'আমার গুরুর নিষেধ আছে।'

ইজাক বলল, 'যা বলেন। তবে ইহুদী, মুসলমান, খৃস্টান সবাই এসব জায়গাকে ভক্তি করে। অবিশ্যি আপনার গুরু যা খুশি বলতে পারেন। এইখানে মরুভূমির শেষ। সামনের ঐ গ্রাম থেকে টাট্টু ঘোড়া, গাধা বা খচ্চর ভাড়া করে নিতে হবে। আর পায়ে চলা যাবে না।

আমি বললাম, ঘোড়াই দেখ, গাধা বা খচ্চরে চাপতে পারব না।' ইজাক বিচলিত হল না, শুধু বলল, 'যেমন বলেন, টাট্টুর ভাড়া বেশি। কিন্তু যীশু মুসা যা চড়ে বেড়াতেন তাকে যদি যথেষ্ট ভালো মনে না করেন—' এই বলে দুটো টাট্টু ভাড়া করে আনল। দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু ছোটবেলায় দার্জিলিং-এ কত টাট্টু চেপেছি। ঘোড়া-ফোড়ায় আমার কিছু করতে পারবে না। তবে এদের লাগাম টাগাম ছিল না, স্রেফ খালি পিঠ, মুখে দড়ি। তাই সই। ঐ বন্ধুর পথে টাট্টু চালানো তো আর আমার কম্ম নয়, দড়ি ধরে বসে রইলাম, টাট্টু নিজের ইচ্ছে মত চলতে লাগল।

অতি সাবধানে পাথরের মধ্যে দিয়ে এগুচ্ছি, হঠাৎ দেখি বাঁয়ে একটা অদ্ভুত অট্টালিকা। ঠিক অট্টালিকাও নয়, তার তো ভেতর থাকে; এটা স্রেফ নীবেট পাহাড়ের গায়ের পাথর কেটে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের সামনে দিকটা বানিয়েছে। কিন্তু তার পেছন কোঠা দালান কিচ্ছু নেই, শুধু একটা অন্ধকার গুহা। অদ্ভুত ব্যাপার।

কারণটেই পাথরের মধ্যে সরু একটা ফাঁক মাত্র কয়েক ফুট চওড়া। ইজাক তারি মধ্যে ঢুকে পড়ল, পেছন পেছন আমার টাট্টুও। দু পাশে দেখলাম দু তিন শো ফুট উঁচু খাড়াই পাথরের দেয়াল, হাজার হাজার বছরের জলে-ঝড়ে ক্ষয়ে গিয়ে অদ্ভুত সব আকার নিয়েছে। পরতে পরতে আলাদা রং, কিন্তু সবই পাটকিলে, মেটে বেগনি গোলাপী। অনেক উপরে একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে এক চিলতে রোদ একেক জায়গায় পড়ছে আর অমনি ঝিকে গোলাপী গাঢ় গোলাপী লাল বেগনি রং ঠিকরোচ্ছে।

ইজাক বলল, মাত্র পাঁচটা লোক এখানে বিশাল সৈন্য ঠেকাতে পারত। জায়গাটার নাম বড় খারাপ। স্থানীয় লোকরা অন্ধকারের পর এদিকে মাড়ায় না। এইতো সেদিনও একদল ফরাসী মেম টাট্টু চেপে এই পথে পেট্রা দেখতে যাচ্ছিল। দিব্যি ফুটফুটে দিন ঝকঝকে রোদ। হঠাৎ কোথা থেকে প্রবল জলস্রোত এসে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পাহাড়ের মাথায় বৃষ্টি হয়ে থাকবে। চলুন, এই তিন মাইল পথ তাড়াতাড়ি পার হওয়া যাক।

হঠাৎ পথ শেষ হয়ে গেল, মাথার ওপর খোলা আকাশ, টাট্টুর পায়ের নিচে পাথরের স্তূপ। ইজাক বলল, 'ঐ দেখুন, পাথরের গোলাপ পেট্রা নগর স্বপ্নেও যার দেখা পাওয়া যায় না।'

আমি তো স্তম্ভিত, একি সত্যি শহর, নাকি মায়া? প্রাচীনকালের একটা বাঁধানো সড়কের ওপর, সারি সারি অপূর্ব কারুকার্যখচিত পাথরের প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। যেমনি তাদের খোদাই কর্ম তেমনি তাদের রং যেন মণি-মাণিক্য দিয়ে গড়া, লাল বেগনি, গোলাপী চোখ ঝলসিয়ে গেল।

ইজাক বলল, 'ঐ প্রথমটা ছিল নবতীয়দের ধনাগার ওটাকে খাজনে বলে।

আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। এ আবার কেমন ঘরবাড়ি, সামনেটা আছে, পাশ নেই, পেছন নেই। ঢোকবার অপূর্ব প্রবেশ দ্বার, কিন্তু অন্দর নেই। পেছনে শুধু-দুটি তিনটি করে অন্ধকার গুহা। তার মধ্যেও অপূর্ব কারুকার্য। কি হত এখানে? ওর মধ্যে বাস করা কি সম্ভব? নাকি গুদোমঘর না সমাধি, না কি কে জানে।

এটুকু বলতে পারি এমন শহর দুনিয়াতে কোথাও নেই। অট্টালিকা শোভিত রাজপথ, কিন্তু একটিও ঘর নেই। আস্তে আস্তে সবটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। সব নীরেট পাথর কেটে তৈরি, ইঁট কাঠ বা জোড়াজুড়ির চিহ্ন নেই।

ইজাক বলল, 'খাজনের সদর দরজার মাথায় ঐ যে মস্ত ভাণ্ড দেখছেন, একেবারে নীরেট পাথরে কোঁদা? স্থানীয় প্রবাদ ওটি হীরে মাণিক দিয়ে ঠাসা। কিন্তু নাগালের বাইরে। ওপর থেকে দড়ি বেয়েও নামা যায় না, নিচে থেকে মই লাগিয়েও ওঠা যায় না। বন্দুকের গুলি ছুঁড়েও কেউ ভাঙতে পারে নি। ঐ দেখুন গুলির দাগও

আমার মুখে কথা সরছিল না—কি হল তারিণী, ফোঁস করল যে?'

তারিণী বলল, 'না, এতক্ষণ পরে মইয়ের কথা বললেন কিনা?'

বিপিনদা বললেন 'এই? আমি কবে না জানি কি? হ্যাঁ একটি মাত্র তৈরি বাড়ি ছিল বটে, একটা রোমক মন্দির। অনেক পরে তৈরি, স্থানীয় লাল পাথর দিয়ে, দেখতে মন্দ নয়।

ইজাক বলল, 'চলুন হোটেলে জায়গা দেখা যাক। রাতটা কাটিয়ে ভোরে ফিরবেন।'

হোটেল শুনে আমার আসল কাজের কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হোটেল কাদের জন্য? এই দুর্গম স্থানেও যাত্রীরা আসে নাকি?' ইজাক হাসল, তা আসে না? দেখতে তো আসেই, তা ওপর এটাকে নানান দেশের গুপ্তচরদের একটা ঘাঁটিও বলতে পারেন। আসুন, খানকতক ঘর আছে, নয়তো তাঁবুর ব্যবস্থা আছে, নয়তো কয়েকটা গুহাতেও শোয়া যায়। বিজলি নেই আমবাতি আছে, প্রাচীন কুয়ো আছে। যা চান।

আমতা আমতা করে বললাম, 'খোঁজ নাও তো হোটেলে নবাগত কেউ এসেছে কিনা।' ইজাক অবাক হল, 'নবাগত? নবাগত তো মাত্র দুজন, আপনি আর আমি। আসুন, ভালো খাবার দেব।'

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। চিরকুট নিয়ে লোকটা তো এল না। হোটেলে কয়েকজন সাহেব, ভ্রম টুরিস্ট দেখলাম। খেলাম-দেলাম ভালো দুজনে একঘরে শুলাম। পরদিন সকালে হোটেলের যৎসামান্য চাহিদা মিটিয়ে দিয়ে আবার সেই আশ্চর্য রাজপথ ধরে সেই অপূর্ব গিরিপথ দিয়ে বহির্জগতে ফিরে এলাম। ইজাক আমাকে মরুভূমি ছাড়িয়ে বাস ঘাঁটি অবধি পৌঁছে দিল। ওর ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছিল। বিদায় নেবার সময় বললাম, স্বর্গ দেখালে আমাকে ইজাক—এ আমি কখনো ভুলব না। তবে আমার একটা কাজ ছিল, সেটা হল না, এই যা।' ততক্ষণে বাস স্টার্ট দিয়েছে; ইজাক আমার হাত ধরে পাদানীর ওপর থেকে বলল, 'সেজন্য দুঃখ করবেন না স্যার। সাহেবরা বেশি টাকা দিয়েছে। চিরকুট তাদের দিয়েছি—।' আমি তো হাঁ।

'ইজাক, তুমি? তুমি? কেন দিলে ওদের?'

ইজাক বলল, 'তাতে কি হয়েছে স্যার? খুশি ওদের। আপনি আমি ছাপোষা মানুষ অমোদের সঙ্গে তার কি?

ঐ তার সঙ্গে শেষ দেখা। বিপিনদা গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারিণী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু মই? মইয়ের কথা বললেন না?'

বিপিনদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মই? কোন মই? ছোটবেলায় চুচড়োর মামার বাড়িতে মইয়ের তলা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে চুপের বর্ণাতি উল্টে চোখ-টোখ প্রায় গুলে গেছিল, সেই ইস্তক মইয়ের তলা দিয়ে হাঁটি না। তোরা কি রে? পাথরের গোলাপে মন ওঠে না, খালি মই আর মই। মই আবার একটা কিছু ইম্পর্টাণ্ট জিনিস নাকি—আহা—হা আমার মাথার ওপর দিয়ে মই নিয়ে যাচ্ছিস কেন বলতো।'

প্রকাশিত হয়েছে !!

(শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অবশ্য পাঠ্য)

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির উপর লেখা দুঃসাহসী লেখক

বেদুইনের সর্বশেষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ—

কার পদধ্বনি ১২

প্রলয় সেনের আবশ্যপঠনীয় উপন্যাস

কয়েদখানা ১২.

(সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনের পাপপুণ্য মেয়ে-জেলের এবং বিক্ষোভ-সংগ্রামের বিস্তৃততর পটভূমিকায় রচিত অবিস্মরণীয় উপন্যাস)

সদ্য প্রকাশিত

দেবেন্দ্র মৈত্রের

রেল কর্মচারীদের সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে অসামান্য উপন্যাস

জোড়া ইস্পাতে রং ৮.

দেবেন্দ্র মৈত্রের আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি—

ব্রড গেজ মিটার গেজ ৫॥

স্কুল ও পাঠাগারের উপযোগী

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অসামান্য গ্রন্থ

দেবদাস দাশগুপ্তের

আকাশ ও পৃথিবী ৫.

পরাভূত প্রকৃতি ৩.

চাঁদের দেশ ৩.

সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ১৫।৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

যৌবন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দুনিয়াখানা যৌবনের বশ।

এক বুড়ো প্রায়ই আক্ষেপ করত আর বলো কেন তারা দুনিয়া তার যৌবন যায়।

ছেলেবেলায় এই যৌবনটির জন্য ভেতরে ভেতরে একটা লোভনীয় পরীক্ষা ছিল। ঈর্ষা হয় সকলেরই থাকে। কিন্তু সময়ের বেড়া বাঁধা এই ক্ষমা বাগিচায় পা ফেলার পর তার অনেক চটক চোখে পড়ে না। যাই হোক ওই দুর্লভ গণ্ডীর মধ্যে বিচরণকালে তার মহিমা সম্পর্কে আমি নিজে অন্তত খুব সচেতন ছিলাম না।

...বয়স প্রৌঢ় ব্যবধানে সরে আসার পর আজ আমার সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখছি যৌবন চটকদার বস্তু বটে। শুধু তাই নয় দি ওয়ার্ল্ড ইজ ফর দি ইয়ং—সেই বুড়োর ভাষায় দুনিয়া তার যৌবন যার।

এক নামজাদা দার্শনিক বলে গেছেন যৌবন অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কিন্তু কদাপি ধী-শূন্য নয়। সর্ব কৃত্রিমতার ওপর তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—সে মেকী ও কাঁকি ধরতে জানে। কিন্তু আজকের বাস্তব দুনিয়ায় দার্শনিক এই বাসি প্রসঙ্গ নিয়ে আসৌ মাথা ঘামাবেন কিনা সন্দেহ। তিনি বরং উত্তর যৌবন সম্পর্কে কিছু দর্শন বচন শোনাতে পারেন। কারণ এ যুগের এটাই বড় সমস্যা।

কেন?

কারণ দি ওয়ার্ল্ড ইজ ফর দি ইয়ং। যৌবন যার দুনিয়া তার। এতে দ্বিমত কেউ নয়।

অতএব আজকের দার্শনিক যদি কিছু যৌবনের বদলে সম্প্রসারিত যৌবনের কথা বলবেন অর্থাৎ কাজ ফুরালেও যে যৌবনের মহিমা অনেক কাল পর্যন্ত অটুট রাখা যায়—তার কথা। আর বলবেন যোগ ব্যায়াম একেবারে উল্টো কথাই। বলবেন টেনে বাড়ানো এ যৌবন ধী-শূন্য যদি বা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কদাপি নয়। সর্ব কৃত্রিমতা আড়াল করার প্রতি তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—মেকী আর কাঁকি তার একমাত্র পুঁজি।

খবরের কাগজে সেদিন একটা কার্টুন দেখে আপনারা অনেক হাসাহাসি করেছেন জানি।...এক ভিড়ের ট্রাম থেকে একজন মহিলা নেমে যাচ্ছেন তার চুলের (পরচুলের) খোঁপা এক ভদ্রলোকের ছাতায় আটকে আছে আর ভদ্রলোক তাঁকে চেঁচিয়ে ডাকছেন ও ম্যাডাম আপনার পরচুল যে আমার ছাতায় আটকে থাকল নিয়ে যান নিয়ে যান।

যাঁরা হেসেছেন তাঁরা হেসেছেন কিন্তু আমার ধারণা যদি কোনো ম্যাডামের বরাতে অমন দুর্দৈব ঘটেই তাঁর পুঁজি খোয়ানোর দুঃখে আজকের দিনে কাঁদবার লোকেরও অভাব হবে না।

আজ আমি কোনো গুরু-গম্ভীর তত্ত্ব বিস্তারে বসিনি। যৌবন আগলে রাখার

প্রেরণা বা তাড়নায় বহু বিচিত্র নজির সকলেই হামেশা দেখছেন। অবকাশ সময়ে আমিও দেখি। আমার দেখার রকমফট এক হাল-ফ্যাশনের চুল ছাঁটার সেলুন। নাম প্রসাধনী। প্রসাধনীর ছেড়ে কারিগর যে মালিকও সেই। নাম অমল বয়েস এখন তেত্রিশ বত্রিশ হবে। চৌদ্দস টেপ্পটে ছেলে। আমি তাকে গত বারো বছর ধরে দেখছি। তখন বাড়িতে এসে চুল ছেঁটে দিয়ে যেত। নিজের উদ্যম সেকাল করেছে তারপর ক'বছরের মধ্যে সেটাকে এমন ঝকঝকে তক্তে তুলেছে। আশপাশের দুটো সেলুন কম্পিটিশনে টিকতে না পেরে উঠে গেছে। তাদের বাছাই করা তিনটে কারিগর প্রসাধনীতে কাজ পেয়েছে। অমলের আশা অদূর ভবিষ্যতে সেলুনটাকে সে এয়ার কন্ডিশন্ড করে ফেলতে পারবে। আর তার একটা বড় খেদ এ লাইনে একটিও দিশি মেয়ে কারিগর মেলে না। তাহলে আলাদা একটা পার্টিশন করে মেয়েদের ব্যবস্থাও রাখত। দোকান জমজমাট হত তাহলে। এ তো আর সাহেবপাড়ার দোকান নয় যে মেয়েরা এসে পুরুষ কারিগরের হাতে চুলের বেণী ছেড়ে দেবে। —মেয়েরা না থাকলে কোনো ব্যাপারই ঠিক কমপ্লিট হয় না কি বলেন সার?

ওর হাত যেমন চলে রসালো জিভখানাও তেমনি অবিরাম নড়ে। আমাকে দেখলে আরো বেশি নড়ে। গল্প উপন্যাস লিখি ও জানে। একটু-আধটু পড়েও। তাই দেখামাত্র অন্য খদ্দেরদের শুনিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তারপর সোৎসাহে বলে আপনার অমুক লেখাটা পড়ছি সার। অমুক বইটা খুব্বই বা আপনার অমুক ছবিটা দেখলাম দারুণ ক্লাস।

গোড়ায় গোড়ায় বিড়ম্বনা বোধ করতাম বিরক্তও হতাম। কিন্তু ও সেটাও খুব সহজেই বুঝত। দুটু ফাঁক পেলেই গলা খাটো করে বলত কিছু মনে করবেন না সার এরকম বললে আপনার তো কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু আমার বড় উপকার হয়—কতজন এসে আপনার কথা জিজ্ঞেস করে আপনি জানেন না সার।

প্রসাধন কলা ছাড়া তোষামোদ কলাতেও লোকটা যে কম পটু নয় এ বোধ হয় ওর শত্রুও স্বীকার করবে।

ওর বচনের জনালায় হোক বা ভিড় এড়ানোর জন্যে হোক ইদানিং প্রতি মাসে আমি রাত্রে নির্ঝঞ্ঝাটেই আসি। তখনো যে খদ্দের একেবারে থাকে না এমন নয় তবে অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। যাই হোক এখান থেকেই মানুষের যৌবন-প্রীতির অনেক সকৌতুক নজির আমি দেখেছি। আর এই দেখাটুকু জাহির করেই অমল খদ্দেরদের অনেক মূল্যবান কাণ্ড-কারখানা আমাকে শোনায়। এই নিয়ে আমি একবার একটা হাসির গল্প লিখেছিলাম। এরপর থেকে ওকে আর পায় কে। রসদ যোগাবার তরল আনন্দে ও আপনা থেকেই মুখর হয়ে ওঠে।

নববর্ষে পত্রপুটের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জেমস হেডলী চেজ-এর

সদ্য প্রকাশিত অস্বস্তিকর উত্তেজনাপূর্ণ ক্রাইম থ্রিলার

অন্ধকারে একা

YOU'VE GOT IT COMING

ভাষান্তর / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫-০০

ফ্রেডরিক ফরসাইথের
শৃগালের শেষ প্রহর
শ্রেষ্ঠ বাস্তব থ্রিলার ২৫-০০

হ্যারল্ড রবিন্সের
দি কার্পেটব্যাগার্স
১ম খণ্ড ২০-০০ ২য় খণ্ড ২০-০০

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর
কোন পথে?
২য় খণ্ড ১৮-০০ ১ম খণ্ড ১২-০০

নিমাই ভট্টাচার্যের
শেষ পারাণির কড়ি
প্রেমের উপন্যাস ৭-০০

অসিত সরকার অনূদিত
গর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প
১ম খণ্ড—৩০টি গল্প ২০-০০

জুলিয়াস ফুচিকের
ফাঁসীর মঞ্চ থেকে
ভাষান্তর/অসিত সরকার ৫-০০

জিম করবেটের
কেনিয়ার জঙ্গলে
৬-০০

জুল ভের্ন
লিভোনিয়া রহস্য
৮-০০

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন
আতঙ্ক,
সেই সঙ্কেত
ভাষান্তর/সৌরীন রায় ১২-০০

এরিখ মারিয়া রেমার্ক
প্রেম মৃত্যু
ভালবাসা
ভাষান্তর/অসিত সরকার ১৪-০০

এরিখ সেগালের
ভালবাসা ভালবাসা ৬-০০

জয় অ্যাডামসনের
বর্ন ফ্রী ৮-০০
লিভিং ফ্রী ৮-০০
এলসা ফ্রেন্ডার ফ্রী ৮-০০

আগাথা ক্রিস্টির
মমির দেশের মেয়ে ১০-০০
তিনে লক্ষ্য চারে ভেদ ১০-০০
রইলো না আর কেউ ৫-০০

প্রকাশক—পত্রপুট / পরিবেশক—কণা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-১২

সেদিন ঘরে ঢুকে নাগাতে গিয়ে কেন অমলের দোরে কবরকে একটা ধাক্কা দাঁড়িয়ে। ভিতরে অমল অপরিমিত মনোযোগ সহকারে এক যৌবন ভদ্রলোকের চুলে কলপ লাগাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি মাঝা চুল পরিপাটি ভাবে ভদ্রলোকের কালো করাটাও প্রসাধনীর এক বড় আকর্ষণ। অমল বলে, এ কাজে ও স্পেশালি ট্রেনিং নিয়েছে। চুল কালো করার মাসুল দু টাকার থেকে পাঁচ টাকা—অর্থাৎ খদ্দের বুঝে যেমন ভাড়া করা যায়। বাপার লক্ষ্য করেছি শুধু একটু মর্যাদা-প্রাপ্তি আর তোষামোদের হাওয়া চাই।

ভদ্রলোককে দেখে আর অমলের সুতীব্র মনোযোগ দেখে বুঝলাম পাঁচ টাকার খদ্দের তো বটেই বেশিও হতে পারে। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। আটঁসাটি [illegible] হাতে সোনার ঘড়ি [illegible] আর নীলাভ আংটি জমকে চুনীর বোঝাম।

ভদ্রলোকের চুল কতটা পাকা ছিল সঠিক বোঝা গেল না। কারণ কলপ-বিন্যাস পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন অমল যা করছে সেটা বাড়তি স্পর্শ অল্পের কিছু [illegible] আশা তার। অমলকে দেখেই চোখে [illegible] একটু অপেক্ষা করতে বলল এবং খালি কারিগর আমার দিকে এগিয়ে আসতে ইশারায় তাকেও নিষেধ করল। অর্থাৎ হাত খালি হলে সে নিজেই কাজ ধরবে। বুঝলাম আমাকে সোনানোর মতই কিছু রসদ তার কাছে জমা আছে।

আধো মিনিট দশেকের মধ্যে ওদিকে কেশ-বিন্যাস শেষ। অমল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পরিষ্কার চেলে দাঁড়িয়ে আধো একটু বাড়তি সম্মান দেখাল। ভদ্রলোক পকেট থেকে বড়সড় মানিব্যাগ বার করতে করতে পুষ্প-ছোরের ওধারে চলে গেলেন।

কলপ ঠোলে অমল আবার ফিরে আসতে চেয়ার টানা শব্দেতে তার মুখখানা ভেসে উঠছে। হাতের দশ টাকার নোটখানা ভাঁজ করে কাঠের বাক্সে রাখতে রাখতে সামনের দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালো একবার। তারপর দ্বিতীয় কর্মচারীটিকে বলল আজ লটা থেকে গেছে এই রাতে আর কেউ আসবে না তুমি যাও।

আমার গলার স্বরে কাগড়ের এক্সন ভদ্রলোক চিরুনি কাচি হাতে পিছনে এসে দাঁড়াল। —সত্য, এই যে ভদ্রলোকটি চলে গেলেন...চিনলেন?

কাচি দেখে মাথা নাড়ার উপায় নেই। বললাম না।

মস্ত লোক, আপনার তো চেনার কথা। জগু দত্ত...থিয়েটার কোম্পানীর মালিক।

নামটা চেনা। ওই রাজ্যের মস্ত লোকই বটে।—তোমার খদ্দের হয়েছেন?

—হাঁ মাস ধরে। পাকা হাতের কলপ মাসে একবার লাগালেই চলে; কিন্তু উনি পনের দিন অন্তর আসছেন—এই মাসে দুবার এলেন।

আমি নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম কেন চুল খুব বেশি পাকা?

—পাকাই বটে তবে ভয়ে আর অশান্তিতে ভেতরটা আরো বেশি পাকা বুঝলেন?

পরের বিশ মিনিটের মধ্যে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকল না। অমল বেশ রসিয়ে পাকা চুলের ভয় আর অশান্তির ব্যাপারটার বিস্তার শুরু করল। তার সার মর্ম : জগু দত্তের বয়েস এখন ষাট ছুঁয়েছে। তার চারটে বাড়ি তিনটে গাড়ি আর অঢেল টাকা। অবশ্যই আনুষঙ্গিক গুণাবলীও আছে। তার মধ্যে একটি সাঙ্ঘাতিক গুণও

অস্বীকার করা যায় না। নিজের একটি ছোট ভাই আছে নাম সুবল দত্ত। কম করে কুড়ি বছরের ছোট তাঁর থেকে। এই ভাইটিকে নাকের মত মানুষ করেছেন তিনি সাঁতাই ভালবাসেন তাঁকে। বিষম গোল বাধল প্রিয়বালা আসার পর থেকে।

—প্রিয়বালাকে দেখছেন নিশ্চয় সার? ওঃ! স্টেজে ঢুকে যখন তামাম হলখানাকে হাওয়া করলে যায়।

দুমাস হল প্রিয়বালা জগুবাবুর থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। পশ্চিমের ছাটাল মেয়ে আগে কেউ তাকে কলকাতার কোনো থিয়েটারে দেখেনি। সেই থেকে জগুবাবু অমলের খদ্দের।

এই প্রিয়বালা জগুবাবুর চোখের মণি। বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিন-রাত তার কাছেই পড়ে থাকতেন। কিন্তু ক্যাসার বাধল আদরের ছোট ভাই সুবল দত্তকে নিয়ে। সেও প্রিয়বালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ফলে দাদা দুঃখে নিজের মাথার চুল ছেঁড়েন জগু দত্ত। ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের বেমানান। ওদিকে উদার হয়ে ভাইটিকে দেয় একটা মোটা অঙ্কের টাকা অনেক আগেই দিয়ে বসেছিলেন। তার বিষগাছ গজাচ্ছে এখন। শোনা যাচ্ছে সেই টাকা নিয়ে সুবল দত্ত প্রিয়বালাকে নিয়ে আলাদা থিয়েটার খুলবে।

জগু দত্তের বন্দুক আর সব বুঝলেন। আর তাঁর মাথায়ও রক্ত চড়েই আছে। একবার ভাবেন ভাইকে গুলী করে মারবেন আর একবার ভাবেন প্রিয়বালাকে। ...আমার মনে মনে হয় ওই বন্দুক দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নিজের মাথারই খুলি উড়াবেন...কি বলেন সার?

আমি কিছু বলিনি। কিন্তু মনে মনে ভেবে-চিন্তে আর সাধা-ভাষা করে একটা মামুলী গল্প লিখেছিলাম। সেই প্লটের গল্পে ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের রেষারেষিতে শেষে দুশ্চিন্তে চল্লিশ বছরকেই জিতিয়ে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু সুক্ষ্ম বিচারে হৃদয়ের দিক থেকে ষাট বছরই অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।

গল্পটা অমলের আদৌ পছন্দ হয়নি। প্রশ্ন করেছে এটা কি বললেন সার ষাট বছর ওই অভিনেত্রীর জন্য তার চারটে বাড়ি আর তিনটে গাড়ি একটা কথা বলতেই তো অনায়াসে তাকে দাঁড়ান মহাত্মার পুরতে পারত! আর জগু দত্ত যদি ফোর্থটির জানতে পারে এই গল্পের খোরাক আমি জুগিয়েছি আমাকে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

ভাবলাম ষাট বছর কিভাবে ও যোগ্যতর মোটা বখশিশটা পেতে তাঁর কাছ থেকে।

মন্দ নয় প্লটের কথা। প্রসাধনীতে ভুলে সেই রাতে বিলাতী গোখের শূন্য বোতলটা অর্থাৎ যোগ্যতর সঙ্ঘাতের দেখা [illegible] নাতের লিপি বলিতে মাথায় এক [illegible] মস্ত শাখা চুল কালো করতে বলেছে [illegible] কিন্তু ছোরার একটি [illegible]

॥ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ॥

শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস সম্পাদিত

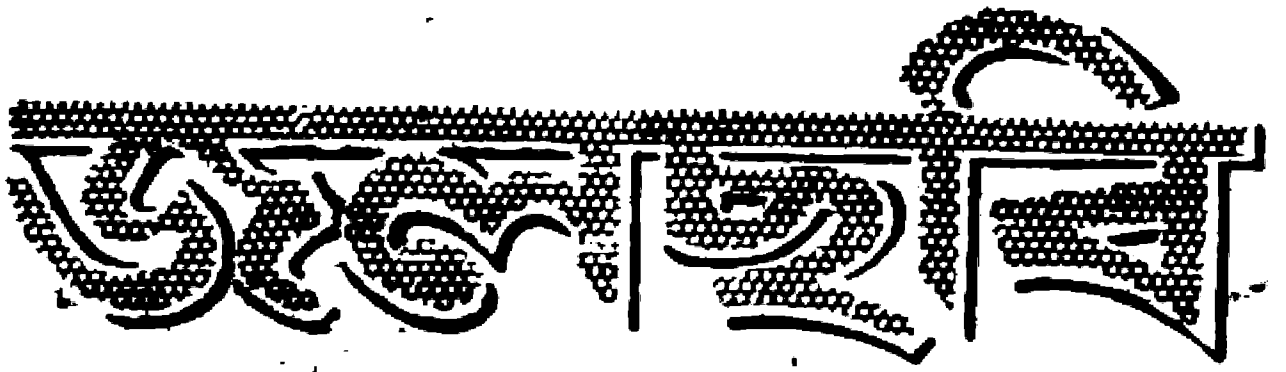

১২·০০

আংশিক লেখক সূচী : সত্যজিৎ রায় ॥ জরাসন্ধ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ আশাদেবী ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ হরপ্রসাদ মিত্র ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ চিরঞ্জীব সেন ॥ আবদুল জব্বার ॥ চিরঞ্জীব প্রভৃতি ॥

জ্যোতি প্রকাশন। ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

গোড়-পোড়া কলিচে—কপালের দুদিকে ফুটে ওঠা নীল শিরা দূরে থেকে দেখা যায়। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য আর ভেতরের ছাপ। পরনে তেলচিটে খাটি হাফ পান্ট পায়ে বিবর্ণ একটা হাওয়াই চটি, সঙ্গে খাই খোল দেহের কাঠামো তেমন শীর্ণ নয়।

এ হেন মূর্তির মাথার সাদা চুল কালো করার তাগিদটা তাই একটু অস্বস্তি লাগল। অমল তার ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা নিজের অজান্তে দর্পণে এসে গজগজ করে উঠেছে—স্থির চোখে বসুন মাত্র ছটফটে বয়সে কালোর ভেতর দিয়ে অনেক সাদা চুল দাঁত বার করে হাসবে। এই সরল ভাষা আমার পরিচিত।

অমল বিব্রত মুখ করে বলল একটু, বসুন সার ভোলা খেতে গেছে, এলো বলে।

ওর হাত লোক থাকলে ভোলাই আমার চুল কেটে থাকে। আমি মাথা নেড়ে অদূরে বসে সকৌতুকে অমলের ওই খদ্দেরটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। অমল সেটা লক্ষ্য করল এবং বার দুই তিন আমার দিকে ফিরে তাকালো। বিব্রত ভাব তার চোখেও যেন সরস কৌতুক নেচে উঠছে। সাদা চুলের গোছায় হাত চালাতে চালাতে সামনের আয়না দিয়ে লোকটার মুখখানা ভালো করে দেখছে আর চাপা খুশীতে দাঁতে করে নিজের ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছে। এবারেও গল্প আছে কিছু, হাবভাবে অমল যেন সেটাই আমাকে বোঝাতে চাইছে।

ভোলা আসতেই গম্ভীর মুখে অমল তাকে জানালো এই এদিকে আয় এঁর কাজটা ধর, খুব ভালো করে শুনিয়ে দিবি, চুল দিয়ে কালো কেউ বেরোয় যেন—

ভোলা সঙ্গে লোকটাকে বলল কিছু ভাবনা নেই মশায় ও আমার থেকে অনেক ভালো কার করবে।জাপান থেকে চুল কালো করার ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

সংশয় ভরা চোখে লোকটা একবার ভোলার দিকে তাকালো শুধু। কোনরকম প্রতিবাদ করল না।

অমল সোজা এগিয়ে গিয়ে লম্বা ঘরের ওধারের শেষের একেবারে শেষ চেয়ার আর আয়নার সামনে গিয়ে আমাকে ডাকল ইঙ্গিতে আসুন সার—

উদ্দেশ্যটা এই বাধন বুঝেও বললাম, ওকে ছেড়ে এসে কেন তোলাই তো কাটতে পারত—

আমার গলার চাদর জড়াতে জড়াতে অস্ফুট একটা শব্দ বার করল গলা দিয়ে। তারপর চাপা স্বরে বলল, দু টাকা রেট, দুদিন রাত দুপুরে এসে ঘর ঝাঁকাঝাঁকি করে আজ সেই টাকায় কাজ সেরে যাচ্ছে।

আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম এমন অবস্থায়ও চুল কালো করার সখ!

—প্রাণের দায় যে। চুলে ক্রিপ চালিয়ে খুটো গলায় অমল লঘু উচ্ছ্বাস ঝরে করল ফেলল মেয়েদের মতো সেখানেই গেল, বুঝলেন সার, খুব মজার ব্যাপার..... আপনাকে বলব বলেই এদিকে নিয়ে এলাম..... কিন্তু লিখতে গেলে এবারে আপনার পক্ষেও খুব মুশকিল হবে—

আড় চোখে যতটুকু সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে একবার ওধারের লোকটার দিকে তাকালাম। কোনো দিকে হুঁস নেই, তন্ময় আগ্রহে অমলের নিজের মাথাচুলের ওপর তোলা হাতের কসরৎ দেখছে।

চুলে কাঁচি চালাতে চালাতে অমল তেমনি চাপা গলায় অথচ চাপা আনন্দে গল্পটা বলে গেল।... লোকটা কলে কাজ করে, আর বয়েস তো দেখতেই পচ্ছেন। ঘরে একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে প্রথম পক্ষের অনেক আগেই খতম হয়েছিল। ওর বড় ছেলেও ছেলেটাকেও মিলে ঢুকিয়ে তার যন্ত্রে দেবার চেষ্টায় এসেছিল। কিন্তু ছেলে কলা মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেরই মুণ্ডু ঘুরে গেল—চালাকি করে ও-বাড়ী নিজেই তাকে বিয়ে করে বসল। তারপর থেকেই বিষম ফ্যাসাদ। বাপে ছেলেয় সাপ-বেজির সম্পর্ক, আর ওই ছেলের দিকেই বউটার গোপন টান... হবে না তো কি, বউটাকে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি—প্রথম দিন ওকে দরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার সঙ্গে চুল কালো করা নিয়ে দর-দস্তুর করতে এসেছিল। বড় ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও বউকে বিশ্বাস করে না বলেই সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয়। তখন দেখেছি। কালো পাথরে কোঁদা চেহারা—সব অঙ্গে স্বাস্থ্য আর ইয়ে যেন ছুঁইয়ে পড়ছে। এই বুড়ো অমন মেয়েমানুষ বশে রাখবে কি করে!

আমি নীরব শ্রোতা। একটু চুপ করে থেকে তেমনি খুটো গলায় অমল যেন প্রায় ফিসফিস একটা সাংঘাতিক ইঙ্গিত ছুঁড়ে মারল—কিন্তু একবার লিখলে বুড়োর বলল আপনি ওই ছোঁড়াটাকে ছেড়াবেন কি করে—মা-ছেলে সম্পর্ক যে!

জবাব দিইনি। লেখারও বাসনা ছিল না।

কিন্তু তা হবার নয় বলেই বোধহয় দেড় মাস বাদে এই রঙ্গমঞ্চে আবার এক রাতে এই বুড়োর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা। আরো কিছু আরো বড়ো মূর্তি। অমলের হাতে তার চুল কালো করার কাজ চার ভাগের তিন ভাগ শেষ।

অতএব ভোলা এসে আমার দখল করল। আর সেই দখল হস্তান্তর মিনিটখানেক আগে টাক থেকে সন্তর্পণে খুচরো পয়সা গুনে অমলের হাতে দিচ্ছে দেখলাম।

আমি বাইরে এসে সিঁড়ি অমলের লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা কুড়ে অয়না বার করে বুড়োটা নির্বিষ্ট মনে তার কালো পালিশ-করা চকচকে চুল পর্যবেক্ষণ করছে। ঘরের মত আয়নাতে দেখেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

পাশ কাটিয়ে গিয়েও আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। গম্ভীর অথচ লঘু, বিদ্রূপের সুরে বলে ফেললাম, জমকার হয়েছে। কেউ বলতে পারবে না।

অবাক চোখে লোকটা মুখ তুলল, তারপরই মুখে হোক-যোগ হাসি।—হ্যাঁ হুজুর.....তবে বড় খরচ।

হুজুরে শুনে হোক বা খরচের কথায় বিমর্ষ শুকনো মুখ দেখে হোক, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেরা নেয় নি?

—আজ্ঞে কার্তিক ফালুই। এত আজ থেকে মুখখানা যেন আরো কিছু বিমর্ষ লাগছে। আমার মনের অগোচরে কোনো খটকা লেগেছিল কি না জানি না—এখানে থাকো কোথায়?

—ফুটপাথে।

—আমি অবাক এ কে থাকে

—এখানে কেউ থাকে না তবে অনেক গরিব-বড়লোক ফেলে থাকে।

সত্যিই খটকা লাগছে। ছেলে কোথায়?

আমাকে সদয় ভেবেই লোকটার বিষণ্ণ মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস—মেদিনীপুরে—

—তা অত খরচ করে পাকা চুল কালো করবার সখটা কি?

খুটো গলার করুণ চাপা স্বরটা আমার মুখের ওপর ঝমকালো।—কি করব, পেটের দায়—ভিক্ষে করতে মন সরে না।

—কেন? কি করতে?

—আজ্ঞে হুজুর বিকল চুল...আমার সাদা চুল দেখে কেউ আমায় বিকলায় উঠতে চায় না, সব ছোকরাদের ডিকলায় ওঠে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করে লম্বা ঘাড় দুইটা টেনে লোকটা চলে যাচ্ছে

লাইটপোস্টের নীচে আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে।

মনভরানো রঙের সুরে
মনের কথার গল্পগুলি
গীতি-প্রতিমা
দাম: পঁচটাকা

আজকের ইউকোব্যাঙ্ক : জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

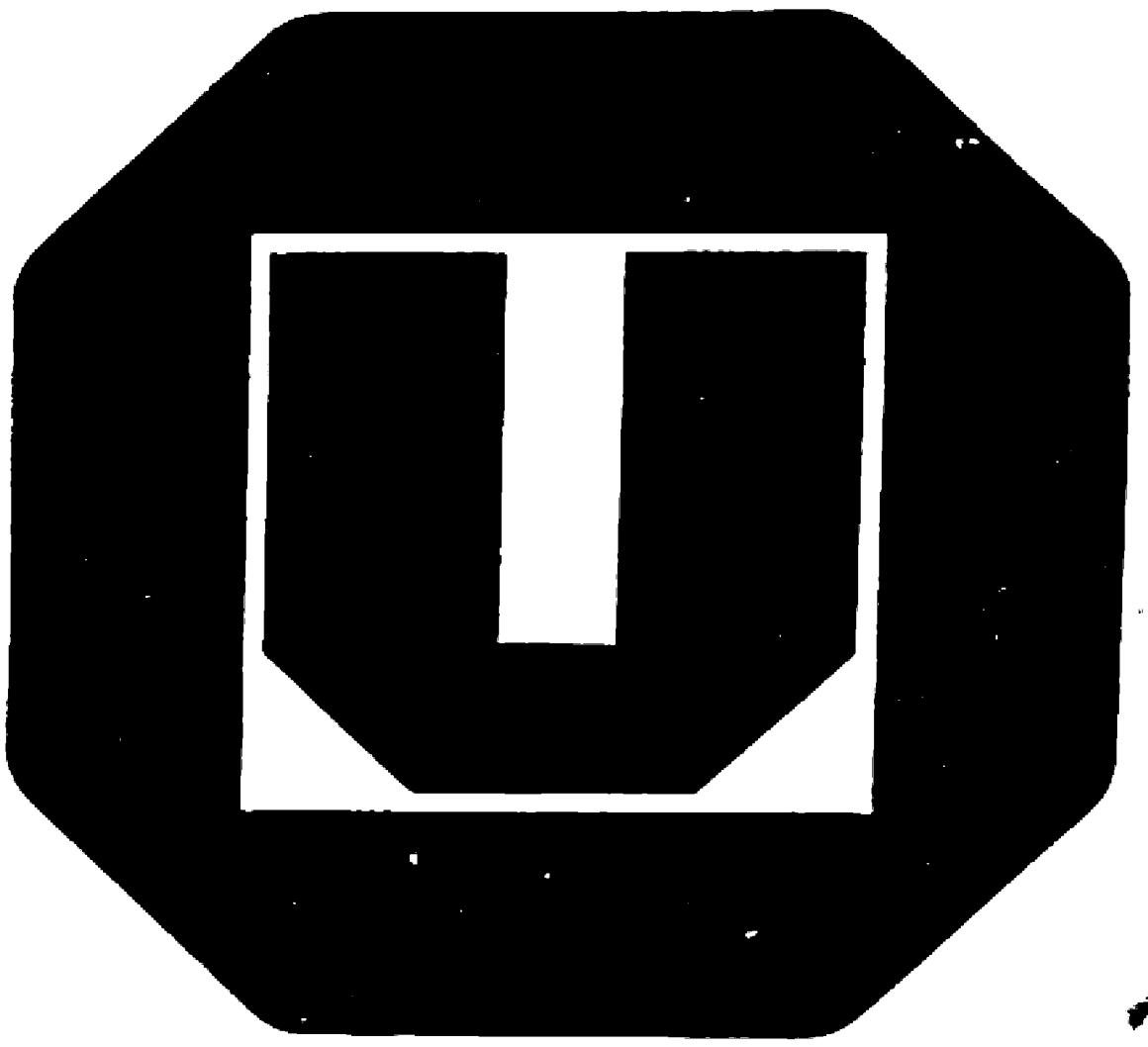

জাতীয় উদ্দেশ্য ও
আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমতা
রেখে শুধুমাত্র গতানুগতিক
ব্যাঙ্ক না হয়ে ইউকোব্যাঙ্ক এখন
সামাজিক দায়িত্ব পালনে
পুরস্কৃতিত একটি ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত
হয়েছে।

এর জন্য এই সংস্থাকে বর্তমানে
ঢেলে সাজানো হচ্ছে, যাতে
কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার
ক্ষমতা দু-চারজনের হাতে
না রেখে অনেকের হাতে ছড়িয়ে
দেওয়া যায়।

ইউকোব্যাঙ্কের কয়েকটি নতুন
কাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য :

আজকের ইউকোব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা আপনার দোরগোড়ায় নিয়ে হাজির করেছে

দ্রুত সম্প্রসারণ কর্মসূচী
হাতে নেওয়ার ফলে এখন
আমাদের ৭৪০ টিরও বেশি
শাখা কাজ করছে।
অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক
শাখা খোলার কাজও আমাদের চল[illegible]

আজকের ইউকোব্যাঙ্ক লক্ষজনের কর্মসংস্থানে সাহায্য করছে

ইউকোব্যাঙ্কের সনক
পত্রে একটি "ও লক্ষ
কর্মসংস্থান সেল" খোলা হয়েছে।
এই সেল আপনার প্রকল্পের
সম্ভাব্যতা ও লাভজনকতা খুঁটিয়ে বিচার
করতে এবং মূলধনী
কেনা ইত্যাদি ব্যাপারে বিভ্রান্ত
করে দেখতে সাহায্য করছে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে
সাহায্য করছে

CENTRAL LIBRARY

আর্যভট্টের জন্ম ও মৃত্যু

সত্যজিৎ রায়

অনেকের মতে আর্যভট্টের ছিলেন যাকে ইংরেজীতে বলে চাইল্ড প্রডিজি। তার যখন দশ বছর বয়স তখন একদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পাতায় নীচের দিকে এক লাইন লেখা তার চোখে পড়ল—সান রাইজেজ টুডে অ্যাট সিকস থার্টিন এ এম। আর্যভট্ট কাগজ হাতে নিয়ে পিতা সৌম্যভট্টের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

—বাবা
—কী রে?
—কাগজে এটা কী লিখেছে।
—কী লিখেছে?
—ছটা বেজে তেরো মিনিটে সূর্য উঠবে।
—তা ত লিখবেই। সেই সময়ই ত উঠছে সূর্য।
—তুমি ঘড়ি দেখেছিলে?
—ঘড়ি দেখতে হয় না।
—[illegible]
—[illegible]
—[illegible]। আশ্চর্যি।
—[illegible] না ওঠে।
—ঘড়ি [illegible]
—যদি ভুল না হয়?

—তাহলে আর কী। তাহলে প্রলয়।

সেদিন থেকে আর্যভট্টের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সূত্রপাত।

এর দু বছর পরে আবার আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আর্যভট্টকে পিতার কাছে যেতে হলো।

—বাবা।
—হুঁ।
—চাঁদ আর সূর্য কি এক সাইজ?
—দূরে বোকা।
—তাহলে?
—সূর্য ঢের বড়।
—কত বড়?
—লক্ষ লক্ষ গুণ।
—তাহলে এক সাইজ মনে হয় কেন?
—সূর্য অনেক দূরে তাই।

—ঠিক কতখানি দূরে হলে এক সাইজ মনে হয় ওত দূরে?
—হুঁ।

—কী করে হল?
—জানি নে বাপু। আমি তো আর সৃষ্টিকর্তা বিধাতা নই।

এখানে বলা দরকার, সৌম্যভট্ট বৈজ্ঞানিক নন। তাঁর পেশা ওকালতি।

বাপের সঙ্গে কথা বলে [illegible] বুঝলেন, চন্দ্র-সূর্যের আয়তন [illegible] দৃষ্টিতে এক হওয়াটা একটা আকস্মিক ঘটনা। তার মনে এই আকস্মিকতা প্রচণ্ড বিস্ময় উৎপাদন করল। পাঠ্যপুস্তকের কথা ভুলে গিয়ে তিনি বাপের আলমারী খুলে বড় খণ্ড সমাপ্ত হর্মসওয়ার্থ পপুলার সায়েন্স থেকে গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে পড়তে আরম্ভ করলেন। বলাবাহুল্য এ কাজে তাকে ঘন ঘন অভিধানের সাহায্য নিতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে নিরাশ হন নি, কারণ কল্পনাপ্রবণতার সঙ্গে একাগ্রতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তার চরিত্রে।

তার চতুর্দশ জন্মতিথিতে আর্যভট্ট পিতার টেবিলের দেরাজ খুলে তিনখানা অব্যবহৃত ডায়রী বার করে তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট বড় তার প্রথম পাতায় লিখলেন—আমার মতে সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে প্রাণী থাকলেও তা মানুষের মতো কখনোই হতে পারে না কারণ এমন চাঁদ আর এমন সূর্য অন্য কোন গ্রহে নেই। যদি থাকত, তাহলে আমাদের মতো মানুষ সেখানে থাকত, কারণ আমার মতেই চন্দ্র-সূর্য আছে বলেই মানুষ মানুষ।

এর পরের বছর আর্যভট্ট হঠাৎ একদিন খোলাচুলে মুখে মুখে দুরূহ গাণিতিক প্রশ্নের সমাধান করতে সুরু করলেন। যোগ বিয়োগ গুণ-ভাগ ত আছেই, তাছাড়া আরো আছে যা একেবারে উচ্চমান গণিতের পর্যায়ে পড়ে। সেদিন আকাশে [illegible] চিল দেখে তার

পর্বতের মতো মাটি থেকে তার উচ্চতা এবং তার বৃত্তপথের পরিধি নির্ণয় করে ফেললেন অমরশেখর। গৃহশিক্ষক সুবিমল মজুমদার ছাত্রের এই আকস্মিক ব্যুৎপত্তিতে অপ্রস্তুত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। সোমাশেখরও ছেলের এই কাণ্ডে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হলেন। তার এবং তার কয়েকটি বন্ধু ও মক্কেলের উদ্যোগে কলা শহরের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞদের দৃষ্টি অমরশেখরের প্রতিভার দিকে আকৃষ্ট হল। প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক জীবনানন্দ কর নিজে এসে সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে অমরশেখরকে নানারকমভাবে পরীক্ষা করে তাকে দীর্ঘ প্রশংসা পত্র লিখে দিয়ে গেলেন। তিনি লিখলেন মুখে মুখে গণিতের সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনে অমরশেখর সোমেশ বসুকে অতিক্রম করে গেলে আমি আশ্চর্য হব না। আমি এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন বালকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

অতিরিক্ত আহ্লাদে একটা সম্ভাবনা সামনে পড়লে অনেক অর্থবান ব্যক্তিও সহজে সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে না। সোমাশেখরের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল, সুতরাং পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার সাহায্যে অর্থের পথটা কিঞ্চিৎ সুগম করে নেওয়ার পরিকল্পনা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তবে ছেলেকে না জানিয়ে কিছু করার ইচ্ছা তার ছিল না, তাই তিনি অমরশেখরকে ডেকে পাঠালেন।

—ইয়ে একটা কথা ভাবছিলাম বাবা।

—কী?

—আমরা-তো-জানিস্ই — মানে আজকাল যা দিন পড়েছে—সেই অনুপাতে এ খুব একটা ইয়ে হচ্ছে না—মোটামুটি চলে যায় আর কি। তা তোর যখন এমন একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে সবাই বলছে—মানে এও তো ধর গিয়ে একটা মানিক! তা সেটা যদি আর পাঁচজনকে দেখাবার সুযোগ দেয়া যায়—মানে বেশ ভালো একটা জায়গা-টায়গা দেখে ভালো ব্যবস্থা-টাবস্থা...

বলতে বলতে এবং সেই সঙ্গে ছেলের কুদ্ধ বিস্ময়ভাব দেখে সোমাশেখর নিজেই লজ্জা বোধ করলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামিয়ে তারপর সুর পরিবর্তন করে বললেন, অবিশ্যি তোর যদি আপত্তি থাকে তাহলে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তামাসা আর প্রতিভা এক জিনিস নয় বাবা। কিন্তু বাবহারে আত্মশেখরের মনে নতুন প্রশ্নের উদয় হল। এমন প্রতিভাবান পুত্রের এমন হীন স্বার্থান্বেষণপর বাবা হয় কী করে? পিতা পুত্রের চরিত্রের এই বৈপরীত্যই কি স্বাভাবিক, না এটা একটা ব্যতিক্রম?

আর ব্যতিক্রমই যদি হয় তাহলে তার ঐতিহাসিক কারণ কী? আত্মশেখরের অবসরের অভাব ছিল না কখন তার গণিতের প্রতিভা প্রকাশ পাবার কিছুদিনের মধ্যেই সোমাশেখর তাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই অবসরে আত্মশেখর হেরিডিটি প্রজনন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করে দিলেন। অচিরেই তিনি জীবনে মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলেন। মনুষ্যের শরীরে কয়েকটি পরমাণুর মধ্যে তার নিজের এবং তার উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন পুরুষ পরম্পরার আকৃতি ও প্রকৃতির নির্দেশ লুকিয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য?

আত্মশেখর আরেকবার বাপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

—বাবা আমাদের বংশলতিকা নেই?

—বংশলতিকা? কেন?

—আছে?

—থাকলেও তো উইয়ে খেয়েছে। কেন হঠাৎ কি আত্মীয়-টাত্মীয় হল বলে মনে হচ্ছে?

—না। জানতে চাচ্ছিলাম আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ প্রতিভাবান ছিলেন কিনা। তোমার আর ঠাকুরদাদার কথা তো জানি। তার আগে।

—সাতপুরুষের মধ্যে কেউ ছিলেন কি না এ গ্যারান্টি দিতে পারি। তবে আগের কথা জানি না।

ঘরে ফিরে এসে আত্মশেখর চিন্তা করতে শুরু করলেন। বাপের দিকে সাতপুরুষের মধ্যে নেই। মামাকুলেও থৈথৈচ —বরং সেখানে স্বচ্ছলতা আরো কম গুণের দিক দিয়ে নীহারিকা দেবী অতীব সাধারণ শ্রেণীর মহিলা। তিনি এখনো তাকে খোকা বলে সম্বোধন করেন বলে আত্মশেখর পারতপক্ষে তার কাছে ঘেঁষেন না।

হেরিডিটির প্রভাব অনিশ্চিত। পরিবেশ? এনভায়রনমেন্ট? তেতিশ নম্বর পটুয়াটোলা লেনকে কি দৈনিক দিয়ে খুব প্রশস্ত বলা চলে? বোধহয় না। তাহলে?

কিন্তু শুধুমাত্র হিসেব নিয়েই কি সত্যিকার কিছু প্রমাণ হয়? বাবার বাবা কবে বংশ-লতিকা জিনিসটাকে ঠুটো একেবারে সৃষ্টির আদিতে নিয়ে যাওয়া যায়। জীনের প্রভাব কি তখন থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে না? কে জানে আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে আত্মশেখরের পূর্বপুরুষে কে বা কেমন ছিলেন। এমনও তো হতে পারে তিনি আলতামিরার গুহার দেয়ালে বাইসনের ছবি এঁকেছিলেন। এইসব আদিম গুহা-চিত্রকরদের জিনিয়াসের পর্যায়ে ফেলা যায় না? অথবা হরপ্পা মোহেনজোদারোর মত শহরের পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা তাদের? অথবা বেদ-উপনিষদের রচয়িতাদের? এদের মধ্যে কেউ যদি আত্মশেখরের পূর্ব পুরুষ হয়ে থাকেন তাহলে আর চিন্তার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু তবু তার মনটা খচখচ করতে লাগল। সোমাশেখরের মত কল্পনা-

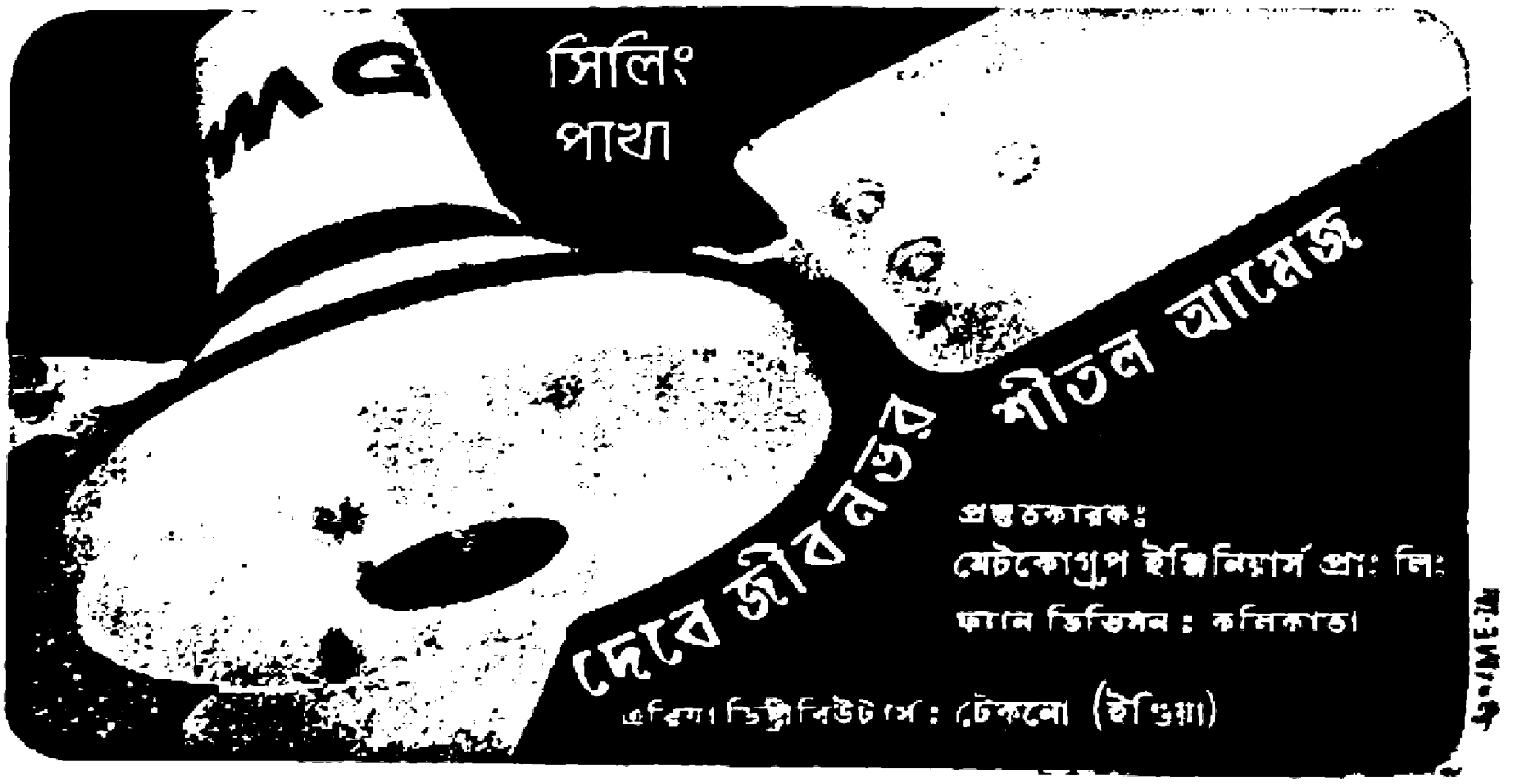

বিরুদ্ধে বৈষয়িক চিন্তাসর্বস্ব স্থূল বুদ্ধি যে তার জন্মঘাতা হতে পারে। এর কোন বৈজ্ঞানিক সমর্থন তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ভাবতে ভাবতে সহসা একটি সম্ভাবনা এসে তার মনে দুরন্তপনের মত আঘাত করল।

তিনি যদি জারজ সন্তান হয়ে থাকেন? যদি সৌম্যশেখরের ঔরসে তাঁর জন্ম না হয়ে থাকে?

কথাটা মনে হতেই আর্যশেখর বুঝে-ছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তাঁর বাবাই দিতে পারেন এবং সে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। সত্যা-ন্বেষণের খাতিরে পুত্র পিতাকে প্রশ্ন করবে এটা আর্যশেখরের কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হল। নশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ ল ডাইজেস্ট নিমগ্ন সৌম্য-শেখর পুত্রের প্রশ্ন প্রথমবার সঠিক অনু-ধাবন করতে পারলেন না।

—যমজ সন্তান? কার কথা বলছিস?

—যমজ নয়, জারজ। আমি জানতে চাই আমি জারজ সন্তান কিনা।

এ কথায় সৌম্যশেখরের ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত হল। তারপর তাতে কম্পনের আভাস দেখা দিল। তারপর সে কম্পন তার সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হল। তারপর তার কম্প-মান ডান হাত কাছে আর কিছু না পেয়ে একটি ভারী কাঁচের পেপার ওয়েট তুলে আর্যশেখরের দিকে নিক্ষেপ করল। আর্যশেখর আর্তনাদ করে রক্তাক্ত মস্তকে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

আরোগ্যলাভের পর বোঝা গেল আর্য-শেখরের অলৌকিক গাণিতিক প্রতিভাটি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধিৎসা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

আর্যশেখরের যখন উনিশ বছর বয়স, তখন একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে একটি শিরীষ গাছের নীচে উপবিষ্ট অবস্থায় বৃক্ষস্থিত কোন পক্ষীর বিষ্ঠা তার বাম স্কন্ধে এসে পড়ায় তিনি সহসা মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে সচেতন হলেন। যথারীতি তিনি এ বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁর ধারণা ছিল নিউটনের, আপেলের ঘটনাটা বুদ্ধিদীপ্তিবিবর্জিত। প্রিন্সিপিয়াতে নিউ-টনের নিজের লেখায় সে ঘটনার উল্লেখ দেখে তাঁর ধারণার পরিবর্তন হল। তাইকো-ব্রাহি গ্যালিলিও থেকে শুরু করে কেপলার নিকোলাস কোপলার, লাইবনিৎস-এর রাস্তা দিয়ে ক্রমে আর্যশেখর আইনস্টাইনে পৌঁছে গেলেন। আর্যশেখরের বিদ্যায় আইনস্টাইন জীর্ণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু পাঠ্য-অপাঠ্য বোধ্য-দুর্বোধ্য সবরকম পুস্তকই আদ্যোপান্ত পাঠ করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আর্যশেখরের। অবিশ্যি বর্ত-মান ক্ষেত্রে তাঁর পড়ার আগ্রহের একটা কারণ ছিল এই যে তিনি জানতে চেয়েছিলেন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে কিনা। আইনস্টাইন পড়ে এটুকু তিনি বুঝলেন যে মাধ্যাকর্ষণ কী তা জানা গেলেও মাধ্যাকর্ষণ কেন তা এখনো জানা যায় নি। তিনি স্থির করলেন এই কেন'র অন্বেষণই হবে আপাতত তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

সেইদিনই আর্যশেখর স্থির করলেন যে, তিনি যাবতীয় তুচ্ছ ঘটনার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। অনেক আবিষ্কারের পশ্চাতেই যে নিউটনের আপেলের মত একটি করে তুচ্ছ ঘটনা রয়েছে, এটা তাঁর জানা ছিল।

দুঃখের বিষয়, প্রায় তিন মাস ধরে সহস্রাধিক তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করেও তিনি তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেলেন না যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক আগেই হয়ে যায় নি। অগত্যা আর্যশেখরকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হল। উপলব্ধির আদিতে ধ্যান এই বিশ্বাসে তিনি তাঁর বাড়ীর তিনতলার ছাতে চিলেকোঠায় গিয়ে ধ্যানস্থ হতে মনস্থ করলেন।

প্রথম দিনই—সেদিন ছিল রবিবার ছাতে উঠে চিলেকোঠার তক্তপোষে বসে চক্ষু মুদ্রিত করার অব্যবহিত পূর্বে জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির ছাতে একটি তুচ্ছ ঘটনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রতিবেশী ফণীন্দ্রনাথ বসাকের সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা ভলি বাহু উত্তোলন করে ধৌতবস্ত্র রজ্জুতে আলম্বিত করেছে। এই দৃশ্যে মুহূর্তের মধ্যে আর্যশেখরের মন মাধ্যাকর্ষণ-সম্পর্কিত এক আশ্চর্য নতুন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সাতদিনের মধ্যে ফুলস্কাপ কাগজের একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করলেন। বর্তমান সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তার বিস্তারিত বিবরণ সম্ভব নয়, তবে তার মূল বক্তব্য ছিল এই: মাধ্যাকর্ষণের প্রতিবেদেই প্রাণের সৃষ্টি কারণ প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বগামী, মাধ্যাক-র্ষণের প্রভাব নিম্নগামী। মাধ্যা-কর্ষণের মত জীবনবিরোধী শক্তি সত্ত্বেও প্রাণ সৃষ্টি হল কী করে? তার কারণ সূর্য। কিন্তু সূর্যের প্রভাব চিরস্থায়ী নয়: পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের নৈকট্য ও অবিরাম প্রভাব ক্রমে সূর্যের প্রভাবকে পরাভূত করে। ফলে প্রথম জরার প্রকোপ এবং শেষে মৃত্যু এসে প্রাণশক্তিকে গ্রাস করে। শুধু যে জড়পদার্থই এই দুই প্রভাবের পারস্পর বিরোধ দেখা যায় তা নয়। মানুষের কাজে, চিন্তায় হৃদয়াবেগে, মানুষে মানুষে সম্পর্কে—সবকিছুতেই এটা বর্তমান। মনুষ্যের মত হীন প্রবৃত্তি, সমাজের মত অনাচার, অবিচার, দুঃখ দারিদ্র্য যুদ্ধবিগ্রহ সবই মাধ্যাকর্ষণজনিত। আর যা কিছু সুন্দর ও সতেজ যা কিছু উন্নত, যা কিছু মঙ্গলকর, সবই সূর্যের প্রভাবে। মাধ্যা-কর্ষণ আছে বলেই কোনদিন পৃথিবীর কলঙ্ক দূর হবে না। অনেকদিন আগেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো—কিন্তু তা হতে দেয়নি। ধ্বংসের পাশে পাশে সৃষ্টির কাজ চলে এসেছে আবহমানকাল থেকে।

প্রবন্ধটি শেষ করে আর্যশেখর চিলে-কোঠার থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম সূর্যের উদ্দেশে, তারপর প্রতিবেশী ভলির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। ঠিক সেই সময় শকর ভরদ্বাজ এসে বলল তাঁর বাপ নীচে ডাকছেন।

সৌম্যশেখর কদিন থেকেই ছেলে সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। স্ত্রী নীহারিকার মৃত্যু হয়েছে গত বছর। ছেলের একটা হিল্লে দেখে যেতে পারলেন না বলে মৃত্যুশয্যায় তিনি আক্ষেপ করেছিলেন।

হাতের কাগজ পাকিয়ে নিয়ে আর্য-শেখর বাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—তুই কি ইঙ্গিত করছিস? সাপ না ব্যাঙ না বিচ্ছু?

—সেটা আমার জীবনের স্বরূপ না বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে না।

—কিসের স্বরূপ?

—জীন।

—তোর ত অর্ধেক কথার মানে বুঝি না।

—সবাইত সবকিছু বোঝে না। আমি কি ওকালতির কিছু বুঝি?

—আমিও ওকালতির জোরে খাচ্ছি সেটা বোঝ ত? তবে তোমার যা বয়স তাতে বসে বসে বাপের পয়সায় খাওয়াটায় কোন বাহাদুরি নেই। কাজেই ওসব জীনফীন বলতে এসো না আমার কাছে। তুমি ছাতের ঘরে বসে যাই কর না কেন, এটা জেনে রেখো সে আর পাঁচটা বাউণ্ডুলে বখাটে বেকারের সঙ্গে তেমন কোন প্রভেদ নেই। আর এক বছর সময় দিলাম। তার

রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম প্রতি খণ্ড ২০ টাকা। গ্রাহক পক্ষে ১২ টাকা। গ্রাহকচূড়ি ৬ টাকা। নতুন গ্রাহকরা প্রথম খণ্ড এখনই পাবেন।

রামপ্রসাদ জীবনী ও রচনাসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম ২০ টাকা। গ্রাহক পক্ষে ১২ টাকা। জুন মাসে প্রকাশিত হবে। গ্রাহকচূড়ি ৫ টাকা।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১২ টাকা। গ্রাহকচূড়ি ৩ টাকা।

অমৃতলাল বসু রচনাসমগ্র

৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহক পক্ষে প্রতি খণ্ড ১২ টাকা। গ্রাহকচূড়ি ৬ টাকা।

গ্রন্থ-মেলা

এ-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

যাহোক যা হোক একটা চাকরি দেখে নেবে। ডিগ্রী ডিগ্রী যখন হল না তখন বেশি কিছু আশা করি না আমি। তবে স্বাবলম্বী তোমায় হতে হবে। তারপর অন্য কাজ।

—অন্য কী কাজ?

—বলেছিলাম কথাটাও ভাবতে হবে। নাকি তুমি বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছ?

—হ্যাঁ

—করবে না?

—না

—কেন সেটা জানতে পারি?

—প্রথমত আমার প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।

সৌম্যশেখরের বিষম লাগল। আর্যশেখর তাকে প্রকৃতিস্থ হবার সময় দিলেন।

—দ্বিতীয়ত অমন্ত জীবনের মধ্যাহ্নে যখন সূর্যের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল, তখন আমার কাজ ও চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে এটা আমি চাই না।

—তুই কি কেন ধর্মেটর্মে দীক্ষা নিয়েছিস নাকি?

—তা বলতে পার।

—কী ধর্ম?

—সেটা আমার ব্যক্তিগত ধর্ম। ঘোষণা এখনো হয়নি।

মহূর্তকালের জন্য সৌম্যশেখরের আশা হয়েছিল যে তিনি বুঝি পুত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। এখন বুঝলেন সেটা ঠিক না। কিছুক্ষণ তিনি ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বিশেষ করে তার চোখের দিকে। বুদ্ধিটুদ্ধি পালটে যাবার কোন লক্ষণ আছে কি? সৌম্যশেখরের প্রতিভাময় শেষ-জীবন উন্মাদ হয়ে এক মহাষ্টমীর দিন উলঙ্গ অবস্থায় গ্রামসুদ্ধ লোকের সামনে পুজোমণ্ডপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর্যশেখরকে এ ঘটনা তিনি কখনো বলেননি।

সৌম্যশেখরের মনে পুত্র সম্বন্ধে একটা স্নিগ্ধ বাৎসল্য ভাব জেগে উঠল। হাজার হোক একমাত্র ছেলে, সবেধন নীলমণি। যা করছে করুক—বেঁচে থাকলেই হল। আর হাতে টাকাপয়সা না থাকলেই হল।

—ঠিক আছে। তুমি এসো এখন।

আর্যশেখর প্রবন্ধটি লিখেছিলেন [illegible] জাতীয় লেখার কোন বাঙালী পাঠক করবে একথা তিনি বিশ্বাস করেন নি। এবার তিনি সৌম্য-শেখরের পুরোন রেমিংটনের সাহায্যে অপটু হাতে অনেক পরিশ্রমে প্রবন্ধটির বার কপি টাইপ করলেন। এ কাজটা করতে তাঁর সময় লাগল তিন সপ্তাহ। কপি শেষ হলে পর তিনি অনুভব করলেন, ঘাড় হাত পা কোমর-পিঠ টান ধরে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া একটানা ঘরের মধ্যে থেকে থেকে মনও প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে।

আর্যশেখর স্নান থেকে নেমে এলেন। গোলদীঘির ধারে একটু হেঁটে আসবেন মনে করে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখলেন, দেওয়া পায়জামা পাঞ্জাবী পরিহিত লম্বা গৌর-লম্বকেশবিশিষ্ট একটি যুবক তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে।

আর্যশেখরকে দেখে যুবক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, মহাবোধি সোসাইটির অবস্থানটা তার জানা আছে কিনা। আর্য-শেখর বললেন, চলো তোমায় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি [illegible]কেই যাচ্ছি।

যাবার পথে আর্যশেখর যুবকের পরিচয় পেলেন। তার নাম [illegible]বেষ গুডম্যান। নিবাস টোলিডো ওহায়ো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া-শুনো ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসেছেন প্রেম ও আলোর সন্ধানে।

আর্যশেখরের ছেলেটিকে ভালো লাগল। সেইদিনই রাত্রে তাকে তাঁর প্রবন্ধটি পড়তে দিলেন। বললেন, তুমিই প্রথম আমার এ লেখা পড়ছ। তোমার মন্তব্য জানার আগ্রহ রইল।

পরদিন সকালে গুডম্যান ফুলকপির তরকারি নিয়ে চীনা বাদাম খেতে খেতে এসে বললেন,—ইটস গ্রেট, গ্রেট। ইয়া—ইউ গট সমথিং দেয়ার—ইয়া।

আর্যশেখর চাপা গলায় তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর গুডম্যান বললেন কিন্তু তোমার লেখায় এত পেসিমিজম কেন? মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করার কত উপায় ত তোমার লেখাই রয়েছে। তুমি লোভাটেলদের কথা জান না? তোমাদের দেশের যোগী পুরুষদের কথা তুমি জান না?

গুডম্যান এবার তার ঝোলা থেকে একটি কাগজের মোড়ক বার করে আর্য-শেখরের হাতে দিলেন। মোড়ক খুলে দেখা গেল তাতে রয়েছে একটি চারচৌকা চিনির ডেলা। অদ্ভুত দেখতে তাকে চিনি বলেই মনে হয়। গুডম্যান বললেন, এটা সুগার কিউবই বটে, কিন্তু এর মধ্যে এক কণা অ্যাসিড রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণকে জব্দ করার মত এমন জিনিস আর নেই। তুমি খেয়ে দেখো। নানান প্রতিক্রিয়া হবে—ভয় পেয়ো না। আমার মনে হয় এটা খেলে পর তোমার মন থেকে পেসিমিজম দূর হয়ে যাবে।

গুডম্যান প্রদত্ত মোড়কটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে আর্যশেখর সটান চলে গেলেন তিনতলার ছাদে। আশ্বিনের অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ পড়ন্ত রোদে মাদুরে বসে হয়ে বসে তিনি চিনির ডেলাটি মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ করলেন।

কয়েক মিনিট কিছুই হল না। তারপর এক সময়ে আর্যশেখর অনুভব করলেন, তিনি সূর্যের দিকে উত্থিত হচ্ছেন। এক আনির্বচনীয় সুখকরতায় তাঁর দেহমন আচ্ছন্ন হল। নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন ধূলি-ধূসর কলকাতা শহরকে তেহেরানের গালিচার মত বর্ণাঢ্য ও মনোরম দেখাচ্ছে। মাথার উপরের আকাশ সর্পিল গতিবিলম্বী অজস্র বিচিত্র বর্ণখণ্ডে সমাকীর্ণ। আর্য-শেখর বুঝলেন সেগুলো ঘুড়ি কিন্তু এমন ঘুড়ি তিনি কখনো দেখেন নি। একটি বর্ণখণ্ড তার দিকে এগিয়ে এলো। আর্য-শেখর পরম আত্মীয়ত বোধে বাহু সম্প্রসারিত করে সেই বর্ণখণ্ডের দিকে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই।

ডাক্তার বাগচির নির্দেশমত ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে মিহিজাম যাবার আগে আর্যশেখর একজন পেশাদার টাইপিস্টকে দিয়ে তাঁর মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত প্রবন্ধটির পঞ্চাশ কপি টাইপ করিয়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের বাছাইকরা বিজ্ঞানী ও মনীষীদের পাঠালেন। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজনএর উত্তর মিহিজাম যাবার ঠিক আগের দিন আর্য-শেখরের হস্তগত হল। ইংলণ্ডের নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ প্রফেসর কার মাইকেল প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছেন—আই ফাউণ্ড ইট মোস্ট ইন্টিরেস্টিং।

মিহিজাম পর্বের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, সুতরাং তার বিবরণও সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

১১শে অক্টোবর—অর্থাৎ মিহিজাম পৌঁছাবার পরের দিন আর্যশেখর ডায়ারিতে লিখলেন—পাখি পাখি পাখি পাখি। পাখি ইজ পাখি। মোস্ট ইন্টিরেস্টিং: সূর্যের সবচেয়ে কাছে যায় কোন প্রাণী? পাখি। ও বার্ড হাউ ব্লাইট শাউটস মাধ্যাকর্ষণ!'

২রা নভেম্বর ভোরে ভরদ্বাজ দেখল আর্যশেখর কোত্থেকে জানি একটি বাবুইয়ের বাসা নিয়ে এসে বিছানার উপর পা ছড়িয়ে বসে গভীর মনোযোগে বাসার ভেতর পর্যবেক্ষণ করছেন।

পরের দিন আর্যশেখর নিজেই খড়কুটো সংগ্রহ করে এনে নিজে হাতে একটি বাবুইয়ের বাসা তৈরী করতে শুরু করলেন। সেদিন রাত্রে তার ডায়েরিতে লেখা হল। অ্যানদার হাইয়েস্ট অ্যাচিভমেণ্ট উড বি টু টাইজ টু দ্যা লেভেল অফ বার্ডস।

১৩ই নভেম্বর বাবুর ফেরার দেরী দেখে ভরদ্বাজ তাকে খুঁজতে বেরোল। আধঘণ্টা খোঁজার পর আর্যশেখরকে সে পেলো অজ্ঞান অবস্থায় ধানক্ষেতের পাশে একটি বাবলা গাছের নীচে। গায়ে একটি কাঁটার সঙ্গে বাঁধা তৈরি বাবুইয়ের বাসা।

স্থানীয় ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সানস্ট্রোক। সৌম্যশেখর কলকাতা থেকে চলে এলেন। তিনদিন ঘোর বিকারের পর পিতা ও ভৃত্যের সামনে আর্যশেখরের মৃত্যু হল।

দেহনিশ্বাস ত্যাগ করার ঠিক আগে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন আর্যশেখর—মাগো।

গৃহ বধূরা আজ স্বাধীন....

SICO

তাদের বৈদ্যুতিক
সরঞ্জামে সাজান

সিকো কিচেন

উপহার দিয়ে
বিজ্ঞানের
প্রয়োগে রান্নাঘরে
বিপ্লব এনেছে

গৃহস্থালীর কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুন্দর সমন্বয় শুধু "সিকো"তেই পাবেন।
"সিকো" সরঞ্জামের সাহায্যে খুবই অল্প সময়ে চিকেন রোস্ট, চিকেন রোল, কেক, কাস্টার্ড একই "ওভেন" তৈরী হবে। যে কোনো খাবার ওভেনে ইচ্ছেমত গরম ও তাজা রাখতে পারবেন, মনে হবে এখনি ওভেন থেকে নামান হল।
আপনার রান্নাঘর ধোঁয়া, হেঁসেলের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত থাকবে।

SICO
1911

গৃহস্থালীর বিস্ময়কর সিকো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
কুকিং রেঞ্জ···ওভেন···হটফুড ক্যাবিনেট,
হটপ্লেট···স্টোরেজ ওয়াটার হিটার ইত্যাদি

দি সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট
কোঃ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : ৬, ডেভেরাহাদুর সাপ্রু রোড,
এলাহাবাদ-২১১০০১।
এলাহাবাদ ○ বোম্বে ○ কলকাতা
○ মাদ্রাজ ○ নিউ দিল্লী ○ আহমেদাবাদ
○ হায়দ্রাবাদ ○ বাঙ্গালোরে
এতদঞ্চলের বিক্রয়বিভাগ :
ন্যাশনাল স্কার্ফ ইলেকট্রনিক্স
৩৪ মুক্তারাম বাবু, কলিকাতা-৭০ ফোন : ৩৪-৬৫৭১

হাই প্রেসার

সতীনাথ ভাদুড়ী

চল চল আর দেরী করিস না। এখনই শরীর কড়া হয়ে উঠবে।

হাই-ব্লডপ্রেসার দুজন চলে গেছে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ বহুক্ষণ।

দেখো বাবা।

হাই-ব্লাডপ্রেসার নম্বর এক আর দুই কালীবাড়ীর ঘাটে ভোরবেলায় এক ঘণ্টা করে সাঁতার কাটেন কুস্তির আখড়ার যাওয়া আসবার পথ থেকে। কেউ তাঁদের সম্মুখে পড়তে চায় না।

আধ ঘণ্টায় সাঁতার কাটলেই যদি ব্লড-প্রেসার কমতো তাহলে আর কথা ছিল না।

কালীবাড়ীর নতুন সাধুমহারাজের প্রেসক্রিপশন।

ওই সন্ন্যাসীর কথা বেদবাক্য ওঁদের কাছে। গাঁজা খেলে বোধ হয় কথায় থক বাড়ে।

দীক্ষা নিয়েছে বোধ হয় সন্ন্যাসীর কাছে। দেখিস না লোক দিকেলে গরুড়-পক্ষীর মতো বসে থাকে ওরা দুজন ধুনির পাশে।

দুজন না, তিনজন। কালী মন্দিরের ভশ্চাজ্জি মশাইও থাকেন।

হ্যাঁ, আর যে যাবার জায়গা নেই, হাই-ব্লাড-প্রেসার দুজনের।

অগত্যা ওইখানেই।

কিন্তু হাই বলিস, লোক খারাপ না ওরা।

দুটো ঘরে রেফিউজী পরিবারকে ওরা বাড়ীতে থাকবার জায়গা দিয়েছে, গত দু সপ্তাহ থেকে। কটা লোকের সে মন আছে।

কটা লোকের সে সঙ্গতি আছে।

অফিসারদের কাছে ছুটোছুটিও করছে দেখছি ওই রেফিউজী পরিবারদের ক্যাম্পে পাঠাবার জন্য।

ক্যাম্পে পাঠাবে না তো কি চিরকাল ওদের বাড়ীতে বসে খাওয়াবে?

চক্ষুলজ্জা কেন? সন্ন্যাসীঠাকুর কিংবা ভশ্চাজ্জিমশাই শুনতে পেলে, নিশ্চয়ই বলে দেবে হাই-ব্লাডপ্রেসারদের কাছে।

কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে তাহলে।

হ্যাঁ, শুধু ছেলের দল কেন, পাড়ার সকলেই দুজনকে এড়িয়ে চলে ধর্মভীরু বলে। কথা বলতে গেলেই বিপদ। চড়-চাপড়ের ভয় পদে পদে।

কানুবাবু আর পানুবাবু। হাই-ব্লড-প্রেসার নম্বর এক আর হাই ব্লডপ্রেসার নম্বর দুই। কথায় কথায় চটেন বলে পাড়ার লোকে এই নাম দিয়েছে।

তাঁদের বাড়ীর লোকরা চায়, তাঁরা বাড়ীর বাইরে বাইরে থাকুন। আর বাইরের লোকে চায় তাঁরা নিজের নিজের বাড়ীর ভেতরেই থাকুন।

অগত্যা কানুবাবু যান পানুবাবুর বাড়ীতে, আর পানুবাবু আসেন কানু-বাবুর বাড়ীতে। কোথাও না গেলে পেনসন-পাওয়া লোকদের সারাদিন কাটে কি করে।

নিজেদের কোপন স্বভাব সংযত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি তাঁদের নেই। করে দেখেছেন অনেক কিছু সারাজীবন ধরে। নুন খাওয়া ছেড়ে দেখেছেন, ফলমূলাহারী হয়ে দেখেছেন; সংস্কৃত পাঠ নিয়মিত করেন; বাদাম একদিনের জন্যও ভাজেননি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ছোটখাটো কথা-কাটি তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়; কেন দিন নেই যেদিন এক আধটা বড় রকম তাঁরা ঝগড়া বেধে না করে ফেলেছেন। তাঁরা জন

না, তবু ঘটে যায়। উঁচুতে কথা বলবার স্পৃহা থেকে হয় ডিপ্রেসটার আরম্ভ; কিন্তু মুখ থেকে কথা বার হবার আগেই লোকটাকে ঘাড় মেরে বসেন।

কালীবাড়ী ঘাটে একজন সন্ন্যাসী দিনকয়েক থেকে ধুনি জ্বেলেছেন। মন্দিরের ভচ্চাজ্যি মশাই বলছিলেন ইনি উঁচুদরের সাধক। সাধু-সঙ্গে স্বভাব বদলায়। হাই-ব্লাডপ্রেসার নম্বর এক তার দুই এঁরই শরণ নিলেন সেদিনে। সন্ন্যাসী এক লোকে আউড়ে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে সংবত্তাত্মা হতে গেলে সর্বভূতহিতেরত হতে হয়। এইটাই যোগের প্রথম সোপান। পরোপকার করবার প্রবৃত্তি ছিল না বলেই দুর্বাসা মুনি তাঁর কোপনস্বভাব জয় করতে পারেননি।

প্রথম সোপানে উঠতে গিয়ে কানুবাবু আর পানুবাবু দেখলেন ও পথেও বাধা অনেক। পাড়ার কেউ তাঁদের সঙ্গে বারোয়ারী কাজে নামতে রাজী নয়। লোকেদের বাড়ীর ভোজ-কাজ ইত্যাদি বহুৎ ব্যাপারে কর্মী হিসাবে প্রবেশ পাওয়া শক্ত। তাঁরা ঢুকলে অন্য কর্মীরা সরে দাঁড়ায়। কেউ তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে সম্মত নয়। যাঁদের উপকার করতে চান, তাঁরাও অস্বস্তি অনুভব করেন হাই-ব্লডপ্রেসারদের উপস্থিতিতে। ভিখিরী ছাড়া আর কেউ তাঁদের সহানুভূতির প্রত্যাশী নয়। ঠিক এই সময় পাড়াপকাদের উপরন্তু পাতপাত্রী জুটে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সাধুমহারাজেরই কৃপা নিশ্চয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত তিনচারটি শরণার্থী পরিবার, কালীবাড়ীর বারান্দায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভদ্র রাহুগ পরিবারগুলি। নিঃসম্বল হলেও অন্য দল রকমের শরণার্থীদের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে এখনও আভিজাত্যে বাধে। নিরুপায়ে কাগজপত্র সঙ্গে না থাকায় এঁরা সরকারী সাহায্যও পাচ্ছেন না। তাই সম্পূর্ণ ভগবানের উপর নির্ভর করে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সরকারী অনুমতিপত্র পেলে গন্তব্যস্থলে যেখানে পাঠাবে, সেখানে যেতে রাজী। একটি ছেলে আছে এঁদের মধ্যে, সে ঢাকায় মর্চেন্ট অফিসে কাজ করত। ম্যাট্রিক পাস। সে-ই দলের মুখপাত্র হয়ে কন্ট্রোলের অফিসে দৌড়াদৌড়ি করে ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। কেন চাকরি পেলে বোধ হয় এখানেই থেকে যাবার ইচ্ছা হবে।

ছোট ছোট পরিবার কয়টির মধ্যে বেশ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, একই বিপদের ছায়ায় এতদিন একসঙ্গে থাকায়। গুরুঠাকুর হবার নাম্ভ ভয় পান। কানুবাবু আশ্বাস দেন—আমাদের দুজনের বাড়ী যেখানে দূরে দূরে নয়।

পানুবাবু সায় দেন—এক বাড়ী ছেড়ে ছাকলে আর এক বাড়ীর লোকে সাড়া দেয়।

একদিন তো ছাড়াছাড়ি হবেই। অনিচ্ছাতে বাকী হলেন তারা। দুটি পরিবারকে স্থান দিলেন কানুবাবু তাঁর বৈঠকখানায় আর একটি পরিবারের হল স্থান পানুবাবুর আউট-বাড়ীতে। যতদিন না এঁদের ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারা যায়, ততদিন এঁদের সম্পূর্ণ ভার নিলেন হাই-ব্লডপ্রেসার নম্বর এক, আর হাই-ব্লডপ্রেসার নম্বর দুই। পরোপকারের প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আলাপন খেয়ে তাঁরা লেগেছেন নিজেদের দায়িত্ব সুচারুরূপে নির্বাহ করতে। শরণার্থীনী বালুর মাকে কানুবাবু দুই বেলা নিজেদের ঠাকুরঘরে রান্নাবান্না করবার অনুমতি দিয়েছেন। কন্যাস্থানীয়া বালুকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। বাড়ীর লোকের সঙ্গে শরণার্থীদের আহারের ব্যবস্থা হয়েছে।

পানুবাবুর বাড়ীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা। শরণার্থী পরিবারের ছোট্ট ফ্রকপরা নবম বর্ষীয়া মেয়েটির সঙ্গে অনবরত মাতামাতি করেন তিনি। মাঝে মাঝে ছেলেটিকে সঙ্গে করে সরকারী অফিসে ছোটাছুটি করছেন। ত্রুটি রাখেননি কোন বিষয়ে।

কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। আগেও যেমন, এখনও তেমন। দুই কম্বুরে কেউ কারুর সেই কথা হয় সব সময়।

সাধুমহারাজের কথায় সন্দেহ হতে আরম্ভ হয়েছে, এই সময় কালীবাড়ীর ভচ্চাজ্যিমশাই এক নতুন খবর শোনালেন।

সাধুমহারাজ যে বিরাট বিত্তবান ব্যক্তি এবং সাধক হিসাবে যে এরও বড়—তার প্রমাণ ভচ্চাজ্যি মশায়ের হাতের মুঠোয়। মুঠো খুলে তিনি দেখালেন একটা টেলার নোট। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে এক সময় প্রথম স্থান অধিকার করে এই পদবী পেয়েছিলেন সাধু-মহারাজ। সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে আসবার সময় এটাকে সঙ্গে এনেছিলেন। সব ছেড়েছিলেন, কিন্তু এটার মোহ ত্যাগ করতে পারেননি এতকাল। এই জন্য কাল হচ্ছিল তাঁর কী অনুশোচনা! ভচ্চাজ্যি-মশাইকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন সেটাকে গ্রহণ করবার জন্য। ভচ্চাজ্যিমশাই সেটাকে হাতে পেতে নেবার পর, সাধুমহারাজ সমাধিস্থ হয়ে যান কয়েক ঘণ্টার জন্য।

'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'

—শান্তিনিকেতন

কোলাহলের অসহ্য পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চলুন সব পেয়েছির দেশ শান্তিনিকেতনে, যেখানে মানুষ আর প্রকৃতি কাছাকাছি, যেখানে পরিবেশ সুমধুর, বাতাস স্নিগ্ধ, পক্ষবদিন। জগৎ এসে যেখায় মেশে সেই শান্তিনিকেতনে এলে মনে হবে এলেম নতুন দেশে।

রবিতীর্থ এই আশ্রমে এসে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন, ফিরিয়ে আনুন মনের প্রশান্তি। দেখুন মুক্তাঙ্গন অধ্যয়ন, বিচিত্র দেয়ালচিত্র, নন্দলাল, রামকিংকর, বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম, কলাভবন ও বিচিত্রার অমূল্য সংগ্রহশালা, রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি আর তাঁর চিত্রকলার নিদর্শন। আসুন উত্তরায়ণের আঙিনায়—দেখুন সেখানকার অপূর্ব গৃহশৈলী, উদয়ন, কোনার্ক, পুনশ্চ উদীচি আর শেষ বেলাকার ঘরখানি শ্যামলী।

আসুন শান্তিনিকেতনে, যেখানে আকাশে গান, বাতাসে গান, ঋতুতে ঋতুতে উৎসব। আপনার আনন্দ আর আরামের জন্য প্রস্তুত ট্যুরিস্ট লজ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ
(ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

পর্যটন (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এরপর আর সাধুমহারাজের প্রেসক্রিপশানে সন্দেহ করা চলে না।

কিসে শরণার্থী পরিবারের মঙ্গল হয়, সেই চিন্তা তাঁদের অষ্টপ্রহর। কিন্তু খাওয়াপরা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা ছাড়াও যে অন্য অনেক কিছু করবার আছে, সেকথা মনে পড়িয়ে দিলেন তাঁদের সাধুমহারাজ। এই নতুন প্রোগ্রামের ইঙ্গিত আগেও তাঁদের দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু কানুবাবু পানুবাবু ধরতে পারেননি ইঙ্গিতের অস্পষ্টতার জন্য।

রাণু নামের মেয়েটির সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস ছেলেটির বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এর চেয়ে বড় উপকরণ শরণার্থী রাণুর মায়ের আর কি হতে পারে? সাধুমহারাজ, কানুবাবু, পানুবাবু এবং উচ্চাঙ্গিমশায়ের অনুরোধে ছেলেটি শেষ পর্যন্ত সম্মতি না দিয়ে পারল না।

তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল। যত সংক্ষেপেই করতে চাও, কিছু খরচ করতেই হয় বিয়েতে। পানুবাবু কানুবাবুর সে খরচটুকু করতে আপত্তি নেই। কার্পণ্য করলে নিজেদেরই ফাঁকিতে পড়তে হবে।

করছেন তো সব; কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা তার কিছু হচ্ছে না। কথায় কথায় চটে ওঠবার স্বভাব ঠিক যেমন ছিল, তেমনিই আছে। এমন কোন দিন যায়নি, যেদিন তাঁদের কোন না কোন লোকের সঙ্গে হাতাহাতি হয়নি। দুজনে গিয়ে মনের কথা খুলে বললেন সাধুমহারাজের কাছে।

সাধুমহারাজ আশ্বাস দিলেন—এ সব তো আমি জানিই। তোমাদের মুখ থেকে এই কথা শোনবার জন্যই তো আমি অপেক্ষা করছিলাম গত কয়েকদিন থেকে। হতাশ হবার কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। রসরা-রত্নাকর বাল্মীকি হতে পেরেছিলেন। তোমাদের কেস রত্নাকরের চাইতে অনেক কম জটিল। পরহিতব্রত যেমন করছ করে যাও। ক্রোধপ্রবৃত্তির উপশমের জন্য তোমাদের আর একটা জিনিস করতে হবে। প্রতি একাদশী তিথিতে তোমরা নিক্রোধ-দিবস পালন কর। প্রতি পক্ষে এই একদিন কিছুতেই চটবে না এই হবে তোমাদের প্রতিজ্ঞা। একাদশীর দিন উপবাস অবশ্য করবে। তারপর সারাদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠে এবং সারারাত ধর্মালোচনায় কাটাবে।

সাধু মহারাজ বলেছিলেন যে, বিদেশে ও পথে অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য দিনক্ষণ দেখবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঘটক-ব্রতচেরণার নম্বর এক আর দুই তাঁদের পরহিতব্রতের মধ্যে কোন খুঁত রাখতে চান না। পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির হয়েছে। বিয়ের এখনও দুই সপ্তাহ দেরী আছে। কানুবাবুর স্ত্রী এরই মধ্যে একদিন মাট্রিক পাস ছেলেটিকে নিমন্ত্রণ করে জামাই-আদরে খাইয়েছেন। আর পানুবাবুর স্ত্রী বাদুকে ঘটমা বলে ডাকবেন নোটিস দিয়েছেন। আর তাঁদের স্বামীরা নিজের নিজের মনকে তৈরী করছেন যাতে আগামী নিক্রোধ-দিবস নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপিত করতে পারেন সেইজন্য।

প্রত্যহ এর মহলা চলছে। প্রত্যহ প্রয়াস অসফল হচ্ছে, কিন্তু এঁরা আশা ছাড়েননি। কাল ঝগড়া করেছেন ঘোষ কারেকটর সাহেবের সঙ্গে।

এসে গেল বহু প্রতীক্ষিত প্রথম নিক্রোধ-দিবস। সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্যদিন শয্যা ত্যাগ করেন এক ঘণ্টা, সেদিন করলেন দুই ঘণ্টা। তাঁদের ধারণা অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হলে হাতাহাতি করবার ঝোঁকটা কমে যেতে বাধ্য।

কানুবাবু স্নান সেরে বাড়ীতে এসে দেখলেন রান্না চাকরটা তখনও ওঠেনি। ওঠা উচিত ছিল। পূজোর ঘরে স্ত্রী তাঁর পূজোর জন্য ফুলবেলপাতা সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছেন। পূজোয় বসবার আগে স্ত্রীর উদ্দেশে একবার বললেন—রামাটা এখনও ওঠেনি? জপ করতে করতেও যার কানে এই কথাটা মনে পড়ল। পূজো শেষ হলে উঠে আবার তাকালেন চাকরদের ঘরের দিকে। এখনও দরজা বন্ধ। আঙুল দেখ একেবার। নটার বদলে এরা ফুরুবে দশটায়। কোথায় আজ একটু হাড়াতাড়ি উঠবে, অন্যদিনের চেয়ে, তা নয়, একেবারে উল্টো। গভর্নমেন্টেরও অন্যায় দেখ। হুকুম হয়ে গেল, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যোগদানেচ্ছু থেকে কাগজপত্র লিখিয়ে না আনতে পারলে সরকারী সাহায্য পাবে না। এখন থেকে কাগজপত্র লিখে দিয়ে দিলেই তো হত। এই কষ্ট করে রেফিউজিরা এখানে এসে পৌঁছেছে কোনোরকমে এখন এসব আবার দেখতে হবে

৪০% কম দামে বই কিনবেন?

আজই অ্যালফা-বিটা বুক ক্লাবের সদস্য হোন। ভালো ভালো নতুন বই কম দামে পাবেন। কোনো চাঁদা নেই, কেবল ভর্তি ফী ২ টাকা পঠান। ক্লাব-নির্বাচিত তালিকা থেকে বারো মাসে কমপক্ষে চারখানি বই ইচ্ছামতো কিনলেই হলো। বিনামূল্যে 'গ্রন্থ সমাচার' মাধ্যমে প্রতি মাসের বই-এর খবর পাবেন। অভূতপূর্ব, অভাবনীয়!

নববর্ষের অভিনন্দনসহ সদ্যপ্রকাশিত হলো...

সবিতা ঘোষের সচিত্র চমকপ্রদ প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ কাহিনী

পূর্ব সাগরের পার হতে ১২,

'বাস্তবিকই এই ভ্রমণ কাহিনী পড়ে বড় ভাল লাগল' —রাশাপূর্ণা দেবী

উত্থানপদ বিজলীর কাব্যগ্রন্থ : যান্ত্রিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রয়াস

নগর প্রান্তর বনস্থলী ৩-৫০

গণিতের কথা ও কাহিনী
নন্দলাল মাইতি ৪৲
ছোট্টো ছোট্ট মন
গোপাল রায় ৪-৫০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ
হেনা চৌধুরী ১২৲
রোমাঞ্চ (নোটা সংকলন)
প্রশান্ত গুহ ৪৲
আর এক জন্ম আর এক আকাশ
কল্যাণ জানা (গল্প) ২-৭৫
ইচ্ছার মৃত্যুর ছায়া (কবিতা)
অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় ৩-৫০
বাঁচতে সবাই চায়
ডঃ অসীম বর্ধন ৩-৭৫
কেটে যাবে মেঘ
ডঃ অসীম বর্ধন ২-৫০
জনপদ (উপন্যাস)
প্রফুল্লকুমার সিংহ ৮৲
বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা ১০৲
দূরযাত্রীর ইতিকথা
সন্তোষী (ভ্রমণ) ৪৲
কেমন ছেলের বুক (কবিতা)
জগদীশচন্দ্র পাল ৩-১৫

আশাতীত কম দামে রেকর্ড ও কিনুন

বুক ক্লাবের উদ্যোগে প্রবর্তিত অ্যালফা-বিটা রেকর্ড ক্লাবের সদস্য হলে আপনি কম দামে এইচ-এম-ভি, মেগাফোন, হিন্দুস্থান, পলিডর ভারতী ইত্যাদি ভালো ভালো কোম্পানীর নতুন রেকর্ড কিনতে পারবেন। ক্লাব-নির্বাচিত তালিকা থেকে বারো মাসে কমপক্ষে চারখানি রেকর্ড কিনতে হবে—এল-পি ৩৪-৯৫ (বাজারে ৪৫-২৫)। ইপি ১২-৯৫ (বাজারে ১৬-২৫) এস-পি ৫-৯৫ (বাজারে ৭-৯৫)। এছাড়া সেভেন ১৭-৯৫ (বাজারে ২১-৮৫)। কোনো চাঁদা নেই, ভর্তি ফী ২ টাকা মাত্র। প্রতি মাসে 'রেকর্ড সমাচার' পাবেন।

অ্যালফা-বিটা ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, হেদোতলা, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-২৩০১ ॥ সময় ১০টা—৬টা

কৃষ্ণনগরে উঠিয়ে। এই নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল কানুবাবুর। কিন্তু সে অন্যায়টার কথা ভেবে আজকের মত দিনে অবশ্য উত্তেজিত হতে চান নি তিনি। তাঁর বর্তমান সমস্যা রামাকে নিয়ে।

বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ হয়ে গেল। স্ত্রীকে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন—মনে থাকে যেন নতুন এদের বাস। ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে দিও। আর রান্নাটার কাণ্ড দেখেছ! এখনও উঠল না। ওকে কিছুতেই আজ ডেকে তুলো না। দেখি কতক্ষণ ঘুমুতে পারে।

জয় গুরু! জয় গুরু!

রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও। নটার বাস মনে আছে তো?

কৃষ্ণনগরে যেতে কতক্ষণ লাগবে এখান থেকে?

ঘণ্টা তিনেক। বাজারের সময় পৌঁছে যাবে ওখানে।

একটি রেফিউজি শিশুকে কোলে তিনি আদর করছেন কানুবাবু।

খোকা তুমিও আজ মোটরগাড়ীতে চড়বে নাকি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা তুমি আমাদের এখানে থেকে যাও। দিদিমা রাজভোগগুলো খেতে দেবো। কত খি খেতে চাবো?

ছেলেটি কান্না জুড়ে দিলো। সে দিদির সঙ্গে মোটরগাড়ীতে যেতে চায়।

আচ্ছা, আচ্ছা যেয়ো। তুমিও যেয়ো দিদির সঙ্গে। দিদির কোলে বসে যাবে, না আর কোলে বসে যাবে?

আর।

দিদি দুষ্টু? রাক্ষুসী শোন তোমার ভাই কি বলছে?

গৃহকর্ত্রী স্নান সেরে এলেন।

এক্কেবারে তৈরী? কি টাসাহেচড়াই না করছ গভর্নমেন্ট আপনাদের নিয়ে।

সব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে দাদা।

মনকে সংযত করবার জন্য কানুবাবু এত কথা বলে চলেছেন। বহু রকমের কথা ভাববার চেষ্টা করছেন। চাল কেনবার কথা, সেদ্ধচালে নিয়ে শাঁখা বাঁধানোর কথা, গোয়ালের গরুর কথা, পানুবাবুর মেজাজের কথা, আরও কত কথা। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর সব কথা শেষ হয়ে যাচ্ছে শুধু যে কথাটি মনে আনতে চাচ্ছেন না সেই কথাটি ছাড়া। পায়চারি দ্রুততর হয়, মুখমণ্ডলের কতকগুলো রেখা দৃঢ় ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, গোঁফের একগাছা অবাধ্য চুলকে দাঁত দিয়ে কাটি করে কেটে ফেলবার অদম্য বাসনা হঠাৎ তাঁকে পেয়ে বসে। কিন্তু রামাকে কিছুতেই আজ ডেকে তুলবেন না, এই তাঁর সঙ্কল্প। দেখতে চান কতক্ষণ পর্যন্ত যাদু-সাহেব ঘুমোতে পারেন। গিন্নীর কাছে আস্কারা পেয়ে পেয়েই চাকর-বাকরেরা মাথায় উঠেছে। বাড়ীর লোক সাত-সকালে উঠে সাহেবের কাজ করছে, আর ঘরের মধ্যে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন নবাবসাহেব।

নরম রোদ চড়া হয়ে উঠছে। কড়া মেজাজ ক্রমে আরও কড়া হচ্ছে। বৈঠকখানার ঘড়িতে ঠং ঠং করে সাতটা বাজল। নিজের সঙ্কল্প বজায় রাখা আর সম্ভব হল না। চাকরদের ঘরের দরজায় দড়াম করে লাথালেন এক প্রচণ্ড লাথি। ভিতর থেকে খিল দেওয়া ছিল না। দরজা খুলে যেতেই নজরে পড়ল, মেঝেতে পাতা মাদুরের উপর শুয়ে রয়েছে রামা। নবাবপুত্তুর। বেলা আটটা পর্যন্ত এইরকম নাক টেনে ঘুমোচ্ছে।

অগ্নিশর্মা কানু চড়, লাথি ও গালি-বর্ষণের পর কানুবাবু চাকরদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীর ওপর হুকুম হয়ে গেল রামাকে তখনই মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিতে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

বৈঠকখানার ইজিচেয়ারে বসবার পর মনে পড়ল আবার, যে আজ নিষ্ক্রোধ-দিবস পালন করতে চেয়েছিলেন তিনি। এখন আর অনুতাপ করেও কোন লাভ নেই।

স্ত্রী এসে খবর দিলেন যে, রামার বাস্তিরে জ্বর এসেছে—মাথার যন্ত্রণায় তাকাতে পারছে না। তার মাইনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছি ছি ছি ছি।

স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারছেন না কানুবাবু, লজ্জায়।

অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে একটু দুধ-বার্লি করে দিও। আর এদের বাসে কৃষ্ণনগরে যাতায়াতের খরচটা দিয়ো।'

খবরের কাগজ পড়বার মত মানসিক অবস্থা তখন তাঁর নেই। তাই কাগজখানাকে হাতে নিয়ে চললেন পানুবাবুর বাড়ীর দিকে।

পানুবাবু আরও সাবধানী ব্যক্তি। নিষ্ক্রোধ-দিবসে মনের ভিতর শত্রুর প্রবেশ-পথগুলি নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করবার দিকে প্রথম থেকে ছিলেন সজাগ। গঙ্গাস্নান করে ফেরবার সময় দেখলেন বাগানের বেড়া ভাঙ্গা। মোটরগ্যারেজের পাশে মাটি খুঁড়ে রেফিউজিরা যে উনুন করেছে সেদিকে তিনি ইচ্ছা করেই তাকালেন না। সোজা গিয়ে ঢুকলেন ঠাকুরঘরে। স্ত্রী পুজোর যোগাড় সব ঠিক করে রেখেছিলেন আগে থেকে। আসনে বসেই একটা গন্ধ নাকে গেল। মৃদু, দুর্গন্ধটা অতিপরিচিত। ছুঁচোর গন্ধ। চন্দন আর ধূপের সুবাসকে ছাপিয়ে উঠেছে এই গন্ধটা। জলে বসে নিষ্ক্রোধ-দিবসে রাগ করাও চলবে না, তার গায়ের গন্ধ ভগবানই দিয়েছেন। তবে মন খারাপ হয় ঠিকই। ছুঁচোটা বোধহয় রাত্রিতে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিল। ওই দুর্গন্ধজনিত অস্বস্তিতে কিছুতেই জপে মন বসাতে পারছেন না। গিন্নীরই দোষ। ভোরবেলায় ঠাকুরঘর খুব ভাল করে ধুয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কোথা দিয়ে ছুঁচোটা ঘরে যাওয়া-আসা করে তার খবর যদি গিন্নী না রাখেন তবে আর কে রাখবে? কিন্তু আজ তিনি রাগ করতে চান না কারও উপর। কোনরকমে নমো নমো, করে পুজো সেরে উঠেই স্ত্রীকে অত্যন্ত নরম গলায় বললেন, ইঁদুর মারবার কলটা ঠিক করে রেখো তো, রাত্রিতে ঠাকুরঘরে পাততে হবে।

ঠাকুরঘরে ইঁদুর দেখলে নাকি এখন?

না। রাত্রিতে ছুঁচো ঢুকেছিল। ঘরে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এখনও।

নালী, জানলা-দরজা সব বন্ধ, ছুঁচো ঢুকবে কেমন করে?

বড় তর্ক করা স্বভাব মেয়েদের। যাক, সে সম্বন্ধে আজ তিনি কিছু বলতে চান না।

তুমি রেখো তো ইঁদুরমারা কলটা পেতে আজ ওঘরে। আর রেফিউজিদের পলতা টব। বসতবাড়ী দিয়ে দিয়ো।

স্ত্রী একবার পুজোর ঘর থেকে ঘুরে এলেন।

২৫শে বৈশাখ দ্বিতীয় খণ্ড
প্রকাশিত হচ্ছে
নবীনচন্দ্র রচনাবলী
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল
রচনাবলী
ঈশ্বর গুপ্তের ৩ খণ্ডে ও ১ খণ্ড সম্পূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম খণ্ড ও রঙ্গলাল রচনাবলী গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে।
প্রকাশিত নবীনচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম খণ্ড এবং রঙ্গলাল রচনাবলী এখনও যে সব গ্রাহক সংগ্রহ করেন নি তাঁরা যদি আগামী ২৫শে মধ্যে বইগুলি সংগ্রহ করে না নেন তাহলে আমরা আর গ্রাহক মূল্যে বইগুলি দিতে বাধ্য থাকবো না।
দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

'ছুঁচোর গন্ধ কেন হতে যাবে। গন্ধটা কাল যে ধূপ এনে দিয়েছো তার।'

'ফাজলামি করবার আর জায়গা পেলে না।'

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ভদ্রমহিলার মুখ। এই বুঝি হয় কাণ্ড। অতৃপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। পানুবাবু ঠাকুরঘর থেকে একটা ধূপকাঠি এনে জ্বালালেন স্ত্রীর সম্মুখে। তিনি চটেননি এইটা স্ত্রীর ও নিজের কাছে প্রমাণ করবার জন্য এই কষ্ট স্বীকার।

হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে, স্ত্রীর কথাই ঠিক। ধূপের গন্ধটার মধ্যেই এক কিসে ছুঁচোর-গায়ের গন্ধ মেশানো। নিষ্ক্রোধ-দিবসের পরোটা পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য কাল তিনি এক প্যাকেট নতুন কস্তুরী ধূপ কিনে এনেছিলেন সতীশের দোকান থেকে।

কিন্তু ছিঁড়ে-মুড়িও দিয়ে দিও রেফিউজিদের সঙ্গে বুঝলে?

পরোটার ঘর থেকে ধূপের প্যাকেটটা নিয়ে, আর একটাও কথা না বলে পানুবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক কিনা তাই খুব আস্তে আস্তে হাঁটছেন।

সতীশের দোকান তখন সবে খুলেছে। কুলুঙ্গির গণেশের সম্মুখের ধুনুচি থেকে তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে।

'নিজেরা ব্যবহার করো ধুনো আর আমাদের জন্য এই ছুঁচোর গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি?'

'ও তো কস্তুরী ধূপ।'

একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেখে বলল—'না, ঠিকই তো কস্তুরী-ধূপ।'

'এই তোমার কস্তুরীর গন্ধ?'

'দু'আনা প্যাকেটের ধূপে কি আসল মৃগনাভি দেওয়া থাকবে?'

'ছুঁচোমি করবার আর জায়গা পাওনি। আমি কি কচি ছেলে যে যা বোঝাবে তাই বুঝে যাব? এই নাও তোমার মৃগনাভি।'

প্যাকেটটা সতীশের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি চলে এলেন। খুব সামলে নিয়েছেন নিজেকে। হাতাহাতি যখন হয়নি তখন এটাকে রণ বলা চলে না। তবে সতীশের মুখের উপর প্যাকেটটা ছুঁড়ে না মারলেই হত ভাল। বিশেষ করে নিষ্ক্রোধ-দিবস উদযাপনের দিনে। বিশেষ সতর্ক থাকা সত্ত্বেও ওই ছুঁড়ে মারবার ঝোঁকটা হঠাৎ এসে গিয়েছিল। এর জন্য দায়ী তিনি নন, দায়ী তাঁর ব্লাডপ্রেসার।

অনুতাপ হতাশার গ্লানি আর ব্লাড-প্রেসারের উপর আক্রোশ এই তিনটে জিনিসের মিলন হলে, মানুষকে পায়চারি করতে হয়। তাই করছিলেন পানুবাবু যখন কানুবাবু ঘোরের মত তাঁর কক্ষ-উৎসের ভিতর প্রবেশ করলেন।

কানুবাবু বললেন—'হল না।'

পানুবাবু বললেন—'হবে যে আমাদের দ্বারা।'

'দু'ই সপ্তাহের মধ্যে একটা দিনও আমরা পাবি না।'

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

(আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস)

সন্তোষকুমার ঘোষ
- শেষ নমস্কার : ইন্দুবেলু মা-কে ২০-০০
- সোজাসুজি ৪-০০
- সুখের নরক ১২-০০

কালকূট
- হারায়ে সেই মানুষে ৮-০০
- আরব সাগরের জল লোনা ১০-০০
- নির্জন সৈকতে ১০-০০

নিমাই ভট্টাচার্য
- গ্রাজাম ৫-০০
- পিলাতিনী সার্কাস ১৪-০০
- হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স ৪-০০
- ককটেল ৭-০০
- আকাশ-জলা সূর্য-তৃষা ৫-০০

বুদ্ধদেব বসু
- মুক্তমি ৬-০০
- প্রেমপত্র ৬-০০
- প্রভাত ও সন্ধ্যা ৮-০০

আশাপূর্ণা দেবী
- মধ্যে সমুদ্র ৭-০০
- মনের মুখ ৬-০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
- কুমারসম্ভবের কবি ৪-০০
- শৈল ভবন ৫-০০

শঙ্কু মহারাজ
- লীলাভূমি লাহুল ৭-০০
- গঙ্গা-যমুনার দেশে ৭-০০
- জাপ্পা পেউলের দেবতা ১০-০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তী
- কেরালার উপকূলে ৫-০০
- কাশ্মীরী বাহার ৬-০০

বাসুদেব বসু
- নেকা সুন্দরী নেকা ৫-০০
- রহস্য নিজেই যখন নিশেহারা ৭-০০

শ্রীপান্থ
- মমতাজ মহিমা জাহানারা ৭-০০
- সিংহদ্বার ৬-০০

সমরেশ বসু
- কৃষ্ণপক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
- নিহত নায়িকা নিহত নায়ক ১০-০০

নির্মল মিত্র
- চার চোখের খেলা ৬-০০

চাণক্য সেন
- কালের ইতিহাস ১০-০০
- মধ্য পঞ্চাশ ৬-০০

উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়
- আমার আমি ৭-০০

সুনীল চৌধুরী
- পাহাড় পাহাড় খেলা ১০-০০

বিভূতি চক্রবর্তী
- ধাপি রহস্য ১০-০০

বুদ্ধদেব গুহ
- প্রথমার জন্যে ৫-০০
- অগ্নিতোষিণী ১০-০০

সুবোধ ঘোষ
- এসো পাঁথিক ৪-০০

গৌরকিশোর ঘোষ
- পশ্চিমবঙ্গ এক প্রত্যন্ত ভ্রমণী হা হা ৫-০০
- এই মাটি ৪-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- প্রথম দিনগুলো ৮-০০
- গভীর গোপন ৬-০০
- মাঝিপত্ত ৫-০০
- হেমন্তবিন্দু ৪-০০
- একটুকরো মেঘ মুখ ৫-০০

সমরেশ বসু
- অকালবোধ ১০-০০
- চন্দনের মুখ ১০-০০
- নিষিদ্ধ লহরী ৬-০০
- পাঁথিক ৭-০০
- কামনা-বাসনা ৪-০০
- বি টি রোডের ধারে ৬-০০
- বাঁধির বসন্ত ৬-০০
- স্বর্ণচন্দ্র ৬-০০
- ছায়া ঢাকা মন ৬-০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
- মৃত্যু প্রতীক্ষার কারণে ৬-০০
- আনন্দরূপ ১০-০০
- খনির নতুন রাশি ১২-০০
- অপরিচিতের মুখ ৭-০০
- ত্রিকোণপকেটিকে ৫-০০
- রূপের হাটে ঝিকিমিকি ১০-০০
- মেঘের মিনার ৮-০০

প্রফুল্ল রায়
- নিজের সঙ্গে দেখা ১০-০০
- সুখের পাখি অনেক দূরে ৭-০০
- রৌদ্রকলক ১০-০০
- আমার নাম বকুল ৭-০০
- নয়না ৪-০০
- আকাশ ছোঁয়া ৯-০০
- শীর্ষবিন্দু ১০-০০
- শঙ্খিনী ১২-০০

প্রতিভা বসু
- সমুদ্র পেরিয়ে ১০-০০
- সময় হৃদয় ১০-০০
- সোনালি বিকেল ১০-০০

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
- সীমাহীন ৬-০০

দে'জ পাবলিশিং C/o. দে বুক স্টোর

১০, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৫০০৫

'জীবনের মধ্যে একটা দিনও আমরা পারব না।'

'আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও।'

'হ্যাঁ এ তো আর কুস্তি করা নয়।'

বেখাপ্পা হাই-ব্লাডপ্রেসার চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নাকে দড়ি দিয়ে সেখানে সামান্য মানুষের চেষ্টায় কি হবে!

খেদ ও স্বীকারোক্তির পালা চলে ঘণ্টাখানেক। বহু আলোচনার পর ঠিক হয়—হাই ব্লাডপ্রেসার সম্পর্কে না পারেন তাঁদের ক্রোধের উপশম হতে পারে না। এর চিকিৎসার জন্য যেতে হয় ডাক্তারের কাছে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

অতঃপর দুই ভূতপূর্ব কুস্তিগীর দ্বিধাকুণ্ঠিত হাসি নিয়ে প্রবেশ করলেন আশু ডাক্তারের চেম্বারে। এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বিচক্ষণ ডাক্তার বলে এঁর খ্যাতি।

সব রুগী ফেলে ডাক্তারবাবু এগিয়ে এলেন এঁদের দিকে।

'আসুন বসুন। কী ব্যাপার? চাঁদা?'

'না না, কোন রাজেয়ারী কাজের জন্যে তো আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'না শুনলাম কিনা যে—'

'কী?' গলার স্বর চড়ে পানুবাবুর।

'কী শুনেছেন?' চোখের চাউনি রুক্ষ কানুবাবুর।

'যে আমরা চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছি?'

'লোকের বাড়ী বাড়ী থেকে?'

এখান[redacted]লা হিসাবে ডাক্তারবাবু

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

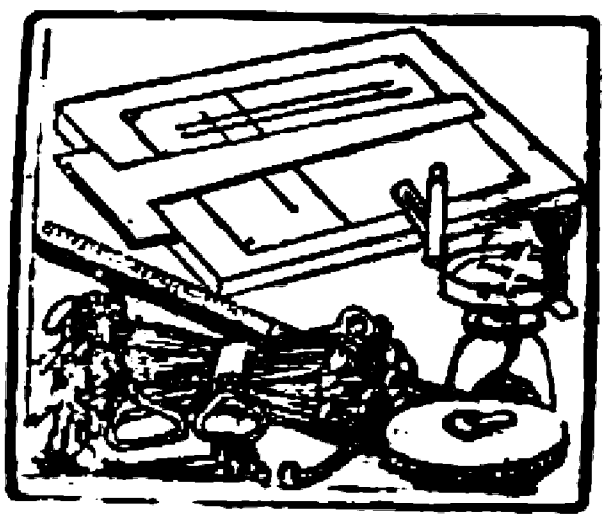

সাভে ড্রইং, নানা রকম কাগজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অনাতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোর্স
[redacted], রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, [redacted]
গ্রাম: [redacted], পোর্ট বক্স—০৮ হাওড়া
পরিচালক : কর্মীবৃন্দ প্রবাইস
(স্টেশনারী বিভাগ)

এঁদের বিলক্ষণ চেনেন। তিনি বললেন—না, না, সেরকম কথা কেউ বলেনি। শুধু শুনেছি যে একটি ব্লিফিউজি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা নাকি আপনারা করছেন।'

'করছি তো কি হয়েছে? এর জন্য লোকের কাছে ভিক্ষে চাইতে যেতে হবে?'

ডাক্তারবাবু সময় থাকতে সাবধান হয়ে গেলেন।

'আপনারা ঠিকই বলছেন। আমারই ও-কথাটা তোলা ভুল হয়েছে। অতি বৃহৎ কাজে আপনারা হাত দিয়েছেন। ক'জন লোকের এত বড় দায়িত্ব মাথায় নেবার সাহস আছে!'

একটু নরম হলেন ব্লাডপ্রেসার নম্বর এক আর দুই।

'আমরা এসেছিলাম রুগী হিসাবে।'

'বাড়ীতে কার অসুখ?'

'বাড়ীতে না। আমাদের নিজেদেরই অসুখ।'

'আমাদের মানে? আপনার না পানুবাবুর?'

'দুইজনেরই।'

'দুইজনেরই একসঙ্গে! কোন ছোঁয়াচে অসুখ নাকি? চলুন ওই ঘরের ভিতরে।'

'কী ভাবেন কি আপনি আমাদের? ও-ঘরে যাবার দরকার নেই। এখানেই হবে। আমরা এসেছি হাই-ব্লাডপ্রেসারের চিকিৎসার জন্য।'

ঘরভরা রুগীর দল হেসে গড়িয়ে পড়ে কানুবাবু আর পানুবাবুর নিজের মুখে হাই-ব্লাডপ্রেসার কথাটা শুনে।

অতি কষ্টে হাসি চেপে আশু ডাক্তার বললেন—'এক-এক বয়সে। দুজনের একসঙ্গে তো হবে না। আচ্ছা, আপনি প্রথমে আসুন কানুবাবু। কোনরকম শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? মাথা ধরে? মাথাঘোরা আছে? অনিদ্রা? কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ত? সবই ঠিক আছে তবে আপনার অসুবিধাটা কিসের?

'আপনি আমার ব্লাডপ্রেসারটা আগে দেখুন তো।'

'বয়স কত হল?'

'ছেষট্টি।'

'আর পানুবাবু, আপনার?'

'পঁয়ষট্টি।'

আশু ডাক্তার কানুবাবুর ব্লাডপ্রেসার চার-পাঁচবার মাপলেন।

'খুব বেশী নাকি ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবুর চোখমুখ দেখে কানুবাবু ইতস্তত হয়েছেন।

'না এ্যাবনরম্যালি লো, অস্বাভাবিক কম।'

অসুস্থ রুগীদের হৃৎকম্প হঠাৎ মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

'আপনার প্রেসার মাপবার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে যায়নি তো ডাক্তারবাবু?'

'না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'তবে?'

'দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। সব রোগেরই চিকিৎসা আছে। বলছি, আগে পানুবাবুর প্রেসারটা মেপে নিই।'

পানুবাবুর প্রেসার মেপে ডাক্তারবাবু বললেন—আপনারও তাই। সেম কেস—রক্তের চাপ অস্বাভাবিক নীচু এই বয়সের পক্ষে।

পানুবাবু মানতে চান না।

'আচ্ছা আমার আর একটা ব্লাডপ্রেসার মাপবার যন্ত্রও আছে।'

সেটা দিয়ে মেপেও ওই একই প্রেসার উঠল?

'এত কম প্রেসার তবে আমরা একটুতেই এমন চটে উঠি কেন?'

'রক্তের চাপের সঙ্গে মানুষের রাগের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে কিনা, সে-কথাটা আমার ঠিক জানা নেই।'

চটে উঠেছেন কানুবাবু আর পানুবাবু।

'আমাদের নিয়ে তামাসা আরম্ভ করলেন নাকি?'

'যে-কথা এখনকার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত জানে সে-কথা এত বড় একজন ডাক্তারের জানা নেই, এও বিশ্বাস করতে হবে নাকি আমাদের?'

আশু ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন—তাঁর কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে অন্য ডাক্তার দেখাতে পারেন তাঁরা।

পানুবাবু ইঙ্গিতে কানুবাবুকে মনে করিয়ে দিলেন যে আজ নিষ্ক্রোধ-দিবস তাঁদের।

'বলুন ডাক্তারবাবু, এখন আমাদের কি করা উচিত।'

'রাগ কমানর ওষুধ আমাদের জানা নেই, তবে রক্তের চাপ বাড়াবার ওষুধ আমাদের জানা। সেই ওষুধই আপনাদের দিচ্ছি। এই ট্যাবলেট দিন পনের খেয়ে দেখুন প্রথমে। প্রোটিন খাদ্য অর্থাৎ ডিম মাংস ছানা বেশী করে খাবেন। পনের দিন পরে আবার একবার প্রেসারটা মাপিয়ে নেবেন।'

দুটো করে ট্যাবলেট খেয়ে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে দুইজনে গিয়ে বসলেন পানুবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে। 'ওষুধে দোষ নেই কি বলো?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত শান্ত এই আলোপাথি।'

'নাড়িটাকে ছেড়েছিলাম ডাক্তারী পড়াব। আর পড়াব না ঠিক করে ফেললাম।'

দুইজন একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। কিরকম যেন খালি-খালি ভাব। কি যেন একটা জিনিস হারিয়ে গিয়েছে। নিজেদের বয় মেজাজের এতদিন তবু একটা অজুহাত ছিল হঠাৎ সরিয়ে নিয়েছেন সেই খুঁটিটা আশু ডাক্তার।

আজ খাওয়া-দাওয়ার পাট নেই। মাধু মহারাজের নির্দেশমত সারাদিন কাটাতে হবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে। রেফিউজি ছেলেমেয়েরা গিয়েছে কুরুক্ষেত্রে। পানুবাবুর বাড়ীতে হাই কোন হইচই নেই। পালা করে মহাভারত পাঠ আরম্ভ হয়ে গেল। একজন পড়েন, আর একজন শোনেন। যিনি

'পিয়ারলেস'-এর অগ্রগতির কয়েকটি বিস্ময়কর নিদর্শন

সমষ্টিগত কৃতিত্ব		১৯৭৩ সালে		১৯৭৪ সালে
ক্রাউন, চ্যাম্পিয়ান ও মিলিয়নেয়ার এজেন্টের সংখ্যা	—	১০	—	২১
গোল্ড কাপ, গোল্ড মেডাল ও সিলভার কাপ বিজয়ী এজেন্টের সংখ্যা	—	৫৪৪	—	১২৩৭
কর্মসংস্থান (নূতন এজেন্ট নিয়োগ)	—	১২,০০০	—	২৩,৭৮৪
বিক্রীত নূতন সার্টিফিকেটের সংখ্যা	—	১,২৪,৬০০	—	২,৫২,০০০
বিক্রীত নূতন সার্টিফিকেটের মূল্য (মোট কেস ভ্যালু)	—	৩৫ কোটি টাকা	—	৮০ কোটি টাকা

ব্যক্তিগত চমকপ্রদ কৃতিত্ব				
এজেন্ট কর্তৃক সর্বাধিক আদায় (প্রথম বর্ষের চাঁদা)	—	৫৭,২৮৪৲ টাকা	—	১,১৬,২৭৯৲ টাকা
এজেন্ট কর্তৃক সর্বাধিক সার্টিফিকেট বিক্রয় (মোট কেস ভ্যালু)	—	১৯·৫১ লক্ষ টাকা	—	২৫·২৩ লক্ষ টাকা
ফীল্ড-অফিসার কর্তৃক সর্বাধিক আদায় (প্রথম বর্ষের চাঁদা)	—	২৭·৫১ লক্ষ টাকা	—	৫২·৯৮ লক্ষ টাকা
ফীল্ড-অফিসার কর্তৃক সর্বাধিক সার্টিফিকেট বিক্রয় (মোট কেস ভ্যালু)	—	৭·৪৮ কোটি টাকা	—	১৪·৫৯ কোটি টাকা

— ১৯৭৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা —
নূতন ব্যবসায় — ১০০ কোটি টাকা

গভঃ সিকিউরিটিতে লগ্নী – ৪ কোটি টাকার উর্দ্ধে (Face Value)

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

(পূর্বতন দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ)

(স্থাপিত ১৯৩২)

রেজিষ্টার্ড অফিস :
'পিয়ারলেস ভবন'
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৬৯

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য 'পিয়ারলেস কর্মী-সংগঠন'-এ যোগ দিন

পড়ল তিনি জানেন, স্বামী শোনেন তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে নাক ডাকান। এই করে তো বিকেল হল।

পানুবাবু বাড়ী আছেন নাকি?

কালীবাড়ীর ভট্টাচার্যমশাই এসে চকলেন ঘরে। মানসিক উত্তেজনা চাপবার প্রয়াস তাঁর মুখচোখে স্পষ্ট। একটা কথা বলবার জন্য এসেছেন। মহাভারত পাঠে বাধা পড়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কানুবাবু আর পানুবাবু।

কি ব্যাপার?

দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে ভট্টাচার্যমশাই জানালেন যে তিনি আসছেন বেণী সেকরার বাড়ী থেকে। সাধু মহারাজের দেওয়া মেডেলটা নিয়ে গিয়েছিলেন সেকরা-বাড়ীতে। ছেলেদের সোনাটুকু কোন সং কাজে যায় তারই কানুবাবু আর পানুবাবু পরলোকগতদের সেবায় এত পয়সা খরচ করছেন, আর সম্প্রতি অভাবে তিনি কিছু করতে পারছেন না, এ চিন্তা তাঁকে পীড়া দিত অষ্টপ্রহর। বাপু নামের রেফউজি প্রেমটিক বিষয়োপলক্ষে কেন গহনা গড়িয়ে দেবেন মনস্থ করে তিনি গিয়েছিলেন সেকরা বাড়ী। বেণী সেকরা স্পষ্ট বলে দে মেডেলটা সোনার নয়। এ সন্দেহ আলোচনা করবার জন্যই ভট্টাচার্যমশাই এখানে ছুটে এসেছেন।

সান্ধ্যকালীন মহাভারত পাঠে অবসন্ন-মন কানুবাবু আর পানুবাবু। ঠিক ধরতে পারলেন না ঐ মেডেলটা সোনার না হওয়ার জন্য ভট্টাচার্যমশাই এত বিচলিত কেন।

তাতে কি হয়েছে?

উত্তেজিতভাবে ভট্টাচার্যমশাই বললেন, কী হয়নি তাই বলুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া মেডেল যদি পিতলেরও হয় তাতেই বা কি যায় আসে?

কিন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া না হয়?

এরচেয়ে পরিষ্কারভাবে নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করবার সাহস ভট্টাচার্যমশায়ের নেই।

একটু মজে বসলেন কানুবাবু। নিজের চেয়ারখানা একটু এগিয়ে নিয়েই এলেন পানুবাবু। ছিল শ্রদ্ধা এক হল। ফিসফিস করে অনেক কথা হল। পরিষ্কার বহু আগে বিশ্ববিদ্যালয় সোনার মেডেল দিত, না পিতলের মেডেল দিত, সে বিষয় এখনই জানবার কোন উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কি করে তুমাল কি? সাধু মহারাজের ঠিকানা জানা কিছু অসম্ভব নয়। তবে কথাটা একবার তাঁর কানে তুলে দেওয়া উচিত। এই হল সকলের অভিমত। কানুবাবু ভার ভট্টাচার্যমশায়ের উপর। তিনজনে মিলে বাড়ী থেকে বার হলেন।

রাস্তার লোকেরা আজ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে কানুবাবু আর পানুবাবুর হিরোর 'বুডপ্রেসার' যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধিলাভ করেছে, এই অভাবনীয় সংবাদ পাড়ার ঘরে ঘরে পৌঁছতে দেরী হয়নি। সকলের মুখেই কৌতুকের হাসি।

এদের দেখে মায়া হচ্ছে আজ কানুবাবু আর পানুবাবুর। বেচারারা ঠকেছে খুব তাঁদের ভুল নায়কত্ব করে।

সাধু মহারাজকে প্রণাম করে তাঁরা গলবস্ত্রে বসলেন। প্রথমেই আসল কথাটা তোলা খারাপ দেখায়। ভয় ভয় করে, তাঁদের মনের কথা হয়ত উনি সব জানেন। তাই বোধহয় এত গম্ভীর আজ।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মহারাজ?

করো।

নিষ্কণ্টক-দিবসে চা খাওয়া চলে?

না।

ঢোকে ঢোকে নিশ্বাস পড়ল কানুবাবু আর পানুবাবুর। এইবার কাজের কথা পাড়লেন ভট্টাচার্যমশাই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারবারে বড়ই চিন্তা।

সাধু মহারাজ হাঁ না কিছু বললেন না। বিরক্ত হলেন নাকি? মনের কথা ধরে ফেলেছেন নিশ্চয়ই। ঘুরিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করা বৃথা এঁর কাছে।

মহারাজ, আপনি যে মেডেলটা দিয়েছিলেন আমাকে সেটা সোনার নয়।

ওটা কি দিয়ে তৈরী সেকথা তো আমি তোমাকে বলিনি। ওটা আমার অহংকার প্রতীক বলে ওটাকে আমি ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম। সোনা ভেবে ওটাকে তুমি গ্রহণ করছ একথা আমি ভাবিনি। আমার ভুল হয়েছিল তোমাকে দেওয়া। গলায় ফেলে দেওয়াই উচিত ওটাকে।

অনুতপ্ত ভট্টাচার্যমশাই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কাছে আছে মেডেলটা। ওটাকে ফেলে দিই গঙ্গায়।

যাও।

জলল চুপ করে একটা শব্দ হল। চোখ বুজে এল সাধু মহারাজের। ধ্যানস্থ হয়েছেন তিনি। তিন অপরাধী সন্তর্পণে পা টিপে টিপে উঠে এলেন সেখান থেকে।

সারারাত ধর্মালোচনায় কাটাতে হবে। তাই তাঁরা এসে বসলেন তাকিয়া ঠেস দিয়ে কানুবাবুর বাইরের ঘরে।

রাত নটার সময়—গিন্নী ভিতর থেকে খোঁজ নিতে পাঠালেন যে, রেফউজীরা আজ বাড়িতে ফিরবে কিনা? তাদের খাবার জাগলে কত রাত্রি পর্যন্ত বসে থাকা উচিত হবে সে খবরটাও তিনি জানতে চান।

তখন খেয়াল হল তাঁদের যে রেফউজিরা ফেরেনি। সন্ধ্যাবেলাতেই ফেরা উচিত ছিল। বেলা বারোটার সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছেই কাজ সেরে চারটে পাঁচটার মধ্যে সেখান থেকে রওনা হওয়ার কথা। আট ঘণ্টা পর পর কৃষ্ণনগর থেকে বাস ছাড়ে। অন্তত রাত নটার বাসে তাদের 'নিশ্চয়ই আসবার কথা। না আসায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হলেন সকলে।

কী হল? একটা কিছু করতে হয়। খোঁজ নিতে হয়। যারা সেবাধর্ম পালন করতে চায় তাদের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা অসম্ভব। তাহলে এখনই দশটার বাসে কৃষ্ণনগরে যেতে হয়। একঘেয়ে ধর্মালোচনায় সারারাত কাটানোর চেয়ে দোলাদুলি করে রাত কাটানো অনেক সহজ।

রাতদুপুরে দুই বন্ধু গিয়ে পৌঁছলেন কৃষ্ণনগরে। চেকপোস্টের লোকজনদের কাছে তোলা গেল না ঘুম থেকে। পুলিস তাঁদের সাবধান করে দিয়ে থানার বারান্দায় শুয়ে থাকতে বলল। তাঁরা জেগে বসে থেকে বাকি রাতটুকু নিজেদের পরোপকার ব্রত অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করলেন। ভোরবেলায় বর্ডার চেকপোস্টের লোকজনদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে উদ্বাস্তু রেফউজি পরিবারগুলি কাল এখানে আসে নি। চেক-পোস্টের একজন প্রবীণ অফিসার সারা বিবরণ শোনবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সন্ন্যাসী আশপাশে নূতন এসে আস্তানা গেড়েছেন কিনা? একজন একটা গাঁয়ের নাম করল। এর পর মনে পড়ছে না কেউ পরে না। বাড়ী ফিরে এসে প্রথমেই রেফউজিদের থাকবার ব্যবস্থা করা ভাল হবে। ঘরের মধ্যে কোন জিনিস নেই। ফিরে জন্য কেনা সুটকেস, কাপড়চোপড়, প্রসাধন দ্রব্যগুলি পর্যন্ত বাপের মা নিয়ে গিয়েছেন। পানুবাবু ছুটতে ছুটতে এলেন নিজের বাড়ী থেকে। সেখানকার অবস্থাও এই রকমেরই। বাড়ীর লোকজনদের তিনি বলে এসেছেন ভাল করে দেখতে বাড়ীর ভিতর থেকে কোন জিনিস চুরি গিয়েছে কিনা।

সোকালোল পড়ে গেল বাড়ীতে। কানু-বাবু আর পানুবাবুর এখন আর কোনদিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই। তাঁদের গন্তব্যের লক্ষ্য কালীবাড়ীর ঘাট। যেতে হল না ঘাট পর্যন্ত। মন্দিরের কাছেই দেখা হয়ে গেল ভট্টাচার্যমশাইয়ের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকেই খবর শুনলেন। সাধু মহারাজ অন্তর্হিত হয়েছেন কাল রাত্রিতেই। আজ মন্দিরে কালীমূর্তির বাঁধানো জিভটা আর সকাল থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আ!

পুলিসে খবর দিয়েছেন?

এখনও দিইনি। দেওয়া দরকার কিনা সেই কথাটাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। মায়ের জিভটি ছিল পিতলের উপর সিলভার করা।

পিতলের?' সাধু মহারাজের উপর চটবার বদলে হেসে ফেটে পড়লেন কানুবাবু আর পানুবাবু। এর আগে কখনও ভট্টাচার্যমশাই এঁদের দুজনকে হাসতে দেখেন নি। এটা নিষ্কণ্টক-দিবস পালনের ফল না ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধির ওষুধের ফল, শুধু সেইটা বুঝতে পারলেন না।

কৌতুক ও কৌতূহল

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এবার পুরীতে গিয়ে হঠাৎ বলাইদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অনেকদিন পরে দেখা—আজ বোধ হয় দশ-বারো বছর আর দেখা হয়নি। আগে যখন ওঁরা মোমিনপুরে থাকতেন তখন প্রায়ই মাঝে মাঝেই ওঁর কাছে যেতুম উনিও আসতেন। তারপর শরীর ভেঙে যেতে ঐখান থেকেই টাটানগরের কাছাকাছি সিংভূম জেলার কি একটা জায়গায় চলে গেলেন সে-ই থেকেই যোগাযোগ গেল ছিন্ন হয়ে।

ওঁর অবস্থা না ফিরে উপায় ছিল না। শরীর খারাপ হয়েছে—আজকাল চিকিৎসা মানেই রাজসূয় যজ্ঞ অত করে কে? এখানে থাকলে ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকা—তাও আপন ভাই নয়, খুড়তুতো ভাই—তিনি যতটা সাধ্য যত্ন-আত্তি করতেন কিন্তু তার বেশী করা সম্ভব নয়। সেটা আশা করাও অন্যায়। বলাইদার অবসর তো সরকারী সেভেনটি টাকা পেনসন—তাতে আর কত চলে? ওখানে এক বন্ধুর বাড়ী পেয়েছেন বিনা-ভাড়ায় তাদেরই একটি আদিবাসী কি আছে—খোরাকীর পরিবর্তে সে রোধে-বেড়ে দেয়। কাজেই কোন মতে চলে যায় ঐ আয়েই। ওখানে গিয়ে শরীরটাও ভাল হয়ে মধ্যে মধ্যে সামান্য জ্বর-জ্বালা ছাড়া কোন অসুখ-বিসুখ নেই। সেও একটা বুঝিয়ে-পড়িয়ে কমেছে কতকটা।

বলাইদা ইংরেজ আমলে বিপ্লবী ছিলেন। কলেজে পড়তে পড়তেই কোন এক গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়ে ইংরেজ-নিধন যজ্ঞে ব্রতী হয়ে পড়েন। অবশ্য তার মধ্যেই এম-এটাও পাস করে নিয়েছিলেন এক সময়ে—কিন্তু আর কিছু করা হয়ে ওঠেনি। বহুবার জেল খেটেছেন। অন্তরীণে আবদ্ধ হয়েছেন—মার যে কত খেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম বয়সে জেলের অপেক্ষায় থাকতেন তখনও মার কম খাননি পরে বিপ্লবী দলে যোগ দেবার পরে তো কথাই নেই।

সেদিনের সেই সব মানুষগুলি যে কষ্ট করেছেন—তাকে কঠোর তপস্যা বলাই উচিত। আজ যাঁরা স্বাধীনতার পর বড় বড় চাকরি আর প্রতিপত্তি নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছেন যেসব তরুণের দল তাঁদের মতে বিশ্বাস না বিরোধিতা করছেন—তাঁরা সেদিনের এইসব মানুষগুলির সে কষ্ট স্বীকার, সে আত্মত্যাগ, সে তপস্যার কঠোরতা কল্পনা করতে পারবেন না—

এই তো বলাইদা-ই এম-এ পাস স্বাস্থ্যবান সুদর্শন তরুণ যুবা—সেকালে অনায়াসে বড় চাকরি নিয়ে বিয়ে-থা করে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন।...সে জায়গায় জল-জঙ্গলে পাহাড়ে গুহাবাসী নিশাচর পশুর মতো আত্মগোপন করে থেকে অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটিয়েছেন। কত নির্যাতন সহ্য করেছেন কত কৃচ্ছ্রসাধন কত উপবাস, তবুও কী অসীম ধৈর্য আর অটল নিষ্ঠার সঙ্গে আরব্ধ ব্রত পালন করে গেছেন। প্রাণ বিপন্ন হয়েছে অনায়াসে—কর্তব্য ত্যাগ করেন নি। সহকারের সৈনিকের মতোই সমিতির হুকুম তামিল করেছেন নিজের কোন বাঞ্ছিত কাম্য, সুখ অসুবিধেকে কখা হতে দেননি।

সে কর্তব্য করতে গিয়ে বছরের পর বছর জেলে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তার ভেতর কত চাঁদ উঠেছে আকাশে, কত ঋতু পরিবর্তন এসেছে—প্রকৃতি কতবার নব সাজে এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের পৃথিবীর আঙিনায়: কতদিন তার আলো এসে তাঁর ঘিরেছে বাইরে থেকে কত অন্ধকারময়ী নিঃসঙ্গ রজনী একা একা নির্নিদ্রপ্রায় সারত; পাখ-পালায় পাখ-পাখালি . কতবার ধূসর বসন্তের রঙিন আকাশ ছেয়েছে ছেয়ে হয়ে উঠেছে মন যার চৈত্রের উদাসী হাওয়ার ঠেলে এসেছে চাঁপার গন্ধ নিয়ে—তার তপ্ত হাওয়া বিরহী মনে হাহাকার জাগিয়েছে। আষাঢ় শ্রাবণে ভরতে ভরতে খালে-ভরা আর পাশে-পাশে মধুর কলাপ যাদের বেজে বেজে শ্রান্ত হয়ে . গেছে—ওঁরা তা শোনেও পাননি।

এই ত্রেন্দ স্বীকারের জন্য কোন পুরস্কারের কথা চিন্তা করেন নি ওঁরা—

ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া। পানও নি কিছু।

আজ ভগ্নস্বাস্থ্য লোকটা—জীবনের যা কিছু সঞ্চয় সব দেশলক্ষ্মীর পায়ে সঁপে দিয়ে নিঃশব্দে সরে গেছে। সাফল্যের উৎস থেকে: কোন সুদূর প্রবাসে কোন্ অজ্ঞাতের মধ্যে—কোনমতে স্বাস্থ্যহীন আনন্দহীন ভবিষ্যৎহীন জীবন কাটাচ্ছে—কেউ দেখবার নেই, কেউ খোঁজ করবার। কোনদিন হয়ত এইভাবেই শেষ ডাক এসে পৌঁছবে—একা ঘরে পড়ে থাকবে—বহুদিন পর্যন্ত কেউ হয়ত জানতেও পারবে না।.....

মাপ করবেন—একটু হয়ত ধীন জানতে নিজের গীতই হয়ে যাচ্ছে।

বলাইদাকে দেখলেই এই সব কথা মনে পড়ে আমার। কারণ আমার কাছে বলাইদাই সেদিনকার সেই জীবন-মরণ-পণ-করা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক। আরও কোন কোন বিপ্লবী নেতাকে দেখেছি—কিন্তু সে মন থেকে বলাইদার মতো এমন-ভাবে তাঁদের কাছে মেশবার সুযোগ পাইনি। তাছাড়া যা দেখেছি, মেশবার ইচ্ছাও করেনি সকলের সঙ্গে। তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখেছি আভিজাত্যের জোর—লক্ষ্য করেছি নীরব ও সরব-অহরহ একটা অভিযোগ। কিন্তু বলাইদাকে একটি দিনের জন্যেও এতটুকু দুঃখ কি পরিতাপ প্রকাশ করতে শুনিনি কোন অসুখ কি পরাজয়েরতেও সেদিন তাঁর মধ্যে—যেন কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই তাঁর। এখনও অকারণে-অকারণে হো-হো করে হেসে উঠতে পারেন। সে হাসিতে একটু মালিন্য কি কৃত্রিমতা নেই। এখনও হাসিতে-খুশিতে ভরপুর—ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারেন না।

এইজন্যেই বলাইদা আমার এত প্রিয়, এত আপনও।

এ হেন বলাইদাকে এভাবে হঠাৎ পেয়ে যাব তা ভাবতেও পারিনি। শুনলাম বলাইদা তাঁর ঐ মাসিক পেন্সনটি টাকার মধ্যে থেকেই পাই পাই করে পয়সা জমিয়ে শ'তিনেক টাকা হাতে নিয়ে ভেসে পড়েছেন সেই অজ্ঞাতবাস থেকে। পুরীতে এসে কটাদিন সমুদ্রের ধারে চুপচাপ কাটানো নাকি তাঁর অনেক দিনের শখ, সেই শখ মেটা-তেই এবার মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এখানকার এক হোটেলের মালিক তাঁর পূর্ব পরিচিত, তিনিই নামমাত্র খরচে ওঁকে রাখতে রাজী হয়েছেন, সুতরাং এখন হাতে রয়েছে কটা দিন নয়—মাসখানেকই ওঁকা চলবে ঐ টাকায়।

বলাইদাকে দেখে আমি যত খুশী বলাইদাও তত। আমি থাকি চক্রতীর্থের দিকে এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তবু এখানে আর কাজই বা কি—খাওয়া ঘুমোনো আর বেড়ানো ছাড়া।.....তাই প্রায়ই আমি চলে যাই আমার বাসা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখানে আসি, তারপর রাত আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে বসে কাটিয়ে একটা রিকসা ধরে বাড়ী ফিরি।

প্রথম দু-তিন দিন আমি একাই ছিলাম বলাইদার আড্ডার সঙ্গী।—কিন্তু ক্রমশ আরও দু-চারজন জুটে গেল। তাঁরা সকলেই ওঁর পূর্ব পরিচিত মহল থেকে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওঁর ঐ বিখ্যাত হো-হো হাসি শুনে সোজা কাছে এসে ভাল করে ঠাউরে দেখে চিনতে পেরেছেন। এঁরা সবাই প্রায় বলাইদার সমবয়সী—আমার থেকে অনেক বড় তবে তাতে কিছু এসে যায়নি। বলাইদাকে কেন্দ্র করে যে আড্ডা তাতে বয়সের তফাৎ কোন কৃত্রিমতা ঘটায় না।

আড্ডা হলেই নানা প্রসঙ্গ উঠবে এই আড্ডার প্রসঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বিশেষ বুদ্ধদের আড্ডার ধর্ম ও পরলোক এবং অলৌকিক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব। অবশ্য আরও আছে অপেক্ষাকৃত খুচরো প্রসঙ্গও আছে কিছু কিছু—স্বাস্থ্যতত্ত্ব, আহারতত্ত্ব নিষ্কাশনতত্ত্ব আর একটু উঁচুদরের প্রস-ঙ্গের মধ্যে সমাজতত্ত্ব। তবে তার কোনটাই জন্মান্তর পরলোকের মতো মুখরোচক নয়।

সুতরাং সেদিন স্বভাবতই কথাটা উঠেছিল—ঐ ভূতুড়ে বাড়িটার কথা।

নরেশবাবু বললেন আমি এখানের অনেক লোকের মুখে শুনেছি, বাড়িটায় ভূত আছে।

বিজয়দা এখানকার মাতব্বর লোক—তাঁর কথার দাম আছে। টঁদ ছত্রিশ বছর কেটে গেছে এই পুরী শহরে এতবড় একটা হোটেলের মালিক তিনি তাছাড়া সভা-সমিতি বারোয়ারী পুজো ঠাকুরের জন্মোৎ-সব এখানকার বাঙালীদের যা কিছু কর্ম অনুষ্ঠান সমস্ত কিছুতেই তিনি অগ্রণী। বিজয়দা বললেন, আরে সেই জন্যেই তো বাড়িটার ভাড়া হয় না। অত বড় বাড়ি অত ওয়েলকেপ্ট—তবু ভাড়াটে আসে না কেন?—বাড়ির মালিক যিনি মস্ত ধনী—তিন হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চেয়েছেন। যদি কেউ একসঙ্গে সাতদিনরাত ও-বাড়িতে বাস করতে পারে তাকে ঐ টাকাটা দেওয়া হবে। এমন কি একজন সঙ্গী নিয়ে থাকলেও আপত্তি নেই তাঁর— তিন চার বাড়ির দুর্নামটা কেটে যাক। .....টাকার লোভে চেষ্টাও করেছে অনেকে—কিন্তু কেউই একটা পুরো রাত কাটাতে পারেনি। এমনি অত শান্ত নিস্তব্ধ বাড়িটা, কিন্তু রাত একটা বাজলেই নাকি তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যায় একেবারে। ভূতের নেতা আমরা বলি—কথার কথা। এ একেবারে সত্যি সত্যিই তাই। তাবড় তাবড় সাহসী ছোকরা-কেও ছুটে বাইরে পালিয়ে আসতে দেখেছি, তারা জানেও পারে না—ঠিক কি দেখেছে বা শুনেছে এমনই ভয় পেয়ে যায়।

এরপর আরও অনেকে অনেক কথা বললেন ও বাড়িটার সম্বন্ধে। যাঁরা গেল সকলেই কিছু না কিছু জানেন। কেউ শুনেছেন পাণ্ডার মুখে কেউ বা অপর কোন যাত্রীর মুখে। যাতায়াতের পথে রিকশাওয়ালারাও বলেছে কিছু কিছু। রাত একটা বাজলেই নাকি দুদ্দাড় দরজা-জানলা আছড়ে পড়ার শব্দ হয়—বিনা বাতাসেই। সব কটা শেকল কড়া ঝনঝন করে ওঠে। হো-হো অট্টহাসির শব্দ ওঠে—সে শব্দ একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে

রামায়ণী প্রকাশ ভবন

রমাপদ চৌধুরীর

সুবৃহৎ গ্রন্থ-বিচিত্রা

কৈশোর যৌবন

রেক্সিনে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা

বয়স যাকে চিরন্তন বলায়। কিন্তু সব মানুষই স্মৃতিতে এবং কল্পনায় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণটিতে দাঁড়িয়ে থাকে সারাজীবন। যে-কোন বয়সের পাঠকের মন ঐ মুখগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকতে চায়। তাই যে কোন লেখকের কৈশোর-যৌবনের স্পর্শ পাওয়া রচনাগুলিই পাঠকহৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। কারণ সেই উত্তাপ আন্তরিক, সেই কল্পনা উষ্ণ অবশ্য, বর্ণচ্ছটা এবং উচ্ছ্বল তবু পৃথিবী। অথচ তার বাস্তবতাও সমান তীব্র। এমনই তিরিশটি সুরে বাঁধা পাঠক ঝুমঝুমি : তিনভায়া, তারাশঙ্কর উপন্যাস এবং আলোকন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ সরস্বতী—একত্রে পঞ্চকান্তি ঘোষ সুবৃহৎ এক খণ্ডে। তারই নাম কৈশোর যৌবন। দাম ২৫-০০।

খোঁজ নিন : স্যাণ্ডহীন পাবলিশার্স কলকাতা

৩৫ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি—৯

ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ—রাত বাড়ে যত ততই জোর হয়। কখনও নাড়ের শব্দ ওঠে কখনও চাপা আর্তনাদ—হঠাৎ বুকে বা পিঠে ছুরি বসালে যেমন নাকি আহতদের গলা দিয়ে স্বর ওঠে যেমনই; কখনও বা শোনা যায় কে যেন গান গাইতে গাইতে অথবা কাঁদতে কাঁদতে ঘর বেড়াচ্ছে—ঘর থেকে বারান্দায় অথবা বারান্দা থেকে ঘরে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে আমি আর শিবদাসবাবুই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী। তৌতিক বিবরণ শুনতে শুনতে আমরা দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলুম।

আমি বললুম, চলুন বলাইদা আপনি আর আমি একদিন দুখানা লণ্ঠন বন্দুক নিয়ে একটা রাত কাটিয়ে আসি। যদি একটা রাত কাটাতে পারি—তাহলে চাইকি বিজয়দা ঐ যে কী বললেন হাজা না জমিদার কে—তাঁর পুরস্কারটাও নিয়ে নিতে পারি। এক রাত কাটালে সাত রাতও কাটবে।

বলাইদা এতক্ষণ তাঁর অভ্যস্ত সদা-উৎফুল্ল মুখে বসে ছিলেন, আমার কথায় একেবারে যেন একটা চাবুকের ঘা খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন। নিমিষে সাদা হয়ে উঠল তাঁর মুখ না না আমি না। আমি না। আমি ও কাজে নেই।

'সে কি! শিবদাসবাবু বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, 'আপনি এত দিনের ঘেটোয়ান পাকা বিপ্লবী, ইংরেজের কামান বন্দুককে ভয় করেন নি সামান্য ভূতের এত ভয় আপনার! না, আপনি সত্যিই এবার বুড়ো হয়ে গেছেন।'

'তা হয়েছি ভাই, স্বীকার করছি। আর বয়স তো কম হল না—সাতষট্টি পেরিয়ে গেছে কবেই।'

অবাক হয়ে গেলুম আমিও। বলাইদাকে আজ নতুন দেখছি না, এত সহজে বয়সের দোহাই দেবার লোক উনি নন। বললুম, কী ব্যাপার বলাইদা, ভূতুড়ে বাড়ীতে রাতের নাম শুনেই আপনি অমন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন? আপনার তো দুর্জয় সাহস শুনেছি। তুয়ার্সের জঙ্গলে একা শুধু হাতে ঘুরে বেড়িয়েছেন—সেখানে পুলিশ পর্যন্ত রাতে ঢুকতে সাহস করে না বলেই আপনি নিরাপদে নেপাল বর্ডার পর্যন্ত চলে যেতে পেরেছিলেন শুনেছি—আপনার তো এত ভূতের ভয় স্বাভাবিক নয়।

বলাইদা কেমন যেন ক্লিষ্টকণ্ঠে উত্তর দিলেন। 'ওসব কথা থাক ভাই। সে তখন প্রথম যৌবন, সাক্ষাৎ যমকেও ভয় করি না। তখন আমাদের মধ্যে একটা অলিখিত আণ্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল—টেররিস্টের কাজ যে করবে সে কখনও ডাক্তার ডাকবে না। পালাতে পালাতে বা পুলিশের সঙ্গে লড়াইতে যদি কেউ খুব সাংঘাতিক আহত হয়—বাকী যারা থাকবে তারা সঙ্গী তারা গুলি করে মেরে রেখে যাবে। সেসব দিন গেছে অনেক। এখন আশেপাশে পয়সাই ডাক্তারের ওষুধে চলে যাচ্ছে। তার মূলে কি, ভয় ছাড়া তো কিছু নয়—ভয়ই প্রাণেরই ভয়।'

আরও এই ধরনের পাঁচটা কথা বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিলেন বলাইদা।

তাঁর সমবয়সী বন্ধু বা পরিচিত যাঁরা ছিলেন— তাঁরাও এ প্রস্তাবটাকে তত আমল দিলেন না। এই বাড়িটা সম্বন্ধে আরও কে কী শুনেছেন, কলকাতার লাসসভউন রোডে নাকি এমনি একখানা ভূতুড়ে বাড়ি আছে, সেখানে নাকি যারা রাত্রিবাস করতে গেছে তারা সবাই পাগল হয়ে গেছে, এমনি সব আলোচনাতেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহী দেখলুম। ভূত থেকে দেবতা, ভূতুড়ে বাড়ি থেকে বৃন্দাবনের নিধুবন পর্যন্ত পৌঁছে—সেখানে কেন রাতে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না— সেই কারণ নিয়ে তর্কাতর্কি হতে হতেই রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। এর-পর আর বিকল্প মিলবে না, অগত্যা আড্ডা ভেঙে উঠে পড়তে হল। সেদিনের মতো ও প্রসঙ্গেও ছেদ টানতে হল বাধ্য হয়ে।

কথাটা কিন্তু আমি ভুলতে পারলুম না কিছুতেই। পরের দিন তাই আমাদের অভ্যস্ত সময়ের আগেই বলাইদার হোটেলে পৌঁছে গেলুম।

তখনও সমুদ্রের ধারে বসার সময় হয় নি। তখনও রোদ সেখানে—ঘরেই বসতে হবে আর খানিকক্ষণ। তবে তাতে অসুবিধে ছিল না কারি মতো হলেও ওঁকে পরে একখানা বইই দিয়েছিলেন হোটেলের মালিক বিজয়বাবু। সেদিকটা বেশ নিরিবিলিও। আমি একেবারে বিনা ভূমিকায় (ভয় হল পাছে আর কেউ এসে পড়ে সব মাটি করে দেয়) প্রশ্নটা তুললুম কী ব্যাপার বলুন তো বলাইদা কাল ঐ হানাবাড়িটার থাকার কথায় অমন চমকে উঠলেন কেন? একেবারে আনলাইক ইরোসেলফ?... আদৌ ঐ ধরনের ভয় স্বাভাবিক নয় আপনার পক্ষে।...কোথাও একটা কিছু ইতিহাস আছে এর পেছনে নিশ্চয়।... কী হয়েছিল কি? মানে— ব্যাপারটা কি?'

'কী হবে তোর শুনে?' নস্যির একটু টিপ আলগোছে করে তুলে নিয়ে কৌটোটা আবার বন্ধ করে পাশে রেখে স্বাভাবিক গলায় বললেন বলাইদা 'নাই বা শুনলি? কথাটা আমার পক্ষে খুব সহজ নয়—ব্যাপার পেনফুল। এমনিতেই রাতে ভাল ঘুম হয়নি। আমার রাত তিনটে পর্যন্ত চোখ জেগে।'

'না না বলাইদা, ওসব কোন যুক্তিই নয়, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। উত্তেজনা তো হয়েছিল সবটা বিফলে যায় কেন?' আমি একেবারে হাতে ধরে বলে পড়লুম।

'দূর পাগলা।' স্নেহে ধমক দেন বলাইদা অবশেষে— খানিকটা চুপ করে থেকে শুরু করেন, সে অনেক দিনের কথা, সেই ফার্টিফ্ট-এর। তখন আমি বছর দেড়েক রক্সা ক্যাম্পে কাটিয়ে সবে ছাড়া পেয়েছি—

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক আপনাদের সেবায় ধন্য

বি কে সাহা

এণ্ড

ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সর্ব্বভারতীয় চা-য়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫ পোলক স্ট্রীট
২ লালবাজার
কলিকাতা—১

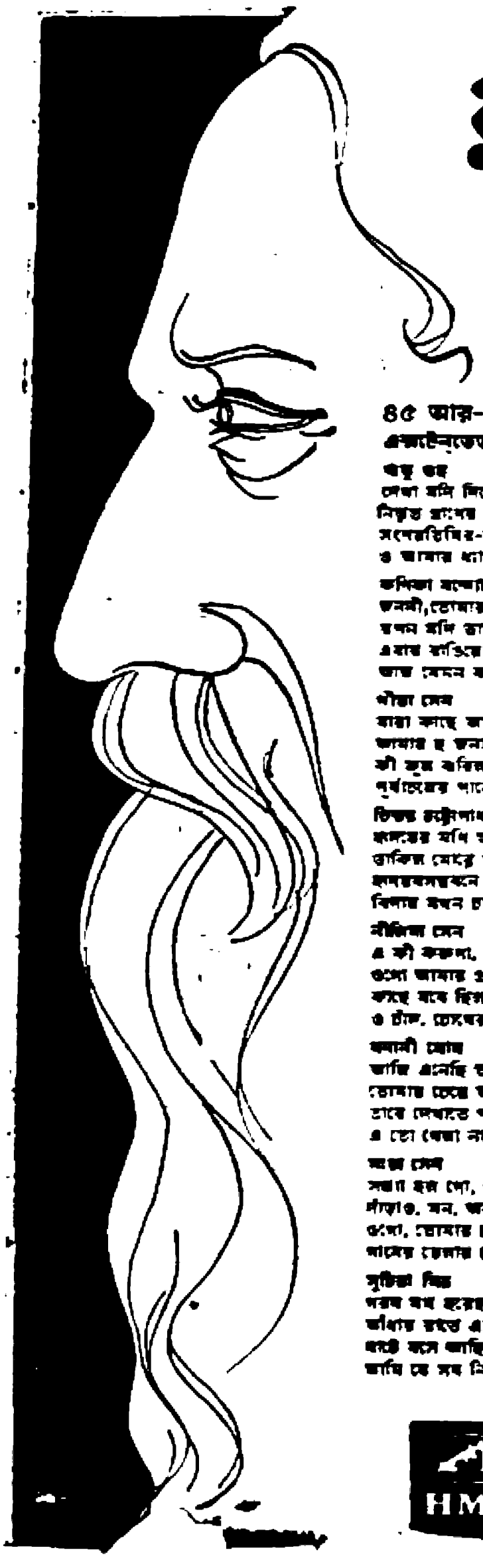

রবীন্দ্র সংগীতের নতুন রেকর্ড

চিরমধুর রবীন্দ্র-সংগীতের নতুন রেকর্ড সংকলন।
নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে গাওয়া এইচ-এম-ভি'র অনবদ্য অবদান।

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ড

ধনু ওহ
দেখা হলি নিয়ে
নিভৃত প্রাণের দেবতা
সংশয়ছিন্নির-মনে
ও আমার থাকেরই ধন

কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
জননী,তোমার করুণ চরণখানি
যখন হলি তাকিলে
এবার ভাসিয়ে দেব
আজ যেমন করে গাইছে আকাশ

গীতা সেন
যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্
আমার যে জনার নিলে
কী সুর বাজিয়ে নিপুণ অন্তরে
পূর্ণচাঁদের পানে চাকোই

নিশিত ভট্টাচার্য
প্রাণের যদি আনন্দিনী মোর
তাকিস মোরে আমার আধি
হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিলে
বিদায় যখন চাইলে তুমি

নীলিমা সেন
এ কী করুণা, করুণাময়
ওগো আমার প্রথম ঠাকুর
কাছে যবে ছিল
ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার

অমানী ঘোষ
আজি এনেছি ডালিতে আশীর্বাদ
তোমায় চেয়ে আছি বসে
তারে দেখাতে পারি নে কেন
এ তো খেলা নয় খেলা নয়

মঞ্জু সেন
সন্ধ্যা হল গো, ও মা
দাঁড়াও, মন, অনন্ত বসন্তে-মনে
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে
আমের ছোলায় খেলা-অবেলায়

সুচিত্রা মিত্র
পরশ মণি হারেছ, প্রভু
আঁধার হতে একলা পথিক
ঘাটে বসে আছি আনমনা
আমি যে সব দিতে চাই

সুশীল মল্লিক
কেন চেয়ে আছ গো মা
কত রজনীর আশা আমি
আজি সাঁঝের বসুনায় গো
আজি আঁধি ভুবালো

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সংসার মরে মন কেড়ে নয়
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
কেন আমায় পাগল করে যায়
ওরা অকারণে চঞ্চল

অনিতি সেনগুপ্ত
এমন আর কতদিন চেয়ে রবে যে
হৃদয়ের কি লুকানো রয়েছে

হৈমন্তী মিত্র
আমি কেমন করিয়া জানাবো
ঝর-ঝর-ঝর-ঝর ঝরে

কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার সকল নিয়ে বসে আছি
শেষ নাহি যে, শেষ কথা
ওগো অন্তর্যামী
কবে আমি বাহির হলেম
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে

মীরিনি বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ-পানে চেয়ে দেখি
জানমনা, জানমনা
কৃষ্ণা ওহঠাকুরতা
পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোথা হতে শুনতে যেন পাই

রমা ওহঠাকুরতা
মা, আমি তোর কী করেছি
যারা কথা দিয়ে তোমার কথা রাখে
পবিত্রা রায়
জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি

৩৩½ আর-পি-এম
সুপ্রভা সেনগুপ্তা লিটরিও রেকর্ডে

পূর্বা দাস
অমল কমল সহজে জলের কোলে
আমি কিছুই না যে
কৃষ্ণা ওহ
আজে আমার পুলক লেগে
কোন্ গহন অরণ্যে
কৃষ্ণা চোধুরী
জনতে আমন্দলোকে
আমার মুকের মাঝে

পুরবী মুখোপাধ্যায়
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে
ধরা দিতেছি গো আমি
সুধীর সেন
আমি হেথায় থাকি শুধু
তুমি তো সেই মাঝেই চলে
প্রীতা সেন
আমারে যদি জাগালে আজি, নাথ
আমি তোমারই যাচিব করুণা

মানী ঠাকুর
অনেক দিয়েছ, নাথ
মুখখানি করো মলিন বিধুর
অর্ঘ্য সেন
তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না
কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
গীতা ঘটক
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
যে সুরে মোর সেই তো করে

(১) সাগর সেন (২) সুমিত্রা সেন
(১) আজি প্রথমি তোমারে
(২) আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
(১+২) দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে
(২) ছন্দা মনাইহে মনে মনে
(২) পীতল-ধন্তা মাদল রবে
(২) চলে ছলছল নদীধারা

৩৩½ আর-পি-এম
লিটরিও লং প্লে রেকর্ডে

হিমেন মুখোপাধ্যায়
আমার মাথা নত করে দাও হে
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা
সকল কর হে প্রভু, আজি সন্ধ্যা
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
তোমার হাতের রাখীখানি
পন্থা দিয়ে যবে গো মোর

যদি যৌবনমুকুলে যাই পথি
কিছু মনে করো এসেছিলেম
ওগো বধূ সুন্দরী
দূর রজনীর স্বপন মাঝে
যেদিন সকল মুকুল ঝরে যায়
হৃদয় হরিণী, এখনি কি হল তোমার

HMV হিজ মাস্টার্স ভয়েস

EMI

ওরও মন পাগোল,— নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। মায়ের খুব অসুখ— এই খবর পেয়েই কর্তৃপক্ষ ছেড়েছেন আমাকে। সহজেই ছেড়েছেন তার কারণ, একটা ব্যাপারে আমি মহাআতঙ্কে চেলা— জেলে থাকার সময়ে আমি কোন গোলমাল করতুম না— মানে আইনের বইকে কিছু করতুম না। নিয়মের মধ্যে যেটুকু না হত— নাচা দরখাস্ত-দাওয়া পাওয়ার জন্যে আন্দোলন করেছি— কিন্তু তাও কোন হাঙ্গামা বাধাই নি কখনও।

মা-র অসুখের খবরটা অবশ্য সত্যি নয়। বেরিয়ে এসে শুনলুম যে, ওখানে অনেকে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, জায়গাটা নাকি ভয়ঙ্কর জায়গা— এই সব নানারকম গুজব শুনে মা পাঁচজনকে ধরে-করে এই ব্যাপারটি পাকিয়েছেন। বরং মা আগের চেয়ে সুস্থই আছেন। সংসারের দিকে আমি তো কখনও তাকাইনি— তাকালে সে সম্বন্ধে কোন বিষয়-চেতনা থাকলে আর দেশের কাজ করা হত না। বাবা মারা গেছেন তখন আমার বয়স বেশী। ছোট ভাইটার বয়স মেরেকেটে সাত। কাকারা সবাই এক সংসারে ছিলুম, কাকারাও সেইভাবে দেখতেন, তাই লেখাপড়াটা হয়েছিল; বোনেদের বিয়েও তাঁরাই দিয়েছিলেন। কিন্তু ছোট ভাইটাকে মানুষ করতে পারেন নি কেউ। হয়ত আমি মন দিলে হত, আসলে অন্যমনস্ক— আর কেবলই কলেজ-অকলেজে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার একটা বদ-আদর্শ সামনে থাকায় ছেলেটা বিগড়ে গেল।

লেখাপড়া হবে না যখন বোঝা গেল তখন বিপ্লব বন্ধ হয়ে গেছে কানাইয়ের। তখন যদি কোন কারখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া যেত তো ভাল হতো— কিন্তু সে সময় এখনকার মতো এত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তেমন কারখানাই বা ছিল কটা? কাকা বিনয়দার ওয়ার্কশপে একটা ব্যবস্থা করে-ছিলেন, আঠারো টাকার মত মাইনে পেত গোড়াতেই— পরে বছর বছর বাড়ত— কিন্তু মা শুনেই কু গ্লাকাটি শুরু করলেন। ভোর ছটায় বেরোতে হবে— ঘরের ছেলে তাই খাইসিস হয়ে মারা যাবে।

সুতরাং কিছুই করা হল না। দিদি ঘরের খেয়ে কাকাদের পয়সায় সিঁড়ি-কিনারেই ফুঁকে বেড়াতে লাগলেন— পাড়ার ফুটবল ক্লাবের যাত্রাদলের চাঁই হয়ে উঠলেন।

এই দেখে গেছি আমি—শেষ জেলে ঢোকার আগে। দুশ্চিন্তা খুবই ছিল একটা। কাকারা ক্রমশ নিজেরাই জড়িয়ে পড়লেন সংসারে, তাছাড়া আমার জন্যেই তাঁদের ওপরও পুলিশের নেকনজর বড় কম ছিল না— বাস্তবিক রোজগার করার খুব অসুবিধা। সেক্ষেত্রে কত দিন আর তাঁরা দু-দুটো মানুষের খোরাক টানতে পারবেন— সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

কিন্তু এবার বাড়ি এসে দেখলুম কানাই কিছু কিছু রোজগার শুরু করেছে। চাকরি-বাকরি কিছু পায়নি অবশ্য— আর তখনকার দিনে নন-ম্যাট্রিককে কে-ই বা কি চাকরি দেবে— কিছু কিছু নাকি বলেছিল শুনে, করেছে। জমির দালালি, বাড়ি বিক্রির দালালি, সেই সঙ্গে লাইফ ইনসুরেন্সের একটা এজেন্সী নিয়েছে। সব জড়িয়ে মন্দ পায় না। মা বললেন, বাঁধা কিছু নেই, তবে কোন মাসে পঞ্চাশ কোন মাসে ষাট টাকা এনে কাকাদের হাতে ধরে দেয়। ইনসুরেন্স আপিস থেকে যে চেকগুলো পায় সেগুলোও বাড়ির ঠিকানায় আসে, কাকাদের হাতে পড়ে— মেজকাকা জোর করে ওর নামে ব্যাঙ্কে নাকি কি একটা হিসাব খুলে দিয়েছেন— বেশী নয় অবশ্য— তবু কিছু সড় জোর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ— তবু ঐটে তাঁরা সরাসরি সেই হিসাবে জমা করে দেন; সেই কিছু কিছু জমছেও। মেজকাকা বলেন— ওটা তো জন্ম-হতভাগা, যা পাবে সব উড়িয়ে দেবে, এইটুকু তবু থাক অসময়ের সম্বল।.....

এছাড়া, মাসে সংসারে যা দেয় তাছাড়াও নিজে কিছু-কিছু খরচ করে। মার কাপড়, নিজের জামা কাপড় এসবও নিজেই কেনে এখন। মাকে একখানা গরদের কাপড়ও কিনে দিয়েছে পুজোর জন্যে। এর মধ্যে নাকি গত পুজোয়—দুই কাকিমাকেও দুখানা শাড়ি দিয়েছে।.....

খুশীও হলুম, নিশ্চিন্তও হলুম। চোখেও দেখলুম—কাপড়জামার শ্রী ফিরেছে। শ্রীবিলাস যে ঠো-ঠো করে ঘরে বেড়ানো ঠিক আছে—বরং এখন তো আরও বেপরোয়া ঘরে বেড়ানোই তার কাজ, আর কিছু বলবার নেই। তামুর মেটা খারাপ লাগল শুনলুম, থিয়েটারের ক্লাব নিয়ে খুব মেতেছে, ওই নাকি হয়েছে প্রধান আড্ডা-ধারী সেখানকার। ফলে কখন বাড়ি ফেরে যায় তা মা ছাড়া কেউ জানে না, মাঝে মাঝে একেবারেই রাত্রে ফেরে না।

খারাপ লাগল, মাকে বললুমও, মা উল্টে আমাকেই অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন,

বিখ্যাত বইয়ের বাঙলা অনুবাদ

রুশ উপন্যাস
ম্যাকসিম গর্কীর
কিলম সামগিন ১৫·০০

ফরাসী উপন্যাস
রমাঁ রলাঁর
জাঁ-ক্রিসতফ (১-৫ খণ্ড)
বিমুগ্ধ আত্মা (১-৩ খণ্ড)

জার্মান উপন্যাস
হাইনৎস লাইপমানের
অগ্নিগর্ভ ৮·৫০
[নাৎসি জার্মানীতে গোপন কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে]

ইভ কুরী'র
মাদাম কুরী ১২·০০
[প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবনী ও বিজ্ঞান-সাধনার ইতিকথা]

মাও সে-তুঙের
নির্বাচিত রচনাবলী
মার্কসীয় দর্শন প্রসঙ্গে
ডঃ মুলক্ রাজ আনন্দের
অজুন ৬·৫০ : দুটি পাতা
একটি কুণ্ডি ৭·৫০ : এক রাজার কাহিনী ৮·৫০

গণিত প্রসঙ্গে
প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা
ডঃ রমাতোষ সরকার

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
INDE ভারত-দিনপঞ্জী
[বহু অপ্রকাশিত অজানা ঘটনার সম্ভার। রমাঁ রলাঁ]

মনীষী রমাঁ রলাঁর জীবনী
প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখিত
কালান্তরের পথিক
রমাঁ্যা রলাঁ

পাকের লুমাকিভস্কীর
পামীরের মেয়ে নিশো ১·৫০
[উপজাতি জীবন নিয়ে এমন চমৎকার উপন্যাস বাংলায় এই প্রথম]

In English
The Communist Manifesto of K. Marx & F. Engels (with Explanatory Notes by Prof. D. Ryazahoff) 15.00
Manx and Trade Unions by A. Lozorsky 15.00

ন্যাশনাল বুক ক্লাব ৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২

বলছেন, কাকে বলব বলো বাবা, তুমিই কি আমার কথা শুনেছ কোন কালে? কলে আপনাংলা যেমন বয় সেছনাংলা তেমন ধায়! তুমিও তো সেই ষোল বছর বয়স থেকে মাসের আর্ধেক দিন বাইরে কাটছ কোথায় থাকো কি করো কোথায় যাবে—কাউকে বলেছ কোন দিন?.....ওকে এখন শাসন করতে যাবো, ও যদি তোমার দৃষ্টান্ত দেয়—কী জবাব দোব? ও তো তবু, দুটো পয়লা ঘরে আনছে, তোমার স্বরূপ তো তাও কোন দিন হল না।

বুঝলুম মার মনের ব্যথাটা কোথায়। চুপ করে গেলাম। আর সত্যি কথাই তো—কী জবাব দেব? তখনকার দিনে—দেশ স্বাধীন করার জন্যে খাটছি, এটা কোনরকমের কোন কৈফিয়ৎ ছিল না। দেশ যে স্বাধীন হবে এই কথাই বিশ্বাস করত না কেউ।... ও কাজের চেয়ে পাঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি করা লোকে বুঝত ভাল।

আজকের দিনের বই

নতুন চীনের নতুন মানুষ

ডঃ বি. কে. বসু • আসিত সেন ৪.০০

মাওসে-তুঙ

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

সুপ্রকাশ রায় ৫.০০

জার্মান গেস্টাপোর হাতে নিপীড়িত, নির্যাতিত • নিহত জুলিয়াস ফুচিকের

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে

৫.০০

বিজন সেনের লেখা

জাতি সমস্যায় মার্কসবাদ ১০০

নিউ বুক সেন্টার

১৪, রবীন্দ্রনাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা—৯

যাই হোক, নিশ্চিন্ত হলুম অনেক-খানিই। কোন পিছুটান আর রইল না। মার ভাবনাটাই বড় ছিল, তিনিই তো একরকম সে দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন।

একটু থেমে বলাইদা আবার তার কাহিনীর সূত্রে ধরলেন : ভেবেছিলুম ছুটির কটা দিন মার কাছেই কাটাব। কিন্তু দিন সাতেক বাদে আর ভাল লাগল না। আত্মীয়স্বজনের অবিরাম যাওয়া-আসা, আর একটি ভাল জাগর মেয়ে বিয়ে করে ঘরবাসী হবার উপদেশ—ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল।

ফিরেই যেতুম—প্যারোল পীরিয়ড শেষ হবার আগেই—মনে পড়ে গেল বোনটির কথা। অনেকদিন যেখিনি তাকে। খুব একটা দূরেও নয় বহরমপুরের দিকে থাকে। ভগ্নী-পতিটিও মানুষ ভাল। আমারই বয়সী প্রায়। হয়ত বছর দুই-তিনের বড় হবে। খুব আমুদে লোক। একটু বেপরোয়া গোছেরও। অন্যায় নামের একটা আতঙ্ক ছিল, সরকারী কর্মচারীরা কেউ আত্মীয় বলে পরিচয় দিত না—কিন্তু বিপিনের এসব ভয়-ডর ছিল না। সে সরকারী চাকরি করত না এটা ঠিক —তবে খাস ইংরেজ কোম্পানীর আফিসে কাজ করত। তাতেও ভয় পেত না সে, বলত, 'ওরা বেনের জাত দাদা কাকে দিয়ে কতটুকু কাজ পাবে আর তাতে কী লাভ হবে বেশ বোঝে। আমি যা কাজ করি তা কোন দেশী ইংরেজ বাচ্চাকে দিয়েও হবে না। কাজেই—আমি যতক্ষণ না কোন সাহেব মারতে যাচ্ছি সাহেবরা আমাকে মারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বিপিনদের বরাট দৈতল বাড়ি, একেবারে গঙ্গার ওপর না হলেও কাছাকাছি। ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যায়। একে কুটুম বাড়ি তায় অত ঘরে—এখানকার মত অত আত্মীয়-সমাগম হবে না। স্থির করলুম যে কটা দিন থাকি ওদের বাড়িতেই কাটাব।

বিপিনদের সংসার ভাগ হয়েছে বটে, জাতিদের সঙ্গে—বাড়িতে তখনও পাঁচিল ওঠেনি। ফলে বিরাট ছাদ ভোগ করত ওরা। ছাদে বাগানও করেছিল মেজ টবে টবে। বিপিনেরই শখ, সে-ই খাটত, পয়সাও খরচ করত। সেই ফুলের বাগিচা মধ্যে ইজী-চেয়ার পেতে গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে থাকতুম—খুব ভাল লাগত। সাহিত্যেও চর্চা ছিল না। কোন কবি-প্রকৃতির লোক হলে ঝুড়ি-ঝুড়ি কবিতা লিখত ওখানে বসে, কিন্তু আমার সেই বাকে বলে চড়ুকে পিঠ সুড়-সুড় করে উঠল। আর আমাদেরও লাইনের মজাই ছিল এই—বেড়াল যেমন বহু দূর থেকেও ঢাকা দেওয়া মাছের গন্ধ পায় টেরিরিস্টরাও তেমনি টেরিরিস্টদের গন্ধ পেত। ওখানে যারা সব নতুন গজানো বিপ্লবী ছিল তারা গোপনে যাতায়াত করতে লাগল আবারও একটা ঝড়ঝঞ্ঝা জড়িয়ে পড়লুম।

তবে একটা কথা আমার মনে ছিল যে, আমি প্যারোলে আছি। সুতরাং উপদেশ নির্দেশ যা দেবার দিলেও নিজে কিছু করতুম না। ফলে সন্ধ্যাটা একেবারেই নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে কাটত—গঙ্গার শোভা দেখে আর ফুলের গন্ধ উপভোগ করে। সারাদিন বই পড়তুম, তখন আর বইও ভাল লাগত না তাছাড়া ওদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো বসেনি তখনও, পড়ার সুবিধেও ছিল না। বিপিনের আফিস থেকে ফিরতে দেরি হত—আটটায় বাড়ি ফিরে স্নান করে চুরুট ধরিয়ে ছাদে এসে জমতে জমতে দশটা বেজে যেত।

তাই বলে আড্ডায় সেও কম যেত না। খাওয়ার আগে ও খাওয়ার পরে বহুক্ষণ আড্ডা চলত আমাদের। শুতে শুতে রাত বারোটা বেজে যেত। এই আড্ডার মধ্যেই আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁ হে বিপিন, এই বড় হলদে বাড়িটা কাদের, ঐ যে? দিন-রাতই দেখি দরজা-জানালা বন্ধ থাকে? কেউ থাকে না বুঝি?

বিপিন যেন একটু অবাকই হল, ওটা জানেন না? ওটা তো পোরনো কুঠী বাড়ি। পর্তুগীজদের আমলে তৈরী হয়েছিল এই পর্যন্ত শুনি—সে ঠিক কতদিন আগে তা কেউ জানে না।.....জায়গায় জায়গায় পলস্তার উঠে গেছে, তাতেই দেখা যায়, আগেকার সেই ছোট ছোট ইঁটের গাঁথুনী।

তা এখন ওর মালিক কে?

ঘাড় নাড়ল বিপিন, তাও জানি না। পর্তুগীজদের হাত থেকে নাকি ফরাসীদের হাতে আসে। সেখান থেকে ইংরেজদের। তবে এ সবই শোনা কথা। আমরা তো দেখছি যতদিন জানি হয়েছে—বন্ধই পড়ে আছে। অনেক বছর আগে একবার মেরামত আর রং হয়েছিল। সে তখন আমি এতটুকু ছেলে—ইস্কুলে পড়ি। সেও যে কে করিয়ে-ছিল মনে মালিক কে—তা জানি না।

কাজী নজরুল ইসলামের

শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ---- ১৪.০০

২। গুল বাগিচা ---- ৩.৫০. ৩। কাব্য আমপারা—৪.০০

৪। পুবের হাওয়া ---- ২.০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি—২.০০

মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

সকালে ঘরের পরও কেউ বাস করেনি, এমনিই পড়ে আছে স্রেফ হয়ে।

'সে কি!' আমি অবাক হয়ে বলি 'অতবড় বাড়িটা বেকার হয়ে পড়ে পড়ে। কলকাতার ওপর বাড়ি, এখন থেকে তো মনে হয়—বাড়িটার নিজস্ব একটা ঘটও আছে কলকাতার ওপর—কেউ ভাড়াও নেয় না? ভাল গুদোম তো হয়!'

বিপিনও সায় দিল তা হয়। তবে প্রথমত কে ওর মালিক তাই কেউ জানে না। তা অত বড় বাড়ি নিয়ে ব্যবসা করার মতো কারবারই বা এখানে কি আছে? বেশ হয়ে এখন যেদের ধারেই গুদোম চট সকলে। বড় বেসব বিলিতী কোম্পানী তাদের সকলকারই নিজস্ব বড় গুদোম আছে, কলকাতার মাঝেই চায় তারা। তারা এতদূর আসবে কেন? এক নিতে পারে কোন মাড়োয়ারী মহাজন—সস্তা পেলে—তা তারা ওর হিসীমানায় কেউ ঘেঁসবে না।

'কেন?'

'ওটা যে ভূতুড়ে বাড়ি।'

'ভূতুড়ে বাড়ি! সে আবার কি? আমি একটা ভালরকম মজার গন্ধ পেয়ে সোজা হয়ে বসলুম।

'লোকে বলে ওতে ভূত আছে। কেউ বলে ভূত, কেউ বলে ব্রহ্মদৈত্য, কেউ বা বলে পাগল—সেই ভয়ে সন্ধ্যের পর কেউ ওর একশ' হাতের মধ্যেও যায় না।'

'ও লোকে বলে!' বেশ একটু হতাশই হই, 'ওরকম পোড়ো বাড়ি পড়ে থাকলেই লোকে হানাবাড়ি ভাবে।'

'না দাদা,' একটু নড়েচড়ে বসে বলে বিপিন। তার চিরকৌতুকময় বেপরোয়া ভাব যেন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে আসে, 'কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে।...আমি জানি।'

তুমি জানো! সে আবার কি? তুমি নিজে দেখেছ?'

'দেখেছি।' গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় বিপিন।

'কী রকম কী রকম?' খাটের সোজা হয়ে বসি, 'কী দেখছ?'

'আমার বাবার মুখেই প্রথম শুনি আমি ছেলেবেলায় যে, ঐ বাড়িটায় ভূত আছে। তিনি থিওজফিস্ট ছিলেন, তিনি বলতেন ইভল স্পিরিট কেন নষ্ট আত্মা। তিনি নাকি ঐ বাড়ি থেকে বিশাল লম্বা কালো হাত বেরিয়ে এসে পাশের ঐ বড় বাঁঠাল গাছটার ডাল ভাঙতে দেখেছেন। এক-এক সময় নাকি অন্ধকারের মধ্যেই আরো কালো লম্বা মতো একটা ছিপছিপে দেখেছেন, মানুষের ছিপছিপে মতো দেখতে তিন-চারটে সমান উঁচু হয়ে উঠছে, তবে মানুষের মতো হাত-পা-মাথা নয়তো চোখ—এদিক-ওদিক ঘুরছে...এসবই তাঁর নিজের চোখে দেখা।

আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না এমন এই হাসি তো জানি—হাহা করে হেসে উঠলুম। বিপিন হাতে একটু কাজ হল। তেমনি গম্ভীর হয়েই বসে তাকে কোনো মানুষ, তবে সমস্তটা মানুষের মতো ওপর-নীচে হতে পারেন না। এ-বিষয়ে বাবা যতোই পড়াশুনো করুন না কেন। বহু-বার তাঁরা মিডিয়ামের মধ্যে আত্মা নামিয়েও তবু এমন প্রমাণ নিয়ে যেতে পারেন নি যা ঐ মতে বাঁধা গতা কোনো জানা সত্যের নয়। এবারে এখনও একটা আসরেই এর ইভল স্পিরিট টাকে পড়ে খুব বিপদে পড়েছিল শুনেছি।

আমি আর কথা বাড়ালুম না। বললুম যে ওর কিছুক্ষণের আমার মোগাড়। চটপট কথা চুকিয়ে নেবার জন্যে বললুম 'তা তুমি কি ভাবছ কি বলছ না তো?'

আমিও দেখেছি, যেন গোল লুটো আলোর মতো তাই ঐ ঘাটে ওপর ঘুরে

বাড়াচ্ছে, কালো লম্বা একটা হাতও কোথায় পাশের বড় গাছটা থেকে কি টপকে নিল—

'এ কি চাঁদের আলোতেও দেখছ?

'তাই কি দেখা যায়? তবে আজ শুক্লপক্ষের একাদশীর দিনও দেখিনি।'

'তবে কালো লম্বা হাত দেখলে কি করে অন্ধকারে?'

'অন্ধকার বলে তো ঠিক একেবারে অন্ধকার নয়। ঘোলা গলার ওপর আকাশে এতগুলো তারা—তারও একটা আলো আছে। তাছাড়া ওপারে বড় বড় মিল ডাঙ্গের আলো আছে—ইলেকট্রিক আলোর মালা একেবারে গঙ্গার ওপর এতগুলো জাহাজ-নৌকো রাতের আলো—সব জড়িয়ে বেশ একটা ফিকসা আলো হয় বৈকি। কিন্তু এধার থেকে দেখলে ওপারের আলোর ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা সামান্য কিছু নড়লেও দেখা যায়।'

ও-বাড়ির ভূত যেন আমার মাথাতেই ঢেপে বসল। বললুম, 'চলো বিপিন, একটা হাত কাটিয়ে আসি ওখানে।'

'তুমি কথনে দাদা,' বিপিন যেন শিউরে উঠল একেবারে 'ওর মধ্যে আমি নেই। ঘরে আমার বাচ্চা ছেলে, অল্পবয়সী স্ত্রী—আমি ওসব রিস্ক নিতে পারব না। মজা তো হবের কথা—মাথাটাই যদি খারাপ হয়ে যায়, এসের দেখবে কে? ওসব ইভল স্পিরিট—ওরা সব পারে'

তবু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলুম অনেকবার কিন্তু বিপিন অটল। আর সাহস কথা—সে ওসব বাহাদুরীর মধ্যে নেই।

আমি কিন্তু এইসব বাজানুবাদের মধ্যেই আমার সংকল্প স্থির করে ফেলেছি—বিপিন যাক বা না যাক—আমি যাবই। সে-কথা অবশ্য বিপিনের কাছে পাড়লুম না, শুনেই সে হৈ-হৈ করে উঠবে চেঁচামেচি করে তার বৌকে জানাবে, আমার কাকে খবর দেওয়াও আশ্চর্য নয়। তাই মনসা চিন্তায়ং কর্ম, বলসা মা প্রকাশয়েৎ এই নীতি ধরে চোর হয়ে রইলুম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আয়োজন শুরু করে দিলুম। তখনকার দিনে টর্চ জিনিসটা এখনকার মত এত সুলভ ছিল না, এক বাড়িতে চোদ্দটা কেন একটাও মিলত না। আমার পকেটে টাকা বস্তুটা আরও দুর্লভ। তবু পরের দিন বিপিন অফিসে রওনা হবার পরই বেরিয়ে আগে একটা ছোট পকেট-টর্চ কিনে নিলুম। এগুলো বেশীদিন যায় না—কিন্তু আমারই বা এত সময়ই কি একটা রাত গেলেই যথেষ্ট। যাকে অধিকাংশ সময়ই রাতজাগিয়ে হয়ে থাকতে হয়—তার এসবের কোন প্রয়োজনই তো নেই।

টর্চটা পকেটে ফেলে আস্তে আস্তে কুণ্ডী-বাড়ির দিকে গেলুম। রাস্তা থেকে যতটা যা দেখা যায় ঘুরেফিরে দেখলুম। এখন পরিষ্কার জনহীন হয়ে এসেছে। মজুরেরা যে-যার কাজে বেরিয়ে গেছে—মজুরের গুষ্ঠিও স্নান করতে জলার সময় হয়নি। সুতরাং ভাল করে ঘুরে দেখতে কোন অসুবিধে হল না। এক-আধজনের সঙ্গে যে দেখা হল না তা নয়—তবে আমি নিতান্তই উদ্দেশ্যহীনভাবে ভাব করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—চরম বেকার ভেবেই তারা উপেক্ষা করে গেল—কৌতূহলী হল না।

বাড়ল যেটা দেউড়ি, সেটা আধভাঙা হয়ে পড়ে আছে, কাঠের ফটক একটার কোন পাত্তা নেই চারিদিকে আগাছার জঙ্গল। কিন্তু সেখান থেকেই সদরের বড় দরজাটা দেখা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড একটা সেকেলে তালা ঝুলছে। তালাটার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, বহু বছর সেটা খোলা হয়নি, এবং মনে পড়ে তার এমনই অবস্থা হয়েছে যে সহজে বোধহয় খোলা যাবেও না।

ঘুরেফিরে চারদিক দিয়েই দেখলুম। বড় বড় জানলা সব, কিন্তু সবকটাই বন্ধ হয়ে আছে, সম্ভবত দীর্ঘকালই। চোকাঠ আর পাল্লায় ঘুণে' নানা রকমের গাঢ় গজিয়ে গেছে, তার মধ্যে স্যাঁত-স্যাঁতেরও অভাব নেই।

অর্থাৎ দীর্ঘকাল এখানে কোন মানুষের পদার্পণ ঘটেনি।

তাই বলে এত সহজে হাল ছাড়বার মানুষও আমরা নই। আমি স্থির জানি এই শূন্য বন্ধ বাড়িটায় মানুষের যাওয়া-আসা আছে, আর তার জন্যে একটা পথও আছে কোথাও—।

দোতলাটার দিক বেটা, পশ্চিমের ওপরে ও এপাশে—সেদিক ছেড়ে আমি একেবারে পিছনের পেছনে দিকটা ধরলুম। এবার আমার ধৈর্যের পুরস্কারও মিলল। বাস আর আগাছার জঙ্গল সেদিকেও, তবু ওর মধ্যেই মনে হল একটা যেন পায়ে-চলা পথের মতো সংকীর্ণ জায়গা একটু পরিষ্কার—সেখানের ঘাসগুলোও একটু অবদমিত। সেই বিশ্বাসেই সেই পথ ধরে গিয়ে যে বিরাট জানলাটার সামনে পড়লুম, তার একটা গরাদে ধরে টানতেই সেটা নঃশব্দে খুলে এল, তার পাশে আরও একটা, মানে দিব্যি একটা লোক গলে যাবার মতো ফাঁক পাওয়া গেল। এবার ভাল করে চেয়ে দেখলুম এই দুটো পাল্লার ধরেও কম। একটাতে একটু সমঝানো ধাক্কা দিতেই খুলে গেল—কোন রকম শব্দ না করে। এবার স্পষ্টই চোখে পড়ল পাল্লার কব্জা তিনটেতে চর্বি বা জেলীসিন জাতীয় কিছু মাখানো।

বোঝা গেল এইটিই হলো ভূতের যাওয়া-আসার পথ।

আমাদের কাছে এর কোনটাই নতুন নয়। বিপ্লবীদের কাজ গোপন রাখার জন্যে এমনি এক-আধটা পুরনো পোড়ো বাড়িতে ভূতের আস্তানা তৈরী করতে হয়। এইসব বাড়িতেই এমনি এক-আধটা গরাদে কেটে আবার সেটা বেমালুম বসিয়ে রাখতে হয়—পাল্লাও ঠিক এইভাবে খোলা থাকে, অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

এপর্যন্ত সবটাই মিলেছে। এও কি তাহলে কোন গুপ্ত বিপ্লবীদের আস্তানায় এসে পড়লুম?—আমি জানি না এমন কেন মনে?...সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন বলল, তা সম্ভব নয়। এ-ধরনের কোন আড্ডা কোথাও থাকলে সে-খবর পেতুমই, কখনও না কখনও। তাছাড়া কেমন যেন বেবাকই মনে হতে লাগল এ কোন পাপচক্রের আস্তানাতেই এসে পড়েছি।

তখনকার মতো যা দেখবার তা দেখা হয়ে গেছে। বেশীক্ষণ থাকাও নিরাপদ নয়। অন্য পক্ষ খবর পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি ফিরে এসে স্নানাহার সেরে নিয়ে—যা কখনও করি না—বেশ একচোট ঘুমিয়ে নিলুম।

সন্ধ্যাবেলা চা-জলখাবারের পর বোল্টাকে একটা ধাপ্পাই দিলুম। বললুম, মা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন—বুধবার একটু আসিস—ভুলেই বলেছিলুম। এই এখন মনে পড়ল। তুই বিপিনকে বলে দিস—আমি আজ আর হয়ত ফিরব না। ফিরলেও মার কাছ থেকে খেয়ে আসব। আমার জন্যে বসে থাকতে হবে না।'

এর মধ্যে অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না, সহজেই ছেড়ে দিল সে। আমার অসুবিধের মধ্যে এখন অনেকটা সময় পথে কাটাতে হবে আমাকে। অবশ্য সে-উপায়ও একটা করে নিলুম, চুপি চুপি একটা সিনেমায় ঢুকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিলুম। তারপর বেরিয়ে একটা মোটর গাড়ি করে এসে কুণ্ডীবাড়ির দু-দুই গজ দূরে নেমে পড়লুম। বিকেলে জলখাবারটা একটু বেশী করেই খেয়ে নিয়েছিলুম সিনেমা থেকে বেরিয়ে এক কাপ

শ্রীজ্যোতিনাথ মিত্রের
বিদেহিনী অনবগুণ্ঠিতা
মৃত্যুর পরই কি সব শেষ হয়ে যায়? এই প্রশ্ন আদি এবং অনন্তকাল ধরে মানুষের মনকে আলোড়িত করে রেখেছে। কিন্তু সত্যিই কি এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা যুক্তি নেই? হ্যাঁ, শ্রীজ্যোতিনবাবুর এই পরলোক এবং আত্মার বিভিন্ন অবস্থা ও তথ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-সম্বলিত এক অভূতপূর্ব সমাধান পাওয়া যাবে।
দাম : —বারো টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান :— নিউ শরৎ প্রকাশন, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

চা-ও ওদের কিনে খেতে অসুবিধে ছিল না।

ভূতকে দেখতে পাওয়া যায় যদি একটার পর একটা সকলেই নাকি তাই দেখেছে। সুতরাং তখনও হাতে ঘণ্টাখানেক সময়। আমি ধীরেসুস্থে পাহারাওলা ও নিশাচর পথিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এক সময় সেই জানলাটার কাছে এলুম এবং পকেটের লিক সারিয়ে একটা পাতা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার ঠিক ঠিক সব লাগিয়ে রেখে দিলুম। এইবার টর্চ ফেলে দেখলুম আমার অনুমান ঠিক, পরিত্যক্ত ঘরের জমাট-বাঁধা ধুলোয় অসংখ্য পায়ের ছাপ। কেউস ভূতের ছাপ—আসা-যাওয়ার সূচিকেতেই। তবে একই লোকের না একাধিক—সেটা ঠিক বোঝা গেল নাই একটা ছাপের ওপর আর একটা ছাপ পড়েছে—ছাপ পাওয়া শক্ত।

আমার পায়েও কেউস জুতো ছিল, তারও ওপরে আমি একজোড়া পলমের মোজা পরে নিয়েছিলুম—যাতে সামান্য কোন শব্দও না পাওয়া যায়। তাছাড়া কেউস জুতোও অনেক সময় একটা হিউকেল শব্দ ছাড়ে, সেন খানিকটা দূর থেকেও পাওয়া যায়—এতে সে-সম্ভাবনাও থাকল না।

বিরাট বাড়ি। সেকেলে ইউরোপীয়ান বণিক-জমিদারদের প্রাসাদ এতে যে কত গলিপথ, কত গোপন চোরাকুঠরী এবং গুপ্ত প্রণালীর বা গহ্বর আছে, তার ইয়ত্তা নেই। ভেতরে কতকগুলো দোর খোলাই আছে—সম্ভবত ভূতেরাই খুলে রেখেছে। যেখানে এগিয়ে যাবার বাধা নেই। দু'-একটা যা খুলতে হল—সেগুলো ঠিক যেমন ছিল—আগে থাকতে দেখে নিয়ে তেমনি বন্ধ রাখলুম।

ঘরে ঘরে দেখছি, এমন সময় খুট করে একটা শব্দ হল। খুবই সামান্য শব্দ তবু আমার কান এড়াল না আর সেটা কোন দিক দিয়ে আসছে, তাও বুঝতে পারলুম। ঐ জানলার দিক থেকেই। আমার পায়ে ছিল একটা নরম রবারের জুতো, আর কালো প্যান্ট—অন্ধকারে মিশিয়ে থাকার কোন অসুবিধে নেই। একটা সিঁড়ির নীচে খানিকটা জায়গা ছিল—সেইখানে ঘাপটি মেরে বসে রইলুম।

সে এল—সম্ভবত সে রোজই আসে। কারণ কোনরকম আলোর আয়োজন নেই দেখলুম তার সঙ্গে। প্রায় নিঃশব্দে জানলার কপাটটা খুলে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারেই অভ্যস্ত হাতে বন্ধ করে দিল আবার, তারপর নিভুলভাবে এগিয়ে চলল বাইরের দিকে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে।

আমিও তখন একটু এগিয়ে যাবার অবকাশ দিয়ে তার পিছু নিলুম। তখনকার আমারও চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে খানিকটা। তাছাড়া সব ঘরেরই প্রায় ওপর দিকে কাটা করে আওয়াজী ছিল—তাতে সামান্য একটু নক্ষত্রের আলোরও আভাস এসে পড়েছে, কালো-পানা একটা জিনিস এগিয়ে যাচ্ছে—সেই অন্ধকারেও সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

শ্রীরূপগোস্বামী-কৃত
উজ্জ্বল নীলমণি
ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৫-০০

বঙ্কিম-অভিধান
অশোক কুণ্ডু ১৫-০০

শক্তিদর্শন ও শাক্তকবি
ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১০-০০

কাব্যমঞ্জুষা (সমগ্র)
মোহিতলাল মজুমদার ১৫-০০

লোকসাহিত্যে ঈশপ
ডঃ সুধীর করণ ৮-০০

বঙ্গের রত্নমালা
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১০-০০

মেঘদূত
মল্লিনাথ রচিত ও পূর্ণ চক্রবর্তী চিহ্নিত ৬-০০

চন্ডীদাস-বিদ্যাপতি
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৬-৫০

HISTORY OF VERNACULAR EDUCATION IN BENGAL
Dr. N. L. Basak 4.00

সংস্কৃতির ধর্ম
দক্ষিণারঞ্জন বসু ১০-০০

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ১০-০০

বিদ্যাপতি-সমীক্ষা
ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী ১০-০০

অপরূপা অজন্তা
নারায়ণ সান্যাল ১৫-০০

শ্রীরূপ ও পদাবলী-সাহিত্য
ডঃ শুকদেব সিংহ ১৫-০০

ময়মনসিংহ-গীতিকা (সম্পূর্ণ)
সম্পাদক—সুখময় মুখোপাধ্যায় ২৫.

ভারতী বুক স্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। ফোন : ৩৪-৫১৭৮

অবশ্য অত কষ্টরও দরকার হল না। যে এসেছিল সে বড় হলঘরটা পেরিয়ে গিয়ে পশ্চাদ্ দিকের একটা দরজা খুলে বাইরে বেরোল—কিন্তু দরজাটা বন্ধ করল না, প্রয়োজনীয় বলেই বোধহয়। বাইরের আলোটা তাই ফ্রেমে-বাঁধা অঙ্কনার মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠল জমাট-বাঁধা আঁধারে। তখন আর লক্ষ্যভেদ অনুসরণ করায় বাধা কি?

দরজার কাছে এসে একটা কপাটের আড়ালে জায়গা বেছে নিলুম, সেখান থেকে পরো ব্যাপারটাই দেখা যায়। যে-লোকটি এসেছিল সে বাইরে থেকেই এই পোশাকে এসেছিল কিনা বুঝতে পারলুম না—মোদ্দা এখন দেখলুম আপাদলম্বিত একটা কালো 'ম্যাকিনটোশ' বা ওভারল জাতীয় পোশাক তার পরনে। মুখও বাঁদুরে টুপির মতো একটা জিনিস দিয়ে ঢাকা। শুধু চোখ দুটোই বেরিয়ে আছে তা থেকে।

কিন্তু লোকটি বাইরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

ঘাটের ওপর, বাড়ির দরজা ঘেঁষে একটা মাঝারি গোছের বাঁশের লাঠি শোয়ানো ছিল। সেটাও দেখলুম কালো রঙ লাগানো—সম্ভবত আলকাতরা—সেইটে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে দেওয়াল ঘেঁষে গিয়ে জানলার খুবই কাছ দিয়ে গেল একবার। লাঠিটা তুলে নিয়ে কাঁঠালের দিকে নাড়তে লাগল। এইবার বুঝলুম ভূতের কালো লম্বা হাত বড়ানোর ইতিহাসটা।

এই সময় কিন্তু একটা ঘোর বিপদে পড়ে গিয়েছিলুম। ওর কী কার্যকলাপের ফল, তা তো জানিনে, লাঠিটা শুইয়ে রেখেই সে বেরিয়ে আবার ঘরে ঢুকে এল। ভাগ্যিস আমি একেবারে সামনে ছিলুম না; আর আমারও ঘাড় রঙের পোশাক ছিল, এই লাইনে কাজ করার ফলে নিত্য ধরা পড়ার আশঙ্কা—বিনাশব্দে নিশ্বাস নেওয়া-ফেলা কৌশলও জানা—তাই কোনমতে বেঁচে গেলুম।

লোকটি এসে সেই অন্ধকারেই একটা ঝুলঝুলী থেকে কি সংগ্রহ করল। তারপর ফস করে দেশলাই জ্বালল। ততক্ষণে আমি একটা ঘরের আড়ালে চলে গেছি, তাই রক্ষা। দেশলাই জ্বেলে সে আসলে একটা লণ্ঠন ধরল—রেলের গার্ডরা যেমন লণ্ঠন ব্যবহার করে, তিনদিক চাপা—তেমনি। আলোটা জ্বেলে তার ওপর আবার একটা ঘেরাটোপ পরিয়ে দিল। তারপর সেটা মাথার ওপর তুলে দরজার ঘাটে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এতে দুটো উদ্দেশ্য সফল হবে। প্রথমত দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখবে আশ-পাশের বাড়িঘর থেকে—কারণ ঘেরাটোপে আলো সবটাই ঢাকা শুধু দুটো ফুটো ছাড়া—দ্বিতীয় দুরন্ত ওর দলের লোক ওর উপস্থিতির সঙ্কেত বুঝবে।

বুঝলও তাই। খানিকটা অমনি ঘোরার পর আলোটা নিভিয়ে আবার ঘরে রেখে গিয়ে ঘাটে দাঁড়াতেই—অতি মৃদু একটা ছপ-ছপ শব্দ উঠল ঘাটে; এতই মৃদু যে অন্য যে-কোন লোক হলে মাছের ঘাই' দেওয়া ভাবত। সৌভাগ্য আমি এই ধরনের শব্দ আশা করছি বলেই ভুল হল না।—একটু পরেই দেখলুম একটা ছইওয়ালা সাধারণ নৌকো ঘাটে এসে ভিড়েছে।

কোন পক্ষেই কোন কথা হল না। নৌকোর মাঝি আর দাঁড়ি দুজনে মিলে ছইয়ের নিচে থেকে তিনটে ভারী ভারী বাক্স বার করে এনে ঘাটের শেষ পৈঠেটায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। এ-লোকটাও সেই ঢিলে পোশাকের মধ্যে হাত পুরে বিনাবাক্যে কী একটা বার করে একজনের হাতে দিল—সম্ভবত টাকাই। তারপর নৌকোটা তেমনিই প্রায় নিঃশব্দে খোলার চলে গেল, যেন মনে হল অন্ধকার থেকে অন্ধকার দিয়ে গড়া কী একটা জিনিস এসে ভিড়েছিল, আবার অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

এবার এই লোকটি বাক্স তিনটে একে একে তুলে এনে সবচেয়ে ওপরের ধাপটায় রাখল। বাক্সগুলো খুবই ভারী নিশ্চয়, কারণ একেবারে বেঁকে পড়ে তুলতে হল এক-একটা বাক্স।

ব্যাপারটা আর ঝাপসা রইল না একটুও। সোজাসুজি চোরাই চালান বা 'স্মাগলিং' যাকে বলে। সরকারের কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে এইখানে এনে পৌঁছে দেয় মালিকরা, নগদ টাকা নিয়ে চলে যায়। এই লোকটি বা এর দলবল—মালগুলো ব্যাপারী-দের কাছে গোপনে বেচে দেয় মোটা লাভে। এদেরও ঠিক আমাদের কারণই ভূতের ভয় জীইয়ে রাখার প্রয়োজন—সেইজন্যেই খুঁজে খুঁজে এই কিনাড়ার হানা-বাড়িটা বার করেছে। আর এখনও কিম্বদন্তীর ভূতটাকে বাঁচিয়ে রাখছে। বুঝলি না?

যাই হোক বাক্সগুলো ওপরের ধাপে রেখে আবার ঘরে ঢুকল সে। এবারই আমি তৈরীই ছিলাম। জানি ঘরে তো ঢুকতেই হবে ওকে—আমি ওপাশের একটা ছোট খুপরী মতো ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম আগেই। এ-লোকটা আবার এক-এক করে বাক্স তিনটে ভেতরে এনে রাখল। তারপর ঘাটের দিকের দরজাটা ভাল করে এঁটে বন্ধ করে দিয়ে আর একবার দেশলাই জ্বালল, আবারও লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিল।

চারদিক বন্ধ এদিকে কোন কালের জানলাও নেই, আলোর মধ্যে এই তিনদিক চাপা আঁধারে লণ্ঠনের মত আলোটা—ও বাইরে থেকে দেখা যাবে না। এবার লোকটি ধীরেসুস্থে মালের বাবস্থায় মন দিল।

আগেই বলেছি—অসংখ্য গুদোম ঘরের মতো কুঠুরী আছে বাড়িটায়। এ-ধরনের কুঠিবাড়িতে এটা অপরিহার্য। ঘরগুলো সে-আমলে মাল রাখার কাজেও ব্যবহৃত হত—গারদখানা হিসাবেও। যেসব চাষী বা খাতক টাকা দাদন নিয়ে সময়ে ফসল দিত না বা কম দিত, তাদের পুরে রাখা হত। তবে সে-সব ঘরে দু-একটা ফুটো থাকত—মালের পরিমাণে নিশ্ছিদ্র রাখা হত ইঁদুরের ভয়ে।

এই বড় দালানটার একদিকে এমনি কতকগুলো গুদোমঘর ছিল। লোকটি এগিয়ে গিয়ে তারই একটা ঘরের ভারী পুরনো তালাটা খুলল। এই ঘরগুলোর—মাল বোঝাই করে রাখার সুবিধের জন্যেই বোধহয়—কপাট খোলে বাইরের দিকে। এর কপাটটা আমার দিকেই খুলল, আড়াল আর আঁধার রচনা করে। অর্থাৎ তার ছায়ায় এগিয়ে যাওয়ার বেশ সুবিধে। গেলুমও এগিয়ে। কপাটের আড়ালে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। একে ঐ লণ্ঠনের আলো অত্যন্ত ক্ষীণ—তায় সেটা ঘরের মধ্যে রেখেছে—সুতরাং আমাকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা ছিল না।

সে-লোকটা এবার সেই বাক্সগুলো একে একে গুদোমে এনে ঢোকাতে লাগল। উঁকি মেরে দেখলুম ভেতরে এমনি আরও গুটিকতক বাক্স ও চটে মোড়া প্যাকেট আছে। বাক্সগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে সে সেগুলো এক পাশে টাল দিয়ে সাজিয়ে রাখল। তার আগে পুরনো স্টক থেকে একটা বাক্স সরিয়ে নিয়ে এল দরজার কাছে—বোধহয়, সেইটে আজ রাত্রে পাচার করা হবে।

হঠাৎ কী একটা দুর্বোধ্য ঘটল—কী যে দুর্বোধ্য তা আজও বলতে পারি না—কেন এল মাথায়—আমি নিঃশব্দে ঠেলে কপাটটা বন্ধ করে দিলুম এবং ভেতরের ভীতিসন্ত্রস্ত লোকটির ঘটনাটা কি ঘটছে ভাল করে বোঝবার আগেই শেকলটা টেনে দিলুম। তারপর তালাটা বন্ধ করা তো এক সেকেণ্ডের কাজ। ভারী, মোটা পুরনো লোহার গুলকাটা কপাট—

এ বছরের শ্রেষ্ঠ পত্রোপন্যাস
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে ৬.০০
সত্যেন সেন সম্পাদিত রায় জলধর হত পত্রোপ হলে জ্যোতি ভট্টাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পত্রে ১৪ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী এতে বক্তব্য রেখেছেন।
শেখর বসু ভট্টাচার্যের
সে দিনের কাহিনী ও ঐতিহ্য ৪.০০
প্রবীর কর্মকারের
মার্কসবাদ ও মানবীয় মূল্যবোধ ৩.০০
প্রাপ্তিস্থান জাগরণী, ১৪বি, নয়ন রোড, কলিকাতা-২৮

লোহার মতই মজবুত ও নিরন্ধ্র। সে দরজা ভেঙে বের হবে এমন বলবান মানুষ এ-যুগে নেই।

সে-লোকটি ততক্ষণে তার বিপদের পরিমাণ বুঝতে পেরেছে। দুম দুম করে দরজায় কিল মারছে আর চেঁচাচ্ছে প্রাণ-পণে—কিন্তু দরজার ঠিক এ-পারেই আমি, তাই মনে হচ্ছে বহুদূরের আওয়াজ—এ-শব্দ বাইরে থেকে কেউ শুনতে পাবে সে-সম্ভাবনা নেই। তবু—আমি একটা ভৌতিক অট্টহাসি হাসলাম হা-হা করে আরও ভয় দেখাতে — আনুমানিক অবশ্য, আসল ভূতের হাসি আর কে শুনেছে? যতটা সম্ভব পৈশাচিক করারই চেষ্টা করলুম সে হাসি। সেই বিরাট শূন্য দালানটায় সে-হাসির শব্দ অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমারই হৃৎস্পন্দনের কারণ হল বলতে গেলে। ও-লোকটার বাপাদাপিও ভয়েই বোধ করি—বন্ধ হয়ে গেল তখনকার মতো।

অতঃপর আমি নির্ভয়ে টর্চ জ্বেলে দ্রুত বেরিয়ে এলুম সেখান থেকে। ঐ বুক-চাপা আর হাওয়ায় বেশ হাঁপিয়ে উঠেছি এই ঘণ্টাখানেকেই, খোলা হাওয়ায় না আসতে পারলে আর বাঁচব না।

কী মনে করেছিলুম তা আজও জানি না ভাই, বিশ্বাস কর। একবার ভাবছিলুম সকালবেলা বিপিনকে দিয়ে পুলিশে খবর দেব বয়ান সমেত একটা স্মাগলারকে ধরিয়ে দিতে পারলে কিছুটা পুলিশের গুড-বুকে থাকবে—আবার ভাবছিলুম যে, ও-পাড়ায় যে ক্লাবে বিপ্লবীর দলটি গড়ে উঠছে—তাদের খবর দিই, তারা যদি লোকটার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারে তো করুক পার্টির জন্যে, অথবা কিছু মাল চোরের উপর বাটপাড়ি করে নিয়ে তারাই থানায় খবর দেবে। এদেরও কাজ হবে লোকটাও সাজা পাবে।

মোদ্দা কথা তখনও মনস্থির করতে পারিনি। আর করা হলও না। হন হন করে হেঁটে বিপিনের বাড়ির কাছ বরাবর এসেছি, হঠাৎ যেন কোন অন্তরীক্ষ থেকে একদল পুলিশ বেরিয়ে আমাকে ঘিরে ধরল, আর চোখের পলকটাও ভাল করে ফেলার আগে হাতে হাত-কড়া পড়ে গেল। তাদের সঙ্গে ছটা অস্ত্র রিভলবার বন্দুক মিলিয়ে, নিরস্ত্র একটা লোককে ধরার জন্যে ব্রিটিশ শক্তির কী বিপুল আয়োজন।

চার্জ? চার্জ অনেক। প্যারেড ভঙ্গ করেছি দু'বছরে। বাড়িতেই থাকার কথা কদিন থাকিনি, পাড়ার থানায় জানিয়ে এলে অপরাধ হত না—প্রয়োজন হবে না বলেই জানাইনি, ঠিক সময়ে ফিরে যাব, কে আর জানতে পারবে? দ্বিতীয়ত এখানে এক বিপ্লবী দল গঠন করে মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধ। সে দলের বাকী সকলে ধরা পড়েছে, তাদেরই কে চুকলি খেয়ে আমার নাম-ধাম বিবরণ কোন কোন

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত

• রবীন্দ্র চর্চা •

॥ ডঃ অমলেন্দু বসু ॥
সাহিত্যালোক ১০·০০ ॥

॥ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ॥
রবীন্দ্রচর্চা ১০·০০ ॥

॥ ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী ॥
রবীন্দ্রসংগীত : লোকসংগীত, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব ১২·০০ ॥

॥ আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন ॥
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ৫·০০ ॥

• সাহিত্য ও সমালোচনা •

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ১০·০০ ॥

॥ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ॥
বাংলা নাটকের ইতিহাস ১৬·০০ ॥

॥ শংকরীপ্রসাদ বসু ॥
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য ১০·০০ ॥

॥ সুখময় মুখোপাধ্যায় ॥
আধুনিক বাংলা
সাহিত্যের বিপ্রহর ···৫·০০ ॥

॥ ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য ॥
এক দিগন্ত বিলাপের ৬·০০ ॥

॥ হিমাংশু চৌধুরী ॥
বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা ৬·০০ ॥

• ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি ও সমাজবিজ্ঞান •

॥ আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার ॥
বাংলাদেশের ইতিহাস
প্রাচীন যুগ ১৫·০০, মধ্যযুগ ২৫·০০
আধুনিক যুগ ৩৫·০০
প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগ (যন্ত্রস্থ)

॥ ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ॥
ভারতের স্বাধীনতা
সংগ্রামের ইতিহাস ১২·০০ ॥

॥ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ॥
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (দুই খণ্ডে সমাপ্ত)
সংস্কৃত মূলসহ প্রতি খণ্ড ১৫·০০ ॥

॥ ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ॥
উনিশ শতকের সমাজ ও
সংস্কৃতি ৬·০০ ॥

• ভ্রমণ সাহিত্য •

॥ অমিতা রায় ॥
চেনাশোনার বাইরে ৫·০০ ॥

॥ ঘণ্টাকর্ণ ॥
হিমালয়ের চিঠি (১ম খণ্ড) ৬·০০ ॥
ঐ (২য় খণ্ড) ১২·০০ ॥

॥ কৃপা সেনগুপ্ত ॥
জলারের দেশে ৪·০০ ॥

• কাব্য নাটক ও সংগীত •

॥ নিতাই ঘটক কৃত নজরুলের গানের স্বরলিপি ॥
সন্ধ্যাতারা : (চারি খণ্ডে)
প্রথম খণ্ড ৭·৫০ ও
অন্যান্য খণ্ড ৫·০০ ॥

॥ ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত কাজী নজরুলের ॥
দেবীস্তুতি (৩টি গীতিনাট্য) ৩·০০ ॥

॥ সুরেশচাকর নিলীপকুমার রায় কৃত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের স্বরলিপি ॥
দ্বিজেন্দ্রগীতি (৩য় সং) (যন্ত্রস্থ)
হাসির গান (৩০টি গান) ৩·০০ ॥

॥ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ॥
সাগরপোষণ (মিলনের বেলার
রাগসমূহের আলোচনা) ৮·০০ ॥

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥
বিস্মরণী (নবম সং) ৬·০০ ॥

॥ অমিতা রায় অনূদিত ॥
এমিলেন্‌কুর কবিতা
(বিদেশী কবিতা) ৩·০০ ॥
ছুটির খেলা (৩ অঙ্কের নাটক) ২·০০ ॥

• ধর্ম ও দর্শন •

॥ চিন্মিতা দেবী ॥
ঔপনিষদ (উপনিষদের ব্যাখ্যানুযায়ী)
৫·০০ ॥

॥ শ্রীনিলীপকুমার রায় ॥
যুগার্ষি শ্রীঅরবিন্দ ১০·০০ ॥

॥ মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ॥
অভয়ের কথা ৫·০০ ॥

• রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য •

॥ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য ॥
কলিতীর্থ কামারপুকুর ১০·০০ ॥

॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ॥
সমসাময়িক দৃষ্টিতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৫·০০ ॥

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫·০০ ॥

॥ স্বামী বিশ্বপ্রাণানন্দ ॥
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ :
জীবন ও বাণী ২·০০ ॥

॥ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ॥
শ্রীমা-দর্শন (১৫টি খণ্ড)
মোট মূল্য ১০৫·০০ ॥

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
যাত্রী
সম্পূর্ণ নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

॥ জেনারেল বুকস্ ॥ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

মিটিং-এ আমি উপস্থিত ছিলাম সেসব কাগজপত্র পুলিশের হাতে দিয়েছে।.....

সবটা ঘটে গেল চোখের নিমিষে। সেই রাত্রেই ঢাকা-কর্ড গাড়িতে করে স্টেশনে, সেখান থেকে স্পেশাল পুলিশ বাবস্থায়। বিপজ্জনক ছাপ নিয়ে আবার বকসা। সেখানে নির্জন কারাবাস—মানে সেল ব্যবস্থা। এত দ্রুত সব ঘটনা ঘটে গেল যে, ঐ তুচ্ছ এক হতভাগার বন্দীদশার কথা ভাববারও অবসর পেলুম না। মন যখন পড়ল তখনই অবশ্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কিন্তু তিনজনের সুপারিশ করে জেলার-সাহেবের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সাত-দিন কেটে গেল। তিনিও সব শুনে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা কী? বোমটোমা পুঁতে রেখে এসেছেন বুঝি? এই খবর পেয়ে যে একদল পুলিশ বাবে তাদের উড়িয়ে দেবার বাবস্থা? যে কটা বার মানায় পুলিশ? হ্যাঁ?'

অবশ্য অবশ্য অনেক কাকুতি-মিনতি—পুলিশের বুদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট বাঙ্গোক্তি করার পর—তিনি কলকাতা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এছাড়া কিছু করারও ছিল না, সেই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম।...

এর পর ছাড়া পেলাম একেবারে আড়াই বছর পরে। পায়েল ভঙ্গ করির ব্যাপারটায় খুব একটা জড়াননি দেখা পর্যন্ত, বাল-খিলাদের সন্ন্যাসী দলেও আমার উপ-স্থিতিটা ভাল করে প্রমাণ হয়নি—সুতরাং মোটামুটি অল্পেই রেহাই পেয়েছিলুম। তবে এই সময়টা আমার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগটা খুব রেগুলেট করা হয়েছিল—কারণ আমাদের একটা নিজস্ব গোপন নিউজ-সার্ভিস ছিল। সে-খবর কেমন করে আসত আর কে—কেউ জানে না। তারই মারফৎ খবর পেয়েছিলাম। আমার ছোট ভাই কানাইও কোথায় ডুব মেরেছে!—তখন অত মাথা ঘামাইনি। ভেবেছি কোথায় হয়ত বম্বে-টম্বে গেছে—ফিল্ম-লাইনে চোকার জন্যে—কিম্বা আমারই মতো এই রকম কোন গুপ্ত বিপ্লবী দলে ভিড়ে গেছে।

কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসে শুনলুম যে সেদিন পর্যন্তও কোন খবর পাওয়া যায়নি—মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হতে বসেছেন প্রায়—তখন কেমন যেন একটা অস্বস্তি পেয়ে বসল আমাকে, বুকের মধ্যেটা যেন হিম বোধ হতে লাগল—কী একটা আবছা অস্পষ্ট অথচ ভয়ঙ্কর সংশয়।

ঠিক কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না কানাইকে—সে-খবরটা পেতে একটু দেরি হল। কারও স্পষ্ট মনে নেই, এমনকি মারও না। তিনি তো যে তারিখ বললেন, সে আমার ধরা পড়ারও দুদিন আগের। অথচ সেদিন যে ছিল—তা আমি নিশ্চিত জানি। ...কেবল ছোটকাকাই বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে লাগলেন 'দুই তিনদিন থেকে উধাও হয়েছে, কানুটাকেও সেই রাত থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমি ভেবে রেখেছিলুম তোর দলেই নাম লিখিয়েছে বুঝি।' অথচ কাকীমা বললেন, না, না আমার মনে হচ্ছে পরের দিনও তাকে দেখেছি।' ইত্যাদি.....

কাউকেই কিছু বললুম না। মাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিয়ে সে-রাতটা মার কাছেই কাটালুম। কিন্তু মনে মনে একটুও স্থির হতে পারলুম না। পরের দিন ভোরবেলাই বিপিনের বাড়ির নাম করে বেরিয়ে পড়লুম। মামুলী কুশল প্রশ্নের পর কথায় কথায় বিপিনকে জিজ্ঞাসা করলুম—তার ভূতের খবর। ও-বাড়ির কোন খবর কানে গেছে কিনা—অথবা ওখানে কোন পুলিশ 'হেড-এর খবর জানে কিনা'।

বিপিন কিছুই জানে না দেখলুম। কোন কথা কোথাও থেকে শোনেওনি। ভূতের খবর নেবার ওর অত সময়ও ছিল না, ভূত যেমন ছিল তেমনিই আছে নিশ্চয়—সে-খবর নিয়ে লাভই বা কি?

তখন আর কথাটা গোপন রাখতে পারলুম না একজনকে না জানলে চলছে না তখন, একজনকে না সাথী করতে পারলে! ওখানে একা যেতে সাহসে কুলোচ্ছে না আর!...বিপিনকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘটনাটার কথা বললুম। সব শুনে সে স্তম্ভিত একেবারে। তারপর সেখলুম তার চোখেও একটু একটু করে অস্পষ্ট সংশয়, আর শঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এল। সে বলল, চলুন দাদা আপিস আজ থাক।—আজই দুপুরবেলায় একটু ঘুরে আসি।'

চাবিটা সেদিন নিয়ে আসিনি—আসবার পথে একটি ঝুলবারান্দাতে লুকিয়ে রেখে এসেছিলুম, দেখলুম ঠিক সেখানেই সেটা পড়ে আছে, এক পুরু ধুলোর মধ্যে। কিন্তু চাবির কোনও দরকার ছিল না। দরজার কাছে গিয়ে দেখলুম কে বা কারা এর আগেই এসে সে দরজা খুলেছে। উঁকি দিয়ে ঘরে ঘরে শোকল কেটেছে তালা ভাঙতে পারেনি। টর্চ ফেলে দেখলুম, মাল কিছুই নেই আর—পড়ে আছে শুধু লণ্ঠনটা আর মেঝের মাঝখানে একটা গলিত শব; গলিত কেন বলব, পচা মাংসের আর চিহ্নও নেই। সম্ভবত উইপোকা বা পিঁপড়েরা খেয়ে ফেলেছে, ছেঁড়া পচা জামা-কাপড়ের টুকরো দু-একটা আর কঙ্কাল।

অর্থাৎ এই স্মাগলিং ব্যাপারে যারা ছিল, তারা ওর পাত্তা না পেয়ে—অন্য কিছু সন্দেহ করে এসে দরজা ভেঙে দেখেছে এই ব্যাপার—আস্তে আস্তে চুপিসাড়ে মাল নিয়ে সরে পড়েছে। এখানের ঘাঁটি ভেঙে দিয়ে। নিজেরা জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আর হৈ-চৈ করেনি।

মাল নিয়ে [redacted] মানুষটাকে সরানোর কি দরকার ছিল, এ-খুন কি নিতেই বা যাবে কেন? বোঝা গেল যে, পুলিশের তরফ থেকেও কোন চেষ্টা করা হয়নি—আমার দেওয়া সে-খবর হয়ত এখনও কোন ফাইলের অতলে পড়ে আছে।

যাই হোক, এত কথা ভাবার তখন সময়ও ছিল না মানুষকে চেনবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। বিপিনই আমাকে দেখাল, 'দাদা দেখুন' বলে। তার প্রশ্ন সেই আর্তস্বরেই বুঝলুম ব্যাপারটা—ছুটে কাছে গিয়ে টর্চের আলোয় দেখলুম, কঙ্কালের বাঁ অনামিকার একটা সোনার আংটি তখনও আটকে আছে—সাধারণ আংটি, মিনেতে ইংরেজী হরফে 'কে' লেখা।

দুজনের কারুরই চিনতে অসুবিধা হল না। বাবার একটা পুরনো আংটি ভেঙে মা-এইটে গড়িয়ে দিয়েছিলেন কানাইকে বাবার ব্যবহার করা সোনা ওর গায়ে থাকবে বলে। বোধহয় ভেবেছিলেন বাপের জিনিস ছেলের রক্ষা-কবচের কাজ করবে।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

●

আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে' আনন্দ পাবেন

সংহার

জ্যোতিন্দ্র নন্দী

একবার তিনি সংহার শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। আর একবার বলেছিলেন 'সংহারক'।

অবশ্য সংহার যে করে সেই সংহারক, কিন্তু তা হলেও আমি অল্প হেসে মাথা নেড়েছিলাম। বলেছিলাম, পাখিওয়ালাকে আপনি ঠিক এই আখ্যা দিতে পারেন না।'

'নিশ্চয় পারি, আমার চোখে ওই শয়তানও তাই।' একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, ইঁ, কিশোরীবাবু মেদ ভারাক্রান্ত দেহ, বড় বড় চোখ, চোখ দুটোও লাল হয়ে উঠেছিল।

'সিগারেট খান।' পরক্ষণে তিনি শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাইটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার দেওয়ালের [illegible] চোখ রেখেছিলেন।

আমি আর [illegible] তাকাইনি। সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

'শুনুন', মনে হল কিশোরীবাবু কিছু যেন একটা চিন্তা করার পর আমার দিকে চোখ ফেরালেন। 'এটার মত ওটাও যে একটা শয়তান এ আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারছেন না?'

'ঘাঁ, শয়তান আপনি বলতে পারেন, শয়তান নিষ্ঠুর ধূর্ত হৃদয়হীন অনেক কিছু আখ্যা দেওয়া চলে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, লোকটা পাখি শিকার করে, তারপর খাঁচায় পুরে বাজারে নিয়ে সেটাকে বেচে দেয়—এই পর্যন্ত সে তো কাউকে বধ করছে না, সংহার করছে না—'

কিশোরীমোহন মাথা কাঁকালেন। যেন আমি শিশুর মতন কথা বলছি। চোখ বুজে অল্প হেসে নাক দিয়ে এমন একটা ক্ষীণ শব্দও করলেন। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে তান হাতের তেলো প্রসারিত করে ধরলেন।

পাখিটা যে কিনে নিয়ে যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই এটাকে আবার একটা খাঁচায় পুরবে, পায়ে শেকল পরাবে?

ঘাঁ তা তো পরাবেই, বললাম, পাখি পুষতে গেলেই খাঁচা ও শেকলের প্রশ্ন এসে যায়। পাখিওয়ালার কাছ থেকে পাখি কিনে নিয়ে গিয়ে কেউ বনে ছেড়ে দেয় না।'

'কিন্তু আমি একবার তাই করেছিলাম।' কিশোরীবাবু সুন্দর করে হাসলেন। টেবিল থেকে তান হাতটা গুটিয়ে নিয়ে কোলের ওপর রাখলেন। এক বেটা পাখিওয়ালার কাছ থেকে খাঁচাশুদ্ধ পাঁচটা হীরামন কিনে ফেললাম তারপর বিশ্বাস করবেন? সব কটাকে ছেড়ে দেই, তখনকার সেই মুক্তির উল্লাস আপনি যদি দেখতেন, তারা উড়তে উড়তে বনে গিয়ে ঢুকে গেল।'

বিশ্বাস না করার কিছু ছিল না, কিশোরীবাবুর চোখ দুটোর মধ্যে সেই উল্লাস, নিশুদ্ধ জীব-প্রেম নতুন করে জ্বল জ্বল করে উঠতে দেখলাম আমি। তিনি থামলেন না।

একটা পাখিকে বন থেকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখার অর্থ কি, সে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে হারাল, সন্তানদের কাছ থেকে সরে এল বলেই পাখির সম্বন্ধে সে আর ফিরে [illegible] পারছে না—এটা কি তার পক্ষে মৃত্যু মতন না? আপনি বলুন?

চুপ করে রইলাম।

কাজেই যে লোকটার কথা বলছিলাম, মাঠের ওপর ফাঁদ পেতে বসে থাকে পাখিটা কিনবে চোখের সামনে সঙ্গে সঙ্গে দড়ি টেনে করে দিয়ে খুব করে খাঁচার মুখ আটকে দেয়—যেদিনই দেখছি, একটা অদ্ভুত জ্বালা শয়তানটার ওপর আমি আর কিছু প্রকাশ করতে পারছি না। কথা শেষ করে কিশোরীমোহন একটা সিগারেট ধরালেন।

দু বিন টান দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখে তিনি খুব ধীরে ধীরে সেই দেওয়ালের দিকে চোখ রাখলেন।

এবার আমিও সেদিকে চোখ ফেরাই। টিকটিকিটা আর একটা পোকা ধরে গিলে কেমন সন্তোষ মতন সরু সুক্ষ্ম জিভটি প্রায় চোখে দেখা যায় না, পিলপিল করে দুবার নেড়ে মনে হল যেন ঠোঁট চেটে নিয়ে আবার স্থির হয়ে আছে। চোখ দুটো কিন্তু শীতল যেন দুটো কালো পুঁতি, চোখের পাতি নেই, কাজেই এই চোখ নড়ছে কি নড়ছে না বুঝবার সাধ্য নেই, একবার মনে হতে পারে ওটা আসলে জীবন্ত নয়, দোকান থেকে একটা প্লাস্টিকের টিকটিকি কিনে এনে কিশোরীমোহন তার ঘরের দেওয়ালে আটকে রেখেছেন। এত নীরব স্থির নিষ্পন্দ হয়ে থাকতে জানে সে! হঁ নিরীহ উদাসীন অন্যমনস্ক।

এই তো একটু আগে ঘরের মধ্যে ছিল। তখনই অবশ্য আঙুল দিয়ে কিশোরীবাবু আমাকে দেখিয়েছিলেন। এমন এক একটা সময় গেছে, দুটো একটা মাছি শয়তানের গায়ে এসেও উড়ে বসেছে, কিন্তু একটু নড়াচড়া নেই, অস্থিরতা নেই, যেন শ্বাস ফেলছিল না দুটু মাছিরা ভেবেছে একটা কাঠের টুকরো একটা ময়লা কাগজ। এ সেকেন্ড পার হতে না হতে দেখা গেছে আঙুলের মতন সরু জোড়া জিভ বিদ্যুতের মতন ছুটে রং-এর কদাকার ভয়ঙ্কর জীবটির রূপ ও পরক্রম, তা হিংসে হননের, বিচিত্র ধীরতার রূপ ও কৌশল। এক মিনিটেও কম সময়ের মধ্যে পাঁচটা মাছি অবলীলাক্রমে সে উদরসাৎ করল।

এক সঙ্গে দশ দিক দেখতে পাচ্ছি। কিশোরী বলে উঠেছিলেন। আমার আপনার চোখ একই সময়ে আর কাকে বলে—আমরা শুধু আমাদের সামনেটাই দেখি।

কথা না বলে ছেলের দিকে চোখ রেখে ঘাড় কাৎ করেছিলাম। ঈশ্বরের মতন শয়তানের দৃষ্টিও সর্বগামী, জানেন তো। পরে কিশোরীবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠেছিলেন।

তাই দেখছিলাম। পুতুলের মতন ফুদে চোখ দুটো মেলে সে সামনের মাছিটাকে দেখছে, কেমন স্থির হয়ে আছে, কি অপরিসীম ধৈর্য, অদূরে অস্থির মাছি বারবার নড়াচড়া করছে চুপ করে এক জায়গায় বসছে না। কিন্তু তাতে কি, যত সময় লাগুক, সে অপেক্ষা করবে, যেন অনন্তকাল একই স্থিরদৃষ্টি একভাবে ধরে রেখে সে অপেক্ষা করতে পারবে। পাকা শিকারী। কবে কখন কোন মুহূর্তে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার চেয়ে এই জিনিস আর কে ভাল বোঝে।

তাই দেখছিলাম। মাছিটা এতক্ষণ পর এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসেছে, তার ঘাড়ের ও পাখার নড়াচড়া হাতপায়ের কিলবিল থামল। এইবার, এখন। বুকটা দুরদুর করছিল। অবুঝ জানে না, কালমৃত্যু সাক্ষাৎ যম তার জন্য অপেক্ষা করছে, প্রতিক্ষণ শুনছে, মিনিট গুনছে—

কিন্তু একি। হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। কিশোরীবাবু যেন আমার মতন একটা স্তম্ভিত হলেন না। তার চোখ দেখে বুঝলাম। এই জিনিস তিনি অনেক দেখেছেন। আমিও দেখেছি, আমিও আমার ঘরের দেওয়ালে ছেলের টিকটিকি কম দেখি কি—না, কিশোরীবাবু আঙুল দিয়ে না দেখালে এবং এতক্ষণ এই পরম সহিষ্ণু ফুদে অত্যাচারীটি সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা না করলে এতটা মনোযোগ দিয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতাম না।

সামনের দিকে গেল না দুষ্টু, ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে গিয়ে পিছনের একটা মাছিকে ধপ করে গিলে ফেলল।

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' বিড় বিড় করে উঠলাম। কথাটা কিশোরীবন্ধুর কানে গেল। আর একবার নাকের শব্দ করে তিনি হাসলেন। সময় কখনো কারো বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করেছে শুনেছেন?

তাও বটে! বলতে দিয়ে থেমে গেলাম, হঠাৎ টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে কিশোরীমোহন ছেলের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। বলাই বাহুল্য তার হাতের ঢিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। চোখের পলকে একটা লাফ দিয়ে টিকটিকিটা মেঝে ছেড়ে দেওয়ালে উঠে গেল।

'এমনি ওকে মারা শক্ত। আস্তে বলেছিলাম।

কিশোরীমোহনের চোখে মুখে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ সেই সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল। খুব অল্প সময়ের জন্য যদিও। মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছিল, নাকের ডগা কুঁচকে উঠেছিল। পরক্ষণে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে ফেলেছিলেন।

'না কোনো দিন আমি পারলাম না খচ্চরটাকে শেষ করতে।

দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বললাম, কিন্তু এই বেটা যেমন এক মিনিটে পঁচিশটা মাছি গিলতে পারে আপনার সেই পাখিওয়ালা নিশ্চয় এত অল্প সময়ে এত পাখি ধরতে পারে না।'

একটা দুটো ধরতে ও বেটার সারা দিন কেটে যায়। কিশোরী উত্তর করেছিলেন, তারপর একটু থেমে থেকে পরে বলেছিলেন, কিন্তু তবু দুটোর মধ্যে আশ্চর্য মিল, চেহারায় চরিত্রে। দুটোকেই আমি সমান ঘৃণা করি।'

আমি দেখিনি লোকটাকে।'

খুব সহজেই দেখতে পাবেন, আপনিও তো মর্ণিংওয়াক করেন। পার্কের দিকে না গিয়ে লেকের ওদিকটায় চলে যান।'

তাই গিয়েছিলাম। কিশোরীমোহন আমার নিকট প্রতিবেশী। একটা বড় ফার্মের ম্যানেজার। এখানে জায়গা কিনে বাড়ী করেছেন। গাড়ি কিনেছেন। একটু প্রেসারে ভারবেটিজে ভুগছেন বলে সকালে বিকালে পায়ে হেঁটে বেড়ান।

'তার কথা মতন লোকের ধারের একটা পড়ো মাঠে পাখিওয়ালাকে আমি সেদিন দেখলাম। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের একেবারে মাথার দিকের ডালে খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিয়ে যেন কিছুটা দূরে একটা আতাগাছের তলায় ৯/সের ওপর চুপ করে সে বসে আছে।

কিশোরীবাবুর ছকের টিকটিকিটার সঙ্গে পাখিওয়ালার চেহারার মিলটা কোথায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে পড়ল। খুবই ছোটোখাটো একটি মানুষ, তেমনি ঘোলা রুক্ষ মেটেমেটে গায়ের রং, উস্কখুস্ক চুল, এবং চোখ দুটো অসম্ভব ফ্যাকাসে যেন একফোঁটা রক্ত নেই।

কিশোরীবাবুর টিকটিকি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে পোকা-মাকড় মাছি খেয়েও শুকনো জিরজিরে হয়ে আছে। যে পরিমাণ খাচ্ছে এতদিনে বেশ তেলতেলে মোটাসোটা লাবণ্যযুক্ত চেহারা হওয়া উচিত ছিল ওটার।

কিন্তু পাখিওয়ালাকে দেখে আমার মনে হল নিয়মিত দু বেলা খাদ্য জুটছে না লোকটার হয়তো অনেক দিনই তার উপোস-কাপাসে কাটছে।

একটা ভীষণ ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে, পরনে জেলজেলে গামছা।

আমাকে দেখে পাখিওয়ালা যেন একটু বিরক্ত হল। স্বাভাবিক।

মাঠভরা সকালের মনোরম হলদে রোদ অগুনতি ছোরকাটার মাথায় ফাঁড়ুং এসে এসে উড়ে বসছে মাথার ওপর চৈত্রের নীল আকাশ, ঝিরঝির হাওয়া বইছে, উঁচু তুলো গাছের ডালে পাখিওয়ালার খাঁচা আর এধারে আতার ছায়ায় ফ্যাকাসে চোখ দুটো খাঁচার দিকে ধরে রেখে পাখিওয়ালা পাখির ধ্যান করছে —এই নির্জন নিঃশব্দ ধ্যানের জগতে আর একটি মানুষের আবির্ভাব তার কাছে যে খুবই অবাঞ্ছনীয়, অপ্রীতিকর বুঝতে আমার কষ্ট হল না।

দুবার বিরক্ত হয়ে আমার দিকে সে চোখ ফেরাল। তারপর আর তাকাল না। খাঁচার দিকে চোখ তুলে চুপ করে বসে রইল।

না, প্রথমটা আমার নজরে পড়েনি।

একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে জিনিসটা বোঝা যায়। তবু ভেবেছিলাম, খাঁচাটা কিন্তু মোটেই ফাঁকা নয়। ভিতরে একটা পাখি। সবুজে পাতার রং। বুলবুলি টিয়া। কিচকিচ করে ডাকছিল।

হুঁ ডাকছিল। একলা বন্দী হয়ে আছে। নিশ্চয় একটা সঙ্গী কি সঙ্গিনীকে চাইছিল।

দেখলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। চিকচিক শব্দ করতে করতে দূরের একটা অশ্বত্থ গাছ থেকে দুটো টিয়া উড়ে এসে শিমুলের ডালে বসল। এই ডাল থেকে ঐ ডালে গেল। খাঁচার কাছে গেল। খাঁচা ও ভিতরের পাখিটাকে দেখল। বুঝল এটাও টিয়া, সুতরাং খুবই আপনজন।

উঁহু, অন্য খাঁচার মতন এই খাঁচার দরজা কিন্তু এক পাশে নেই, ওপরের দিকে কাজেই উড়ে এসে বসা টিয়া দুটো খাঁচার আশে পাশে কতক্ষণ ছোরাঘুরি করে দরজা-টরজা খুঁজে না পেয়ে একটু হতাশ হল, তারপর যেন মরিয়া করে খাঁচাটার মাথার দিকে চলে গেল। হুঁ এবার তারা রাস্তা দেখতে পেল। এখন ফুরুৎ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে আর একটি সঙ্গী কি সঙ্গিনীর সঙ্গে

প্রকাশিত হইল শক্তিপদ রাজগুরুর নবতম উপন্যাস
জীবনের কলরব ৮৲
বেদইনের সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি অসাধারণ গ্রন্থ
স্মাগলিং চক্র ১০৲
রাতের নগরী বেইরুট ১২৲ অশান্ত চিলি ... ১০৲
প্যালেস্টাইন কম্যান্ডো ১২৲ পাপনগরী সায়গন ১২৲
পূর্বাচল, ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

মিলতে পারার কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু দেখা গেল চট করে দুটির একটিও ভিতরে ঢুকছে না। নিশ্চয় তাদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে, সত্যি এটা কি আর একটা পাখির বাসা, না খাঁচাটাচা কিছু? তখনি আবার দুটিতে নিচের দিকে নেমে এল। এই ডাল থেকে সেই ডালে গিয়ে উড়ে গিয়ে বসল।

কিন্তু খাঁচার পাখি তখন নতুন উৎসাহ নিয়ে দুজনকে ডাকছিল। ওরাও অবশ্য ডাকছিল। কিচকিচ কিচকিচ। তুলো গাছের মাথাটা শব্দে শব্দে ভরে উঠল। ভাগ্যি নজর রো। আমার চোখের পলক পড়ছিল না।

সেই সঙ্গে লক্ষ করলাম, আর এক জোড়া চোখের পলক পড়ছে না। শিকার ধরার আগে টিকটিকির কুতকুতে পলক চোখ দুটো যেমন স্থির হয়ে থাকে, এখানেও ফ্যাকাশে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে, এই অবস্থায় টিকটিকিটা যেমন করে রোগা জিরজিরে মানুষটাও শ্বাস বন্ধ করে থেকে খাঁচাটা দেখছে। খাঁচার মুখের দরজায় সুতো একটা লম্বা দড়ি বাঁধা। দড়ির মাথাটা একেবারে এখানে চলে এসেছে। পাখিওয়ালার হাতের কাছে। পাতাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে সেটা জড়ানো।

এদিকে কি হচ্ছিল?

ভিতরের পাখি ক্রমাগত ডাকছিল খাঁচার দাঁড়ের ওপর উঠে নাচানাচি করছিল ওপরের দিকে বার বার গলাটা ঠোঁটটা তুলে ধরছিল, যেন ওদের দুজনকে ইঙ্গিত করছিল ঐ তো দরজা, ঐ তো ভিতর ঢোকার পথ, এসো চলে এসো, আমার মতন তোমাদের গলায় স্বর চোখ ঠোঁট নাক হলদে পা সবুজ পাখা হয় কি চলে এসো—মিলেমিশে থাকা যাবে.....

তাই কিশোরীবাবুর দেওয়ালের টিকটিকিটাকেও দেখেছিলাম, সব সময় শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না, ছুটে যায় না, কখনও কখনও সামনের দিকের কদর্য রোগা শিকলিতে পা দুটো একটু একটু করে নড়তে থাকে, চোরের মতন সন্তর্পণে একটু একটু করে সে এগোয় আবার স্থির হয়ে দাঁড়ায়, আবার এক সময় পা দুটো নড়ে উঠে। আবার সে এগোয়। পাখিওয়ালার কালো কিটকিটে শিরা বেরিয়ে পড়া হাত দুটো তাই করছিল, একবার দড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আবার থেমে যাচ্ছে।

ঐ খাঁচার পাখি ক্রমাগত ডাকছিল।

যেন ওদের দুজনের একজন আর লোভ সামলাতে পারল না। ঐ ডাল থেকে নাচতে নাচতে এই ডালে চলে এলো। ওরা ডাক শুনে এ ডাকল। তারপর আর দ্বিধা নেই, শঙ্কা নেই। খাঁচার ওপর উঠে গিয়ে বনের পাখি দরজার দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিল ঠোঁটটা ভিতরে নিয়ে গেল। একটা পা পাখিওয়ালার শ্বাস পড়ছে না, ফ্যাকাশে চোখের পাতা নড়ছে না—দড়ির ওপর হাত রেখেছে, তার দুর্বল হাতটা কাঁপছে, আর একটু আর একটা পা ভিতরেই ঢোকালেই হয়ে গেল, এখান থেকে পাখিওয়ালা দড়ির বাঁধন ঢিলে করে দেবে। টুক করে খাঁচার মুখটি বন্ধ হয়ে যাবে।

একটা সাংঘাতিক মুহূর্ত।

যেন কি হবে কি হবে না বলা যাচ্ছে না।

একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে শিমুল গাছের মাথাটা দেখছিলাম।

না, বনের পাখি খাঁচার ভিতর থেকে গলাটা সরিয়ে আনল, পা তুলে আনল। সে বুঝে গেছে, এটা আলো পাখির বাসা নয়, মানুষের তৈরী খাঁচা। ভিতরে একটি পোষা টিয়াকে বসিয়ে রেখেছে, বনের আরও

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি
সুশীলকুমার ভট্টাচার্য ১৫-০০
বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৮-০০
শ্রীচৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি পরিতোষ দাস ১০-০০
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় সুখময় মুখোপাধ্যায় ১০-০০
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী
সন্তোষকুমার কুণ্ডু ৬-০০
পরমারাধ্যা শ্রীমা
মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত ৫-০০
মানব-সমাজ
রাহুল সংকৃত্যায়ন ১০-০০
পাগল হরনাথ
ডঃ কার্তিকচন্দ্র রায় ১৬-০০
রাজা রামমোহন
ঋষি দাস ১২-০০
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক)
মনোরঞ্জন জানা ১৬-০০
কাশ্মীর-অমরনাথ
মন্মথনাথ রায় ৭-৫০
আমি ঃ তুমি ঃ অন্যান্য
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৮-০০
সাগর-বেদে
বিশ্ববন্ধু সান্যাল ৮-০০
শ্রীমতি ক্রাডক
সুনীল বিশ্বাস ৮-০০
অস্তমিত দশক সুকুমার ভট্টাচার্য ৬-০০
অশোক পুস্তকালয়, ৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ছুটো একটা টিয়াকে ভিতরে ঢোকে আনার চমৎকার ফাঁদ।

পাখিওয়ালার পাখি ধরার কৌশলটির মনে মনে আমি তারিফ না করে পারিনি।

কিন্তু কোথায় টিয়া ছুটো কিচমিচ শব্দ করতে করতে শিমুল গাছ ছেড়ে আবার ছুরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে উড়ে গেল।

'শালা!' পাখিওয়ালা ঘাড় থেকে হাত ছুটো সরিয়ে আনল। একটা বড় শ্বাস ফেলল। ঘাসের ওপর একলা থুথু ফেলল।

পারলে না ধরতে। আমি আস্তে বললাম। সহজে কি ধরা দেয়—চালাক হয়ে গেছে। মুখটা কালো করে পাখিওয়ালা উত্তর করল। চুপ করে ছুরের অশ্বত্থ গাছটা দেখল। তারপর আমার দিকে চোখ ফেরাল। বেবাক ছুনিয়া চালাক হয়ে গেছে—পাখি-ফাঁকি আর বাদ যাবে কেন?

খুব হতাশ হয়েছে পাখিওয়ালা বুঝতে পারলাম।

কাল ধরা পড়েছিল কি এক আধটা?

'নাঃ।' পাখিওয়ালা মাথা নাড়ল। আজ তিনদিন ধরে এই চলেছে। একটা নতো উড়ে এসে গাছে বসে ঠিকই, দেখে শুনে আবার সড়ে যায়।'

উঁহু, তখনি ঠিক করলাম কিশোরী-মোহনের ঘরের সেই কুচে শয়তানটির কাছে এই মানুষটা কিছু না। শিশু। বয়সে সময় আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি অন্তত কুড়িটা মাছি বা পোকা খেয়ে সে শেষ করত। আর এই হতভাগা তিনদিনেও একটা পাখি শিকার করতে পারছে না।

তবে কিনা চেহারার দিক থেকে চরিত্রের দিক থেকে কিশোরীবাবু যেমন বলেছিলেন, লোকটির যে কিছুটা মিল আছে সেটা অস্বীকার করতে পারছিলাম না। খাঁচায় দড়িটা ধরে রাখার সময় ফাঁকাসে চোখ ছুটোর মধ্যে একটা দৃষ্টিহীন একটা কপটতা ও'তপ্রোত ছিল না? দরকার কি তবে এভাবে সারাদিন গাছতলায় বসে থেকে। গলা পরিষ্কার করে বললাম, তাছাড়া জিনিসটা খুব ভালও না, পাখিটাখি ধরা আমার তো মনে হয় অন্য কোনো কাজটাজ করলে ভাল হত।

পাখিওয়ালা চুপ করে শুনল।

নিজের কানেই কথাটা অন্য রকম শোনাল। যেন মানুষটাকে আমি নীতি উপদেশ দিচ্ছি। পাখি ধরাই যদি তার পেশা হয় অন্য কাজ সে করবে কেন, পারবেই বা কেন।

হুঁ, কথাটা বাবু বলছেন ঠিকই, ও একটা জীব জানোয়ারকে খাঁচায় আটকে রাখা ঠিক না। আমার দিকে চোখ তুলে পাখিওয়ালা মাথা ঝাঁকাল। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলল। তবে কিনা আমার এই পেশা ছিল না।

কি করতে আগে? কৌতূহল হল।

কারখানায় কাজ ছিল কারখানা বন্ধ হয়ে বেকার হলাম।'

আর কোনো কাজ জুটলো না?'

নাঃ। ঘাসের ওপর আর একদলা থুথু ছিটিয়ে পাখিওয়ালা কানের পিছন থেকে একটা পোড়া বিড়ি টেনে আনল। বাবুর কাছে আগুন আছে?

'না ভাই আমি বিড়ি সিগারেট খাই না।'

হুঁ কারখানার কাজ গিয়ে বেকার হবে তখন আর কাঁ কি কিনা পুঁজির ব্যবসা, গাছের মাথায় একটা খাঁচা বসিয়ে রেখে পাখি ধরতে লেগে গেলাম।' লোকটা হাসল।

কিন্তু পাখিরা তো তোমার খাঁচায় ঢুকছে না।' আমি পাল্টা হাসলাম।

ঐ যে বললাম বাবু পাখিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। ছুনিয়ার সব বেটা চালাক বনে গেছে, ওরা কি আর বাদ থাকবে পয়লা পয়লা শিকার ভাল জুটেছিল। আজ কটা দিন একটা পাখি ধরা পড়ছে না।'

তবে কি অন্য কোথাও গিয়ে খাঁচা বসাবে?

নাঃ এ আর পোষাবে না এই ব্যবসা একেবারে ছাড়তে হবে।

তাই ভাল।' খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে বললাম অন্য একটা কাজটাজ যদি জুটিয়ে নিতে পার—তাছাড়া পাখি ধরাটা—একথাটা আর শেষ করলাম না আস্তে আস্তে মাঠ থেকে রাস্তায় উঠে এলাম। তখন কিশোরীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সবে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেশ করে প্রাতঃভ্রমণ তার পোষায়। নিজের গাড়ি আছে। অফিসে লেট হবার ভয় নেই। আমাকে হাঁটা বলে বলে ছুলে অফিস করতে যেতে হয়।

কদিন আর কিশোরীবাবুর বৈঠকখানায় যাওয়া হয়নি। সেই সূত্রে পাখিওয়ালাকেও আর দেখতাম না।

এক রবিবার সকালে কিশোরীমোহনের বসার ঘরে ঢুকতেই তিনি হৈ হৈ করে উঠলেন। সমাদর করে বসালেন। কি ব্যাপার! দেখতেই পাচ্ছি না?'

কাজ করে আসতে পারিনি। তারপর, আপনি কেমন আছেন বলুন?

'ভাল!' কিশোরীবাবু আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। সিগারেট খান।

সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিলাম। ঘরে ছুটো নতুন বেতের চেয়ার এসেছে। টেবিলের ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার ডোড়া। পয়সাওয়ালা মানুষ, ভগবান তাকেই এসব শোভা পায়। ফুল এবং

রামানুজ সম্প্রদায়ের
॥ কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ ॥

স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সংকলিত

ভগবদ্রামানুজ বিরচিত		**শ্রীবিষ্ণু আড়বার বিরচিত**	
ব্রহ্মসূত্র শ্রীভাষ্যসহ		তিরুপ্পল্লাণ্ড	১-৫০
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	৬-৫০	**শ্রীপরাশর ভট্ট ব্যাখ্যাত**	
২য় খণ্ড (১ম ও ২য় অধ্যায়)	১৫-০০	শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম	১-৭৫
৩য় খণ্ড	২০-০০	**শ্রীসুদর্শনসূরি ব্যাখ্যাত**	
গীতাভাষ্য	৭-৫০	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ভাষ্যম	২-৫০
বেদান্তসার	৬-০০	**শ্রীবরদাচার্য বিরচিত**	
বেদার্থসংগ্রহ	৫-০০	প্রতিমাগুণদর্পণ	০-৭৫
নিত্যারাধন গ্রন্থ	১-৫০	শ্রীরামকৃষ্ণাদি দিক্‌প্রদর্শন	০-৫০
গদ্যত্রয়	২-০০	**শ্রীবঙ্গীপুর রামানুজাচার্য বিরচিত**	
শ্রীবাদিহংসাচার্য বিরচিত		গুরুবর বলরাম (১ম খণ্ড)	১০-০০
শ্রীমদ্গীতার্থসংগ্রহ	১-৫০	(২য় খণ্ড) ৬-০০ (একত্রে)	১৫-০০
শ্রীরামকৃষ্ণায় স্তোত্র	১-২৫	শ্রীবৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম (১ম) ৮, (২য়)	১০·
শ্রীলোকাচার্য স্বামী ও শ্রীবরবরমুনি কৃত বা ব্যাখ্যাত		বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও ইহার প্রাচীনতা	১-৫০
শ্রীবচনভূষণ	৮-০০	মানব-উজ্জীবন	২-৫০
শ্রীবচনভূষণসার	২-৫০	আড়বার	২-২৫
তত্ত্বত্রয়	৪-৫০	তত্ত্ব ও কথা	৪-৫০
অর্থপঞ্চক	০-৩৭	অর্চিরাদি মার্গ	২-২৫
উপদেশরত্নমালা	২-০০	: অন্যান্য :	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৫-০০	রামায়ণসার	৬-৫০
শ্রীকান্তাল আড়বার বিরচিত ও শ্রীকলাবস্বামী ব্যাখ্যাত		ব্রহ্মসূত্র	৪-০০
শ্রীস্তব (তিরুপ্পাবৈ)	৩-০০	প্রপন্নপারিজাত	২-২৫
শ্রীমধুরকবি আড়বার বিরচিত		: নবপ্রকাশিত গ্রন্থ :	
মধুরগীতি (তিরুবায়মোড়ী)	১২-০০	ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত	
		সহস্রশ্লোকী ভাগবত (১ম খণ্ড)	৩-০০
		ঐ (২য় খণ্ড)	৪-০০

পোঃ বলরাম ধর্মশোপান বারাসত (২৪ পরগনা) **শ্রীবলরাম প্রকাশনী** ১০১ বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬

(বিস্তারিত বিবরণ-তালিকার জন্য লিখুন)

সেখা দেখা শেষ করে ঘরের দেওয়ালের দিকে চোখ রাখলাম।

কিশোরীবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছিলেন।

আপনি কিছু খুঁজছেন নিশ্চয়ই?'

হুঁ, কিশোরীবাবুর চোখের দিকে তাকালাম। আমি বুঝতে পেরেছি আপনার তাকানো দেখেই ধরে ফেলেছি আপনি কাকে খুঁজছেন।

কোথায় গেল ওটা?

শেষ হয়েছে আপনা থেকেই শেষ হল। কিশোরীবাবু সোফার পিঠে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। পেপার ওয়েট ছুঁড়ে কষ্ট করে আমাকে আর মারতে হল না।

আমি তাঁর চোখদুটো দেখছিলাম। কিশোরীবাবু বললেন, জান শনিবার, যখন-তখন অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতেই পায়ের নিচে ক্যাচ করে একটা শব্দ শুনলাম কি ব্যাপার? তাকিয়ে দেখি আমার জুতোর চাপে বেটা চেপটা হয়ে গেল।'

খুব চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল আর কি! আমি হাসলাম। কারু আর অন্য কোনদিকেই ওর চোখকান ছিল না।'

তার মানে পাপী এভাবেই একদিন শেষ হয়, পাপের বেতন মতো আপনি মানেন তো। কিশোরীমোহন গম্ভীর হয়ে বললেন' আমি শব্দ না করে আস্তে কাত করলাম।

ভাল কথা মনে পড়ল। কিশোরীবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সেদিন তো আপনি পাখিওয়ালাকে দেখলেন, তারপরে কি আর লোকটাকে দেখেছিলেন?

'না।' একটু থেমে থেকে বললাম অবশ্য কিন্তু তাতে আমি ওই ব্যাটা পাখিওয়ালা, আমার মনে হয় পাখি ধরা সে ছেড়ে দিয়েছে।'

হুঁ, মনে হয় ছেড়েই দিয়েছিল অন্য রকম ধরেছিল—আপনি শুনে অবাক হবেন, ওই শয়তানও এইভাবে শেষ হয়েছে।

কি রকম? চোখ দুটো রীতিমত ছোট করে ফেললাম।

কিশোরীমোহন পিঠ উঁচু করে সোজা হয়ে বসলেন।

প্রায় দশগজ দূরে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করল, দরজা খুলে নেমে এসে দেখলাম, সেই বেটা পাখিওয়ালা।'

এভাবে ছুটছিল কেন?

ঐ যে গলির ভেতর ঢুকে, বাড়িতে ঢুকে কিছু করতে গিয়েছিল, টের পেয়ে পেছন থেকে পাড়ার মানুষ তাড়া করল ধরা পড়ার ভয়ে উল্কটা ছুটছিল যদি একটা ফল করার চেষ্টা না করে রাস্তায় কিনারা ধরে সেটা ছুটতো তো আর যাই হোক গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরত না। কিশোরীবাবু হাসলেন।

তা তো বটেই। একটু থেমে থেকে বললাম, সবসময় সবসময় ঘরে ঢুকে কিছু নিশ্চয়ই?

তা আবার বলতে, মকেলদের কারুর একটা লোককে চাপা দিয়েছি, আমার কেরদানি হয় এবার আমার ঘরে সব ঠেলাগাড়ি-টাও নষ্ট করায়, কিন্তু সত্যি তখন সত্যি কথাটা বলে ফেলছিল বেটা চোর চুরি করে পালাচ্ছিল আমার কোন দোষ নেই, আমি তো সবসময় সাবধানে বেরুই কিন্তু না এই চুরুলোকের কোন দোষ নেই সাধেরগাড়ি চাপা পড়ার ভয়ে চোখ বাঁচাতে ছটাতে গিয়ে কেউ গাড়ির নিচে চলে যায় তো তার জন্য সেটা দায়ী নয়—'

তারপর?

আমি অবশ্য বেটাকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলাম। কিন্তু বাঁচল না।

পাখিধরা ছেড়ে দিয়ে পেটের দায়ে লোকটা চুরি করতে শুরু করেছিল। বিড় বিড় করে বললাম।

কোনোরকম চমকিত না হয়ে কিশোরীবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

'খুব গরম পড়েছে।' কিশোরীমোহন আবার সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। আমি জানালার বাইরে আকাশটা দেখলাম।

চমৎকার, বৃষ্টি নেই।

বাজারে যান টান?

অন্যদিকে তাকিয়ে কিশোরীবাবু বাজারে চলে গেলেন।

যাই বই কি, যেতে হয়।' আস্তে বললাম, মাছ প্রায়ই সবই সে কিনে আনে।'

তার আর বলতে, দাঁড়ান আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, আমি নিজে বড় একটা বাজারে যাই না আজ ইচ্ছে হল, বুটকে চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরে এলাম ভরিহর।

কিশোরীমোহন তার চাকরকে ডাকলেন, হরিহর পিছনের দরজায় টাকি দিতে কিশোরীবাবু বললেন, বাবুকে মাছটা এনে দেখা।'

আমি তাহলায় একটা আস্ত কাতলা নিয়ে এসে তার চাকর জামার সামনে হাজির করবে। হরিহর দুহাতে একটা প্রকাণ্ড গামলা ধরে নিয়ে এল। দেখলাম গামলা ভর্তি কালো চকচকে মোটা মোটা মাগুর মাছ। এ একটা মাছ এক হাতেরও বেশী লম্বা।

বাঃ বেশ বড় মাগুর পেয়েছেন তো। সব কটাই খুব পুষ্ট—এত বড় মাগুর আজকাল এ বাজারে আসে না।

আমার কথা শুনে কিশোরীবাবু হাসলেন।

ঐ যে অশিনমূল্য বললেন, বস্তা টাকা জেতে নিয়েছে বেটা, একটা আধুলি ছাড়ল না।

তা হলেও বেশ মাছ হয়েছে। যেন কিশোরীবাবুকে খুসী করতে বললাম, এক সঙ্গে অনেক মাছ নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

হুঁ, এবেলা চলবে খুব ওবেলা গারদা। কিশোরীমোহনের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল: অন্য কিছুই তো খেতে পারি না, প্রেসার, ডায়বেটিস সবই আছে, আজ মাগুরের ঝোল আর চাট্টি ভাত একবেলা ভাত একবেলা রুটি খাব বলেছিলাম 'তিনটা মাছ রয়েছে বাড়িতে বলে দিয়েছি, এই মাছের ভাগ আর কেউ পাবে না—আমার একলা, তিনদিন চারদিন ধরে ঝোল খাবে কি বলেন?

তা চলবে।' মাথাটা উঁচুর করলাম। মানুষটার চোখ দুটো দেখতে আমার ভয় করছিল।

আনন্দ বাগচীর আবদুল জব্বার-এর

পরমায়ু ৮-০০ বদর বাউল ৬-০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

ছোট পাখি নীল আকাশ ৫-০০

প্রশান্তকুমার মিত্র সম্পাদিত

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ৭-০০

এঁরা লিখেছেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ বাগচী, গোপাল ভৌমিক, আশা দেবী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অজিত কুমার গৌরী বসু অমৃত মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

মিত্র প্রকাশনী। ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। ফোন : ৩৪-৪৬১২

'হলুদ বসন্ত'র নয়না চৌধুরী কে একটি চিঠি

বুদ্ধদেব গুহ

৮-৮-৭২
রবিবার সন্ধ্যাবেলা

অমার
নয়না সোনা,

অনেক মাস পরে আজ হঠাৎ তোমাকে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করল। আজকে দুপুরে হিমাংশু আর তার স্ত্রীর সঙ্গে ইন্টারকন্টিনেন্টালে খেতে গেছিলাম। রবিবার দুপুরে বিশেষ ভিড় থাকে না তাই ডান পাশের ডাইনিং-রুমের একটা পাশ পর্দা কাচে মোড়া—সাদা নরম ট্রান্সপারেন্ট কাপড়ের পর্দা লাগান। এইমাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। সবুজ লন তাতে লাগে, নীল ছাতা, সুইমিং পুলে ইলেশেগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে ননরতা মৎস্যকন্যাদের মত সুন্দরী দেশী-বিদেশী মেয়ের শিহরণ আঁকা—সব মিলে ভরা ভরা লাগছিল। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে, তুমি আর আমি (শুধুই আমি আর তুমি) একদিন সমস্ত দুপুর এখানে বসে থাকি। আমি কিছু খাব না—শুধু একটি সিগার নিয়ে বসে থাকব আর তোমাকে দেখব। তুমি একটি সাদার উপর কালো প্রিন্টের শাড়ি পরে গলায় কলম ফুলের মালা পরে কানে মুক্তোর ইয়ারটপস পরে আমার সামনে বসে থাকবে। বসে বসে এক গ্লাস গোল্ড স্পট কমলা এ্যাপল জুস নিয়ে নাড়া-চাড়া করবে।

আমি শুধু তোমাকে দেখব দু-চোখ ভরে দেখব। শিকাকাই দিয়ে তুমি সেদিন চুল ঘষে আসবে, চোখের কোণে আলতো করে একটু কাজল মাখবে, শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে কালো টিপ পরবে একটি, ইন্টিমেট পারফ্যুম মাখবে। পায়ে একটি কালো চটি পরবে—আর তুমি যখন কথা বলবে অথবা কথা বলবে না আমি তখন একদৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে থাকব। আমাদের সামনে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে হিমাংশুর স্ত্রী ঝুমা বলল, কি হল? তুমি কার কথা ভাবছ? আমি হাসিমুখে বললাম, কারো কথা নয়। ও জোর দিয়ে বলল নিশ্চয়ই ভাবছ কারো কথা। আমি আবার হাসলাম, বললাম, তাহলে তবুও।

ঝুমা আমাকে এক বিশেষভাবে ভালবাসে। আমরা পুরুষমানুষরা অনেক সময়েই মেয়েদের ভালোবাসার সমাদর করতে জানি না। সকলের ভালোবাসা কখনোই একরকম হয় না। আমার কেন জানি মনে হয় মেয়েদের ভালবাসা জলের মত অবয়বহীন, তারা যে-পুরুষকেও ভালবাসে সে-পুরুষের মনের পাত্রের আকারের উপর তাদের ভালবাসার প্রকৃতি পুরোমাত্রায় নির্ভর করে। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ পুরুষেরই মনের পাত্র একটি মাত্র ছাঁচে গড়া—যেন কোনো স্টীল কারখানে ঢালাই করে তৈরী করা। পুরুষের মন মনে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। আমার মনে হয় এক-একজন মেয়ের মনের ভালবাসা এক-একরকমভাবে গ্রহণ করতে হয়—করা উচিত; নইলে তাদের অযথা অসম্মান করা হয়। আমাদের মানে পুরুষদের পরীক্ষা এমন একটা যন্ত্রণা ব্যাপার যে শরীর ছাপিয়ে মনের রাজ্যে বিচরণ করা আমাদের বেশীর ভাগের পক্ষেই সম্ভব হয় না। যখন বিচরণ করি তাও সাময়িকভাবেই পরক্ষণেই আবার শরীর এসে পড়ে সম্পর্কের জরুরদখল নেয়।

ঝুমার ভালবাসা আমি কিন্তু অন্যভাবে গ্রহণ করেছি। প্রথমত সে আমার বন্ধুর পত্নী, তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা ভাবতে পারি না। যেদিন পারব, সেদিন হিমাংশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখব না স্থির করেই তা করব। নইলে সেটা বিশ্বাস-ঘাতকতা হবে। যেটা থাকে তা সম্ভব নয়।

ঝুমাকে আমি বৈশাখের ভোরের হাওয়ার মত তপ্ত দিনের দীর্ঘ পথে কোনো কদাচিৎ গাছের ছায়ার মত গ্রহণ করেছি। ওর সঙ্গ আমার ভাল লাগে, ও কাছে এলে আমার ভালো লাগে (হয়তো ওরও লাগে, হয়তো কেন বুঝতে পারি নিশ্চয়ই লাগে) কিন্তু ওর জন্যে, ওর সঙ্গের জন্যে ওর কিছুর জন্যেই কখনো আমি অভাব বোধ করি না, করিনি কোনোদিন।

ওর মত অনেকে আমার জীবনে আছে, যারা আমার সব দোষ সত্ত্বেও আমাকে ভালবাসে পছন্দ করে। যাদের ভাল লাগে তাদের ভালোই লাগে, তাদের কাছ

থেকে ভালোলাগা ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই আমার জীবনে হয়ত দেবারও নেই। কিন্তু আমি নয়না চৌধুরী, তুমি যেমন করে আমার জীবনের সব প্রাপ্তি, সব সম্মান সব যশ নষ্ট করে দিলে, আমার অস্তিত্ব ছারখার করে দিয়ে আমার সমস্ত রকম উন্নতির উচ্চাসনের মধ্যে আমাকে এমন নিশ্চিন্তভাবে কবর দিলে যে তোমার সঙ্গে তুলনা করি এমন কেউ আমার জীবনে নেই আসেনি, হয়ত আসবেও না।

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা নীচু হয়ে গেছে শুধু তোমার জন্যে। নীচু বলব না বলব ইণ্ডিফারেন্ট আনসার্টেন। তোমার সম্বন্ধে আমার অনুভূতি ঠিক কি রকম, তা বোঝবার মত ভাষা আমার নেই। আমার কেন? কোনো ডাকসাইটে সাহিত্যিকেরও নেই। কারণ, তোমার সম্বন্ধে আমার কোনো একটি মাত্র অনুভূতিই স্থায়ী নয়। একই দিনের মধ্যে কখনো কখনো তোমাকে আমার দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে কখনো বা ইচ্ছে হয় তোমাকে ভীষণ—ভীষণ—ভীষণ [illegible] করতে। কখনো তোমার উপর ঘেন্না হয়, কখনো তোমাকে ভীষণ সম্মান করতে ইচ্ছে হয়। কোনোদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে ড্রয়ার খুলে তোমার ছবি বের করে চুমু খেতে হয়, কোনোদিন বা নিস্তব্ধ গরম ছুটির দুপুরে সেই ছবিকেই দেশলাই জেবলে পোড়াতে হয়। কেন এমন হয়, এমন বিভিন্ন রকম বিচিত্র রকম, আপাতবিরোধী সব ইচ্ছা হয় তা আমি বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমার মস্তিষ্কের মধ্যে সব [illegible] অবচেতনে এক সুন্দর অতীতের [illegible] মত তোমার মনের গন্ধ জড়িয়ে থাকে। রাতে ঘুম আসার আগে তোমার মুখ মনে পড়ে, প্রতি সকালে ঘুম ভেঙে তোমার মুখ সবচে আগে [illegible] পড়ি। ভীষণ কঠিন কোনো ড্রইং বা প্রজেক্ট রিপোর্ট শেষ করে উঠে [illegible] তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে মনে পড়ে।

যখনি কোনো এ্যাকসিডেন্টের মধ্যে [illegible] হই যখনি মৃত্যুর ছায়া কাছে বা দূরে দেখতে পাই, তখনি সবচে আগে তোমাকে মনে পড়ে। [illegible] কেউ কারণে কি অকারণেই [illegible] অপমান করে আমাকে, সেদিন [illegible] তোমার কথা মনে হয়, ইচ্ছে হয় [illegible] তোমাকে কাছে পেতাম, তাহলে তোমার স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা সুগন্ধি কোলে, তোমার শাড়ির গন্ধে তোমার গায়ের মিষ্টি সুবাসে মুছে [illegible] সেই অসম্মান বা অপমান [illegible] যেত। কত কি ইচ্ছে হয় তোমাকে ঘিরে কত কি ইচ্ছে হয়।

কখনো কখনো বৃষ্টিঝরা রাতে আমার এমন সব দুরন্ত ইচ্ছে হয় যে, তুমি বুঝবে মধ্যে চমকে চমকে ওঠ। ইচ্ছে হয় তোমার বুকের তিলে মুখ রাখি, তোমার মিষ্টি রুক্ষ কাঠবিড়ালীর গায়ে বৃষ্টির মধ্যে হাত বোলাই। কোনো গভীর রাতের অন্ধকারে, কত কি কত কি ইচ্ছে হয়। তোমার উপর সবচেয়ে রাগ হয় যখনি ভাবি যে জেনেশুনে তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে।

কত পুরুষ আমাকে হিংসা করে, কত সুন্দরী মেয়ে আমার সঙ্গ চায়, আমার কত কি আছে জীবনে গর্ব করার, খুশি হবার আনন্দিত হবার, কিন্তু আমার সব আনন্দ সব গর্ব সব খুশি তুমি তোমার সুন্দর আঙুলে ছারখার করে দিলে, কেন? কেন তুমি এমন করলে?

আমি জানি তোমার স্বপক্ষে অনেক কিছু তোমারও বলার আছে যখন দেখা হয় তা বলো। মনে আছে তোমার বিয়ের আগে একদিন বলেছিলে, যা করলাম আপনার ভালোর জন্যেই করলাম ক্ষমা। এই-ই কি তোমার ভালোবাসার নমুনা? বুঝতে পারি না?

তোমার জন্যে আমার যা-কিছু আছে সব ছাড়তে পারি। এই মুহূর্তে। পৃথিবীতে আমার বলতে যা-কিছু আছে তার সমস্ত নির্লিপ্ত একপাশে সাজিয়ে চুলখোলা তোমাকে অন্যপাশে একটি তাঁতের তুঁতে শাড়ি পরিয়ে দাঁড় করালে নির্ঘাত সব সময় তোমার দিকেই ঝুঁকবে—আমার নির্ঘাত—তা তুমি জানতে—চিরদিন জানতে, তবু সব জেনেশুনেও তুমি আমার ভালোর জন্যে এই করলে।

সারাদিন কুকুরের মত কাজ করার পর (আমার মালিকের কুকুর নই, আমি কাজ ভালবাসি প্রত্যেক সত্যিকারের পুরুষই কাজ ভালবাসে) তোমাকে পাওয়া যায় না।

তুমি যে বিশ্বাহিতৈষিনী। জন্মদিন, মৃত্যুদিন, বিবাহবার্ষিকী, বিয়ে-চাকরির নেমন্তন্ন, বান্ধবীদের বাড়ী ডে-সেলিব্রেট করা তোমার লেগেই আছে। তার উপর তোমার চাকরী। এমন ভাবখানি যে-চাকরী না করলে তোমাদের বাড়ি-গাড়ি সব বিক্রী করে দিতে হত। তার ওপর তোমার জনসমুদ্রের মত বন্ধুবান্ধবী, পলাপালের মত কাজিনস বান্ধবীর দাদির দোকান পাহারা দেওয়া, লক্ষ ডেটিং-করা মেয়ের চুল বাঁধা (যেহেতু তুমি ভাল চুল বাঁধতে পারো) লক্ষ লক্ষ ঝগড়াটি প্রৌঢ় মহিলাদের সঙ্গে ছট-খোলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মতলব ভাল নয়। তুমি কি সমনের ইলেকশানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ডিডেট হয়ে দাঁড়াবে? বইল জনতার জন্যে এত করা কেন? নিজের

॥ লাইব্রেরীতে রাখার মত বই ॥

অপুর পাঁচালী ১৫-০০

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
প্রেমিক ৬·
রাঙ্গা শিমুল ৫·

শ্রীপান্থের
বিনোদিনী ৫·
শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে ৫·

লণ্ডনের আড্ডায় ৬·০০

হিমানীশ গোস্বামী

বেদুইনের
ইন্দোচীনে পাঁচটি রাত ৮·

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
হাঙর ৩·

নিগূঢ়ানন্দের
দিল্লী যখন জাহাঁ[illegible] ৭-০০

বার্নার্ড শ'সাহেবের বেগম ৫-০০

চিরঞ্জীবের
খুনের পরে খুন

অমলেন্দু শাস্ত্রের
স্বপ্ন টুপ্পা আদতে ৩·

পুস্তক প্রকাশনী— ৮২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

দিকে একবারও না তাকিয়ে কতগুলো স্বার্থপর মুখোসপরা লোকের অনুরোধে উপরোধে গলে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কেন? তোমার নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো আমার কিছু বলার ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎটাও এমনভাবে কেন যে নষ্ট করলে জানি না। তোমার কি আমার জন্যে কিছুই করার নেই? কিছুই কি করার ছিল না কোনো দিন?

যে হলুদ-বসন্ত পাখীটিকে আজ এত বছর ধরে আমার মনের হিজলের শাখায় ছোট থেকে বড় করলাম, ধীরে ধীরে যে আমার সমস্ত শরীরে মনে এক বাসন্তী স্বপ্নের মত তার সমস্ত সত্তায় সঞ্চারিত হল আমার অজান্তে আমার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী এবং একত্ব হয়ে গেল, তাকে ত আজ হঠাৎ ইচ্ছে করলেই হুস বলে উড়িয়ে দিতে পারি না, সেই হিজল শাখা থেকে? এতবড় ক্ষমতাবান ত আমি নই।

তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে আর কোনোদিনও ফেরাতে পারব না এ-জীবনে—যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এ-জন্মের মত।

কোনো পাখিকেই আমি ওড়াইনি—হলুদ-বসন্ত পাখিকে ত নয়ই, সে যদি নিজে উড়ে যায়, তার এই পুরোনো গাছ যদি আর ভাল না লাগে, সে যদি আমার জীবন থেকে এমন হাসতে হাসতে অবহেলায় হেলাফেলায় হারিয়ে যায় ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাহলে আমার কি করার থাকতে পারে? নয়না আমার নয়না, আমার চোখের মণি, আমার সর্বনাশ, আমার ভালবাসা, তোমার দিনান্তে একবারও কি আমাকে মনে পড়ে না? যে-লোকটা সারাদিন সারা-জীবন শুধু তোমার চোখের দিকে চেয়ে তোমার ভাবনা ভেবে কাটাল, তাকে কি একবারও মনে পড়ে না?

যখন 'হলুদ-বসন্ত' উপন্যাস লিখেছিলাম তোমার জন্যে তখন তুমি অনেক ছোট ছিলে, আমিও অনেক ছোট ছিলাম, যে আমি হলুদ-বসন্ত লিখেছিলাম সে আমি আর কোনোদিনও অন্য কোনো হলুদ-বসন্ত লিখতে পারব না। তারার সে ধার নেই, অনুভূতির সে-তীব্রতা নেই আজ ভবিষ্যতের কোনরকম প্রতিশ্রুতিও নেই।

সেইদিনের সেই আর্তির মধ্যে সেই চমকে-ওঠা ছাই-হওয়া নিঃশ্বাস মধ্যে, তবুও কোথাও কোনো ভবিষ্যৎ ছিল শুধু বোসের। মীতিনের সঙ্গে বিয়ে না হবার পর অনেকদিন নয়না চৌধুরী পুরোপুরি শুধু বোসের উপর নির্ভরশীল ছিল। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে এ জন্মে কখনও হবে না—হতে পারত না তা তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু বিয়ে হওয়াই ত সব নয়। আমাকে বিয়ে না করেও তুমি আমার হলুদে-বসন্ত পাখি চিরদিনের আমারই থাকতে পারতে। আমার কাছে আজও তাই-ই আছ। কিন্তু তোমার কাছে আমি আজ কেউই নই। সব মেয়েরাই কি তোমার মত? তোমার মতই স্বার্থপর ও সংস্কারাবদ্ধ?

তবে একটি কথা মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আমার এই হিজলের ডাক ছেড়ে চির-দিনের মত উড়ে যাবার পর যখনি আকাশে ঝড় উঠবে, কালবৈশাখীর মেঘে ঢেকে যাবে সব গাছের মাথাগুলো, উথালপাথাল করবে অথাধা হাওয়ায়— সেইসব দিনে হয়ত তুমি বিদ্যুৎ-চমকের মত বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে জীবনের এক পরম ধন তুমি কি অবহেলায় পথের ধুলোয় ফেলে দিয়েছ। সেই সব মুহূর্তের হতাশা আর অনুতাপ আমাকে তোমার অনেক কাছে টেনে আনবে তোমার মনে মনে।

একথা জেনে ভাল লাগে। সত্যিই বলছি আমার জাগরণের কল্পনায় এবং ঘুমের স্বপ্নের মধ্যে তোমার কাছে অনুক্ষণ আমি হয়ত অনেক কিছু চাই প্রতি মুহূর্তেই চাই সেটা আমার বেদনার উপায়হীনতাতেই চাই। তোমার কাছে আজ হয়ত আমার আসলে কিছুই চাইবার নেই। তোমার দেবার আছে কি—তা তুমিই জান। কিন্তু আমার নতুন করে চাওয়ার কিছু নেই সত্যিই তবু বেদনার মত বেজেছ তুমি আমার জীবনে।

তুমি সবসময় খুশী থেকো, সুখে থেকো, হাসিমুখে থেকো। যদি জানি যে তুমি সুখে আছ তাইতেই আমার সুখ। যদি কোনদিন দুঃখ পাও সেদিন আমাকে খবর দেওয়ার আগেই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব, তোমার সমস্ত রকম দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করব। তুমি দুঃখিত হলেই আমার মন সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পারে। এতটুকুও না জানলে ত তোমাকে কিসের ভালবাসি আমি।

যেখানেই থাকি না কেন কাছে বা দূরে কোলকাতায় কি প্রবাসে তুমি সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, যেমন চিরদিন থাকো। তোমার সঙ্গে সবসময় অনেক কথা বলব, অনেক ঝগড়া করব, কল্পনার ঘুমের মধ্যে অনেক অনেক আদর করব তোমায়। জীবনে তুমি যত বড় কৃপণই হও না কেন আমার কল্পনার জগৎ তোমার মুক্তহস্ত দানে ভরে আছে, যতদিন আমার নিঃশ্বাস পড়বে ভরে থাকবে। তুমি কি জানো তা?

তোমার মত ভাল চিঠি লিখতে পারি না আমি তবুও লিখে ফেললাম চিঠিটা। এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কি জানি না। চিঠি পেলে তুমি বিস্মিত ও বিরক্ত হও। কিন্তু খুব লিখতে ইচ্ছে করল। কি করব বল? হয়ত কেউ কোনোদিন এ চিঠি এবং হয়ত আমার অন্যান্য চিঠি দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করবে। কিন্তু আমার ভয় নেই। কাউকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো হীনতা নেই লজ্জা নেই। একমাত্র ভালোবাসাই আমার ঈশ্বর দত্ত জীবনে এমন কিছু এনে দেয় যা আমার মনের এঞ্জিনে ডিজেলের মত কাজ করে।

তুমি জানো না তুমি আমার একটুকু কাছে থাকলে মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা হলে কথা বলতে পেলে তোমার সঙ্গে এমন কি তোমাকে কোনো চিঠি লিখে ফেলতে পারলেও আমার কতখানি ভালো লাগে। তুমি কি জানো তোমার হাতে তুমি একটু হাত রাখলে আমার কতবড় হতে ইচ্ছে করে এ জীবনে এই মুহূর্তে আমার সব মাথা ছাড়িয়ে সকলের চেয়ে মহৎ কৃতী ও যশস্বী হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়।

তোমার সঙ্গে আমি ভাল করিনি; অভি-নয় করিনি কখনও, তাই তোমাকে ভালবাসি একথা আমি মুখে বলতে বা চিঠিতে লিখতে ভয় পাই না। তোমাকে ভালবেসে অনেক রকমের কষ্ট পেয়েছি আজ পর্যন্ত, তার জন্যে ত হয় ব্ল্যাকমেইলারের দেওয়া কষ্টও সহ্য করতে হবে।

ইতি—

'তোমার ভালবাসার অবহেলার কুরুদা'

ষষ্টি-মধু

নভেম্বরে স্কোয়ের কাটতি সংখ্যা বার হচ্ছে। আপনিই গ্রাহক হোন। এই সংখ্যা [illegible].00 × বার্ষিক ১-০০

প্রকাশক : কুলরেশ ঘোষ

কলকাতা ৪ কলকাতা ৪৪

প্যারী, ক্যান ক্যান, রে ডুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত আসল স্টোরেই পাওয়া যায়।

বাংলার পরিবেশক :

সরকার সেলসিডেক্স প্রাঃ লিঃ

১১ স্টোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

বাঁচার জন্য

প্রফুল্ল রায়

মাঘ মাস শেষ হয়ে এল। তবু শীত যাবার নাম করে না। তার ওপর আজ সকাল থেকেই আকাশের এ-কোণে ও-কোণে পাথরের চাঙড়ার মতন মেঘ জমে আছে। মাঝে মধ্যে একটু আধটু রোদ দেখা দেয় বেলাশেষে ভারী আকাশ আচমকা চমক দিয়ে ওঠে পরক্ষণেই আভাটুকু নিভে যায়।

বিষ্টুপদ যখন উত্তরের মাঠে এসে পৌঁছল, শীতের বেলা হেলে গেছে। গাছপালার ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে।

বিষ্টুপদের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। ঝিঙের মতন মোটা নাকটার দু-ধারে গোলগোল চোখ। কথা নেই বললেই হয়। কালচে পুরু ঠোঁট নীচের দিকে ঝুলে আছে। রঙ ফর্সা-গোলাপী। গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা। শক্তপোক্ত চামড়া থেকে খই উড়ছে। সব মিলিয়ে বাজে-পোড়া তালগাছ যেন। লোকটার সারা গায়ে মোটা মোটা শক্ত হাড় শুধু। এই কাঠামোয় একটু বুদ্ধি মাংস লাগত বিষ্টুপদ পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড বলশালী একটা মানুষে হয়ে উঠতে পারত।

আজ তিনদিন কাজ নেই বিষ্টুপদের। কাজ নেই কাজেই জোরগায়ও নেই। তার মতন ভূমিহীন দিন-মজুরের ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনাদানা জমানো থাকে না যে বসে বসে খেতে পারবে। দু-চার দানা যা চালটাল ছিল কাল পর্যন্ত চলেছে। আজ যদি কিছু জোটাতে পারে বউ ছেলেপুলে খেতে পাবে। নইলে উপোষ।

ঘুম থেকে উঠেই কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল বিষ্টুপদ। কিন্তু কোথায় কাজ? ঘুরে ঘুরে যখন সে ক্লান্ত আর হতাশ সেই সময় উত্তরের এই মাঠটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

উত্তরের এই মাঠ অনেকবার বিষ্টুপদকে বাঁচিয়েছে। এখান থেকে কোনবার ফল পাকুড়, কোনবার শাকপাতা, কোনবার পাখি-টাখি কোনবার মেঠো কচ্ছপ কোনবার খরগোশ নিয়ে গিয়ে ছেলেপুলের প্রাণ রক্ষা করেছে সে। আজও আশায় আশায় এসেছে।

মাঠে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিষ্টুপদ। জায়গাটা নির্জন। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে যতদূর চোখ যায় ধানে-ভরা জমি। এই শীতে ধান অবশ্য সজীব সবুজের উজ্জ্বল নেই বিবর্ণ আকাশে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কোপ-ঝাড় গাছ-গাছালি। মাঠের ভেতর দিয়ে একটা খালও গেছে।

ঘুম থেকে উঠেই কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল বিষ্টুপদ। কিন্তু কোথায় কাজ? ঘুরে ঘুরে যখন সে ক্লান্ত আর হতাশ সেই সময় উত্তরের এই মাঠটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

চারদিক দেখতে দেখতে এক সময় হাঁটতে শুরু করল বিষ্টুপদ। এই পড়ন্ত বেলায় মাথার ওপর কা-কা-রত পাখি উড়ছে। বিষ্টুপদ ভাবল গুলাইটা যদি মিলত। আকাশ থেকে খুব সহজেই দু-একটা পাখি নামানো যেত। না বড় ফুস হয়ে গেছে।

চলতে চলতে ঝোপ অথবা গাছ সামনে পড়ছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে বিষ্টুপদ। ঘাসের জমিতেও তার সমান নজর। কিন্তু যা সে চায়, যা তার কাম্য তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না।

অনেকক্ষণ হাঁটবার পর হঠাৎ মাঠের মাঝখানে খালের দিকে নজর ছোটে থাকে গেল বিষ্টুপদ। খালের পাড়ে একটা মেয়ে-মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন তাকেই দেখছে।

বিষ্টুপদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দশ পা হাঁটলেই মেয়ে-মানুষটাকে ধরা যায়। এত কাছে বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মেয়ে-মানুষটির চোখ ভীত, সন্দিগ্ধ।

এই নির্জন মাঠে শীতের অবেলায় কোত্থেকে এল মেয়েমানুষটা। বিষ্টুপদ ভেবে পেল না। সে-ও একাকীই আছে। মেয়েমানুষটির রং শ্যামলা, গোলগাল ডাটো গড়ন, বোঁচা নাক পুষ্ট বুক। স্বাস্থ্য এত উদ্দাম আর অঢেল যে পরনের খাটো শাড়িটায় যেন মানছে না। তার হাতে একটা বড় কাটারি।

অনেকক্ষণ পর বিষ্টুপদ শুধোল, 'তুমি কে গো এইখেনে?'

তীক্ষ্ণ চাপা গলায় মেয়েমানুষটি বলল, 'সেই হই না। তুমি এখেন থেকে (থেকে) যাও দিকিন।'

'যাও বইলেই কওটা যায় নাকি? এখেনে আমার কাজ আছে।

'কী কাজ?'

'কাজ আছে।' বলে একটু থামল বিষ্টুপদ। তারপর আবার বলল, 'এই নির্জন মাঠে একা-একা তুমি এয়েছ?'

মেয়েমানুষটি বলল, 'আমারও কাজ আছে।'

নিজের অজান্তেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল বিষ্টুপদ। মেয়েমানুষটি তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, এক পাও এগুবে না বাপ্টা বসিয়ে দেবো কিন্তুক।'

বিষ্টুপদ চমকে উঠল। লক্ষ্য করল, একটু আগের ভয় আর নেই মেয়েমানুষটার। তার চোখের তারা এখন দপদপ করছে।

ভয় ভয় বিষ্টুপদ বলল, 'বেশ তোমার যাখন ইচ্ছে নয়, এখুন না। কিন্তুন তুমি মানুষটা কুথাকার কুথেকে (কোথা থেকে) এখেনে এলে, তা কইতে বোধটা কী?'

'কি জেবে মেয়েমানুষটা কিছু, নয়ন হল, আমি তালডাঙায় থাকি। হেই উত্তরে—'

'সি তো অনেক দূর, পেরায় দু' কোশ রাস্তা হবে।'

'হ্যাঁ—'

'অদ্দুর থেকে এয়েছ।'

'দরকার পড়লে আসতে হবে নি?'

'দরকারটা কী, ওও না?'

মেয়েমানুষটি বলল, অত যাখন জানবার ইচ্ছে শোন। আমি শাগপাতা ফল-পাকড়ের তত্ত্বে (জন্য) এখেনে এয়েছি।'

বিষ্টুপদ অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'কী অশ্চয্যি, আমিও তো ঐ সবের তত্ত্বেই (জন্যই) এয়েছি।'

মেয়েমানুষটির চোখের তারা আবার ঝলমলিয়ে উঠল, মিছে কথা।'

মাইরি কইছি, মিছে কথা নয়—বিষ্টুপদ আকুলভাবে বলতে লাগল 'ভগমানের দিব্যি। সকাল থেকে ছেলেপুলো উপুষ দিয়ে আছে। তিন দিন এক পয়সা রোজকার নেই। এই মাঠ থেকে কিছু না নিয়ে ঘরে ফিরলে বাচ্চাকাচ্চা বাঁচবে নি।'

বিষ্টুপদের কণ্ঠস্বর শুনে, তার আকুলতা দেখে কথাটা বিশ্বাস করল মেয়েমানুষটি। বলল, 'তুমো খনাপ মতলব নেই তো তোমার?'

'অই দ্যাখো, ভগমানের দিব্যি দিয়ে কইলাম। বেশ কাছে এইগে (এগিয়ে) এস, তোমার গা ছুঁয়ে কইছি।'

'গা ছুঁতে হবে নি। তা ঘর কুথায় তোমার?

'পয়লপুরে—হেই দক্ষিণে—' দক্ষিণ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল বিষ্টুপদ। তোমার ঘরও তো অনেক দূর।'

একড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁত বের করে বিষ্টুপদ হাসল হ্যাঁ। ঐ যে দুমকা ইস্কুল, নয়কয় পড়লে নুয়ে যেতেও আসতে হয়ে—'

মেয়েমানুষটি বলল, 'তা বটে।'

বিষ্টুপদ বলল, 'এত কথাবার্তা হল। কিন্তুন কেউ কারো নাম জানি না। আমার নামটে বিষ্টুপদ। তোমার?'

'নিশি—নিশিবালা।'

একটু চুপ। তারপর বিষ্টুপদ বলল, 'একটা কথা কইব মেইয়েমানুষ—'

'কী?'

'তুমি যার তরে (জন্য) এয়েছ আমিও তার তরেই এইছি। এসো না দুজনে একত্তর (একসঙ্গে) শাগপাতা ফল-পাকড় খুঁজি। শীতের বেলা, এক্ষুনি সনজে নেবে যাবে। তুমি যুবতী মেইয়েছেলে, একা একা মাঠে ঘুরে বেড়ানো ঠিক লয়।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নিশি বলল, 'সেই ভালো চল তোমার সনগেই যাই।' সে নিজে থেকেই বিষ্টুপদর কাছে এগিয়ে এল।

তারপর মাঠের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দুজনে একটা অলিখিত চুক্তি করে ফেলল। এখানে যা পাওয়া যাবে তারা সমান দু-ভাগ করে নেবে।

এই মাঠের প্রতিটি ঝোপঝাড়, প্রতিটি খানা খন্দে বিষ্টুপদ আর নিশি হানা দিতে লাগল। কিন্তু গোটা চারেক ছোট ছোট মেঠো কচুপ ছাড়া আর কিছুই মিলল না। ওগুলোর শক্ত খোলা ছাড়ালে কতটুকু আর মাংস পাওয়া যাবে?

মুখ বুজে তারা হাঁটছিল না। খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কখনও নিশি শুধোয়, 'ঘরে তোমার কে কে আছে গো বাচ্চাছেলে?' এই অল্প সময়টুকুর ভেতর বিষ্টুপদ সম্বন্ধে তার মন থেকে সন্দেহ আর ভয় কেটে গেছে। তাকে মোটামুটি বিশ্বাস করতে পেরেছে নিশি।

বিষ্টুপদ বলে, ছেলেপুলো আর মাগ।

'কটা ছেলেপুলো?'

'তিনটে। দুটো মন্দ ছেলে আর একটা মেইয়ে।'

'তা হলে পাঁচজনের সোমসার তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কী কর তুমি?'

'মজুর খাটি।'

'ওতে চলে?'

'চলে আর কই। পেরায় দিনই আধপেটা খাই। বইলে উপুষে।'

একটু ভেবে নিশি বলে, 'জমিন-টমিন আছে?'

বিষ্টুপদ বলে, 'জমিন কুথায় পাব?'

'শুধু গতরের ওপর ভরসা করে তাইলে বাঁচা!'

'হ্যাঁ।'

'সি যে বড় কষ্ট।'

'কষ্ট হলে আর কী করব। এমনি করে যদিন টেঁকা যায়।'

কখনও বিষ্টুপদ শুধোয়, 'আমার কথাই শুদু শুনবে? তোমার কথা কও—'

নিশি বলে, 'আমার আবার নতুন কথা আছে নাকিন? গতরের ওপর আমারও ভরসা।'

সি (তা) কি আর বুঝতে পারিনি ভেবেছ? ঠিকই পেরেছি। আমি সি কথা শুদোচ্ছি নাগো মেইয়েছেলে—'

'তবে কী শুদোচ্ছ?'

ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গিনীকে এক পলক দেখে নিল বিষ্টুপদ। তারপর বলল, 'পাখা সিঁদুরে দেখছ না। মেইয়েছেলের কি এখনও বে (বিয়ে) হয় নি?'

অন্যমনস্কের মতন নিশি বলল, 'হয়েছিল।'

'তা হলে?'

বিষ্টুপদ কী জানতে চায়, নিশি বুঝতে পারল। বিয়ে হয়েছিল অথচ তার হাতে শাঁখা নেই, কপালে সিঁদুর নেই। তাই হয়তো বিষ্টুপদর ধন্দ লাগছে। ভারী বিষণ্ণ গলায় নিশি বলল, আমার মদ্দটা নেই।'

জিভের ডগায় আক্ষেপসূচক চুকচুক শব্দ করল বিষ্টুপদ। দুঃখের গলায় বলল, 'আহা গো, এই বয়েসেই সোয়ামী খোয়ালে?'

নিশি উত্তর দিল না।

বিষ্টুপদ আবার বলল, 'তা কী হয়েছিল? রোগ-ব্যায়রাম?'

নিশি বলল, 'না। জোতদারদের সনগে লড়াই করতে গিয়ে মরেছে। পেটে সড়কি চালিয়ে দিয়েছিল ওরা, নাড়িভুঁড়ি বেইরে এসেছিল। সি চোখে দেখা যায় না গো—' বলতে বলতে হঠাৎ এই জনহীন স্তব্ধ প্রান্তরকে চমকে দিয়ে গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল, 'অ বাবা গো, আমার অত বড় জোয়ান মদ্দটাকে ওরা মেরে ফেললে গো।'

বিষ্টুপদ একটু দ্বিধা করল। তারপর নিশির রুক্ষ চুলে হাত বুলাতে বুলাতে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'কেঁদো নি মেইয়েছেলে, কেঁদোনি। কেতি (ক্ষতি) যা হবার তা হয়েই গেছে।'

অনেকক্ষণ পর শোকোচ্ছ্বাস শান্ত হলে বিষ্টুপদ শুধোলো, 'ছেলেপুলা কটা গো তোমার?'

আবেগ গলায় নিশি বলল, 'নেই।'

'তবু রক্ষে।'

নিশি চুপ করে রইল।

বিষ্টুপদ আবার শুধোল, 'সোয়সার আর কেউ আছে?'

'বুড়ী শাউড়ী আছে। দিন-রাত্তির হাঁ করেই থাকে; যত খিদে বুড়ীর। অত বড় পাহাড়ের পানা (মতো) ছেলেটাকে খেল তবু খিদে মেটে না। ওর হাঁ বুজোতে বুজোতে আমিই একদিন সাবাড় হয়ে যাব।'

'জমিন-টমিন আছে?'

'থাকলে কি আর শাগ-পাতার তত্ত্বে মাঠে মাঠে ঘুরে মরছি!'

দুজনে খুঁজছে খুঁজেই যাচ্ছে। কিন্তু জননীর মতন এই বিশাল মাঠ আজ বড় কৃপণ বড় নির্দয়। চারটে মেঠো কচুপের পর গোটা পাঁচেক পাকা বেল ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কিছুই পাওয়া যায় নি। আধাআধি করলে ভাগে আর কতটুকু বা পড়বে?

পশ্চিমে শীতের বেলা আরো ঢলে পড়েছে। রোদ-টোদ এখন আর নেই। সূর্যটা পশ্চিম দিকের ঘন গাছ-গাছালির আড়ালে কখন টুপ করে নেমে গেছে

বিষ্টুপদ বা নিশি টের পায় নি। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার, আলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সকাল থেকেই আকাশের এধারে-ওধারে মেঘের চাঙড় দুলছিল; হঠাৎ সেগুলো অনেকখানি নেমে এসেছে যেন। কোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। তার ওপর আছে ঝলকনে উত্তুরে বাতাস। চামড়া মাংস ভেদ করে বাতাসটা একেবারে হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। ঠাণ্ডা তৃণভূমি থেকে হিম উঠে আসছিল।

ডান পাশ থেকে নিশি বলল, 'শালা বড্ড শীত লয়?'

অন্যমনস্কের মতন বিষ্টুপদ উত্তর দিল 'হ্যাঁ।'

'আবার বিষ্টিও শুরু হল।'

'হ্যাঁ।'

বিষ্টুপদ নিশির কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু মনে মনে অন্য কথা ভাবছিল। ভাগের ভাগ দুটো কচ্ছপ আর আড়াইখানা বেল বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বউ মুখে দেবে? সে বলল, 'আলো কিছু না হলে তো চলবে নি মেইয়েছেলে। আমার সোয়সারে আবার পাঁচটা মুখ।'

নিশি বলল, 'ঠিক কথা। কিন্তু সন্ধে নেমে এল। বিষ্টিও পড়তে লেগেছে। এখন আর কিছু কী পাওয়া যাবে?' তার চোখে মুখে গলার স্বরে সন্দেহ।

'দেখি—' বলতে বলতেই বিষ্টুপদর চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সামনে আকুল বাড়িয়ে ঈষৎ উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল 'ওটা কী গো?'

নিশি সেদিকে তাকিয়ে বলল 'শুয়ার (শূকর) মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

মড়াটা উথেলে কী করছে?'

ভাল করে লক্ষ্য করল বিষ্টুপদ। তারপর বলল, 'মাটি খুঁড়ছে।'

নিশি জানাল, 'শুয়ারটা যখন মাটি খুঁড়ছে তখন নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে। মাটির তলায় কিছু না পেলে অকারণে ওরা খোঁড়ে না।'

বিষ্টুপদ বলল, 'চল না এইগ্যে দেখি।' তার মাথায় বিদ্যুৎ-চমকানির মতন অন্য একটা চিন্তা খেলতে শুরু করেছে। কিছুই যখন পাওয়া গেল না তখন শুয়োরটাকে হত্যা করবে বিষ্টুপদ। শুয়োরটার ওজন কম করে মন-খানেক। নিশিবালাকে অর্ধেক ভাগ দিয়ে যা মাংস পাওয়া যাবে তিন-চারদিন তারা পাঁচটা প্রাণী ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েও শেষ করতে পারবে না। তিন-চারটে দিন বেঁচে থাকতে পারলে তার পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে।

মনের কথাটা নিশিকে জানাতে সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'কথাটা ভাল। কিন্তুন—'

'কী?'

'অত বড় ঘুমসো জানোয়ের (জানোয়ারের) সঙ্গে পারবে নি মেইয়েছেলে। তার ওপর দামনাটা যদি দাঁতাল হয়, রক্ষে রাখবে না।'

বিষ্টুপদ বলল, 'আমার টাঙি আছে না আছে।'

নিশি বলল, 'টাঙি দা দিয়ে ঐ যমটাকে কাবেল করতে লারবে।'

নাছোড়ার মতন বিষ্টুপদ বলল, 'লারি লারব। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি। না খেয়ে মরার চাইতে শোয়ের সঙ্গে একটা লড়াই দি না—' নিশিকে আর কিছু ভাববার বা বলবার সময় না দিয়ে বিষ্টুপদ এগিয়ে গেল। নিশি আর কী করে, তার পিছু নিল।

কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল ওটা দাঁতাল না তবে বড়সড় শুয়োর। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে জন্তুটা অনেকখানি জায়গা গর্ত করে ফেলেছে। গর্তের ভেতর তাকাতেই চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল বিষ্টুপদর। একটা প্রকাণ্ড থাম আলুর অর্ধেক মতন মাটির তলায় সোঁদা বাকি অর্ধেক ওপরে মাথা তুলে আছে বোঝা গেল শুয়োরটাই মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে থাম আলুটাকে বার করেছে।

বিষ্টুপদ আন্দাজ করল আলুটার ওজন কম করে দশ সেরের মতন হবে। শুয়োরটাকে মারতে না পারলেও শুধু আলুটাও যদি পাওয়া যায় তা-ও কম না। মনে মনে হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলল শুয়োরের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কাজ নেই। ওটাকে তাড়িয়ে আলুটাকেই বরং নেওয়া যাক।

পেছন থেকে জোড়া গলায় নিশি বলে উঠল, 'কত বড় থাম আলু দেখেছ ব্যাটাছেলে—'

বিষ্টুপদ বলল, 'হ্যাঁ।'

আপন মনে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছিল শুয়োরটা। মানুষের গলার আওয়াজে চমকে মুখ তুলল। শুয়োরটার ছোট-ছোট চোখ ঘোলাটে লাল। সারা গায়ে আর মুখে মাটি মাখা।

বিষ্টুপদ ওটাকে তাড়াবার জন্য মুখের ভেতর শব্দ করে উঠল, 'উ-য়া-রা, হট-হট-হোই—'

শুয়োরটা নড়ল না। একদৃষ্টে বিষ্টুপদর দিকে তাকিয়ে রইল। তার ছোট ছোট চোখে সন্দেহ ঘন হতে লাগল।

বিষ্টুপদ আবার শব্দ করল। তার সঙ্গে সঙ্গে নিশিও। কিন্তু শুয়োরটা নড়ল।

বিষ্টুপদ বলল, 'শালা ওজন আছে। নড়বে বলে মনে হয় না।'

নিশি বলল, 'আমরা থাম আলুটা দোব বলিন টের পেয়েছে।'

'তা হবে।' বিষ্টুপদ বলতে লাগল, 'তা বলে কিছু হবে নি মেইয়েছেলে।

"সোনার কাঠি" অনুরাগীরা এখনও "সোনার কাঠিকে" ভোলেনি দেখে আমরা আনন্দিত। নতুন সহযোগিতায় "সোনার কাঠি" আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এটাই আমাদের আশা।

সব ছোটদের মনের কাগজ—সচিত্র মাসিক

সোনার কাঠি ৩য় বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা : ১লা বৈশাখ বেরোবে। দাম : প্রতি সংখ্যা ১-২৫ প
বার্ষিক গ্রাহক : ১৭ টাকা (বিশেষ সংখ্যাসহ)। হাতে নিলে ১৬ টাকা

এ সংখ্যায় লিখছেন : বনফুল, স্বপনবুড়ো, ইন্দিরা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, ডঃ অলোক চক্রবর্তী, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশা দেবী, গোপাল ভৌমিক পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, নন্দবিন্দু বেরা, বিশ্বদেব বিশ্বাস, অহিভূষণ মালিক, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং পার্থসারথি চৌধুরী।

বিভিন্ন পত্রিকা স্টল থেকে পত্রিকাটি সংগ্রহ করতে পারেন অথবা আপনার বাড়ীতে যিনি খবরের কাগজ দেন তাঁকে বললেই তিনি পৌঁছে দেবেন "সোনার কাঠি" ঠিক সময়ে আপনার হাতে। সব চাইতে ভালো গ্রাহক হয়ে যাওয়া, তাহলে "সোনার কাঠি" পেতে আর কোন অসুবিধাই থাকবে না।

- এজেন্টরূপে পত্রিকা জানার এ-সংখ্যা আপনার কত কপি প্রয়োজন।
- নতুন এজেন্সির জন্য অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সোনার কাঠি এম, টি, ৭২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

শালার ব্যাটার টাঁটির কোপ খাবার ভয়ে পা অসোচ্ছে।' বলেই এগিয়ে গিয়ে কাঁধ থেকে টাঁটিটা নামিয়ে শুয়োরটার ঘাড়ের কাছে কোপ বসাল।

কোপটা ঠিক মত লাগে নি। শুয়োরটার ঘাড় থেকে একটুখানি মাংস ছিঁড়ে ঝুলে রয়। হিংস্র কটিল চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জন্তুটা হঠাৎ তেড়ে এল।

আচমকা এরকম তাড়া করবে বিষ্টুপদরা ভাবতে পারে নি। তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল।

অনেক দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শুয়োরটা আবার ঘুরে আলুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিষ্টুপদরা কিন্তু থমল না, একটু পর তারাও শুয়োরটার কাছে ফিরে এল। এসেই আবার কোপ লাগাল বিষ্টুপদ। এবার পিঠের কাছে অনেকটা কেটে গেল। রক্তাক্ত জানোয়ারটা আবার বিষ্টুপদদের তাড়া করল।

তাড়া খেয়ে বিষ্টুপদরা ঘুরে চলে যায়। তারপর ফিরে এসে সুবিধা মতন শুয়োরটাকে এলোপাথাড়ি কোপ দেয়। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল।

এদিকে শীতের সন্ধ্যে আরো নিবিড় হয়েছে; গাছ-গাছালির ফাঁকে ছায়া ঘন হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। খানিক আগে ছোটো-ছোটো বৃষ্টি পড়ছিল এখন বেশ জোরেই নেমেছে। তার সঙ্গে উত্তরের হাওয়া বেশ আছাই।

নিশি হতাশই হয়ে পড়েছে। সে বলল, 'আজকের দাও কাটাছেলে। ওই যন্ত্রের মুখ থেকে তুমি খাম আলু নিতে লারবে।'

বিষ্টুপদর জেদ চেপে গিয়েছিল। সে বলল, 'কক্ষনো না; খাম আলু না নিয়ে আমি লড়ছি না। সুবিধে হলে আলুটাও জোর পেটের জানোয়ারও শেষ করব। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে। একেলে আর দুজন উটার সামনে দেঁড়াব নি। আমি সামনে দেঁড়াব, তুমি উটার পেছুতে। আমার যদিন তাড়া লাগায় তুমি পেছু থেকে কোপ মারবে। তোমার তাড়া লাগালে আমি কোপ মারব।'

পরিকল্পনা অনুযায়ী বিষ্টুপদ আর নিশি শুয়োরটার সামনে-পেছনে দাঁড়াল। শুয়োরটা কী বুঝল কে জানে। হয়তো আন্দাজ করল, তার এত কষ্টের খাদ্য আলুটার দাবীদার জুটেছে।

আঘাত হানবার আগেই শুয়োরটা হঠাৎ ঘাড় গুঁজে বিষ্টুপদর দিকে ছুটে এল। জন্তুটা এত দ্রুত চলে এসেছে যে আত্মরক্ষার সময় পাওয়া গেল না। সকাল থেকে পেটে একটা দানাও পড়ে নি বিষ্টুপদর। শরীরটা এমনিতেই দুর্বল হয়ে আছে। প্রমাণসাইজ ওজনের শুয়োরটার ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ে গেল। হাতলটাই অস্ত্র করল উত্তুঙ্গ ভেতর ধারাল দাঁত ঢুকে যাচ্ছে।

বিষ্টুপদ চিৎকার করে উঠল, 'ভেবে ক্যালল মেরে ফ্যালল। বাঁচাও—বলতে বলতেই তার হাত কোমরের কাছে চলে গেল: ধারাল দাটা একটানে খুলে নিয়ে জন্তুটার নাকের কাছে সমস্ত শক্তিতে বা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

ওদিকে পেছন থেকে ছুটে এসে নিশি শুয়োরটাকে কোপাতে শুরু করেছে। ক্ষত-বিক্ষত জানোয়ার বিষ্টুপদকে ছেড়ে পেছন ফিরে নিশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে সে-ও ছিটকে পড়ল; শুয়োরের দাঁতে তার শার্ট আর দেহ ফালা-ফালা হয়ে ছিঁড়তে লাগল। সেই অবস্থাতেই অসুরের মতন হাতের কাটারিটা চালিয়ে যাচ্ছে।

উত্তুঙ্গ বেশ জব্দ হয়েছিল বিষ্টুপদর। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। কিন্তু তা নিয়ে বসে থাকল না সে। উন্মাদের মতন ছুটে গিয়ে শুয়োরটার মাথায় টাঙির কোপ বসাতে লাগল। নিশিকে ছেড়ে শুয়োরটা আবার বিষ্টুপদকে তেড়ে এল: মাটি থেকে উঠে নিশি পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল।

শুয়োরটা আঘাত খেয়ে একবার যায় বিষ্টুপদর দিকে তার পরেই ছোটে নিশির দিকে। দেখতে দেখতে শীতের বাপসা জোৎস্নায় এই নির্জন, প্রান্তর পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে উঠল। খাদ্যের জন্য দুই মানব-মানবী আর এক হিংস্র জন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর মুখের কাছে বিষ্টুপদর টাঙির প্রচণ্ড ঘা খেয়ে শুয়োরটা প্রাণফাটানো চিৎকার করে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে তীরের মতন পশ্চিম দিকের জঙ্গলের ভেতর ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুয়োরটা পালিয়ে যাবার পর বিষ্টুপদ আর নিশি অনেকক্ষণ নির্জীবের মত পড়ে থাকল। তারপর হুঁকতে হুঁকতে উঠে খাম আলুর বাকিটা কুড়িয়ে বার করে নেবার।

খাম আলু কয়েক আর বেল এক জায়গায় জড়ো করে ওরা ভাগাভাগি করতে যাবে, সেই সময় বৃষ্টিটা চেপে এল।

যতক্ষণ লড়াই চলছিল বুঝতে পারা যায় নি। উত্তেজনা আর আদিম হিংস্রতা ছাড়া শরীর যা মনে তখন অন্য কোন বোধ ছিল না। এখন বিষ্টুপদরা টের পেতে লাগল, ভীষণ শীত করছে। হাড়ের ভেতর থেকে থরথর কাঁপুনি উঠে আসছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে যেন।

বিষ্টুপদ বলল, 'কী নচ্ছার বৃষ্টি এল দেখ—'

নিশি কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'এখেনে বেঁচেবর্তে থাকলে নিলঘাৎ ঘরে জায় ব্যাটা-ছেলে। এট্টা কিছু ব্যাওস্থা কর।'

'কুথায় যাওয়া যায় বল দিকিন—'

কি ভেবে নিশি বলল, 'পশ্চিম দিকে একটা শ্মশানঘাট রয়েছে না? সেখানে তো এট্টা ঘর আছে। চল সেখেনে যাই।'

বিষ্টুপদর মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ চল—'

দুজনে দৌড়তে দৌড়তে শ্মশানের চালা ঘরে চলে এল। ঘরটা শবযাত্রীদের বসবার জন্য এক সময় তোলা হয়েছিল।

গায়ের রক্ত মুছে নিশি আর বিষ্টুপদ বসে বসে কিছুক্ষণ হাঁপাল। তারপর বিষ্টুপদই বলল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে মেইয়েছেলে।'

নিশি বলল, 'আমারও।'

'খাওয়ার যোগাড় করি এস।'

খাম আলুর খানিকটা কেটে রক্তমাখা নিশি, বিষ্টুপদ একটা কাছপের খোলা ছাড়িয়ে মাংস বার করল।

কিছুক্ষণ আগে কারা একটা মড়া পুড়িয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আগুন এনে মাংস আর আলু ঝলসে নিল দুজনে। তারপর খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলল।

বিষ্টুপদ বলল, 'সারাদিন পর এই পেটে পড়ল।'

নিশি বলল, 'আমারও।'

'খাওয়া হল; এখন যদিন একটা বিড়ি পাওয়া যেত।'

'হ্যাঁ। আমারও পানের বড় সখ। যদিন পেতাম গো।'

এদিকে বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। আকাশ ফালা-ফালা করে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

নিশি বলল, 'এ বিষ্টি সাজ ছাড়বে নি মনে হচ্ছে।'

'হুঁ—' বিষ্টুপদ মাথা নাড়ল।

'আজ রাত্তিরটা এখেনেই কাটাতে হবে।'

'হুঁ।'

আরো কিছুক্ষণ পর বিষ্টুপদ বলল, 'বসে থেকে আর কী হবে? আমি শুয়ে পড়লাম।'

নিশি বলল, 'আমিও শোব।'

দুজনে ঘরের দুদিকে শুয়ে পড়ল। মাঝখানে বেল খানিকটা দূরত্ব।

রাত আরো গাঢ় হলে নিশি হঠাৎ ডাকল, 'ব্যাটাছেলে—'

ঘরের দূর প্রান্ত থেকে বিষ্টুপদ সাড়া দিল 'কী কইছ?'

'আমার কাছে এস।'

'কেন?'

'বড্ড শীত; আমায় এট্টু জড়িয়ে ধর বিষ্টু।'

এই দুর্যোগ-ভরা শীতের রাতে পরস্পরের দেহ উত্তপ্ত রাখবার জন্য নিশি আর বিষ্টুপদ জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকল।

পরের দিন সকালবেলা বেল কয়েক মুখে করে ছেঁড়া খাম আলুটা ভাগাভাগি করে নিশি গেল উত্তরে, বিষ্টুপদ দক্ষিণে।

CENTRAL LIBRARY

পাহাড়ের রঙ

সুমথনাথ ঘোষ

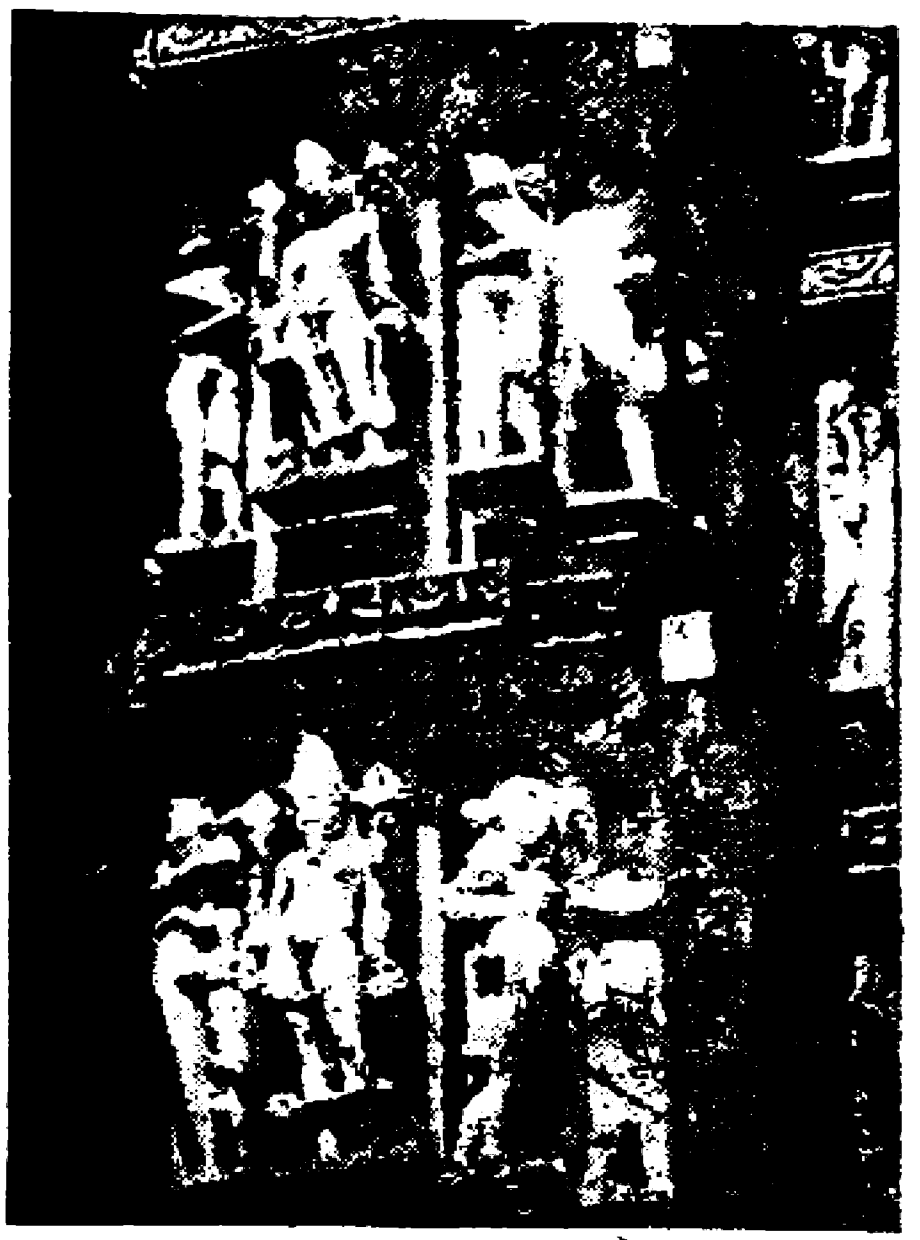

এধারে-ওধারে পাইনবার্চের জটলা। ছোট ছোট কত ফুলের গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। অন্য দূরে, আকাশের গায়ে যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরতুষার দিয়ে চিত্র আঁকা? এমন জায়গায় বসে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়া সৌভাগ্য বৈকি। অন্তত ভবতোষের মনের তাই বিশ্বাস! ঠিক ছাতাটার নীচে তখনো টেনটে সিট ছিল। ছাতার আশ্রয়টুকু যারা সহ্য করতে নারাজ, তারা ছিটকে ছড়িয়ে বসেছিল ছোট ছোট টেবিলে, জোড়ে জোড়ে মুখোমুখি—পুরুষ ও নারী। যেন কাছে থেকেও আরো কাছে পেতে চায় নিজেদের। তাই কারো সামনে চায়ের পেয়ালায় চা জুড়োয় নিঃশব্দে, কারো বা সিগারেট ধূম্রজালগুলির মধ্যে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়, খেয়াল থাকে না। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু অস্ফুট গুঞ্জন করে—কাছাকাছি টেবিলে বসেও কেউ বুঝি—তা শুনতে পায় না। বেশ একটা অন্তরঙ্গ মধুর আমেজ।

কেবল ভবতোষ একা যেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম। একটা শূন্য চেয়ার দখল করে ক্যাটলেটের শক্ত মাংসে দাঁত নিয়ে ছিঁড়ে চা খাচ্ছিল। ঠিক ওর সামনে আর দুটো শূন্য আসন পড়েছিল। একটু পরে সেখানে এসে বসলো দুজন। একটি সুদর্শন পাঞ্জাবী যুবক আর এক তরুণী যুবতী, ওর স্ত্রী হলেও কিন্তু জাতে পাঞ্জাবী নয়—অন্য প্রদেশী। যদিও বাঙ্গালী সুলভ কোমলতা ওর চলনে বলনে, ভাবে ভঙ্গীতে সর্বত্র কিন্তু যেমন ঢাক্কা, তেমনি সুগম ছন্দোময় দেহটি যেন লতানে অপরাজিতার মত ঘন পাতায় ও পুষ্পে সুশোভিত। রুক্ষকেশ চুল, ঠোঁটে রং, চোখে কাজল হলেও কোথায় যেন একটা রুচির শাসন ছিল, কোন উগ্রতা দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না। ভবতোষের একেবারে সামনে ওরা বসেছিল। বেয়ারার অন্য কোন সিট খালি ছিল না বলেই একেবারে ওর মুখোমুখি বসতে বাধ্য হয়েছিল। কাট-লেটের টুকরোটা চিবুতে চিবুতে চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে আড়চোখে একবার চট করে মেয়েটিকে দেখে নিল ভবতোষ। কিন্তু দৃষ্টিটা দ্রুত সরিয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, এই ধরণের চোখের চাউনী এর আগে যেন কোথায় দেখেছে! ঠিক এমনি না হলেও যেন এর সঙ্গে কারুর সাদৃশ্য আছে! চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়া আর ভাবে না। অসম্ভব! যার মুখটা মনে আছে, তার কোথায় কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? পদ্মের সঙ্গে ছোট্ট ফুলের তুলনা? কুমকুম? সেই রোগা কাঠের মত দেহ। যেন শুকনো একটা খেজুর গাছ? আঠারো বছর যে ওর হদিস কে বলবে। তার সঙ্গে চোখের সামান্য আলাপ আজ এই পর্যন্ত! মন থেকে তৎক্ষণাৎ কুমকুমের স্মৃতি মুছে ফেলে ভবতোষ। ওর নামটা এর সঙ্গে মনে পড়তে গা যেন ঘিন-ঘিন করে ওঠে। অপালো একবার আকাশের ভবতোষের সামনের সুন্দরী তরুণীটির দিকে চোখটা যেন জড়িয়ে গেল। রং করা মুখ। কি নিশ্চিন্ত! কি মধুর! যার জন্যে ভবতোষের মনে এত তোলা পাড় তার কিন্তু কোন কিছুই খেয়াল ছিল না। খাওয়াটা যেন গৌণ! হাসিতে চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে কখনো মেয়েটির অনেক কাছে মাথাটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি বলছিল, আবার কখনো কিলকারের ভঙ্গীতে হেসে লুটিয়ে পড়ছিল। নো ডার্লিং, স্টপ ইট সিলি! মেয়েটির মুখের ওই ইংরিজী কথাগুলো যেন ভবতোষের কানে অমৃতবর্ষণ করে। সাঁওতাল ভরতীয় কোন মেয়ের মুখে এত মিষ্টি ইংরিজী উচ্চারণ ইতিপূর্বে শোনেনি ভবতোষ! সেই তরুণী যুবতীর কণ্ঠের মাধুর্যে যেন ইংরিজী শব্দগুলোকে অবলম্বন করে সরস হয়ে ওঠে জিহ্বাগ্রে তারপর ওই রক্তাভ ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে একটি একটি করে পাকা আঙ্গুরের দানার মত ঝরে পড়ে। ইংরেজের মুখের যে ইংরিজী কথাগুলো মনে হয় যেন কর্ণপটাহে আঘাত করে সজোরে কান মুলে দিয়ে যায়, ওই তরুণীর কণ্ঠে তা যেন সঙ্গীত হয়ে বাজে। দু'কানে মধু ঝরে নিয়ে উঠে যায় এক সময় ভবতোষ। আর সহ্য করতে পারে না। চোখের সামনে আর একজনের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে, সে অবিবাহিত। বিবাহের বয়স অনেককাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য পাত্রী জোটেনি বলে যে বিয়ে করেনি তা নয়, যেমনটি সে চায়, তেমনটি পায়নি। অথচ ঠিক যে কেমন চায়, তাও বুঝিয়ে বলতে পারে না। আজ এই মেয়েটিকে

নতুন
হিমু-ক্রীম এর
নতুনত্ব
কিসে ?

নামে তো বটেই

খেয়ে দেখুন
বুঝবেন কত
মোলায়েম,
কত মধুর
আস্বাদে ভরা
আর দামে বাজারের
সমশ্রেণীর আইসক্রীমের
তুলনায় অনেক কম।

ডিরেক্টরেট অফ ডেয়ারী ডেভলপমেন্ট,
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রস্তুত।

দেখে তার সমস্ত মন যেন একসঙ্গে চীৎকার করে বলে ওঠে, ঠিক এমনি একজনকেই সে চেয়েছিল জীবনসঙ্গিনী করতে। ওরা চলে গেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ভবতোষ সেইখানে, ঠিক তেমনিভাবে। ওর দুই কানের ভেতরে তখনো ঝঙ্কার দিচ্ছিল তপ্ত বাষ্পকণার মত সেই ইংরিজী কথাটা ননসেন্স। তরুণীর কণ্ঠের সেই ঝঙ্কার নিমেষে ভবতোষের জীবনের এক ঘূর্ণিত ও বিস্মৃত অধ্যায়ের মধ্যে যেন তার মনকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়। হাঁ, ঠিক এমনি ভাবেই গর্জে উঠেছিল কুমকুম একদিন। তার কণ্ঠের স্বরের সঙ্গে হঠাৎ মিল দেখে কেবল যে বিস্মিত হয় ভবতোষ, তাই নয়, মনে মনে ভাবে, সকল নারীর কণ্ঠ বুঝি এক সুরে মিলে যায়, ওই একটি ক্ষেত্রে, যখন বিষ উদ্গীরণ করে। ভবতোষ আর কুমকুমরা একই বাড়ীর দুটি ফ্ল্যাটে পাশাপাশি ভাড়া থাকতো। সে দশ-বারো বছর আগের কথা। ভবতোষের তখন সবে গল্প লেখক বলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কুমকুম ছিল ওর সেরা নিয়মিত পাঠিকা। যে পত্র-পত্রিকায় ওর গল্প প্রকাশিত হতো আগেই কুমকুম তা পড়ে দেখতো। তাকে নায়িকা করে ভবতোষ এবারের গল্পটা লিখছে কিনা। কেমন করে তার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে ভবতোষ গোপনে তাকে ভালবাসে। তাই যখন তখন ওর লেখার ঘরে এসে সোহাগ-উথলানো স্বরে বলতো, কি আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখলেন না। কবে লিখবেন? এমনি করে আরও তিন বছর কেটে গেল। তারপর একটু থেমে অভিমানস্ফুরিত ওষ্ঠে বললে, আমি মরে গেলে বোধহয় লিখবেন! চটে ওঠে ভবতোষ। দেখো কুমকুম তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই। বব্ করলে চুল ছাঁটলে আর মুখে রং মেখে চোখে কাজল দিয়ে নিত্যনতুন 'বয়ফ্রেন্ডের' সঙ্গে সিনেমাতে রেস্টুরেন্টে এ কিংবা সেকেণ্ড হাওয়া খেতে গেলেই আধুনিকা হওয়া যায় না। এর চেয়ে ওই যারা মুখে রং মেখে সন্ধ্যাবেলায় গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তারাও ঢের ভালো। তাদের তবু বুঝতে পারি। তারা উপার্জন করে পেটের দায়ে। অগ্নিশিখার ওপর যেন ঘৃতাহুতি হলো। অপমানে ভ্রূকুমের সর্বদেহ কাঁপতে থাকে। বলে ছিঃ আমার সম্বন্ধে তাহলে আপনার মনের ধারণা এই! হাঁ। উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভবতোষ যদি সাহস থাকে ত জবাব দাও আমার কথার। বলো সত্যি। এই তিন বছরে অন্তত তোমাকে মিশতে দেখেছি তিন জন যুবকের সঙ্গে। বলো তাদের সঙ্গে সাজ-গোজ করে তুমি যাও। তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তারা কি তোমায় নিয়ে গিয়ে গীতা পাঠ করে? কতক্ষণ তোমার সঙ্গ মানুষের ভাল লাগতে পারে? কি তুমি জানো? আমি তিন বছর ধরে দেখছি আই-এ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছো। বই নিয়ে নয়ত কলেজে যাও আর আসো। না পড়েছো কোন ভালো সাহিত্যের ভাল বই, না জানো ভালো করে কথা কইতে। না জানো গান বাজনা—না জানো ললিত-কলা। একমাত্র সম্বল হিন্দী আর বাংলা সিনেমা দেখা, তাও শুধু তার গানগুলোর জন্যে? সেখানে গল্পের মধ্যে যেটুকু সাহিত্যরস তা গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই তোমার! সেইজন্যে একমাত্র দেহ-ছাড়া আর তোমার কোন সম্বল নেই। কিন্তু দান করতে করতে দেহ অঙ্গ হেঁটলে হয়ে গিয়েছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছো? মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কুমকুম আর পারলো না চুপ করে থাকতে। হঠাৎ মাথায়—লাঠিমারা কুকুরের মত চীৎকার করে উঠলো, ননসেন্স! আমার চেহারার কিছু থাক বা না থাক, আপনাকে কেউ তার সমালোচনা করতে ডাকেনি! বলে একটু থেমে ভবতোষের মুখের ওপর যেন একমুঠো উত্তপ্ত বালি ছুঁড়ে মারলে। আপনার নিজের চেহারাটা কি, একবার দেখেছেন কি? কোন মেয়ে আপনাকে ভালবাসতে পারে না কোনদিন। নিশ্চিন্ত জানবেন। বলতে বলতে ছুটে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই কুমকুমের সঙ্গে শেষ দেখা ভবতোষের। কারণ ভবতোষরা সেই মাসেই সে বাড়ি ছেড়ে দেয় এবং দক্ষিণ কলকাতা থেকে একেবারে চলে যায় পাইকপাড়া। এগারো বছর হয়ে গেল এখনো সেখানেই রয়েছে। সেদিন রাত্রে 'পিঞ্জরী' হোটেলে খেতে গিয়ে আর এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো ভবতোষের। বাজনার তালে তালে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়ে পরের ও রমণী নৈশ-ভোজ করছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে সেই পাঞ্জাবী যুবক ও সেই তরুণী যুবতী দুজনে দুজনের কখনো হাত ধরে কখনো কোমর ধরে নাচে, তালে তালে, বাজনার ছন্দে যেন ভেসে চলেছে। ভবতোষের চোখ দুটো বন্ডাঁশের মত আটকে গেল সেই নৃত্যরতা মেয়েটির দেহে। বাঁশির টানে ওর চোখ দুটো যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। যতক্ষণ সে নাচলো ততক্ষণ খাওয়া ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রইলো ভবতোষ তার দিকে। আশ্চর্য, অদ্ভুত এই রমণী! মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে কেবল এই কথাটাই পাক খেতে থাকে। এর কয়েক-দিন পরে জলপাহাড় থেকে নামছে ভবতোষ এমন সময় নিকটেই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে থমকে থেমে এক পাশে সরে দাঁড়াল, দেখলে সেই তরুণীটি ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারছে আর ঘোড়াটা লাফাতে লাফাতে তীরবেগে ছুটছে। ঘোড়ার সহিস অনেক পিছনে পড়ে আছে। প্রাণপণে ছুটে সে তার নাগাল পাচ্ছে না। মেয়েটি ছুটে ভবতোষের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় শুধু একবার আড়চোখে তাকালে তার মুখের দিকে। সে-দৃষ্টির অর্থ ধিক্কার। ভবতোষের পৌরুষকে যেন ধিক্কার দিয়ে চলে গেল সে। 'নাইন্থ হেভেন' হোটেলে উঠেছিল

পঁচিশে বৈশাখ স্মরণে প্রকাশিত

প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র দত্তের

হিসেব নিকেশ

লেক লেকিং-এর এক সন্ধ্যের বিনয় ওর সদা মৃত পিতার সামনে বসে, একা, নিঃসঙ্গ। ওর ভাগ্যের কথা ভেবে ও এক সময়ে ভয়ার্ত, রুদ্ধশ্বাস। এরই মধ্যে এল ওর পেন্সিকা। এই ভয়ংকর পরিবেশে এক সোজা পেন্সিকা-পেন্সিকার পেন্সে ও মানবভাগ্যের অসাধারণ জিজ্ঞাসার কাহিনী বর্ণনা করেছেন প্রতিষ্ঠিত লেখক বীরেন্দ্র দত্ত।

কবি শান্তিব্রত ঘোষের

বনবাস ৪·০০

এক বলিষ্ঠ পত্রকারবান কবির পেন্সে ও জীবন-অন্বেষার ছবি

আমাদের পরিবেশনায়

বীরেন্দ্র দত্তের		মনীন্দ্র রায়ের	
পাহাড়ে সমুদ্রে	৮-০০	চতুর্দশী	৪-০০
খেলার ছলে	৫-৫০	ঘণ্টাঘড়ি	৪-৫০

পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি হরপ্রসাদ মিত্রের

জানা পাবলিশনী । ৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

অরবিন্দের। আপোলোটা কেবল নির্বাপিত নয় যেন পরিত্যক্ত ভেবেই ও শান্ত পরিবেশ প্রোপুরি যেন ফিরে এসেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে গেছে কিন্তু। মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা যেন সুষুপ্ত, হেমন্ত যেন সন্ধীত ধ্বনি [illegible] ওর পায়ের কাছ থেকে, সেপাটা মুখ থেকে সরিয়ে হাতটা উঁচু করে উঠে বসলো। হাঁ ঠিক ওর পাশের ঘরে থেকেই আসছে। ইংরিজী গানের একটা কলি গুনগুনিয়ে কেউ যেন ওর কানের ইতি আর কী ফার্স্ট ক্লাস দিয়। কাঁপা কাঁপা গলার স্পষ্ট মধুর কথা এ সুর। চমকে উঠে বিছানায় উঠে বসলো অরবিন্দ। একি, এ যে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর। তবে কি? না না। এই হোটেলে ও আজ পর্যন্ত দিন আসে অরবিন্দ, তখনো কি তাহলে দেখা হবে না? পাশের ঘরে অরবিন্দের একটি মেয়েদের গলায় সেই অজানা তরুণীটি রয়েছে, তাবতে তাবতে সারা রাতে আর তার চোখে ঘুম এলো না। পরদিন বিল চোকাতে গেলে, বেয়ারাটি জানালে তার অনুমানই ঠিক। মিসেস কাটিং। তাঁর এসেছেন এই হোটেলে। তার স্বামী তিন দিনের জন্যে বিশেষ কাজে কলকাতায় চলে গিয়েছেন স্ত্রীকে এই হোটেলে রেখে। ব্রেক-ফাস্টের পর কালকের স্টেটসম্যান কাগজটা নেবার ছল করে অরবিন্দ খুব কে বলে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে। একটা সোফায় পা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল তরুণীটি। তার হাতে কথা নয় ও মুখটা আপাতত কাঁকে যে সিগারেটটা ছিল হাতে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অরবিন্দকে বসতে বললো। সেদিন রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তরুণীটি অরবিন্দের সঙ্গে কথা বললে। ঈভনিং গাউনে মেয়েটি যেন পরী হয়ে এসেছে। অরবিন্দের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তরুণীটি তখন মুখটা বিকৃত করে ইংরিজিতে বললে তোমার কাছে কি 'এ্যাসপিরিন্' জাতীয় কোন ট্যাবলেট আছে। আমার মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। নাই। আমার কাছে এ্যাসপিরিন নেই তবে এনাসিন আছে। যদি মনে করেন তাতে কাজ হবে, তাহলে—হাঁ—তাতে হবে। আমার স্যাবটি বাগে ওষুধ ছিল—সে প্যাকটা নিয়ে চলে গেছে নইলে আপনাকে কষ্ট দিতুম না এত রাত্রে। ধন্যবাদ, বলে এনাসিন-এর প্যাকেটটা নিয়ে চলে এলো। অরবিন্দ বললে, যদি রাত্রে কষ্ট যায়, তাহলে আমাকে নিশ্চিন্ত ডাকবেন আমি আপনার ওষুধ এনে দেবো। থাক ইউ। বলে ঘরে গিয়ে ঢুকলো তরুণীটি। কতক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর হঠাৎ ও ঘরে কাতরানি একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করলে তরুণীটি। সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে মিসেস কাটিং—কি কষ্ট হচ্ছে। তরুণীটি কাতরা ঘুলে বললে, একটা তুমান নিয়ে আমার মাথাটা যেন কার ফেটে যাচ্ছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাচ্ছে। অরবিন্দের ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওকে শান্ত করে শোয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ঢলে পড়লো তরুণীটি। পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়, সেইজন্যে আর একটু অপেক্ষা করলো অরবিন্দ বিছানায়। একটু পরে যখন মেয়ে আসছে ঘুমে কাতর, এমন সময় আবার ঐ কল একটা আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটি। অরবিন্দের তুমনাটা আরো শক্ত করে বাঁধতে গেলে, ওর হাতটা কপালের ওপর টিপে ধরলে তরুণীটি। অরবিন্দের তখন ওর মুখের দুটো পাশে টিপে নিঃশব্দে বসে রইলো। রাত তখন [illegible]। তরুণীটির ঘুম ভেঙে গেলে অরবিন্দ বললে সে। ভেবে অরবিন্দের ঘুমিয়ে পড়েছে ওঁর বিছানায়। আর যে হাত নিয়ে ওর কপালটা টিপে ধরেছিল, সেটা ওর মুখের ওপর। লজ্জায় মরে ওর হাতটা কপাল ঠেলে দিতে উদ্যত হয়ে উঠে পড়লো অরবিন্দ। বললে, একসকিউজ মি নিশ্চয়। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছি। সারারাত ধরে ঘুরে মাথাটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে সামলাতে পারিনি নিজেকে। প্লিজ ইউ এ্যাক্সেপ্ট মাই। তুমি ইচ্ছে করে আমার মুখের সুযোগ নিয়েছো। আমি এখনি লোকজন ডেকে আনছি। তুমি আমাকে এ্যাসল্ট করতে চেয়েছিলে।

অরবিন্দের সর্বশরীর তখন ঘামে ভিজে উঠেছে। নো-নো—প্লিজ মাডাম—একসকিউজ মি। আই আসক্ ইয়োর পার্ডন। বলে দুহাত দুটো হাত তার সামনে জোড় করলে, অমনি মেয়েটির মুখের কঠিন রেখা ধীরে ধীরে কোমল হয়ে উঠলো। তবু কণ্ঠে কৃত্রিম রোষভরে সজল বাংলায় বললে, বলুন ক্ষমা করুন। বলুন? নইলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না আপনাকে। ক্ষমা করুন। কাঁপা-কাঁপা গলায় কোন রকমে বললে অরবিন্দ। শুধু, ওই কথা মুখে বললেই চলবে না। কাজে দেখাতে হবে। বলুন কি করতে হবে। আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে। আজকের রাতের এই কাহিনী। আর নায়ক আপনি, আর নায়িকা আমি। বলুন লিখবেন? প্রতিজ্ঞা করুন আমাকে ছুঁয়ে। লোকের কথাটা জোরে বলবার সময় আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না। খিল খিল করে যেন হাসির বন্যা বইয়ে দিলে। কি একটা কি আমায় নিয়ে গল্প লেখা চলে না? আপনি—তুমি.....হাঁ..... তাহলে বাঙালী মেয়ে.....সেই.....কুমকুম? না। কুমকুম নই। সে ঘর বেঁধেছে। আমি মিসেস কুমকুম কাটিং।

CENTRAL LIBRARY

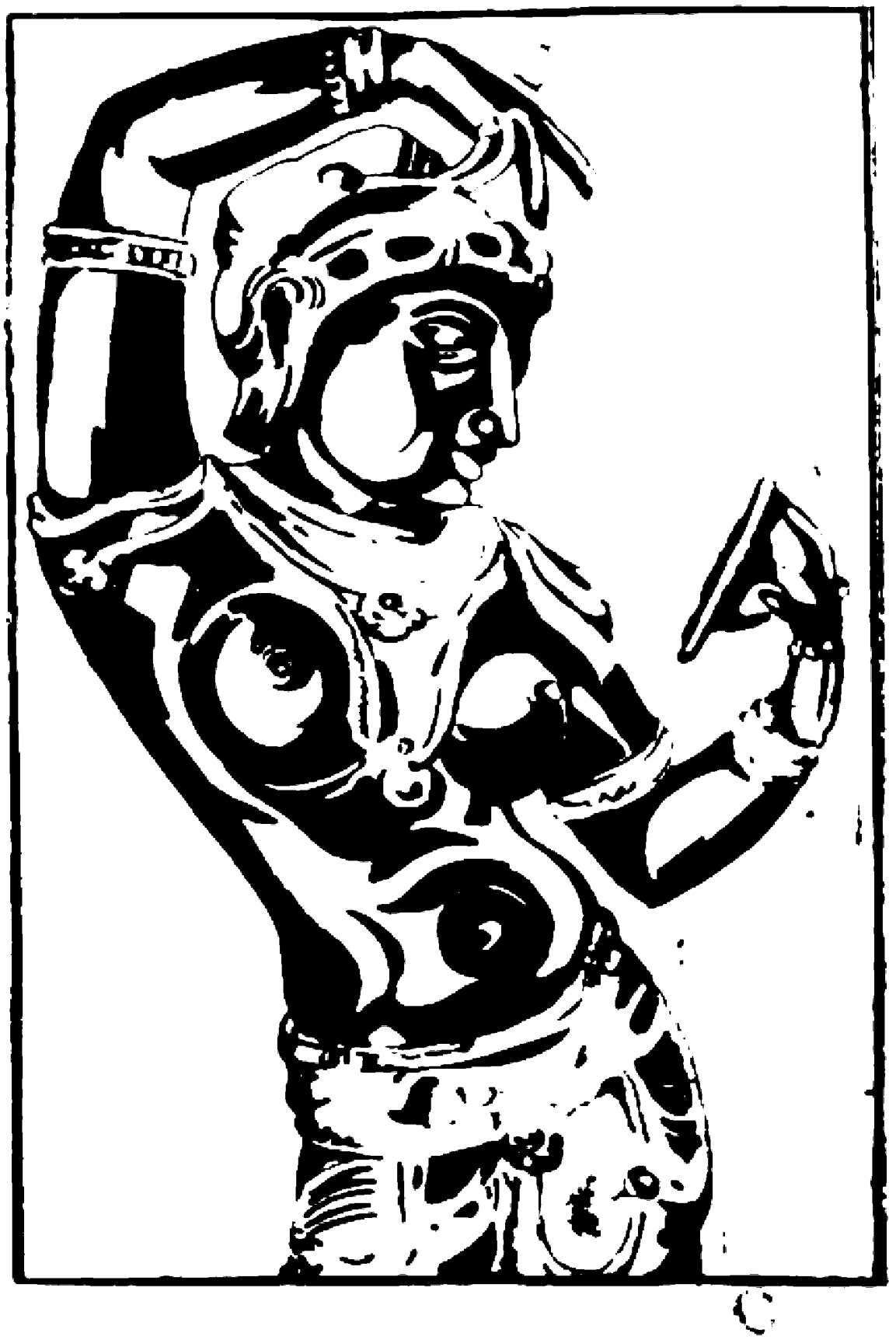

সেলিম চিস্তি

নিমাই ভট্টাচার্য

ঔরঙ্গজেব-ই-আজম-এ এখন আর সন্ধ্যে বিকাশ করেন না। ঔরঙ্গজেব-ই-আজম-এ সন্ধ্যে বলার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়ে না সন্ধ্যেটুকু। রাজপুত দর্শকরা, ভাটিয়ালি পড়ুরী বেশ কয়ী তুলসীমঞ্চে প্রণাম করে ঔরঙ্গজেব-ই-আজম-এর আসরে আসন গ্রহণ করেন না। সে সব কিছু নেই। ফুর্তির লেশ। ফাতেপুর সিক্রি এখন মরে পড়ে রয়েছে। নিশুতি সানাইয়ের গান শুনে যে রাজপ্রাসাদের মানুষ সজাগ হয়ে উঠত সকালে, সন্ধ্যায় গোধূলিলগ্নের প্রথমে মানুষ মুখর হতো যে সন্ধ্যেটি সম্রাটের সঙ্গে। সে সুরের কণামাত্র আর শোনা যায় না।

সম্রাট নেই, সম্রাজ্ঞী নেই সেই রাজপুত কন্যা রাজমাতিনী পাইক সখী বাঈজী নর্তকী। কেউ নেই। সেনাপতি হুসেন খাঁর তবু একজন সাধারণ সৈন্য পর্যন্ত নেই ফাতেপুর সিক্রিতে। দুর্গাদ্বারে আজ আর তেমনভাবে সৈন্যরা পাহারা দেয় না।

তা না হলে আজও নগরের প্রতিটি মুখরিত হয়ে থাকতো সিক্রী। প্রতিটি প্রাসাদ, তার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা কালের ঘনঘোর ঘনঘোর করে। ঘাম ঝরে। একটু অমনস্ক হলে কিংবা

না, রাজপ্রাসাদে ঢোকাই কিন্তু হয় না। সবাই আসে যেন সেলিম চিস্তির সন্ধানে। প্রণাম করে, প্রার্থনা করে। সুতোর গায়ের কালিতে রঙ্গ সুতো বাঁধে। তবে সুতো বাঁধার পর্বটা হয়ে এলে ভক্তরা-ভক্তারা আসনে ফিরে যায় সবাই।

কাঁপছো, তুমি কিছু প্রার্থনা করে লাল সুতো বাঁধবে না?

না।

অবাক হয় জন, সেকি? এবার একটু বাদে ওরঙ্গজেবটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। তখন গণপ্রার্থীর বলল সেলিম চিস্তির, কারু কিছু চাইবার নেই?

আছে বৈকি।

তুমি কিছু চাইবে না? তোমার কোন প্রার্থনা নেই?

কাঁপছো হবে তুমির ভেতরে কিন্তু তুমিকে বলল সে মনে মনে চাইবার কথা।

এখন ঠিক করে বলে পারে না। না তা ঠিক নয়, হবে।

সেলিম চিস্তি নিশ্চয়ই জানে মনের কথা জানে।

সারা বছর ধরে মানুষের ভিড় লেগে থাকে এই সেখ সেলিম চিস্তির সন্ধানে। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-বসন্ত। সব সময়। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি। তবে সেজন্যে সন্ধ্যে পূর্বাহ্ণ। ভিড় হয় না। হবেই সবাই জানে পরে। সন্ধ্যে আসে একটু, স্নান করবার জন্য ওরঙ্গজেব চিস্তির সমাধি ছেড়ে সবাই হরেক-পাড়ের হাট মুখর হয়ে ওঠেন।

হবন সেখ সলিমচিস্তি জন্ম ফতেপুর সিক্রীর পাহাড় ছেড়ে নীচে নামার পরে করেছেন, তখন হিন্দু আর মুসলমান সেখ

সেলিম চিস্তির সমাধির সামনে এগিয়ে গেল।

তোমার কাছে আমি আর কিছু চাই না, শুধু বছরে একবার আমাকে সেলিম চিস্তির সমাধিতে নিয়ে যেও।'

'আমার কাছে আর কিছু চাও না?'

'না।'

বিবেক অবাক হয়। একটু ভাবে, সেলিম চিস্তির সমাধিতে গিয়ে কোন কিছু মানত করবে?

'না না সেসব কিছু না।'

'তবে?'

'কিছুই না, শুধু ভাল লাগে।' একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে বিবেকের স্ত্রী। দৃষ্টিটা একটু যেন দূরের দিকে ছড়িয়ে দেয়। 'খুব ভাল লাগে ওখানে গেলে। মনে হয়ত শান্তি পাই।'

বিবেক প্রতোক বছর স্ত্রীকে এনেছে ফতেপুর সিক্রিতে এসে আকবরের প্রাসাদ দেখে নি। সারা দিন কাটিয়েছে এই সমাধি মন্দিরে। বিবেক বাধা দেয় না, কিছু বলে না। শুধু দেখে, বিভোর হয়ে দেখে আনমনা স্ত্রীকে।

হাসতে হাসতে বিবেক বলে, তুমি বোধ হয় পত জন্মে সেলিম চিস্তির কেউ ছিলে।

বিবেকের স্ত্রী হাসে।

'হাসছ?'

'হাসব না?'

সত্যি বলছি তুমি ওখানে গেলে এমন বিভোর হয়ে যাও, আনভোলা হয়ে যাও যে আমার সত্যি মাঝে মাঝে মনে হয়...

সমাধির মুখোমুখি হতেই থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁগো, তোমাকে আমি বড্ড কষ্ট দিই, তাই না?'

'না, না কষ্টের কি আছে?'

'কষ্ট বৈকি! আমার বায়ুরোগীপনার জন্য তোমাকেও দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

বিবেক একটু কাছে টেনে নেয় স্ত্রীকে। আমার একটুও কষ্ট হয় না বরং ...

'তুমি আমার উপর রাগ করো না...

পাহাড় দিয়ে নামতে নামতে বিবেক বুকের কাছে টেনে নেয় স্ত্রীকে। রাগ করব কেন?'

'বিশ্বাস করো এখানে এসে আমার খুব ভাল লাগে। এখানে না এসে আমি থাকতে পারি না। মুখ থেকে নয়, অন্তর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

বিবেক যেন সব কথা শুনতে পাচ্ছে।

যখন আমি থাকব না, তখন তুমি এসো। সেলিম চিস্তির সমাধির আশেপাশেই আমার আত্মা ঘোরফেরা করবে। আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।'

ভাবতে গিয়েই বিবেকের চোখে জল আসে। তবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। একবার সেলিম চিস্তির সমাধির দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল। এপাশ ওপাশ।

রাস্তায় আটকে গেল। মনে হলো এই লোকটাকে যেন আগেও দেখেছে বিবেক। এই শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতেই। গত বছর। তার আগের বছর কয়েক বছর। একবার এক হোটেলেই বোধ হয় ছিল দুজনে।

টাঙ্গাওয়ালা এসে লোকটাকে ডাক দিল, সাব! চলিয়ে। হোতা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াতেই বিবেক যেন চিনতে পারল। কিছু বলল না, শুধু মনে ভাবল, শেখ সেলিম চিস্তির কাছে ইনিও কিছু মানত রেখেছেন নাকি?

ফুলমান একসপ্রেসে আসবার দুজনের দেখা। টুন্ডলা পার হবার পরই আলাপ হলো। বিবেক জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি প্রায়ই আগ্রা আসেন?

'কেন বলুন তো?'

মনে হয় পরপর কয়েক বছর আপনাকে ফতেপুর সিক্রিতে দেখেছি!'

ফতেপুর সিক্রি মানে শুধু সেলিম চিস্তির সমাধিতে বই

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেলিম চিস্তির সমাধিতেই দেখেছি।'

এবার রঞ্জন জানতে চাইল আপনিও বুঝি প্রতোক বছর এদিকে আসেন?'

একটু শুকনো হাসি হাসল বিবেক। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ছাড়ল। 'আসি মানে আসতে হয়, না এসে পারি না।'

'কিছু মানত করেছেন বুঝি?'

'কিছু মানত করিনি, সেলিম চিস্তির কাছে আমার কিছু চাইবার নেই।

'তবে আসেন কেন?'

ফুলমান একসপ্রেস চলছে। কানপুরে, ফতেপুরে লোক হয়ে এসেছিলাম রাতের অন্ধকারে। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদের দুজনের চোখে ঘুম নেই।

আচ্ছা রঞ্জনবাবু মারা যাবার পর আত্মার দেখা পাওয়া যায়?'

'ঠিক জানি না, তবে অনেকে বলেন পাওয়া যায়।'

বিবেকবাবু তলিয়ে যান নিজের মধ্যে। বোধ হয় মির্জাপুর এলো।

রঞ্জন প্রশ্ন করল, আপনি কি অলৌকিক কিছু দেখার আশায় সেলিম চিস্তির সমাধিতে যান?

না তা ঠিক নয় তবে আমার স্ত্রী বলেছেন, মরার আগে সেলিম চিস্তির সমাধির আশে পাশেই থাকবে...'

'উনি বুঝি সেলিম চিস্তির ভক্ত ছিলেন?'

'নিশ্চয়ই ছিল, তা নাহলে প্রতোক বছর কেন আসত?'

'প্রতোক বছর আসতেন?'

'হ্যাঁ।'

তোমার সেলিম চিস্তির কাছে মানত করে কিছু পেয়েছিলেন অথবা...

বিবেকবাবু তাড়াতাড়ি ওকে বাধা দিয়ে বললেন, না রঞ্জনবাবু, ও কিছু মানত করত না। চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবত। তন্ময় হয়ে থাকত।

রাত আরো গভীর হয়।

'জানেন রঞ্জনবাবু, হঠাৎ আমাদের বিয়ে হয়। আমার স্ত্রী আগ্রাতে ওর ছোট মামার কাছে ছিলেন। আমার শ্বশুরমশাই ওকে টেলিগ্রাম করে কলকাতা আনান। ও আসার দুদিন পরেই আমাদের বিয়ে হয়।

'তারপর?'

'বিয়ের পর আমার স্ত্রী আমাকে শুধু একটি অনুরোধ করেছিলেন...

'কি?'

'প্রতোক বছর এই সেলিম চিস্তির সমাধিতে আসার অনুরোধ করেছিল।

রঞ্জনের যেন কেমন লাগে শুনতে। একটু ভাবে। 'উনি কি আর্কিওলজিতে 'ইন্টারেস্টেড' ছিলেন?'

'ওর মামা আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। আগে বহু দিন আগ্রা ফতেপুর সিক্রীতে ছিলেন।

হঠাৎ রঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, কি নাম বলুন তো?

'সুধীর সরকার।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, সুধীরদা!

সুধীর সরকারের নাম শুনতেই রঞ্জনের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, মুখখানা কালো হয়ে গেল কিন্তু অন্ধকার কম্পার্টমেন্টে বিবেকবাবু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন ওকে চেনেন নাকি?

'হ্যাঁ চিনি।'

'আপনিও কি আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন?'

আর সত্যি কথা বলতে পারল না রঞ্জন। বললো, না।

বিবেকবাবু পার্সের ভিতর থেকে একটা ফটো বের করে পাসেঞ্জের আলোয় এগিয়ে বললেন, রঞ্জনবাবু আমার স্ত্রীর ছবি।

রঞ্জন ও ছবি দেখতে চায় নি। ও ছবি ওর অন্তরের মধ্যে অসংখ্য স্মৃতির জ্বালা দিয়ে বাঁধান আছে। তবু না দেখে পারল না।

পাপিয়া!

ট্রেন স্লো করে স্টেশনে ঢুকছে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি সুটকেসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'নমস্কার।'

'এখানেই নামবেন?'

'হ্যাঁ, আমি একটু বেনারস ঘুরে যাব।'

'আপনার ঠিকানাটা?'

রঞ্জন হাসল, কোন দরকার নেই। ঐ শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতেই দেখা হবে।

CENTRAL LIBRARY

বাঁশের বোমা

অদ্রীশ বর্ধন

নাগিনী নৃত্য জমেছে নাচঘরে। সনাতনী নাগিনী নৃত্য নয়। মাথায় ফণা-তোলা মুকুট, সর্বাঙ্গে সাপের খোলস মার্কা আঁটসাঁট পরিচ্ছদ আর সরীসৃপের মতো বেণী দুলিয়ে সর্পিণী নৃত্যও নয়, এ নৃত্য মার্কিন মুলুক থেকে ধার করা।

নাচঘরের পালিশকরা মেঝের ওপর দেখা যাচ্ছে কেবল জোড়া জোড়া নগ্ন পা। জোরালো সার্চলাইটে উদ্ভাসিত শুধু মেয়েলী পা। এক-একটি পা এক-এক রঙে রাঙানো। সাপের গায়ে যে বিচিত্র বর্ণের বাহার, নগ্ন পাদুটিতেও অবিকল তেমনি বর্ণসমাবেশ। এক-একটি পা যেন এক-একটি হিলহিলে সাপ। জীবন্ত। উন্মত্ত। নৃত্যপর।

রঙীন সার্চ লাইট সীমিত কেবল জংঘা পর্যন্ত। ত্রিকোণ বিকিনি থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ অন্ধকারে বিলীন। আলো-আঁধারির মধ্যে ছায়া-শরীরের অঙ্গগুলো কেবল চোখে ভাসছে... যেন এক দঙ্গল মায়াবিনী আঁধার হতে আবির্ভূত হয়েও আঁধারে থাকতে চাইছে...উদ্দাম তাদের লাস্য... উদ্দাম তাদের সর্বাঙ্গ নাচের তালে, নাচের ঘূর্ণিপাকে, নাচের ছন্দে বিস্রস্ত সবকিছুই..

'স্ট্রেটাইল ড্যান্স' আধুনিক মার্কিন মুলুকের এক আশ্চর্য আবিষ্কার। উচ্ছৃঙ্খল যুবক যুবতীরা ম্যারিজুয়ানা সিগারেটের নেশায় যখন পোক্ত হয়ে পড়ে, যখন এল এস ডি'র অবাধ কল্পনায় বল্গাহীন উদ্দামতার গা ভাসিয়ে দেয় ঠিক তখন সরীসৃপ নৃত্য ওদের রক্তে যে আদিম নাচন জাগায় এক কথায় তা অতুলনীয়।

চুলুচুলু চোখে পিয়ানোর হেলন দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ। টলটলে চোখ যেন স্বপ্নের কুহেলী ভাসছে। মুগার পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতিতে আজ দেড়শ টাকা দামের ফ্রেঞ্চ সুরভি স্প্রে করে এসেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এ সুরভির মহিমা অনেক। মনকে শুধু আমেজে, ভাসায় না—শিরায় শিরায় কামনা জাগায়। সেকস-স্টিমুল্যান্ট পারফিউম হল দেবের মর্ডান রূপ।

তারমন্ত্র প্যাটার্নের সুরা পাত্র হাতে অবিকল চোখে জোড়া জোড়া রঙীন পায়ের উদ্দামতা দেখছিল ইন্দ্রনাথ, অন্ধকার ঘরে এদিকে-ওদিকে ডিভান-সোফায় বসে আরও অনেকে যারা পাকা হেলকুচ ফলের মত ঠোঁটওয়ালীর দল দেখে মনে মনে আবৃত্তি করেছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা—হেলেনের বুকে, দুটি পাকা ফল ভরেছে রসে বিংবা ঠুকরিয়ে খাই দুটি ঠোঁট ফলের মত।

কান ফাটানো বাজনা অবশেষে বিপুল ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে ক্লাইম্যাকসে পৌঁছলো। শেষ হল নৃত্য। ঝপ করে জ্বলে উঠল আলো। মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়তে চাইল নাচঘর। নাগিনীদের স্পষ্ট দেখা গেল এবার। সামান্য দু চিলতে রঙীন বস্ত্র আবৃত করে রেখেছে প্রতিটি নারীর লজ্জাস্থান—টুপিস বিকিনি বস্ত্র কেতাদুরস্ত নাম। এছাড়া সারা গায়ে ভেসেলিন জাতীয় তৈলাক্ত ক্রীমের প্রলেপ। সর্পিণীর মত তেল-চেরা হিলহিলে পিচ্ছিল প্রতিটি তনু। স্বেদধারায় জ্বলো মোহময়ী হয়ে উঠেছে লজ্জাহীনা যুবতীর দল। হেলেদুলে নাচের ছন্দে ওরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-একজন যুবকের প্রসারিত বাহুর মধ্যে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র পাশে নিক্ষিপ্ত হল যে যুবতীটি আজকের নাচের আসরে তার গাইডে সেরা সুন্দরী বুঝি আর নেই। সারা অঙ্গ যেন ঘুমে-ধোওয়া, মাখন আবৃত এবং চোখের তারায় যেন নাগিনী কলাকৃত।

মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে সোফার ওপর আছড়ে পড়ে নিজেকে ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। পাশের তিন্বতী ভেপদায় হীরক প্যাটার্ণ মনিরপাত্র থেকে, মধুগলো আস্ত মৃদুকণ্ঠে : আইডিয়া পেয়েছো?

চিকমিক করে উঠল চোখের পাতায় অভ্রকুচি। খুশির বুকে মুক্তো হেসে উঠলো যেন। বলল 'লাকি হোমস ক্লাব' খ্যাত মিস আইভরি নাহা—'ওস্তাদ এ রকম শিকার আর দুটি পাবেন না। আসলটা হাতসাফাই করো নি তো? না এটা নকল।'

কোথায়?

আমার বুকের খাঁজে বিকিনির ফাঁকে। দুষ্টু দুই চোখে কপট তিরস্কার আনল ইন্দ্রনাথ। দু আঙুল দিয়ে টেনে নিল মুগল পাঁড়ুস্বর খাঁজ থেকে ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজটা। কিছুক্ষণ পর খোলা হাওয়ায় তারার নীচে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। উদ্যোগপর্ব সফল হয়েছে। পকেটে এসে গেছে বাঁশের বোমার রঙতামী কেস। ঠিকুজী কুষ্ঠি।'

দু চোখ কপালে তুলে কবিতা বলল—সেকি ঠাকুরপো, ঐ বোমাবাজদের আড্ডায় তুমি একা যাবে?

কাঁচি টানতে টানতে বলল ইন্দ্রনাথ—তোমাকে এই নিয়ে অযেমহলে যেন মুখ খুলো না। তাহলে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না।

'অত কাঁচা অস্ত্রে আমি নই। আইডিয়ার প্রত দাঁম না হতে পারি মুখ টিপে বলল কবিতা পেটে কথা থাকে।'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না ইন্দ্রনাথ। বলল, সারা পশ্চিমবঙ্গ কাঁপছে বাঁদের বোমার উৎপাতে। বাস উল্টাচ্ছে, সরকারী অফিস পুড়ছে, ট্রেন উল্টাচ্ছে—ব্যালাস্টিক একসপার্টদের তাণ্ডব হয়ে গেছে বাঁদের বোমার প্রলয়ংকর ক্ষমতায়। সরকার এখান থেকে ওখান থেকে কিছু কিছু স্টক উদ্ধার করছে। কিন্তু মূল কারখানার সন্ধান পায় নি—আমদানী সূত্রের ঠিকানা পায় নি। পেরেছি কেবল আমি—একার চেষ্টায় আই-ডিয়ার সহযোগিতায়।'

বুঝলাম, বলল কবিতা। 'অমেক কোটি-পতির রাজনীতির কারবার বন্ধ হবে বাঁদের বোমার আমদানী বন্ধ হলে—তাও বুঝলাম। কিন্তু একা এত বড় ঝুঁকি—'

'বোধি একটা কথা বুঝেছো না কেন যে কোটিপতিরা এত বড় একটা কারবার চালাতে পারে মাদ্রাজ আর বাংলায় বসে, তারা পুলিশ মহলেও চর ঢোকাতে পারে?

'তা আর আশ্চর্য কি। সিলভার টানিকে সব হয়।'

'সেই জন্যেই পুলিশের সাহায্য নিতে গিয়ে নিজের প্রাণটা খোয়াতে চাই না বৌদি। আমি বলে তোমায় ডিটেকটিভ গল্প শোনাবে কে? তোমার ঐ কলমচাপা লেখক স্বামীদেবতার গল্পের টনিকই বা আসবে কোত্থেকে? বাজাই যাট'! বলল কবিতা। ইন্দ্রনাথ। গর্জন করলাম আমি। ইন্দ্রনাথ হয়ে ততক্ষণে বাল্টায় পৌঁছে গেছে। এই পর্যন্ত যেন পৌরচন্দ্রিকা রচনায়। যে গল্প আজ লিখতে বসেছি তার চাইতে কৌতূহলো-দ্দীপক কাহিনী আজ পর্যন্ত লেখার সুযোগ আমার হয়নি। শার্লক হোমস ক্লাব মামলায় ইন্দ্রনাথ রুদ্র দুর্ধর্ষ পার্বাল-সিটি পেয়েছিল সারা দেশ জুড়ে। পুরো পুলিশ বাহিনীকে এবং শার্লক হোমস ক্লাবের বাঘা বাঘা পোকা গোয়েন্দাদের নাকের জল চোখের জল করবার পর ইন্দ্রনাথের লাভ হয়েছিল দুটি : হাটেবাজারে গজিয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে জল্পনা কল্পনা আর আইডিয়ার সন্ধানে একজন দুঃসাহসী বোমারুকে সহকারিণী লাভ। এর পরেই হাতে এল 'বাঁচার মেলা' কেস। মাদ্রাজ, নিরাপত্তার ব্যবস্থার বিশেষ অঞ্চলটার নাম গোপন রাখছি। কালীপুজোর সময়ে এখান থেকেই শুরু লক্ষ টাকার আতসবাজী চালান হয় কল-কাতার বাজারে পাঠিয়ে।

মানুষের বাঁচার জন্য মাঠে নামবার ছুটিটা পড়েছে। মাদ্রাজী সার্কাসের মুখরা এখন 'অলসিয়ানেলা' বিদেশ এই সার্কাসটি তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বারোমেসে অস্তায় গেড়েছে মাদ্রাজে। এখান থেকেই ছোট ছোট কারাভান যায় নানা প্রদেশে। বাংলায় আসে পুজোর মরসুম শুরু হলেই।

সার্কাস প্রাঙ্গণে মুভী ক্যামেরার বিবিধ সরঞ্জাম কাঁধে দারুণ স্মার্ট একজন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে, কদিন ধরে। মুখে পাইপ, চোখে রোদ্দুর চশমা, আর সর্বাঙ্গে মার্কিনী পরিচ্ছদের বাঁধ। মানুষটি নিজেও একজন ধাঁধা। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা অবশ্য এক নজরেই বলে দিতে পারেন লোকটির ধাঁধা রহস্য। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। পুনরায় রহস্য মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে ক্যামেরাম্যান। অন্য ছিরে প্রহরের ভুর-ভুর করে ছেলে সুগন্ধি। আশ্চর্য এই খোশবাইয়ের মহিমায় বুঝি শেষ নেই। নদী জাতি যেন কস্তুরী মৃগের মত পাগল হয়ে ঘোরে গন্ধবাহকের সন্ধানে। মজনাহাত হয় এতটুকু আড়ালেই।

সার্কাস প্রাঙ্গণের সবার কাছেই তাই দু-দিনেই প্রিয় হয়ে উঠেছে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। জাত পরিচয়পত্র অনুসারে ওর নাম অরুণ দিলান ব্যানার্জি—কিন্তু তিতি-পলের ভ্রাম্যমান ক্যামেরাম্যান। সার্কাসের ওপর ডকুমেন্টারী উঠেছে ফরেন কারেন্সি ভরা। তাই—তাই সর্বত্র ওর অবাধগতি। ফার্নান্দিজের ট্রাভেল ভ্যানে অবশ্য জায়গা একটু বেশী মজার কারণ দুটি। ফার্নান্দিজের উপপত্নী রোদ্দুরা আর একটি মকর্ট। ফার্নান্দিজ বড় বিপজ্জনক খেলা দেখায় এ সার্কাসে। পলমহল যেন ওর কথায় ওঠে বসে। এক একটা মনুষ্যের এমনি অলৌ-কিক ক্ষমতা থাকে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে তারা যেন পশুপাখীর মনের কথা বুঝতে পারে, নিজেদের কথাও বোঝাতে পারে। ফার্নান্দিজ রুদ্র সিংহকে নাচায়, খেলায় চোটায় বাঘিনী। ফার্নান্দিজ বাঘ-সিংহের মুখে মাথা ঢোকায় তাদের পিঠে সাওয়ার হয় কান ধরে ঝিলবাজী খাওয়ায়। ফার্নান্দিজকে দেখলে বেরসিক স্বামীরও মন মানে কথা শোনে।

এ-হেন ফার্নান্দিজ আরো দুটি চারটি প্রাণীকে বশ করেছে। চতুষ্পদ প্রাণী নয়—দ্বিপদ। মকর্ট আর রোদ্দুরা।

রোদ্দুরার জন্ম সার্কাসে। বাড়ির ওপর হাঁটতে শেখে। এছাড়াও আরও একটা খেলায় সে শেখে। পুরুষ নাচনেওয়ালী।

দ্বিপদ শিল্পীটির জন্য আফ্রিকায়। সার্কাস পার্টি নিয়ে নাইরোবি গিয়েছিল ফার্নান্দিজ। এক কাফ্রীর কাছ থেকে কিনেছে অর্থমূল্যে সস্নেহ করে শিল্পীটিকে।

অনুকরণ বিদ্যায় পশুপক্ষীরা অদ্বিতীয়। আর মানুষের মত সিগারেট খায় গাড়ী চালায় চা-পান করে। কিন্তু ফার্নান্দিজের অতি প্রিয় এই শাখা মৃগটিকে ইন্দ্রর আর একটি বাড়তি গুণ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন দ্বিপদ সংসারে। হয়ত পূর্ব জন্মে চিত্রশিল্পী ছিল মকর্ট প্রবর। এ জন্মে সেই শিল্পসৃষ্টির সংস্কার নিয়েই তার মকর্ট জন্ম।

অবিশ্বাস্য। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এমনি অবিশ্বাস্য অসম্ভব অদ্ভুত ঘটনা নিত্য ঘটছে। শুনলে ফ্যান্টাসটিক মনে হবে, দেখলে চোখ কপালে উঠবে।

ফার্নান্দিজের শিল্পাঞ্জী অসাধারণ চিত্র-শিল্পী। সামনে ব্ল্যাকবোর্ড-খড়ি, কাগজ-পেন্সিল রাখলেই হল। যাকে যে অবস্থায় দেখবে, সেই অবস্থায় তার পোট্রেট এঁকে দেবে আশ্চর্য কিপ্রতায়। ছবি শেষ হলে মুখের আদল দেখে স্পষ্ট চেনা যাবে ছবি কার কি অবস্থায় কিভাবে মুখের ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছে সেই মুহূর্তে।

ফ্যান্টাসাই এই শিল্পাঞ্জীর আকর্ষণেই ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথ রুদ্রর নিত্য আগমন ঘটতে লাগল ফার্নান্দিজের ট্রাভেল-ভ্যানে।

সেই সঙ্গে মুভী ক্যামেরার ছবির পর ছবি উঠতে লাগল বেশুমার—বিভিন্ন পোজে। ইন্দ্রনাথের মতলব বোঝা ভার। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সুদূর তামিলনাড়ুতে তার আবির্ভাব। অথচ বাঁদের বোমার উৎপাত-হিংসা নিয়ে তার মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্র ঘর্মাক্ত বলে মনে হল না। সারা গায়ে মেড়ল টাকা দামের ফরাসী সেকস স্টিমুলান্ট পারফিউম স্প্রে করা। কারণে-অকারণে ফার্নান্দিজের ট্রাভেল ভ্যানে আসর জমানো আর ক্যামেরা কাঁধে পশুপাখী থেকে বন্দুক বাঁদর পর্যন্ত সব কিছুর পেছনে ঘুরঘুর করা নিয়ে মহাব্যস্ত সে।

কিছুদিন পর আর এক ধাপ এগুলো ইন্দ্রনাথ। ফার্নান্দিজের অবর্তমানে আবি-র্ভাব ঘটতে লাগল ট্রাভেল-ভ্যানের সাবাইল সংসারে। এমন কি রাতেও! ট্রাভেল-ভ্যান মৎ হয়ে রইল ভরা ফরাসী সেন্টের হিপ-নোটিক খোশবাইতে। ফার্নান্দিজ সোকটকে দেখে মনে-হয় না বিপদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় সে সিদ্ধহস্ত। একহারা পাতলা চেহারা। অমায়িক হাসি লেগেই আছে ঠোঁটের কোণে—টকটকে [illegible] রং আর ধূসর-রাঙা চক্ষুদুটি দেখলে অবশ্য মনে হয় বিড়াল জাতীয় প্রাণীকুলের সঙ্গে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য লুকিয়ে আছে তার। হয়তো ঐ চোখ দুটিই দায়ী এই ধারণার জন্যে।

আর রোদ্দুরা? লাস্যে হাস্যে কটাক্ষে যে নারীরা যুগ যুগ ধরে অনর্থ টেকে এনেছে সংসারে—রোদ্দুরা সেই জাতের মেয়ে। দেহ-ভরা স্বাস্থ্য তার দেহভরা ক্ষুধা। ফার্নান্দিজ তার কাছে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) নারীপটিয়সী বিদ্যা নিয়ে, সারা গায়ে নারীপটিয়সী আতর ভড়িয়ে হাজির হল এ হেন রোদ্দুরার সামনে তার পর.....

তারপর ঘটল অঘটনের পর অঘটন। সে কাহিনীর বর্ণনা নাই বা রইল এ কাহি-নীর মধ্যে।

সন্দেহ দেখা দিল ফার্নান্দিজের মনে। একদিন নয় বহুদিন বহু রাত ধরে ফিস ফিস করে সন্দেহ জানা বাঁধল ফার্নান্দিজের

ভয়াল চরিত্র। বাঘ সিংহ যার হুকুমের বশ হিংস্র শ্বাপদও যার রক্তচক্ষুর ত্রাস—তার বিবরে হানা দেওয়ার স্পর্ধাও কারো থাকতে পারে—এ যে কল্পনারও অতীত।

সন্ধেবেলা সূচপাত অবশ্য ভূতেদের সেই গল্পটা থেকে.....বহুর কাছে ট্রাভেলস-ভ্যানে ফিরে যেতে পারফিউমের বিশেষ গন্ধটির অস্তিত্ব টের পেয়েছে ফার্ণান্দিজ, পায়নি কেবল গন্ধের মালিকদের।

ডাকে ডাকে রইল ফার্ণান্দিজ। এল অমাবস্যার সেই রাত। স্নোকারের মত সেই রিংও তাবুতে প্রবেশ করতে পিরেছে ফার্ণান্দিজ। ট্রাভেলস ভ্যানের ভিতরে নরম বিছানায় আবেশে চোখ বুজে মোশুয়ো। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। মার্বেল পাথরের মত সাদা দেহ নীলাভ আলোয় নীল পাথরের মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে নীল পাথরে খোদাই অপরূপ স্ট্যাচু শায়িতা। মখমল কোমল শয্যায়।

অনেক ক্ষুধা নিয়ে অপেক্ষা করছে বোশুয়ো। বহু দিবসের প্রতীক্ষা আজ সফল হতে চলেছে। কথা দিয়েছে বাগদাদী ক্যামেরাম্যান, সে আসবে তারপর...। কিন্তু আবার ঘটল অঘটন। মচমচ আওয়াজ হল সিঁড়িতে। সশব্দে উন্মুক্ত হল দরজা বন্ধ হল পরক্ষণে। পদশব্দ স্তব্ধ হল শয্যার পাশে।

তবুও চোখ মেলল না বোশুয়ো। লাল ঠোঁটের কোণে দুর্জ্ঞেয় হাসি বিছিয়ে রইল প্রতীক্ষায়। ও জানে এর পর কি ঘটবে। শিউরে উঠবে দেহবল্লরী পূর্ণ হবে দীর্ঘ দিনের কামনা...কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা।

আচমকা বাতাস কেটে নেমে এল লিকলিকে বেতটা। বন্য সিংহ বশ করার তেল-চুকচুকে বেত। বহু শ্বাপদ বহু আপদ টিট করেছে যে বেতের জ্বালাময় চুম্বনে—এই সেই বেত। সশব্দে নেমে এল সেই মূর্তি-মান যন্ত্রণা নীলাভ পাথরের মত নিষ্পন্দ তন্বী দেহের ওপর।

সপাং করে দ্বিতীয়বার বেতটা বসে গেল ছিপ-ছিপে বস্তুটা! আর্তনাদ বেদনায় নিজেদের কুটিরে গিয়ে ছিটকে পেল দিগ্বিজয়ী বোশুয়ো।

এর পরে ঘটনা অতীব সংক্ষিপ্ত। এরকম একটা রগরগে কাহিনীর ক্লাইমাক্স যে এত সংক্ষিপ্ত হতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

ধূসর চোখে আদিম হিংস্রতা নাচিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল ফার্ণান্দিজ—'যেশা'।

গ্রীক স্ট্যাচুর বুকে করাঘাত বস্ত্ররেখা ভেদ করে ফুটে উঠেছে। সটান দাঁড়িয়ে উঠে নীলাভ নগ্নকন্যার মতই গর্জে উঠল বোশুয়ো—শাট আপ! আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই। মরতে যেন?'

প্রকাশিত হলো : সুনীল চৌধুরী-র

হিমালয়ের মানুষ আটটাকা

দেওবনের দিগন্তে (২য় মুদ্রণ) ১০৲

প্রফুল্ল রায় — কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটি আর নেই ১২৲ **হায়নার হাসি** ১১৲

এক বিন্দু সুখ ৭·৫০

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী — **জানু ভানু কৃষানু** ১৫৲

কে ডাকে আমায় ৭৲ **রক্তাক্ত খাইবার** ১২৲

নীল সায়রে ৭৲ কপিল চৌধুরী

বাতাসে বিষ ৭৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাড়া জাগানো উপন্যাস

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ১০৲

নিশাচর — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আরক্ত রাত্রি ৬৲ **দেহপট** ৭৲

প্রলয় সেন — শেখর সেনগুপ্ত

সনাক্তকরণ ৯৲ **ঝলসানো বরাভয়** ৯৲

বিমল কর — চিরঞ্জীব সেন

মোহনা ৪·৫০ **মার্কিণী ষড়যন্ত্র** ৬৲

রঞ্জন মজুমদার **বায়োস্কোপিক** বারোটাকা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — অমরেন্দ্র ঘোষ

না নিষাদ ৮৲ **চরকাশেম** ৬৲

বাসুদেব বসু

আলাপ থেকে প্রলাপ ৫৲

অজাতশত্রু

নীলডুংরি ২০৲ **সঙ্গী তিনজন** ৯৲

সাহিত্য প্রকাশ, ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

'বেশ্যা!' বলে আবার গর্জে উঠল ফার্ণান্দিজ, আবার বেত তুলল মাথার ওপর। আবার কঁকিয়ে উঠল বাতাস। কিন্তু অন্তর্নাদ করল না ষোলবুরো। দুই চোখে সহসা বিচ্ছুরিত হল কেন অগ্নিশিখা। বলল আশ্চর্য শান্ত গলায়—'আজকেই হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। আগে বলো মারলে কেন?'

'বেশ্যা!' তৃতীয়বার 'যেন ধনুকের গর্জন শোনা গেল ফার্ণান্দিজের কণ্ঠে। বুকপকেট থেকে খানকয়েক ভাঁজ করা কাগজ টেনে নিয়ে ছুড়ে দিল বিছানায়। ছোট হয়ে সব কাগজ একে একে ষোলবুরো মেলে ধরল বিছানার ওপর। এবং অবশ হল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শিথিল হল হাত তোয়ালে। খেপে উঠল চোখের পাতা। একী দেখছে ষোলবুরো? এর বাভিচারিণী মনের গুপ্ত কাহিনী এমনভাবে প্রকাশ করল কোন শয়তান? তিল তিল করে যে লালসার স্বপ্ন দেখে এসেছে সে, বহু অন্তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে যে সেই বাভিচারের কল্পনাকে এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলল কাগজের বুকে?

ঠিক সেই মুহূর্তে ওর চোখ পড়ল এক কোণে, রেজকর মত আজ সেখানে নিষ্পন্দ দেহে বসে ফার্ণান্দিজের প্রিয় ঘোড়ার ছবি আঁকছে শিল্পাঞ্জী। কিন্তু অত ওর দুই চোখে ও কিসের আগুন? ধক-ধক করে কেন জ্বলা আগুন জ্বলছে শিল্পাঞ্জীর অমানবিক দুই চোখে।

অমানবিক! সত্যিই কি তাই? মানব শিল্পীর মত চিত্র অঙ্কনে যে এত পটু, তাকে অমানবিক বলা যায় কি করে? তাছাড়া অমানবিক ঐ দুটি চক্ষুর বহির্জগতের ছবি যে বিম্বের প্রত্যক্ষ করছে ষোলবুরো তা যে কেবল মানবীর চোখেই দেখা যায়। এরই নাম তো ঈর্ষার আগুন। কিন্তু.....কিন্তু ঈর্ষা তো নারী জাতিরই অলঙ্কার ভূষণ?

বিদ্যুৎ ঝলকের মতই চোখের নিমেষে প্রকৃত সত্য ঝলসে উঠল ষোলবুরোর বিহ্বল ইন্দ্রিয়ের কোষে কোষে।

শিল্পাঞ্জীটা পুরুষ নয় নারী। ফার্ণান্দিজকে সে ভালবাসে—বন্যা মিঠে নায়াজ! কতদিন তাই নিয়ে ঠাট্টা করেছিল ষোলবুরো। বলেছিল 'ও আমার সতীন!'

ধিক ধিক ঈর্ষার আগুনের অর্থ পরিষ্কার হল এতক্ষণে! কিন্তু এযে অবিশ্বাস্য—ফানটাসটিক—ফানটাসির মতই অলীক!

এতগুলো চিন্তা এক নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল ষোলবুরোর মাথার মধ্যে দিয়ে। ঈর্ষান্বিত শিল্পাঞ্জীর পানে তাকিয়ে বলল চিবিয়ে চিবিয়ে—'ও বুঝি তোমার চর?' 'হ্যাঁ।' 'কিন্তু ও যা এঁকেছে সব মিথ্যে।' ও যা দেখে তাই আঁকে। দেখেছে বলেই এঁকেছে'। 'মিথ্যে...মিথ্যে...মিথ্যে...মিথ্যে... ফার্ণান্দিজ বিশ্বাস কর সব মিথ্যে। মিথ্যে তোমার কথা। মেয়েরা জন্ম ইস্তক মিথ্যেবাদী হয়। তোমার শিল্পাঞ্জীও তাই মেয়ে'। কথায় হেরে যাবার বেত তুলল ফার্ণান্দিজ। এবার শঙ্খচিলের মত চিৎকার করে বলল ষোলবুরো—ফার্ণান্দিজ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছ। থমকে দাঁড়াল ফার্ণান্দিজ বাঘ সিংহের খেলোয়াড় ফার্ণান্দিজ—একটা কালো-ছায়া ভেসে গেল পাথর কঠিন মুখের ওপর দিয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ষোলবুরো—'তোমার সিক্রেট.....তোমার সিক্রেট আমি জানি ফার্ণান্দিজ.....

'সিক্রেট!' লক ভিসুভিয়সের গর্জন শোনা গেল ফার্ণান্দিজের কণ্ঠে।

'কৈলাস পাইরোটেকনি ফ্যাকটরীর মোহনী মালিক আমার সামনে—তা আমি জানি গভীর রাতে কেন এত বাঁশের প্রয়োজন হয় একটা বাজী তৈরীর কারখানায়। আমি জানি বাঁশের বোম যায় কোথায়।

ফার্ণান্দিজ চেয়ে ছিল পলকহীন চোখে। মুহূর্তের জন্য সমস্ত রক্ত নেমে গিয়েছিল মুখ থেকে—পর মুহূর্তে ফিরলে রক্ত ঠেলে এল মুখে। ধীরে ধীরে পাল্টে গেল মুখের চেহারা। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল শানিত সমস্ত হিংস্র ভাবনার বেঁকে গেল মেরুদণ্ড দুমড়ে।

ফার্ণান্দিজ নিজেই যেন একটা ন্যাংটা হয়ে গেল। মানবিকতার সব চিহ্ন মুছে গেল ভয়াল মুখচ্ছবি থেকে। গ্রীভেল ঢ্যানের পাশে জমাট অন্ধকারে বড়ে উঠল একটি মূর্তি.....নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কৃষ্ণকায় মার্জারের মত ক্ষিপ্রবেগে উধাও হল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। 'তারপর কি হল?' উৎকণ্ঠিত স্বরে কবিতার। পা নাচাতে নাচাতে কফির কাপ তুলে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র—তারপর আর কি। বাঘের খোরাক হতে হল বেচারা ষোলবুরোকে। পরের দিন সকালে সার্কাসে রটে গেল—ষোলবুরো বাঘের খাঁচায় ঢুকেছিল—মারা গিয়েছে অ্যাকসিডেন্টে। 'ইস' কি হল? চোখের জল এসে গেল নাকি?'

'এত নিষ্ঠুর তুমি? মেয়েদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আটকায় না তোমার?'

আরে গেল যা! কবিতা যে তার গাইতেও নিষ্ঠুর! তাছাড়া আমি কি করে জানবো ফার্ণান্দিজ ওকে বাঘের সামনে ফেলে রেখে? আমি তো তখন আর্মড ফোর্স দিয়ে কৈলাস পাইরোটেকনি ফ্যাকটরী ঘেরাও করতে ব্যস্ত।

'অপারেশন সাকসেসফুল?' 'বিলকুল বাঁশের বোমা এখন ইতিহাসের বস্তু?'

একটু চুপ করে থেকে শুধোলো কবিতা —'ছাজকরা কাগজগুলোতে কি আঁকা ছিল ঠাকুরপো? কি এঁকেছিল শিল্পাঞ্জীটা?'

মুচকি হেসে বলল ইন্দ্রনাথ—বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে ১০৮টি আসন তার কয়েকটি'।

মুখ লাল হয়ে গেল কবিতার— একেবারে গোল্লায় গেছো তুমি! শেষকালে ষোলবুরোর সঙ্গে—

'আরে আরে!' শশব্যস্তে বলল ইন্দ্রনাথ —ওগুলো সত্যি ছবি নাকি—সব মিথ্যে। মিথ্যে বললেই হল? লাম্পট কোথাকার! তুমিই তো বললে, শিল্পাঞ্জীটা যা দেখে তাই আঁকে।

'তাই তো ও'কেছে দেখেই এঁকেছে' ইয়ার্কি হচ্ছে!

আঃ বৌদি রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন— মেয়েরা বড্ড মাথামোটা। আরে বাবা ষোলবুরোর ছবি আর আমার ছবি এক আর্টিস্টের কাছে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম— 'কোনারক খাজুরাহোর মন্দিরে আদিরসাত্মক মূর্তি' দেখা আছে নিশ্চয়। এই দুটি ছবি নিয়ে সেই সব পোজের কয়েকটা পেন্সিল স্কেচ করে দিন। মুখগুলো চেনা যায়। সেই ছবি ধরেছিলাম শিল্পাঞ্জীর সামনে। সে যা দেখেছে তাই এঁকেছে। এতে অবাক হবার কি আছে?

হাঁ করে শুনছিল কবিতা। এবার গালে হাত দিয়ে বললে—আগো। এঁকি উহ্ মুস্কিল।

বাংলার আদিবাসীর মানব পরিচয় অনুসন্ধানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। কয়েক মাসেই হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় মুদ্রণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরুল।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

শবর-শবরীর রহস্য ৫-০০

রহস্যময় মহেনজো দড়ো (২য় মুদ্রণ) ৪-০০
মহাসংগম ৭-০০ যাযাবরী ৩-৫০

প্রাপ্তিস্থান ঃ ৫২।১এ বাগবাজার স্ট্রীট। কলিকাতা-৩।

বায়েন

মহাশ্বেতা দেবী

ভগীরথ যখন খুব ছোট তখনি ওর মা চন্ডীকে বায়েনে ধরেছিল। বায়েনে ধরবার পরে চন্ডীকে সবাই গা-ছাড়া করে দিল। বায়েনকে মারতে নেই। বায়েন মরলে গাঁয়ের ছেলেপিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে, বায়েনে ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

তাই চন্ডীকে সবাই গা-ছাড়া করে ছেলের ধারে ঢালা তুলে দিল।

ভগীরথ বড় হয়েছে অন্য মা-র কাছে অন্য মায় আদরে-অনাদরে। নিজের মা কাকে বলে ভগীরথ জানে না। শুধু মাঠের ওপারে হাতিম গাছের নীচে একটা চালাঘর দেখেছে। শুনেছে এখানে চন্ডী বায়েন একলা থাকে।

কখনো মনেও হয়নি চন্ডী বায়েন কারো মা হতে পারে। দূর থেকে দেখেছে ঘরের মাথায় লাল নেকড়ার ধ্বজা। মাঝে মাঝে দেখেছে উলঙ্গ চন্ডীর মত ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের চড়া দুপুরে লালকাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর।

বায়েন যখন যায় তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বায়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা বুড়ো পুরুষকে দেখে তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রস শুষে নিতে পারে।

তাই বায়েনকে একলা থাকতে হয়। বায়েন আছে জানলে বুড়ো বুড়ো সব পথ ছেড়ে সরে যায়।

একদিন খুব একদিন ভগীরথ তার বাবা মলিনমুখকে বায়েনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল।

চক্ষু লাল ভগীরথ, ওর বাবা ধমকে বলেছিল।

বায়েন পা টিপে টিপে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভগীরথ এক পলক দেখেছিল পুকুরের জলে লালকাপড়, জামাট খুব জটবাঁধা চুল। দেখেছিল দুই চোখে কি ক্ষুধিত দৃষ্টি। যেন ভগীরথকে চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলবে।

না। ভগীরথের মুখের দিকে চায়নি বায়েন। ভগীরথ যেমন করে কালো জলে বায়েনের লাল ছায়া দেখেছিল, বায়েনও ঠিক তেমনি করেই ভগীরথের ছায়াটাকে দেখছিল।

ভগীরথ লিউরে উঠে চোখ দুটো দিয়ে কাপড় চেপে ধরেছিল।

—কেন এসেছিস? ভগীরথের বাবা হিসহিসিয়ে উঠেছিল।

—মেয়ে মানুষ ছেলে ধরে খাওয়াতে হবে কোনদিন নাই। একলা মোকে ভয় লাগে গো।

বায়েন কাঁদছিল বসে বসে। তারের ওপর ওর ছায়া-চোখে জল পড়ছিল।

—কেন, এ শনিবার বারের ডালা নেয় নাই?

শনিবার শনিবার হেমপাড়ার একজন বায়েনের ডালা দিয়ে যায়। চাল, ডাল নগদ, তেল। নিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের কাছে ছাতিম গাছের সঙ্গে বসে বায়েনের সারের ডালা নিলাম গো বলে ছুটে চলে আসে।

—কুকুর খেয়ে নিছে।

—টাকা দিবি? টাকা দে।

—আমার কে জিনিস কিনবে?

—তবে আমি কিনে নেব। তুই এখন যা—

—আমি একলা থাকতে পারি না।

—তবে বায়েন হলি কেন? যা বলছি।

ভগীরথের বাবা পুকুর পাড় থেকে এক বলা কাল তুলেছিল।

—লক্ষ্মণপুর, এ কথাটা কি...

একটা বিশ্রী গালি দিয়ে ভগীরথের বাবা কথার বলাটা ছুঁড়ে মেরেছিল। তখন পালিয়ে গিয়েছিল চন্ডী বায়েন।

—বাবা, তুমি বায়েনের সঙ্গে কথা বললে?

ভীষণ ভয় পেয়েছিল ভগীরথ। বায়েনের সঙ্গে কথা বললে তার মৃত্যু অবধারিত। ভগীরথের মনে হয়েছিল ওর বাবা মরে যাবে আর বাবা মরে যাওয়ার কথা ভাবতেই ভগীরথের মনে হত মাথায় বুঝি বজ্র ভেঙে পড়ল। বাপ মরলে সবাই তাকে তাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

—এখন বায়েন হুট, কিন্তু উ তোর মা।

বাবা অদ্ভুত গম্ভীর গলায় কথাটা বলেছিল। গলার কাছটায় ভেজা, আটকিয়ে গিয়েছিল ভগীরথের। মা! বায়েন কারো মা হয়! মানুষের মা হয় বাবা হয় ছেলে হয় মেয়ে হয়। বায়েন কি মানুষ? বায়েন তো মাটি খুঁড়ে মরা ছেলে বার করে। আবার

করে, খুব খাওয়ায়। বীরেনের দৃষ্টিতে একটা মোটা গাছ অব্দি চড়চড়িয়ে বেড়িয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তো একটা জলজীয়ন্ত ছেলে। সে কেমন করে বীরেনের চোখে ছাড়াল? ভগীরথ ভেবে পায়নি।

—আগে মনমরা ছিল, তোর যা ছিল।

—তোমার বউ?

—আমার বউ।

মলিন্দর কি ভেবে যেন নিশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল— ভেবে সব হল যাদু ভগীরথ। তোর কোন ভয় নাই।

ভগীরথ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে আল দিয়ে হাঁটছিল। মলিন্দর গঙ্গাপুরের পুরাস এমন সরল কখনও শোনে নি। যাদু তোর নয় ওরা শ্মশানের তোম। মড়কাল এখন ডিউটিফিপারিটি মানে একজন ডেড হকার্স নেয়। ভগীরথকে বীরেনদের কাজ ছাড়া সরস্বতী ইস্কুলের কাজ করল। ও মলিন্দর ফোরে সাত মাস ছাড়া। একা মলিন্দর ছাড়া এ অঞ্চলে কোন ছেলে নয় সই করতে জানে না। সেইজন্য মলিন্দর তিনদিন আগে ইস্কুলের লাইব্রেরির কাজ পেয়েছে।

সরস্বতী কাজ। মলিন্দর গঙ্গাপুর ফিরে দেখেছিল টাক মাইন নেবার কাজ। ভগীরথ বলে সব মাসে মাসে সংসারের খরচ চলে তার রিটিং পাইপ-পাঁচিলের চাড় দেয় কাজ। চাল, ডাল সবই সংসারের লাগে মলমাতো খরচ নিজের পকেট পাঁচিলের খাঁচাটা পাওয়া যায় তাহলে অনেক লাভ।

সরকারদের ভগীরথের তবু ডেকারদের কাছে ধুলি-কাদা-কয়লার মোটা লাভের সেল। বাজারে চল-পয়সারা তা দেখে তাকেই বাজা বলে। এই উপরি টাকা মলে খাটিয়ে খাটিয়ে দেয়া করবারটা লাভের হিসেবে।

মলিন্দর পাশে দিকান পরে পারে জুতো পরে মহাজন যায় কাজে ও সরস্বতী ইস্কুলে

সেই মলিন্দর চোখ লাল করে অনেকক্ষণ চণ্ডী বাঁরেনের ঘরের ওপরে গেরুয়া আকাশের কপালে একটুকু একটা সিঁদুর ফোঁটার মত লাল সেকড়ার নিশানটুকুর দিকে চেয়েছিল। বিড় বিড় করে বলেছিল—আঁধারে ডর যায়, অন্ধকারে থকেত পারত, তাকেই বিধাতা বাঁরেন করে ছাড়ল। এখন মলে বাঁরেন শান্তি পায় কিন্তু বাঁরেন নিজে না মরে তো কেউ ওর জল দিতে পারবে, জান, বাপ?

খুব দুঃখ না পেলে মলিন্দর এত কথা বলে না।

—ই মানুষকে বাঁরেন করে বাবা?

—বিধাতা।

মলিন্দর ভাল করে চেয়ে দেখেছিল ভগীরথের আলপাশ দিয়ে দুপুরের রোদ কোন ছায়া চলেছে কিনা? বাঁরেনরা ঠিক হাট-বাজারের ফলে, সোনাপ, মাখনবাজার মত। নানা ভেলাকলা জানে। এরা কোন ছোট ছেলেকে বাঁরেন নিতে চায়, সে যখন বেড়ে হবে, চরাচর রোদে পুড়লেও তার মুখে ঠিক ছায়া থাকবে। অন্যথা হলে বাঁরেন অঁতকে ছায়া এরে ছেলেকে আড়াল করে নিজেরমনে। ছেলেটা মরে গেলে কেউ বাঁর রোধ হয় তা বলে বাঁরেন মুচকি হেসে বলবে—তা কি জানব বল? ধরেকে দেখে এই বেলা নিতে গেলাম, তা তোমার খোকাটা যেন মানীর পড়ল। এই তাতে মরে গেল?

ভগীরথের আশপাশে কোন মরলা, গাছ ওঠা লালাভ আঁচলের ছায়া দেখতে না পেয়ে মলিন্দর যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বলেছিল—তোর কি ওর বাপ? তোর ঘুমো অনিষ্ট উ করবে না।

তবু ভগীরথ ভরসা পায়নি।

পরে ঐদিকে মন চলে গিয়েছিল ওর। মনকেতে হত তোর নিয়ে যাক কেবল মনে হত বেরোপাইন ধরে ছুটে চলে যাই ওখানে। গিয়ে দেখে আসে একলা ঘেরে থেকে বাঁরেন কি করে ওর পায়। দেখে আসে বাঁরেন মাথার ঘেরে ঘোর চলার জন কেমন সরে দিতেই মাথানে ঘুকোয়।

ঘোর লাগে না ভগীরথ ভয় লাগে। মনে হত ইচ্ছ আর না ফিরেও পায় কোনদিন? তাই একদিনই ভগীরথের একটা কাজ করে একটা পাথর তার মোখ রেখ বাঁরেন।

কয়েকদিন ভগীরথ খুব চেয়ে দেখত। সেখত ছাতিমতলা আর চলাঘরের মাঝামাঝি অন্ধকারটা যেন বাঁর কপালের মত। সেই কপালে এক ফোঁটা সিঁদুর টিপের মত লাল নেকড়ার নিশানটা কখনো স্থির হয়ে থাকে কখনো দোলে। মনে হত ছুটে চলে যাই একবার আর পাছু ছুটে যায় সেই ভয় উৎকণ্ঠিত কুলে ভগীরথ মাদী চলে ওকে

আশ্চর্য বাঁরেনের ছেলে বাঁর ওকে কেউ ভেলকা করত না বরং বেশী খাতির করত। বাঁরেনের ছেলেকে খাতির করলে মাঁরেন সেকথা জানতে পারে। যে ভাল খাতির করার তার কাঁচকাঁচা ভাল থাকে। যে দুরকাই করে তার ঘর শূন্য মরতেই থাকে ছেলেপুলে।

ভগীরথের এখনকার মা-ও কিছু বলে নি। সতীনের ছেলের ওপর ওর অনুরাগ আছে না বিরাগ, স্নেহ না ভালবাসা, তার কোনটাই ও কোনদিন প্রকাশ করেনি তার প্রধান কারণ ওর নিজের কোন ছেলে নেই। সৈরবী আর সৈরভী দুটো মাত্র মেয়ে। পুত্রসন্তান না থাকলে স্বামীর ওপর জোর থাকে না। তা ছাড়া এখনকার মা-র ওপরের ঠোঁট ফাঁক, মাড়ি বের করা। বাড়ী থেকে বেরোতে চায় না বেশি। বলে—ঘুন মুখে দেখাতে যাব সি বল দেখি। মুখ মোটে বুজে না যি। হাসলেও মনে হয় মাগী হেসেছে। দেখা গঙ্গাপুরে! মলে পরে মুখখানা গামোছা দিয়ে ঢেকে দিও জানল? নইলে মানুষ বলবে দাঁতী ভেমনী চলল!

মাদ শুধু বাজ করে, ঘর নিকোয় কাঠ কুড়িয়ে গোবরচেপড়া দেয়, কাজের ছোড়ায়। মেয়েদের মাথায় উকুন বাছে ভগীরথকে 'বাপ' বলে কথা বলে। সাধারণ স্নেহ-মমতার সম্পর্ক। বাঁরেনের ছেলেকে মত!-ভাতি না করলে বাঁরেন তার মেয়ে ঘরটোকে মাল মেরে দিতে পারে মলি জানে। আরো জানে, একদিন ভগীরথের ভাতের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

মাঝে মাঝে বাড়ি বেঁ করে ও সভয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। কে জানে ভর-দুপুরে বাঁরেন ওর মেয়ে দুটোর কথা মনে করে মাটি দিয়ে পুতুল গড়ছে কিনা, বাল ফুঁড়ছে কিনা। তখন বাঁরেনকে যত কুটিল তার চেয়ে কুটিল দেখায়। অনেক দুঃখে মলিন্দর ডোমপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে সাঙা করেছে। কয়েকটা বাঁরের ডোমপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি বাঁরেন চলে যাবার পর মলিন্দর আর রূপসী ছেলে দেখতে পারে না। মলিন্দর বউকে খুব ভালবাসে।

হয়তো সেই ভালবাসার কথা মনে করেই একদিন মলিন্দর ভগীরথকে চণ্ডী বাঁরেনের কথা বলল। দুজনে বেরুলাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। মলিন্দরের হাতে ছোরার পেটিলা। এই এক আশ্চর্য দুর্বলতা মলিন্দরের নিজেকে হাতে কাজ শস্যরোগগ্রস্তকে ও কাটতে পারে না। অনেকে শোধে বড় করে ফেরুপক্ষ কাটবার সময়ও দুজন গোটা দুয়েকটা কাউন্ক মেরে দেয়। যে কেন সে মলিন্দরকে একটু ত্রাসে দেয়।

—এটু পাছের কেঁয়াই বসি?

যেন তের বছরের বালকের অনুমতি নিল মলিন্দর। সেখানকার পাতিতাল ঘেরান দিয়ে বসল। ভগীরথ জিজ্ঞেস করল—এখান হতে উকাতে যায়, না কি বাপ?

ভগীরথ এখন বনিয়াদী ইস্কুলে যায়। এই সরস্বতী ইস্কুলের ফেওয়াজ ওদের মাস্টারমশাই এক সময়ে ফেওয়াজ পত্রিকা অধিসম্পাদিকেন ভোলানাথের দিয়ে। নিজে চমৎকার লিখে এনেছিলেন। ভগীরথরা সবগুলি কালি দিয়ে ভরেছিল। সেই লেখাটি পরে ভগীরথ জানায় স্কলারশিপ উনিশশো পঞ্চান্ন-র অক্টোবর-আইনের পর থেকে ওরা কউ আর অক্টোবর নয়।

জেনেছিল ভারতীয় সংবিধান বলে একটা জিনিস আছে তার প্রথমেই একটা মৌল অধিকারের কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে তারা নাকি সবাই সমান।

মেয়াল পত্রিকাটা এখনো টাঙানো আছে। কিন্তু ভগীরথরা জানে সহপাঠীরা বা মাস্টাররা ওদের একটু দূরে বসাই পছন্দ করেন। এই ইস্কুলে অন্য জাতের ছেলেরা নেহাৎ গরীব বা অপরাগ না হলে আসে না। আসবে কেন? এখন চারদিকে ইস্কুল।

যা হোক, ভগীরথ এখন একটু অন্য-রকম ভাষার কথা বলে। মলিন্দর ওর কথা শুনতে ভালবাসে ও ভগীরথের পাশে প্রায়ই ওর নিজেকে এক অযোগ্য বাপ বলে মনে হয়।

ভগীরথ ডাকাতদের কথা জিজ্ঞেস করল। এখন এই সোনাডাঙা, পলাশী, ধনেখালির আশপাশ জায়গায় ডাকাতির সংখ্যা টোন ডাকাতি খুব বেড়ে গিয়েছে। ডাকাতি সবাই করে সম্পন্নের খোলা। ছিনতাইকারী-গরীব-ছাপ-তস্কর-জলোনীর মাসিকরা পাড়াবাড়ীর মালিক—মানাকমায় পরিচয় তারা মাটায় দেয়, কামবায় ওঠে। তারপর ঠিক সময়ে টেন টোন টান ধাঁয়রে

D-SEAL

A wonder chemical compound with a preventive and curative effect for damp conditions on buildings, walls, roofs and leakage spots.

AND

ESTRICH PLASTER

A fantastic chemical mix to get rid of that damaging

"SALTPETRE ACTION"

*

MANUFACTURED BY

CARCARE

(Civil Works Division)

SOLE DISTRIBUTORS

Mayflower Internationale

3, SAKLAT PLACE CALCUTTA-700013

Phone 23-0983

সের অন্ধকার মাঠে। অন্ধকার থেকে সেখোরা আসে। তারপর সবাই মিলে যা পারে নিয়ে খুয়ে মেখেধরে চম্পট দেয়। বিশেষ করে এই বটগাছটা সন্ধ্যের পর বড় ভয়ের হয়ে উঠেছে।

তাই ভগীরথ তাকাতের কথা জিজ্ঞেস করল। মলিন্দর কিন্তু সে-কথা বিশেষ গায়ে মাখল না। শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আকাশে ও মাঠে কি যেন খুঁজল, তারপর বলল।

—আমি আগে নিমারা-নিকা ছিনু জানলু বাপ। তেরা মা ছিল তুহু তুহু ফানেকে কানত। বিয়েতায় বিচর।

যেন ভগবানই তারপর একদিন তোম-পাড়ায় এসে পাশা উল্টে দিলেন। চন্ডী হয়ে গেল বাঁরেন নিষ্ঠুর নির্দয় শিশু-হন্তা। আর মলিন্দর হয়ে গেল তুহুপ্রাণ। হতেই হবে। একজন যদি অমানুষ হয়, মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে অলৌকিক জগতের অদৃশ্য দরজা খুলে ঢুকে যায় তাহলে আরেকজনকে মানুষের মত মানুষ হতেই হবে।

ভগীরথ এই সময়ে বুঝতে পারল ওর বাবা ওকে কিছু বলতে চায়। ভগীরথ একটু আশ্চর্য হল। সেই একদিন বাবা বাঁরেনের সঙ্গে কথা বলেছিল আর বলেনি। আজ আবার বাঁরেনের কথা কেন?

—তোরে সব বলে যাই।

মলিন্দর ভগীরথের হাত চেপে ধরল। বলল—ভয় কি? সবাই সব জানে আর তুই তের মায়ের বিত্তান্ত জানবি না?

ওরা গলাপত্তর। ওরা ডোম। মলিন্দর বাঁশ চাঁছত কাঠ কাটত আর চন্ডীর ছিল কাঁচা ভাগাড়ের কাজ।

ওর বংশগত উত্তরাধিকার। এই গ্রামের উত্তরে বিলের ধারে বটগাছতলে কাঁচা ভাগাড়। পাঁচ বছরের নীচে শিশু মরলে এখন পোড়াতে হয় তখন সবাই পুঁতে দিত। ঐ ভাগাড়ে চন্ডীর বাবা খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ত, কাঁটাগাছ দিয়ে গর্ত ঢেকে রাখত শেয়াল তাড়াত। হই হই হইরা...ওর প্রমত্ত কণ্ঠের ভয়ঙ্কর ডাক রাতে-বিরেতে হরদম শোনা যেত।

খুব মদ আর গাঁজা খেত চন্ডীর বাবা। আর শনিবার একটা ডালা হাতে গাঁয়ে বেরুত। বলত—আমি আপোনাদের সেবক গো আমি গলাপত্তর। আমায় ভালটা দিয়ে দেন গো।

সবাই ওকে ভয় পেত। ওর চোখ থেকে ছোট ছেলেমেয়েকে সরিয়ে রাখত। একটাও কথা না বলে ওকে ভিক্ষে দিয়ে চলে যেত।

একদিন একটি কর্সা মেয়ে কটা চোখ, লালচে চুল এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—

—আমি চন্ডী, অমুকে গলাপত্তরের বিটি। বাপ মরে গেল। বাপের ভাল এখন মোকে দেন।

—বাপের কাজ তুই করবি!

—করব।

—তোকে ভয় লাগে না?

—মোর ভয়ডর নাই।

এই ভয়ডরের কথা চন্ডী বুঝতে পারত না। ছেলেমেয়ের মরলে মা-বাপ কাঁদে সে শোকের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু মরাকে কি কেউ বাড়ীতে ধরে রাখে, না রাখতে পারে? তার সৎকার করাটা তো চন্ডীর কাজ, অন্নের জীবিকা। এতে ভয়ের কি আছে নিষ্ঠুরতাই বা কি? যদি থাকে সেও তো বিধাতারই নিয়ম। সে-নিয়ম তো গলা-পত্তরা তৈরী করেনি? তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ, কেন ভয় পায়?

এই চন্ডীকে মলিন্দর বিয়ে করেছিল। তখনো মলিন্দর সরকারবাবুর সঙ্গে হাড় বেচার কাজ করত। গো-ভাগাড়ের হাড় থেকে সার হয়, সে-হাড়েরও দাম আছে। হাতে পয়সা ছিল মলিন্দরের বুকে সাহস, রাতে মাঠ দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ও ফিরত—কিসকো নেই ডরতা, হাম আগুন খাতা। কিসিকো নেই ডরতা।

সন্ধেবেলা লণ্ঠন হাতে একা চন্ডীকে বটগাছতলায় ঘুরতে দেখে ও বলেছিল—এই তু আঁধারে ডরিস না?

—না, হাম আগুন খাতা জানিস?

চন্ডীর হাসি দেখে মলিন্দর খুব অবাক হয়েছিল। সেই বৈশাখেই ও চন্ডীকে বিয়ে করে। আরেক বৈশাখে চন্ডীর কোলে ভগীরথ এসেছিল।

চন্ডী ভগীরথকে কোলে নিয়ে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল। বলেছিল—মোকে ওরা ঢেলা মেরে দিল গলাপত্তর। বলল আমার লছর মন্দ।

—কে ঢেলা মারল?

—নাও! তাকে কি তুমি মারবা?

—ঢেলা মারল কেন?

মলিন্দর উঠোনে বেড়া পুঁততে পুঁততে প্রায় নাচতে শুরু করেছিল চটকা রাগে। অমার বউকে ঢেলা মারে কে? কার এত আস্পর্ধা। গালাগালি দিতে শুরু করেছিল মলিন্দর।

চন্ডী ওর দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে বলেছিল। তারপর বলেছিল—মোর মন চায় না গলাপত্তর খন্তা ধরতে মন চায় না, কিন্তুক বিধাতাই কাজ মোকে দিয়ে করাবে। তা আমি কি করব বল?

চন্ডী আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে দেখেছিল, নিজের হাত-পা দেখেছিল। ওর বংশে ভাই-কাকা-দাদা থাকলে বংশের কাজ করত কিন্তু কেউ নেই। ওরা সেই আদিম যুগের শ্মশানের দাস, যখন হরিশ্চন্দ্র চাঁড়াল হয়েছিলেন তখন চন্ডীদের পূর্বপুরুষ ওঁর কাজ শিখিয়েছিল। অবশ্য যখন হরিশ্চন্দ্র রাজা হলেন তখন সমাগরা পৃথিবী ওর দান করতে লাগলেন ভয়ে ভয়ে।

—মোদের কি বেবস্থা?

সেই আদিম গঙ্গাপুত্র রাজসভা ফাটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। ওদের কানের ভেতরে রাজদের চিতা চো-চো করে তাই ওরা প্রতিটি কথাই চেঁচিয়ে বলে ধীর কণ্ঠ শুনতে পায় না।

—কিসের বেবস্থা?

—যখন পাই-বলদ পাবে, সমোসানীর নিতা ভিক্ষা মোদের কি বেবস্থা? শ্মশানের কি দিলে?

—পৃথিবীর সকল শ্মশান ছিনাম।

— কি দিলে?

—সসাগরা পৃথিবীর সকল শ্মশান তোমাদের দিলাম।

—দিলে?

—দিলাম, দিলাম দিলাম।

তখন সেই আদি গঙ্গাপুত্র দুই হাত তুলে তাণ্ডব নেচেছিল। উল্লাসে বলেছিল—হা মোরা সকল শ্মশান পেয়েছি গো সকল শ্মশান পেয়েছি। এ পৃথিবীর সকল শ্মশান মোদের।

সেই মানুষটির বংশের একজন হয়ে চন্ডী কেমন করে জাতকর্মে লাথি মারত? মরলে যে সে দেবলোকে পড়ত না তার ঠিক কি? অথচ চন্ডীর ভীষণ ভয় করত ইদানীং খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিত। গর্ত কাঁটাঝোপ চাপা দিলেও ওর ভয় যেত না। মনে হত যেন কোন সময়ে মুখে আগুন নিয়ে একটা শেয়াল বটগাছের মত বড় বড় থাবা দিয়ে দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করবে।

ভগমান - ভগমান - ভগমান—চন্ডী গুনে গুনে করে কাঁদত। এক ছুটে চলে আসত বাড়ী। ঘরে বাতি জেবলে বসে থাকত আর ভগীরথের দিকে চেয়ে ঠাকুরকে ডাকত। এই সময়ে চন্ডী সব সময়ে কামনা করত গ্রামের প্রতিটি শিশু যেন অখন্ড পরমায়ু নিয়ে বেঁচে জীয়ে থাকে কেন না আগে তার যে দুর্বলতা ছিল না এখন সেই দুর্বলতা হয়েছে। ভগীরথের কথা মনে করে ওর প্রতিটি শিশুর জন্য কষ্ট হয়, নিদারুণ কষ্ট হয়। যদি বটতলায় বেশী সময় থাকতে হয়, ওর বুক দুরু দুরু টনটন করে। মাথা নীচু করে ও গর্ত খোঁড়ে ও বাপকে মনে মনে দোষ দেয়। মেয়েকে কেন সে এই নিষ্ঠুর কাজে ব্রতী করে গেল?

—আপোনারা অন্য মানুষে দেখে নাও মোর মন উঠে না।

চন্ডী একথাও বলেছিল একদিন। কিন্তু ওর কথা কেউ কানে নেয়নি। মলিন্দর ওর কথা বিশেষ বুঝত না কেন না অন্য মানুষ যা দেখে ভয় পায় ঘৃণা করে সেই অর্ধগলিত শবদেহ, হাড়, চামড়া নিয়েই ওর জীবিকা। চন্ডীর কথাবার্তা শুনে ও বলত—ধুস বত বিহা-ভয়।

চন্ডী বেশী কাঁদলে বলত—তো-মানীর বংশে তো কেউ নাই, কে আসবে শুনি?

এই সময়েই সেই নিদারুণ ঘটনাটা ঘটেছিল। গ্রামে বেড়াতে এসেছিল মলিন্দরের একটি জ্ঞাতি বোন। তার মেয়েটা কদিনেই চন্ডীর খুব ন্যাওটা হয়েছিল। গ্রামে বেবার খুব বসন্ত হচ্ছে। চন্ডীর কোনদিনই টিকে নেয় না, শীতলাতলায় যায়। ননদের মেয়েটিকে কোলে নিয়েছিল চন্ডী। ঐদিনকে মুরগির পুজো দিয়ে এসেছিল শীতলাতলায়। রেল লাইনের ধারে বিহারী কুলীরা যখন কাজ করত ওরা একটি শীতলামন্দির বানিয়ে গেছে।

সেখানে পাকাপাকিভাবে বিহারী পুরোহিত থাকেন একজন।

কয়েকদিন পরে সেই শিল্পটিই কি আশ্চর্য, মায়ের দয়ায় মারা গেল। চন্ডীর বাড়াতে নয় অন্যত্র। কিন্তু মেয়ের মা বাবা পিসী কাকা সবাই বলতে লাগল চন্ডীই ওকে নিয়েছে।

—আমি?

—হ্যাঁ গো তুমি?

—আমি নয় গো আমি নয়।

চন্ডী এদের সমাজের মেয়ে পুরুষগুলির দিকে চেয়ে সকাতরে বলেছিল।

—হ্যাঁ তুমি।

—কখনো নয়।

চন্ডী সাপের মত ফুঁসে উঠেছিল: বলেছিল—আমা হতে কারু মন্দ হবার নয়। জান আমি কার বংশ।

ভীরু, কুসংস্কারে অন্ধ মানুষগুলি ভীত চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—টুকনকে মাটি দিবার কালে তোমার বুক হতে দুধ মাটিতে পড়ল কেন,

—হা রে বোকার সমাজ।

চন্ডী কিছুক্ষণ ঘৃণা ও বিস্ময়ে সকলের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। তারপর বলেছিল—ঠিক আছে। পিতৃ পুরুষের শাপ মোকে লাগুক, ডর করি না। উ কাজ ছেড়ে দিলাম আজ হতে।

—কাজ ছেড়ে দিবি?

—দিব। যা, যের বীর পরুষে সব, পওয়া যে গা। মোর মন ই কাজে বহুদিন নাই। গঙ্গাপুত্ত গোরমেন্টের ঘরে সরকারী কাজ পাবে, ই কাজে আমি মরতে যাব কেন?

সমাজের সকলকে বোকা করে দিয়ে চন্ডী ঘরে চলে এসেছিল। মলিন্দরকে বলেছিল—কাজ যিখানে সিখা ঘর মেলে না? সিখা চলে যাব। উরা মোকে কি বলল তা জান?

মলিন্দর চন্ডীকে ঠাট্টা করে অবস্থাটা সহজ করে দেবার জন্যে স্বভাবসিদ্ধভাবে চোখমুখ হেসে বলেছিল—কি বলে উরা: তু বাঁয়েন হচ্ছিস?

বলেই মলিন্দর আর্তনাদ চেপে নিয়েছিল। কি বলল। মলিন্দর এ কি ভয়ানক কথা উচ্চারণ করল?

চন্ডী কাঁপতে শুরু করেছিল বাঁজার ঘন্টি ধরে। উত্তেজনায় দুঃখে রাগে চতুর্গুণ চেঁচিয়ে ও বলেছিল—দুঃখের দুইতে কেউ উ বাক্য মুখে লাগাই? আমি বাঁয়েন? আমি ঘরের ছেলে ছেলে মরা ছেলেকে দুধ দেই মরা ছেলে নিয়ে ঘোরাঘুরি করি? আমি বাঁয়েন?

—চুপো!

মলিন্দর ওকে ধাক্কা দিয়ে উঠেছিল কেননা তখন ভয়া দুপুর। এ সময়ে মানুষের কুকথা দুঃসংবাদ বাতাসের মুখে যায়। এ সময়ে মাথায় তেল, পেটে ভাত না থাকলে মনের ভয়ঙ্কর হিংস্র রাগ আক্রোশ সহজে ধাইয়ে ওঠে। মলিন্দর এও সমাজের লোকের স্বভাব-চরিত্র জানত।

—আমি বাঁয়েন নই গো আমি বাঁয়েন নই।

চন্ডীর কান্না চিল চেঁচা মেয়ে বটতলাকে পৌঁছে দিয়েছিল। বাতাস নিমেষে সে কান্নার খবর ঈশান থেকে অগ্নি আকাশের সব কটা কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ঐ একবার কেঁদেই চুপ করে গিয়েছিল চন্ডী, আর কোনো কথা বলেনি। মলিন্দরকে নাকি বলেছিল—মোরা আঁধারে চলে যাই কথা?

কুথা যাবি?

—পালা যা?

—কুথা?

—জানি না।

চন্ডী মলিন্দরের কাছে এসে ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসেছিল। বলেছিল—কাছে পুইড়ে এসো, ওকে মাথা রাখি।

বলেছিল—মোর বড় ডর লাগছে। পিতৃ-পুরুষের কাজ করব না বলে এলাম ঘিকে ডর লাগছে? এতদিন তো ডর লাই? আজ যামন ডর লাগছে তুমাকে আর দেখব না, ভগীরথকে আর দেখতে দিবে না। ভগমান।

এই কথাটি বলে মলিন্দর চোখ মুছেছিল। বলল—এখুনে মনে লায় বাপ, সিদিন ভগমান উর মুখে দিয়ে কথাটা বুলিয়েছিল, জানলু?

তারপর?

তারপর কয়েকদিন চন্ডী আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকছিল। অল্প কাজকর্ম করে আর ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসে থাকে গান গায়। ঘরে খুব ঘুনো জালে পিদীম জ্বালে আর মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে।

একটা না দুটো মাস ঘরে ভাল কেটেছিল। আর চন্ডীকে ডাকতে আসেনি কেউ আর দরকারও হয়নি। খুব শান্তিতে ছিল এরা সেই ক-টা দিন। চন্ডীও খুব শান্ত করে গিয়েছিল। বলেছিল

—ই কাঁচা কাঁচিয়ের জন্য বেবস্থা হতে হয়। ই বেবস্থা খুব মন্দ।

—তবে, বেবস্থা হবে। দিকে দিকে হচ্ছে।

চন্ডী বলত—ভাল করলম কি মন্দ করলম কে বলে দিবে? দেখ, মোকে মন বলে নিশি যামন সুনসাম তামন জানি মোক বাপ হাকুর দেয়।

—তুই শুনলি?

—মন বুলে যামন হুই-হুই-হুইয়া ডাক ছাড়ে। বাপ কি শ্মশান ডাঙায় না কি?

—চুপ যা চন্ডী।

মলিন্দর ভয় পেত। মাঝে মাঝে কি তারই মনে হত না চন্ডী বাঁয়েন হয়ে যাচ্ছে! চন্ডী রাতে চমকে উঠে বটতলার কাদের কান্না শোনে? হয়তো সমাজ যা বলছে সে কথাই সত্যি। মনে হত এর চেয়ে দেশ-গ্রাম ছেড়ে সহরে যাওয়া অনেক ভাল।

সমাজও চন্ডীকে ভোলেনি। চন্ডীর ওপর চোখ রাখছিল। চন্ডী তা বুঝতে পারত না এই যা। সমাজ যখন চায় তখন লক্ষ্য চোখ রাখে। সমাজের অন্য কাজ নেই।

তাই একদিন, ঝড় বাদলের গভীর রাতে, মলিন্দর যখন ঘর থেকে লেপায় টেপটাপ হয়ে ঘুমোচ্ছে, ওর উঠোনটা মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছিল। ওকে ডেকে তুলেছিল কেউনে, চন্ডীর কি রকম মেজো। বলেছিল—তোর বউ বাঁয়েন কি না দেখে যা।

ঘুমভাঙা চোখে মলিন্দর জোকার মত ওদের দিকে চেয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ।

—দেখে যা শালা দেখে যা, ঘরে বাঁয়েন পরে মোদের ছেলেগুলাকে মারা করছিস তাত দিন ধরে।

মলিন্দর দেখতে গিয়েছিল।

দেখছিল বটতলায় মশাল জ্বলছে, লণ্ঠন। সমাজের বেটাছেলেরা ভিড় করে চাক বেঁধে আছে, কেউ কথা বলছে না।

—চন্ডী রে!

মলিন্দরের আর্ত চীৎকারটা কে যেন ছুঁড়ে দিয়ে কেটে ফেলেছিল। সবাই স্তব্ধ, সবাই দেখছে এরা কি করে।

—চন্ডী!

চন্ডী দাঁড়িয়েছিল। হাতে একটা দা। পাশে লণ্ঠন। এক পাঁজা কাঠ গাছের গুঁড়ি পাশে উঁচু করা।

—ডাল কোপ এনে আমি গর্ত ঢাকছিলাম গো।

—কেন তু উঠে এলি কেন?

—শিয়ালগুলোকে চেঁগাতে ছেড়ে যামন খেয়ে গেল তামন শাক মন বুলল উরা গর্তে মেয়ে থাকছে, মরা তুসবে।

—তু বাঁয়েন।

—গ্রামের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বলল সভয়ে।

—ক্যাও পতয়া দেয় না বি!

—তু বাঁয়েন।

—মোক বংশডাক। উরা কি জানবে?

—তু বাঁয়েন।

—আমি বাঁয়েন নইগো, মোক বুকে কাঁচ ছেলা মোক বুকে দুধে ফেটে যায়। বাঁয়েন আমি নই। গঙ্গাপুত্ত তুমি বল না গো, তুমি তো সব জন?

মলিন্দর জবাব দিতে পারেনি। বিশ্রীভাবে জোড়াতালি দেওয়া আঁচলটা দেখছিল মলিন্দর মন্ত্রমুগ্ধের মত। বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছিল মলিন্দর। বুক বলছিল ও মলিন্দর সাপ খেকো তু কাছে যাস আগুনে মেয়ে হাত ঢোকা এখন যায় না তু তুদের মত ভালবাসা দিয়ে ভালবাসার ঘর। তু গেলে ঘরা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মলিন্দর কাছে গিয়েছিল। বুক ফাটা দিয়ে চন্ডীকে ভাল করে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠেছিল জন্তুর মত—আমি ই-ই-ই-ইইয়া। তু বাঁয়েন। বটতলায় [illegible] বিভিচিন্দ যে? আমি ই-ই-ই-ইয়া।

—গঙ্গাপুত্ত..... [illegible]

চন্ডীর ভীষণ ও [illegible] মৃত শিশুদের চন্ডী [illegible] আত্মাকে ওর আদিম [illegible] ভেতরের অগ্নি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মানুষের জগৎ থেকে অমানুষী অভিযোগ

লোকে নির্বাসনের সময়ে মানুষের আত্মা বদ্ধি অমনি করেই কাঁদে। অমনি আকাশ-মাটি-পাতাল কাঁপিয়ে।

কিন্তু মলিন্দর ছুটে ঘরে এসে ওর অবশ্যের শনিপুজোর ঢোলটা নিয়ে আবার ঝটপট চলে গিয়েছিল। ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—আমি, মলিন্দর গঙ্গাপুত্র সোহরৎ নেই। আমার বউ বাঁয়েন হয়েছে গো বাঁয়েন হয়েছে।

—তারপর? ভগীরথ জানতে চাইল।

—তারপর সমাজ উ-কে বেলতলা দিয়ে গেল বাপ। জানলু, একেলা হতে যি তামন ডরাত সি একেবারে একেলা হয়ে গেল। উই. উই শোন্ বাঁয়েন গান গায়।

অনেক দূর থেকে টিনের কৌটোর শব্দ আর এক অদ্ভুত গানের সুর ভেসে এল। সে গানে শব্দ নেই, কথা নেই বলে মনে হয় কিন্তু কথা ধীরে ধীরে শোনা গেল।

—ঘুম এস ঘুম এস রে সোনা, ঘুম এস রে বাদু!...

গানটা [illegible] ছেলেকে ঘুম পাড়ায়।

—চল [illegible] বাপ্।

মলিন্দর [illegible] ভগীরথকে নিয়ে ঘরে ফিরে চলল। ভগীরথ বুঝতে পারল বাঁয়েনের গানটা ওর ভেতরে চুকে গেল, ওর বুকে ছিল শেল, একটা দুর্বোধ্য বেদনার মত ওর কানের ভেতর বাজতে থাকল।

তার কয়েকদিন পর ভগীরথ দুপুরবেলা একেলা চলে এল বজা বিলের পাশে। অনেক দূরে থেকে ও টিনের শব্দ শুনেছে, শুনে ছুটে ছুটে এসেছে।

জলে বাঁয়েনের ছায়া। বাঁয়েন ওকে দেখছে না। চোখ নীচু করে জল ভরছে মাটির কলসীতে।

—তোমার আর কাপড় নাই?

বাঁয়েন চুপ। বাঁয়েন মুখ ফিরিয়ে আছে।

—তুমি ভাল কাপড় পরবে।

—গঙ্গাপুত্তে বেটা ঘরে থাক।

—আমি, আমি এখন ইস্কুলে পড়ি। [illegible] বলে নাহে। আমি [illegible] বলছি।

[illegible] যাতে পাপ আছে ই কথা গঙ্গাপুত্তের বেটা জানে না?

—আমার ডর নাই।

—ঘরে থাক, এখন তাতপর ভাত। ই-কালে ঘরের ছেলা বাইরে ঘুরে না।

—তুমি... তুমি একলা থাকতে ডর পাও।

—একলা? নাহ্ মোর কুন ডর নাই' একলা থাকতে বাঁয়েন ডরে?

—তবে তুমি কাঁদ কেন?

—কে বলে?

—আমি শুনেছি।

—গঙ্গাপুত্তের বেটা শুনেছে! আমি কাঁদি?

জলে লাল ছায়াটা কাঁপছে। বাঁয়েনের চোখে জল। বাঁয়েন চোখ মুছতে মুছতে—ঘরে গেছে গঙ্গাপুত্তের বেটা ঘরে ফিরে বাড়ে বাঁয়েনের ঘরে কুনদিন আসবে না, নয় তো... নয় তো আমি গঙ্গাপুত্তকে বলে দিব।

ভগীরথ দেখতে পেল জল ধরে বাঁয়েন চলে যাচ্ছে। চুলের গোছা উড়ে উড়ে পড়ছে কাপড়ের আঁচল লাল। অনেকক্ষণ বসে রইল ভগীরথ, বিলের জল স্থির হওয়া অব্দি বসে রইল। কিন্তু আজ আর কেউ গান গাইল না— ঘুম এস ঘুম এস সোনা, ঘুম এস রে বাদু!

ঘরে গিয়ে বাঁয়েনও অনেকক্ষণ বসে রইল। বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে থাকল। ভেবে ভেবে শেষে উঠে অনেককাল বাদে একখানা ভাঙ্গা আশী টেনে বের করল।

—আয়নায় কিছু নাই!

অস্ফুটে বলল বাঁয়েন। চুলগুলো একবার আঁচড়াতে চেষ্টা করল। ভীষণ জট।

—টোকাটা কাপড়ের কথা বললেন কেন? উরতো কিছু মনে থাকবার কথা নয়। ফার্স্ট কাপড়, ভাল গোহারার কথা?

ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল বাঁয়েন। অনেকদিনই ও মানুষের মত গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারে না, ভাববার কিছু নেইও ওর। শুধু গাছের পাতায় শব্দ বাতাসের ভাষা, রেলের আওয়াজ নিয়ে কত কথা আর ভাবা যায়, কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হল টোকাটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হঠাৎ, মানুষের বউয়ের মত অবিবেচক মলিন্দরের ওপর রাগ হল। টোকাটাকে সামলে রাখা কার কাজ? বাঁয়েনের নজর থেকে আড়াল করা কার দায়িত্ব?

উঠে, লণ্ঠন জেবলে ও হনহন করে রেল লাইন ধরে ধরে এগোতে লাগল। লাইন ধরে এগিয়ে গেলে ঐ দূরে গুমটি ঘর, কোভল কুসিং। ওখান দিয়ে আসে মলিন্দর। এসে আলপথ ধরে ঘরে যায়। লাইন ধরে যেতে যেতে ও লোকগুলোকে দেখতে পেল। লোকগুলো লাইন থেকে কি সরাচ্ছে। না, লাইনের ওপর বাঁশ গাদা করছে এনে এনে। আজ বুধবার রাতের ফাইভ-আপ মালগোদাম মেলব্যাগ আসবে। অনেক টাকা। অনেকদিন ধরে ওর এই জন্যে তৈরী হচ্ছে।

—তোরা কে?

বাঁয়েন লণ্ঠন তুললো, নিজের মুখ পাশে দোলাল। লোকগুলো মুখ [illegible] করে সাদা, চোখ বিস্ফারিত। ওর সমাজের মানুষের এত ভয় পেতে বাঁয়েন কোনদিন দেখেনি।

—বাঁয়েন!

—তুরা বাঁশ-গাড়ী দিহিস তুরা গাড়ী মারবি? আমার পলাবার বাহিস. হা মোক ডরে? ই বাঁশ কেলা আগে সর্বনাশ হবে।

ওরা বাঁশ আনতে পারে সর্বনাশ ঘটাতে পারে। ওরা বাঁশ নামাতে পারে না লাইন থেকে সর্বনাশ ঠেকাতে পারে না। সমাজ চিরকাল এই করে সমাজের এই কাজ। ওদেরি একজন একদিন ঢোল-সহরৎ দিয়ে ওকে বাঁয়েন করে দিয়েছিল। বাতাসে বিপদের আশঙ্কা, চন্ডী লণ্ঠনটা হাতে নিল। অসহায় কি অসহায় চন্ডী! ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর শোয়া অবকোরের ধনবগুলো এসে ঐ ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে, শুধু, এইটুকু। কি অসহায় চন্ডী। চন্ডী এখন কি করে?

লণ্ঠন হাতে চন্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগল। এক হাত তুলে মানা করতে লাগল এসোনা আর এসো না গো, এখানে পাহাড় প্রমাণ বাঁশগাড়া।

ট্রেন দূরন্ত ছেলের মত কোন বাধা না মেনে একেবারে চন্ডীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রাণ দিয়ে ট্রেনটিকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্যে চন্ডীর নাম অনেকদূর পৌঁছে গিয়েছিল। বুঝি বা সরকারের ঘরেও।

লাশঘর থেকে ওরা যখন চন্ডীকে নিয়ে চলে গেল তখন সরকারবাবু মলিন্দরের গ্রামে এলেন। সঙ্গে বি-ডি-ও।

—রেল কোম্পানী চন্ডী গঙ্গাদাসীকে মেডেল দিবে মলিন্দর তা তোদের বেত্তান্ত তো আমি জানি। বললাম ওর কেউ নাই, তবু মোকাবিলা করতে দেওয়া দরকার তাই ইনি এসেছেন।

—সাহসের কাজ, খুব সাহসের কাজ করেছে। সবাই ভাল বলছে মহকুমায়। তোমার পরিবার?

সবাই চুপ। সমাজের লোকগুলি এ ওর দিকে চাইল। ঘাড় গলা চুলকে মাটির দিকে চেয়ে কেতু বলল—আজ্ঞা আমাদের জ্ঞাতি—

ভগীরথ অবাক হয়ে গেল। সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

চন্ডীকে ওরা জ্ঞাতি বলল? চন্ডীকে ওরা স্বীকার করে নিচ্ছে!

—তোমাদের সকলের হাতে তো ওর মেডেল দেবে না সরকার।

—আজ্ঞা আমাকে দেন।

ভগীরথ এগিয়ে এল।

—তুই কে?

—উনি আমার মা।

[illegible] তোর নাম কি... কি করিস?

[illegible] ডি-[illegible] লিখতে লাগলেন। ভগীরথের চোখ দিয়ে জল [illegible] লাগল। একলা থেকে থেকে [illegible] গেল বাঁয়েন জানতে পারল না [illegible] ও একলা ছিল না। মানবে [illegible] আসে একলা যায় বটে কিন্তু কখনো [illegible] কোন কোন কাজের মধ্যে কিছুক্ষণের [illegible] সমাজের সবাই এক হয়ে হাসতে [illegible] পারে। সেটাও কম পাওনা নয়। ভগীরথ গলা ঝেড়ে বলল—

—আজ্ঞা আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র। বাপ পূজা মলিন্দর গঙ্গাপুত্র। নিবাস ডোমপাড়া ...মা ইশ্বর চন্ডী গঙ্গাদাসী।

ভগীরথ বংশ পরিচয় দিতে লাগল।

CENTRAL LIBRARY

প্রশান্ত হলঘরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এভাবে শরতানের আবাসে খুকু ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছিল। এভাবে গুপ্ত নিবাসের খুকু ক্রমে কল্যাণী হয়ে গেল। কেউ এখন খুকু বলে ডাকলে তার ভীষণ রাগ হয়। তবু বাবা যখন ওপরে উঠে আসার সময় খুকু বলে ডাকেন তখন মনে হয় এ-বাড়ীর ভেতর যে একটা শৈশব ভাব ছিল যুগল বেড়াল ছানা অথবা কুকুর ছানার প্রতি যে ভীষণ মমতা বোধ ছিল কে যেন মনে করিয়ে দেয়। মা মরে যাবার পর থেকে একমাত্র বাবার এই সুন্দর ডাক এবং তাকে সাড়া দেওয়ার ভেতর বেশ একটা আনন্দ আছে। আর কেউ ডাকলেই যেমন বার্ন্ডেট মকবুলে একদিন ভেংচেছিল খুকু দিদিমণি তোমায় কে এসেছে ডাকছে। তখনই কল্যাণী রাগ করে বলেছিল মকবুলে আমাকে আর খুকু দিদিমণি ডাকবে না। আমার ক্লাসের বন্ধুরা শুনে ভীষণ হাসাহাসি করে। মকবুল বলেছিল আচ্ছা দিদিমণি কি বলে ডাকবে?—আমাকে তুমি মেমসাব ডাকতে পার না। মকবুল বলেছিল জী মেমসাব। গীতা হাসি বলেছিল তোমার এখনও মেমসাব হবার মতো বয়েস হয়নি কল্যাণী। কল্যাণী বলেছিল, হয়নি তো হয়নি। ডাকতে বলেছি ডাকবে। গীতা হাসির সে সাহসও নেই। তার প্রতিপত্তিও নেই। মকবুল কল্যাণীর কথা শুনতে পেয়েছিল [illegible] তার তখন। বেশ [illegible] মেমসাব। মকবুলের সান্ত্বনা বিরূপতা [illegible] গীতাহাসির প্রতি। বাড়িটার মকবুলের [illegible] অথবা সেই যে বলা যায় খুকু দিদিমণির মা, সংসারে যে ছিল আসল মৌরুসী [illegible] যাকে মাসের ছলে, [illegible] ছাড়া করেছিল—এবং এতটা [illegible] গীতা হাসির সহ্যের [illegible] তুমি কি ভাবে [illegible] গুপ্তসাহেবকে সে এখনও সহ্য করতে পারে না। [illegible] দিয়ে দিয়ে [illegible] গেল। [illegible] এবং নতুন মেমসাব আসার এ-বাড়ীতে যখন পরিস্থিতি উঠবে তখন তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। সে মুরগীর রোস্ট লোহার উনুনে ঢেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল তখন। দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করছে এবং সন্তর্পণে আর কি কি কথা কাটাকাটি হয় শোনার জন্য বেশ আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার। আর বোধহয় খুকু দিদিমণি টের পেয়ে গেছে—সংসারে একজন আয়া দিন দিন কতটা খাঁটা মাসি হয়ে গেছিল। খুকু দিদিমণি সেদিন মুখের ওপর জবাব দিতে শিখেছে তবে সে আর অন্য কোথাও কোনো বড় হোটেলে কাজ নিয়ে চলে যাবে না ভেবেছিল। কল্যাণীর পড়ার ঘরটা একেবারে পশ্চিমের দোতালায়। এবং ঘরটা ভীষণ নিরিবিলি। আর চার পাশে অজস্র গোলাপের সমারোহ নিয়ে যখন বাড়ীটা এক অতিথেয় বৈভবের ভেতর আছে তখন কল্যাণী তার পড়ার ঘরে সুন্দর কারুকার্যময় টেবিলে ঝুঁকে দেখতে পায় নিজের প্রতিবিম্ব— আয়নার সে দেখতে পায় ভারী সুন্দর এবং শরীরের অলৌকিক ভীষণ লাবণ্যময়। আর সে আয়নায় শাড়ী পড়তে পছন্দ করে। ওর শাড়ীতে তখন নানা রকম [illegible] থাকে। এবং এত ঢাকা যে ঢাকাই হবেনা সে শাড়ী পরে আছে। সে অবাক হাঁটুর ওপর হবার সময় [illegible] অথচ সালোয়ার শাড়ী পরতে পছন্দ করে। এবং কোনো অসুবিধা সেই [illegible] কলাসের সুন্দরতা তাকে ভীষণ পছন্দ করে সেজন্য। সালোয়ার তাকে ভীষণ প্রিয়। বিশেষ সে মাঝে মাঝে পাঞ্জাবি সালোয়ার একটা সালোয়ার বিলাতে দেয়। পাঞ্জাবি সালোয়ার। তার পাঞ্জাবি ভীষণ আকর্ষণ। পাঞ্জাবিতে যা ভাল পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবি পরীর এবং সুন্দরী। [illegible] এটা সৌন্দর্য সম্পর্কে [illegible] পাঞ্জাবির কী পাঞ্জাবি মুসলিম পাঞ্জাবি ঈদে [illegible] ছাড়া হয়। [illegible] পাঞ্জাবি ধরে একটা পাঞ্জাবি পরলে মনে হয়। মহিলারা পরলে পাঞ্জাবিকে পাঞ্জাবি পরলে ভীষণ [illegible]—এটা কল্যাণীর জানা। পাঞ্জাবি পরলে মনে হয়েছে। তখনও কখনও বাড়ীর সবাই অবাক। মকবুল দেখেছে গোপালকে নিয়ে হাজির মুসলমান। ভাল খাবার বা [illegible] মুখোমুখি বসে খেয়েছে. গীতাহাসি তখন কেবল গজগজ করছে অন্য ঘরে। গুপ্ত-নিবাসে এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপার যে কখন দেখেছে এমন বললে মকবুল বলতে পারি দেখেছি।—তুমি আবার কবে দেখলে—বাবে মনে নেই, সেই যে একবার একটা সোনার বেড়াল ছানা নিয়ে বাড়ীতে কি অশান্তি। আপনার কি অশান্তি!—আমার আবার অশান্তির কি আছে!—সেই যে গীতা মাসি মনে নেই করম সিং-এর ছেলে কালু না কি নাম ছিল, মনে নেই একটা লোঁড় কুকুরের বাচ্চা তুলে এনেছিল পাঁচিলের ওপাশ থেকে খুকুদিদিমণি তুলে আনতে বলেছিল বলেছে—আমার মনে আছে সব। গীতাহাসি ভীষণ চটে যেত। এবং যেহেতু থেকে থেকে চর্বি জমে যাচ্ছে. কারণ মকবুলের খুশীতে যদি একবার ঢের পেত। মকবুল মুখ সুস্বাদু খাবার গীতা হাসিকে আপনি যোগান দিয়ে খরচ [illegible] এই সূত্র ধরে মকবুলের কাছে খুব বড় একটা রোয়াব নিতে পারে না গীতা হাসি। বস্তু স্থান হয়ে যাচ্ছে শরীর তত গুপ্তসাহেবের নজর পড়ে আসছে। এবং আর কিছুদিন গেলে মকবুল স্থানে গীতা হাসি গুপ্তসাহেবের কাছে ভারী অকেজো হয়ে যাবে। এবং সে ভাবছিল সেদিনই এ-বাড়ি থেকে তার ছুটি। তার মন একটা প্রতিশোধের স্পৃহা জন্ম [illegible] হাঁটুর কাজ সুসময় আসান যাচ্ছেন। এবং এ-সময়টা বাড়িতে টু লক্ষ রাখা যাচ্ছে না। হঠাৎ তার সুসময় কি [illegible] মকবুল সাহেব আর না ঢোকার সময় সোফায় কি একটা রক্ত হলদের জন্য [illegible] অথবা মীনা যখনকার [illegible] নিয়ে আসছেন। সালোয়ার যার যা দরকার এবং পরনো

গণ্ডা যার যা কিছু লাগবে তিনি সাধারণত স্থির থাকেন। লম্বা খাতায় সাই পয়সা হিসেব। আর মুখে চোখে কষ্ট সং মানুষ এমন একটা ভাব মকবুলের বেলায় যত ছং হিসেবে গণ্ডগোল। এখন হবে না, পরে দেব যাবে— গীতা মাসি কিম্বা করুণ সিং অথবা ড্রাইভার নবীন ভট্টাচার্য তো রোয়াবের মাথায় এসে টাকা পয়সা নিয়ে যায়—সে কেন যে পরে না তোড়জোড় থাকে বলে একটু সে মনের সুখে কাওয়ালী গাইবে তাও পারে না। একবার চানের ঘরে যেমসাব সে জোরে কাওয়ালী গেয়েছিল। মেমসাব বের হয়ে বলেছিল, মকবুল আমি আর চানটান করব না। তোমাদের এত করে বলি তোমরা শুনতে পাও না। এই হতচ্ছাড়া মকবুলের, সে বাকে ওপর মহলায়—প্রায় মেমসাবের মহলার কাছাকাছি এবং যে যেহেতু করসী মানুষ তার প্রতি মেমসাবের ছোটো লাফ সহ্য নেই। যে পোশাকে এসে দাঁড়িয়েছিল মেমসাব, তাতে যতই ধার্মিক হোক চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। মাথা নিচু করে বলেছিল জি মেমসাব! সেই থেকে চানের ঘরে যাচ্ছে শুনলেই মকবুল বড় কম সময়ের কথাবার্তা বলে থাকে। বয় রঙের সাদা প্যান্ট জামা, মাথায় সাদা টুপি পরে তখন পা টিপে টিপে হাঁটে। হাতা গুটিয়ে যেন কোনো শব্দ না হয় এবং যতক্ষণ চানের ঘরে থাকবেন মেমসাব মকবুল একেবারে স্তব্ধ। ওর সাদা হাড়িতে তখন অল্প অল্প ঘাম দেখা দেয়। দু এক ফোঁটা পড়ে ফেলে কাজে ফোলে ভোবা ভেবা বলতে থাকে মনে মনে। এত করেও সে দাড়িতে ঘাম কমানোর কোনো দাওয়াই খুঁজে পায় নি। এবং এক-ঘরে হাত থেকে কাচের জার পরে ফেলে গেলে ওর জন্ম এসে পৌঁছিল। কারণ ভয় ছিল, বুঝি মেমসাব ছুটে আসছে। রাগ হলে মেমসাবের মাথা ঠিক থাকে না, হয়তো একেবারে নাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। গায়ে যে আবু নেই মনেই থাকবে না। তখন যে তার কি হবে এবং ভয় তার জন্য আসার মতো যখন অবস্থা তখন গীতা মাসি এসে বলেছিল, আবার ভাঙলে!— আমি কি করব বুবুন? হাত থেকে পড়ে গেলে আমি কি করব?—তুমি কি করবে দেখছি। বকমাসের মাইনে কাটি মকবুলের। সাহেব জানতে, চাকরি। এটা আমি প্রয়াগের মেলা থেকে এনেছিলাম। গুপ্তসাব বলে ছিলেন, কি সুন্দর মাথো গীতা। কুটি সেট করমাসীর মতো ছেলে ছেলেরে। বোধহয় সেদিন গীতা মাসি আকে খেয়েই ফেলত কিন্তু খড় দিবিধানি খুব ধীর-স্থির পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, কুটি ভেঙেছে? মকবুল বলেছিল, জি মেমসাব!—কেন ভেঙেছ? কাচের জিনিস ভাঙবে না তো সোনার জিনিস ভাঙবে। বলে, প্রায় ধীরে চলে যাচ্ছিল। তখন মকবুল উঠে পড়ে চানের ঘরে গেছে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে মেমসাব!—কিছু বলবে?—মেমসাব কিছু হয়ে না তো?—কী হবে?—গুপ্তসাব বলে.... সে আর শুনেনি। তখনও মকবুল হাত জোড়ে তাকিয়েছিল গীতা মাসির দিকে। তার আত্মা এমন ঘুরুসুরং মেয়েটিকে দোষা করুন, এমন যে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। ওই দিদিমণিকে কি যে ভাল লাগছে। প্রায় খাসমানের তারার মতো। হেঁটে চলে যাচ্ছে। লম্বা মতো পায়ের কাছাকাছি চুল ছেয়ার-ড করা পিঠ একেবারে প্রায় ঘাঁপ। এমন সব ছবি সে যখন জাহাজে চক-ড়ুকের কাজ করত বড় বড় বন্দরের সোকেসে দেখেছে। এখন এ বাড়ীতে। চোখ টানা টানা আর মুখে মিশকালো। জলের রং যেন ছুঁয়ে দিলেই সব ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। গীতা মাসি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। মুখে গোমড়া করে বেখেছিল অনেকক্ষণ—কিন্তু গীতা মাসির যা স্বভাব, ভাল খাবার এই সুস্বাদু কিছু হলে অপমানবোধ একেবারে থাকে না। খুব আপনজনের মতো বলেছিল। আমি তো বলি না মকবুল। যদি কোনদিন গুপ্তসাব জিজ্ঞেস করে, গীতা আমাদের সেই প্রিয় কাচের জারটা কোথায়? তখন কি কি হবে? মকবুল বলতে পারত, সাবের তো মেজাজের আর ঠিক নেই। কাচের জার বেশীদিন টেকে না গুপ্তসাব জানেন। এ নিয়ে তিনি কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ভাবতেই মকবুলের সামান্য হাসির উদ্রেক হল। মকবুল এতসব জানে বলে মেমসাবের চানের সময় কোনো গণ্ডগোল করে না। দু একটা শব্দ কেউ কোথাও জোরে করে ফেললে মকবুল সন্তর্পণে ছুটে যাবে—এই কে রে? কে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছিস। আস্তে বাপজান। মেমসাব চানের ঘরে। এবং গীতা মাসি ভেবে পায় না মেয়েটার এত সময় কেন দরকার চানের ঘরে। যেন মেয়েটা চানের ঘরে থাকলে বের হতে চায় না। ঘাঁড়তে সময় হয়ে যায়। ঘড়ির সামনে গীতা মাসি দাঁড়িয়ে থাকে—আর কেবল বুক টিপটপ করতে থাকে তখন। সময় মতো কলতে পৌঁছে দেওয়া গাড়ী-বারান্দায় সেই তখন থেকে গাড়ী লেগে থাকে—তবু মেয়ের চান শেষ হয়না। আপনে আপনে একেবারে বারোটা বেজে গেছে। কল্যাণীর কি যে সুন্দর লাগে চানের এই ধরণী। সতবার ঢুকে যায় তত এরে যেন মনোরম লাগে। চার পাশে পাতলা লেসের পর্দা ঝোলানো। সুন্দর কারুকার্য করা আয়নার মালার। এবং বাথটবে কাঁচের মতো জলের ভেতর সে-পাউডার মেশানো আশ্চর্য ফেনা। তার ভেতর কল্যাণী ডুবে থাকে। এবং হাতে গ্লাস অথবা জবার মুখোশে মনোরম সব বকম ডলের সয়েজ অথবা নীল কখনও ঠোরোসেন্ট মাছির মতো হাঁ-করা মুখ। আর সেই বাথটব পিঠের কর জবার। ঘোমের মতো মসৃণ এবং বুকে কি যে লাবণ্য। আয়নায় নিজের মুখ চোখ দেখে সে কখনও গুন-গুন করে গান গায় অথবা নিজের সৌন্দর্যে কেমন এক অভিমানী মুখ। তখন চোখ বুজে থাকে। গোপাল, গোপাল নামটা মনে হয় আশ্চর্য এক নাম অথবা যেকোনো দুঃখী বুবক পায়ের কাছে পড় আছে, অথবা ছেঁটে গেলে সে পাল থেকে তার শরীরে লেপ্টে থাকতে চায় এবং মনে হয় সেই জংধনে বুপালে সব আশা ইচ্ছেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে হাত দিয়ে দিয়ে কখনও দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়—এটা এক মনোরম জীবন। এখান থেকে চলে গেলেই তার সব কেমন সাদামাটা। বাড়ীতে সব মানুষের ভারী উৎপাত। ওর কোথাও কখনও পাকা থেকে চুল খসবার নিয়ম নেই। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারি নরম হাতে শরীরের সব জল ধীরে ধীরে মুছবার সময় স্তন উঁচু করে একটু তার বুঁকে দেখা—এ সবের ভেতর তার নিমগ্নতা এবং নিজের কাছে নিজেই বড় মহার্ঘ বস্তু। এ যেন হয়তো ঘরজায় দাঁড়িয়ে গীতা মাসির ভাঙ্গা গলা—কল্যাণী কলেজের সময় হয়ে গেছে। কল্যাণী পাতই দিতে চায় না। সে নিজেও একটা ঘড়ি সেলফে রেখে দেয়। কিম্বা ব্রাকে-হয়ে যেন বড় গোল টেবিল ঘড়ি সব সময় থাকার নিয়ম। ঘড়িটা দামী এবং বিদেশ থেকে আনা। কাঁচের বাতিদানের মতো মনে হয়। ভেতরে একটা পাখী ফুল ঠুকরে যাচ্ছে। সময় হলেই পাখীটা কাঁচের জারে ঘরে বেড়ায় এবং ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। তখন কল্যাণী বুঝতে পারে তার যথার্থ সময় হয়ে গেছে। সব ঘুমে-পাকলে ঘাড়ে এবং বগলে তারপর স্নোর নরম পাফ বুলিয়ে দিলেই কেমন এক স্নিগ্ধতা—সে তখন একেবারে পরিপাটি হয়ে বের হয়ে আসে। দেখতে পায় সাদা চাদরে সব বড় টেবিলটির শেষ, ফলিস পাউডারটি একটু, প্রীম পিঞ্জ, সামান্য স্যালাড় দু টুকরো মুরগীর ঠ্যাং অথবা রোস্ট করা কেক পারে। দুপুরে এই খেয়ে এক কাপ চা। আর কিছু নয়। শরীর সম্পর্কে বেশী চিন্তা কল্যাণীর সে বড় বড় যাচ্ছে, তত সে এভাবে, নিজেকে সুন্দর দেখতে ভালবাসছে। মকবুলের তখন আসার নিয়ম নেই এদিকে। কখন কি ফরমাস কাছে কোথাও থাকে। তখন কি ফরমাস তামিল করতে হবে। গীতামাসি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সে কারো দিকে তখন তাকায় না। ন্যাপকিনে মুখ মুছে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে তরতর করে সিঁড়ি নামতে থাকে। নীচের তলায় নেমে সে ড্রইংরুমের রমেনবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ ড্রিংরুমের পাশে তার ড্রাইভার নবীন বেল একেবারে ঠাঁই পরে যেমন মকবুল কথা, কোথাও এতটুকু অনিয়ম নেই—আর তখন কেন যে কল্যাণীর ভীষণ হাসি পায়— রমেনবাবুকে তো পৃথিবীতে যতবার দেখেছে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীতদাসের মতো ছেলে বড় সুখে আছে, এমন মুখ করে রেখেছে। বোধহয় ওর পায়ের শব্দে এ বাড়ীর টের পেয়ে যায়, মেমসাব নামছে। টের পেয়ে যায় আসছে—একেবারে মুখোমোখি সম্মান জানিয়ে, জোর করে একটু হাসা তখন। কল্যাণী সব বুঝতে পারে কাল সব সময় যেমন অহঙ্কারী মুখ। তবু বিনয় ছাড়েনমুখে

রাখার জন্য কথা বার্তা। ভীষণ মোলায়েম-সহবৎ বজায়ে যা কিছু সব যেন সে জেনে ফেলেছে। গীতামাসি তখন পেছনে পেছনে ওর যা যা দরকার কলেজের বই, খাতাপত্র সব, নোট নেবার ডায়েরী আরও কত কি, বগলদাবা করে নেমে সুজিতের কাছে দিলে—সুজিত বেল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে রেখে দেয়—এবং গাড়ীটা বের হয়ে গেলেই একেবারে সব আমলারা সহজেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন গোলমাল চেঁচামেচি, কারুর সাহ অফিসে, মেমসাব কলেজে, বাড়িটা একবার তখন স্বাভাবিক। রমেনবাবু তখন ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়তে পারেন। চোখ বুজে একটা সিগারেট খেতে খেতে বেশ আধঘন্টাক ঘুমিয়ে দু পয়সা করে নেওয়া যায় যা হোক টাকার গাছপাথর আছে গুপ্তসাহেবের। যে যার খুশিমতো, হুকুমের মতো খেয়ে নাও। গুপ্তসাহেবের কোনো হুকপাত নেই। মনুষ্যটার সব অসদাচরণ, চরিত্রহীনতা সহ্য করাতে কারও কোনো তখন কষ্ট হয় না। কল্যাণী কলেজে যাবার সময় দেখতে পায় ঝিন্নি গিন্নি করছে। ফাটাপাত। এত মানুষ আসে কোথা থেকে। সে মাঝে মাঝে বাইরে বড় শহরে গেছে, অথবা কখনও ভ্রমণে সে কোনো পাহাড়ী শহরে থেকে এসেছে—এই শহর যতই নোংরা অপরিচ্ছন্ন হোক কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে শহরটার জন্য। যদি এইসব মানুষেরা ভাল থাকত কেন এরা ভাল থাকতে পারে না, কিসের অভাব। এরা কেন বাবার মতো নয়, বাবা যেমন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ হলেই তো বড়লোক বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—এবং তখন কল্যাণীর মনে হয় গোপাল ভারী সৎ ছেলে। বিচক্ষণ নয় বলেই সে গোপালকে দিয়ে খুশীমতো সব করাতে পারে। এবং এটা একটা স্বভাব হয়তো কল্যাণীর—খুব বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোকদের তার পছন্দ নয়। সে যেতে যেতে গরীব দুঃখী লোকদের দেখলে ভীষণ কষ্ট পায়। ভিখিরি দেখলে সে ভাবে বড় হলে এদের জন্য একটা হোটেল করে রেখে। সেখানে এরা খাবে থাকবে, তাস খেলবে, দরকার হলে হাড়ডু। সে যেতে যেতে বলল, বকেলে সুজিত তোমার কি মনে হয়না এদের জন্য কিছু করা যায়। সুজিত না তাকিয়ে জবাব দেবে। তাকিয়ে জবাব দিলে তার অপমানের সঙ্গে সে বলবে মেমসাব কি করা যায়?—এই যে দেখো কেমন সব নোংরা ফাটাপাত মানুষজন এরা ছুট নেংরা থকলে আমরা সবাই নোংরা হয়ে যাব।—সে ঠিক মেমসাব।—গোপালকে কেমন লাগে।—খুব ভাল ছেলে মেমসাব—গোপাল তোমার খুব প্রশংসা করে। সুজিত নিজের প্রশংসা শুনে একটু নরম হয়ে গেল। বাবুদের বাড়ির মেয়ে। মর্জি ঠিক বোঝা যায় না। কি আবার তারপর তাকে বলবে, কোনো দরকার না পড়লে বড়লোকের মেয়েরা বড় প্রশংসা করে না। তাকে নিয়ে বড়লোকের কোন কাজ হাসিলের মতলবে বেরিয়েছে। সে বলল, গোপালবাবুকে আজ আবার লিফট দিতে হবে মেমসাব?—গোপালকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। তুমি নিয়ে যাবে।—জি মেমসাব। এবং এটুকু বলবে বলেই সুজিত বেশ চতুর মানুষ হয়ে যেতে পারে। অনেক সুযোগ-সুবিধা সে পাবে মেমসাবের কাছ থেকে। তার মনটা সহসা খুব খুশীতে ভরে গেল।

—কোথায় যাবেন?

—কলেজে যাব না ভাবছি। ওকে আমি তুলে নেব। বলে প্রায় সিটে এলিয়ে পড়ল।

বাতাসে আঁচল উড়ছে হাই উঠছিল যেন ঘুম পাচ্ছে। আসলে শরীরের ভেতর কি যে থাকে—এবং ভেতরে ভেতরে এক অভিনব জ্বালা অথবা দুঃখ। কোনো মানুষের শরীর তখন ভারী রোমাঞ্চকর। সে গোপালকে নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে কোন থিয়েটারে ঢুকে যাবে। তারপর হয়ে গোপাল সামান্য সময় একটু সুখ দেবে। সামান্য সুখের কাঙ্গাল-পনা চোখে-মুখে এখন জ্বলজ্বল করছে। এরা যখন থিয়েটার হল থেকে বের হয়ে এল তখন সন্ধ্যা নেমেছে জনসুলে রাস্তায় ভিখিরিরা সব হাত পেতে আছে। গোপাল ভীষণ ভীরু স্বভাবের—ওর হাত পেতে নেবারও সাহস নেই। গোপালকে জানি। নির্ভরশীল ভেবে সে যখন আমার রাস্তায় তাকে ছেড়ে দিয়েছিল—ঠিক একটা রাস্তার কুকুরের মতো এদিক-ওদিক ছোটে একসময় অসহায় হয়ে গেল গোপাল। গোপালের জন্য তার কেন জানি ভীষণ মায়া হচ্ছিল এবং যাতে কল্যাণী কিছু কলার ঘরে একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেল। শরৎকাল। নিশীথে ফুলেরা ফুটছে। শরীর তার আশ্চর্য সব অনুভূতিময়—সে নিজের শরীর নিয়ে এবারে নরম সাদা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘরটা হলঘরের মতো বড়—ফাঁকা। দেওয়ালে মাঝের বড় একটা অয়েল পেন্টিং পাশে সাদা দেওয়ালে চিত্রকরেরা নানাবর্ণের সব ছবি এঁকে রেখেছে। টি-পয়ে জল জল ফুল ফুটে আছে। তারপর নিজের ভেতরের জ্বালা অথবা কষ্ট ধরার অন্য বাসনা। বড় হতে হতে এসব যে কি হচ্ছে সব। অথবা অন্য কিছু মনে হচ্ছে তার ঠেকাতে পারে। এবং এক খেলা। মনোজ খেলার ছলে সারাক্ষণ সময় টুল করে নিজের ভেতর তাকে খেলা করাতো। হলঘর ঘরের অন্ধকার যেন মায়াজালে তাকে ঘিরে রেখেছে। তার বাবা-মা এবং গীতামাসি অথবা সারাটায় প্রাণীদের এভাবে কিছু থেকে থাকে পারে। গোপাল তাকে সামান্য ছুঁয়ে যেন সে সব দেখতে চাইছে না। আর এক বিকেলে গোপাল অদম্য ইচ্ছায় যখন আপন প্রবাহে লাফিয়ে পড়েছিল ঘাড়ে তখন মনে হয়েছিল ভারি অসহায় গোপাল। বন্ধুত। এবং ইতর। এটা একটা অসুখের মতো কিনা সে জানে না। গোপালের জন্য সে আর এসব সহ্য করতে পারেনি। ঠিক একটা কাপালের মতো গোপাল। এতটা যেন না কাবুতেও পারত। গোপালের জন্য আর তার মায়া ছিল না। বাস্তার কুকুরের মতো গোপাল। এবার তার সেব সংগ্রহ করার পালা শেষ হয়ে গেছে—এবং আবার নিশ্চিত নিরুদ্বেগ দুঃখী একজন মানুষ তার জন্য অপেক্ষা করবে।

ত্রিপত্র প্রকাশন

১৪৭, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া—১।

ফোন ফিলিপ্রিন্ট, ফোনের ঠিকানা

ছেওরাত মত শিল্পের সাহিত্য-সম্ভারের শোভন সম্ভেরণ

সানাই দাম ৫-০০ টাকা

সম্পাদক : শংকর মিত্র

অলংকরণ : রমেনারায়ণ মাসগুপ্ত

লেখা পাঠাও : ভারতের স্যাটেলাইট নিউ মার্কেটস রোড, কলকাতা

হাওড়া—১

পরিবেশনা : বুক মার্ক

(এ-১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

সদ্য প্রকাশিত হল।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করে পঞ্চাশোত্তরকাল লেখকের স্মৃতি চারণে—

শরৎ কথা ৬-০০

সম্পাদনা :—সুজিতকুমার নাগ

নতুন রহস্য উপন্যাস

নিশাচর

মিস্ট্রি মার্ডার ৭-০০

নাটক শেষ সংগ্রাম—তাপস সেন ৪-০০

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন,

CENTRAL LIBRARY

হেস্টিংস ও তাঁর প্রণয়িনী

১৭৬৯ সালে বাংলার শাসনকর্তারূপে ওয়ারেন হেস্টিংস আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এই আসার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত কারণই ছিল প্রধান। তিনি তাঁর পৈতৃক বাসভবন 'ডেলসফোর্ড'টি কিনতে চান, এবং তার জন্যে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাটির উপর হেস্টিংসের অত্যন্ত মমতা ছিল। তাঁর জন্মের পূর্বেই দেনার দায়ে বাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়; হেস্টিংসদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল। সে কারণ, এই বাড়িটির পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন হেস্টিংসকে সর্বক্ষণই পীড়া দিত। এবার ভারতবর্ষের উপার্জন থেকে যথেষ্ট অর্থসংস্থান তিনি ঐ বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করবেন স্থির করেছিলেন।

হেস্টিংস তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বহু আঘাত পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের মৃত্যুতে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে হেস্টিংসের জীবনে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বিখ্যাত সেনানায়ক রবার্ট ক্লাইভের ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তনের পর, হেস্টিংস তাঁর সহকর্মীদের অকর্মণ্যতা দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

দ্বিতীয়বার ভারতে আসার মুখে হেস্টিংস ভারতের শাসন ব্যাপারে বিশেষ কোন উন্নতির আশা দেখতে না পেলেও, একজন শাসনকর্তা হিসাবে তিনি এই সঙ্কল্প নিয়েই আসেন যে, ভারতে পৌঁছে কেন্দ্র করেই তিনি এবার অভিযোগকারীদের তিনি সায়েস্তা করবেন।

এই ভারত-যাত্রার কলকাতায় আসার পথে জাহাজের এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখে হেস্টিংসের কঠিন হৃদয়েও চাঞ্চল্য দেখা যায়। এই সুন্দরী মহিলাটির নাম মারিয়ান—তিনি তাঁর স্বামী কার্ল-এর সঙ্গিনী। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি হলেও, সুচতুর হেস্টিংসের বুঝতে দেরি হয়নি যে, এঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কেমন যেন একটু আলগা ধরনের এবং এ কথার সত্যতা আলাপের কয়েকদিনের মধ্যেই মারিয়ানের স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল হেস্টিংসের কাছে। তাছাড়া তিনি একথাও জানতে পেরেছিলেন যে, কার্ল তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্যের সুযোগ নিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবসা করেন।

মারিয়ানের জীবনের এই রহস্য হেস্টিংসকে যথেষ্ট কষ্ট দিলেও, তিনি মারিয়ানের উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করতে পারলেন না। ভালবাসার ধর্মই এই। এরপর

কিশু মুখোপাধ্যায়

মারিয়ান নিঃশব্দে একদিন হেস্টিংসের ঘরে প্রবেশ করল, কার্ল গোপনে তা লক্ষ্য করে হেস্টিংসের উপর দোষারোপ করেন যে, হেস্টিংস তাঁর স্ত্রীকে গোপনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মারিয়ান আন্তরিকতার সঙ্গে এই অভিযোগের প্রতিবাদ করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হলেন না। এ ব্যাপারে হেস্টিংসও কার্লকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, এমন কোন কথাই তিনি ক্ষমা করতে রাজী নন যাতে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এই সময় জাহাজে কয়েক দিনের জন্য হেস্টিংস হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মারিয়ান কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আন্তরিক সেবা-যত্নে হেস্টিংসকে সুস্থ করে তোলেন। নারী হৃদয়ের এই অবহেলা শক্তি হেস্টিংসএর হৃদয়কেও অভিভূত করে ফেলে। এই ঘটনার পর মারিয়ানের উপর হেস্টিংসের অগাধ বিশ্বাস ফিরে আসে এবং উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হেস্টিংস মনে মনে মারিয়ানকে জীবনএর শাশ্বত সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন—কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

যে জাহাজে হেস্টিংসের জীবনের এই অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ সঞ্চারিত হয়েছিল সে জাহাজখানি মাদ্রাজ বন্দরে না দাঁড়িয়ে, সরাসরি বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

শান্ত সমুদ্র, বিস্তৃত জলরাশির উপর প্রখর সূর্যের দীপ্তিমান প্রভাব। গ্রীষ্মের খর-উষ্ণ আবহাওয়ায় তাঁরা প্রবেশ করছেন; জলের দিকে তাকানো যায় না—চোখ যেন ঝলসে যায়।

হুগলী নদীতে প্রবেশ করে, পলাশীর দুধারের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। চতুর্দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ এগিয়ে চলেছে। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ডান কূড়েঘর পরিবেষ্টিত ফলতার জনশূন্য দ্বীপ। হেস্টিংসের মনে পড়ে গেল এই সে-দিনের কথা—তাঁকে একদিন ঐ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল সিরাজের গুপ্তচরের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।

হেস্টিংস ও মারিয়ান পাশাপাশি বসে-ছেন বলে গল্প হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। হেস্টিংস মারিয়ানকে বীভৎস অন্ধকূপ হত্যার গল্প বললেন,—কিভাবে তিনি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন সে-কথাও জানালেন। ব্যক্তিগত জীবনের বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল হেস্টিংসের মানসপটে।

মারিয়ান হেস্টিংসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও যুদ্ধ করেছিলেন?' হেস্টিংস মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। তিনি আরও বললেন, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকেই সেদিন সঙ্গীন ঘাড়ে করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। সংখ্যায় আমরা শত্রুদের তুলনায় কম ছিলুম, তাছাড়া জঙ্গলে যুদ্ধ করা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়—তবুও আমরা জয়ী হয়েছিলুম!'

কলকাতা এক বৃহৎ চিত্তাকর্ষক শহর—কুইভের নতুন কেল্লা ছিল শহরের প্রধান আকর্ষণ। জলপথে তাঁরা বিস্তৃত নদীর বিপুল জলরাশির উপর দিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। বিস্তীর্ণ পথগুলি গাড়ি ঘোড়ায় পূর্ণ। গাড়ির টং-টং শব্দ, চালক-দের চীৎকার, পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ আর ভিক্ষুকদের কাতর ক্রন্দন—এই সব মিলে-মিশে এক অপূর্ব 'সিমফনির' সৃষ্টি হয়েছে। শহরের মধ্যবিন্দুতে লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত একটি মনোরম পার্ক। তারই সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। আর সেই জলাশয়ের চারপাশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেকগুলি অফিস-কাছারী। পুরোতন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ তখনও নবাগত পথিক-দের কলকাতার যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কলে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক-জন ইংরেজ কর্মচারী হেস্টিংসকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এই কর্মচারীদের নায়ক রিচার্ড বারওয়েল। তিনি অন্তরঙ্গ-ভাবে প্রথমেই এগিয়ে এসে হেস্টিংসের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বারওয়েলের কথা-বার্তার মধ্যে স্কট টান।

হেস্টিংস মারিয়ান ও কার্ল-এর সঙ্গে বারওয়েলের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁর সেক্রেটারী যুবক ইলিয়টকে নির্দেশ দিলেন যে, উপস্থিত কার্ল এবং মারিয়ান অতিথি হিসাবে তাঁর গৃহেই বাস করবেন। এই নির্দেশ দিয়েই হেস্টিংস বারওয়েলের সঙ্গে লাট-প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। চলতে চলতে হেস্টিংস বারওয়েলকে প্রশ্ন করলেন, 'এখন এখানকার খবর কি?' উত্তরে বারওয়েল বললেন, 'আপনি যখন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার চেয়েও বর্তমান অবস্থা অনেক ভাল; তবে এখনও এমন অনেক বাজে দুষ্টু লোক আছে, যারা ভারতীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। হেস্টিংস বললেন, 'ভারতীয়রা শিশুর মত সরল, তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া অত্যন্ত অন্যায়।'

বারওয়েল হেস্টিংসের এই উক্তিতে চিন্তিত হলেন। তিনি অপলক দৃষ্টিতে হেস্টিংসের দিকে চেয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, 'ভারতের শাসন ব্যাপারে আপনি কি কোন মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবছেন?—ডাইভের কথা সম্ভবতঃ আপনার স্মরণ আছে, তিনি লোভী বণিক-সম্প্রদায়কে দাঁড়িয়েছিলেন, ফলে দেশে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ও দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল। আমি আশা করি সে ভুল আর আপনি করবেন না?'

'না।' হেস্টিংস দৃঢ়ভাবে বললেন, 'কেউই ভুল করতে চায় না।'

বারওয়েল আবার বললেন সেখানে আমরা সবাই এদেশে এসেছি লাভের জন্যে, কে কি পেল-না-পেল সেদিকে আমাদের নজর না রাখাই ভাল।'

'আমিও তো তাই বলছি, কিন্তু ডিক (বারওয়েলের ডাকনাম), ভুলে যেও না, ব্যবসায় ন্যায্য মুনাফা এক বস্তু আর লুটে অন্য বস্তু।' উত্তর দিলেন হেস্টিংস।

বারওয়েল বললেন, 'আমরা যদি লুটে-তরাজের সুযোগ না নিই, তবে অপরে সে সুযোগ অবশ্যই নেবে।'

'অপরে অন্যায় করবে বলে আমরাও অন্যায় করব, এটা কোন যুক্তিই নয়। ধর এই নিরীহ জাতগুলি (ভারতবাসী) সহস্র বৎসর ধরে পরের দাসত্ব করে আসছে, আমরা তা জানি, কিন্তু তাই বলে দাসত্ব ভারতীয়-দের জন্মগত অধিকার একথা বলা যুক্তি-সঙ্গত নয়। এদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে।'

সদর রাস্তা ধরে ঘণ্টাখানি সোজা গবর্নমেণ্ট হাউসে গিয়ে প্রবেশ করল। হেস্টিংস বললেন, 'ইংলণ্ডে থাকাকালীন আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট ভেবেছি। আমার বিশ্বাস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি ভারতীয়দের কোন উন্নতিসাধন না করে, তাহলে আমাদের সরকারের এ বিষয়ে হস্ত-ক্ষেপ করা উচিত। আমি পার্লামেণ্টারী কমিশন-এ সাক্ষী দেওয়ার সময় একথা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছি।' আলাপ করতে করতে দুজনেই তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে বাইরে এলেন, তারপর বড় বড় সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। দুধারের ভারতীয় নফররা মাথা নীচু করে তাঁদের সেলাম করে যেতে লাগল।

এই সময় বারওয়েল হঠাৎ বললেন, দেখুন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি,—আপনাদের জাহাজ ভেড়ার পরই আর এক-খানা জাহাজ লণ্ডন থেকে এখানে রওনা হয়ে আপনাদের জাহাজখানিকে পেছনে ফেলে সেই জাহাজখানি এগিয়ে এসেছে। তাতে কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্তর এসেছে। আমি সেগুলি আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি।'

হেস্টিংস কালবিলম্ব না করে চিঠিগুলি দেখবার জন্য সোজাসুজি অফিসঘরে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর চিঠি-গুলি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ একখানি চিঠি পড়তে গিয়ে তাঁর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল, রক্তের লালের ছাপ ঝলমল করে ফুটে উঠল চোখেমুখে। হাঁ, তাঁর স্বপ্ন এবার সত্যিই সফল হতে চলেছে। চিঠিটি আর কিছুই নয়, একটি জরুরী ঘোষণা। ঘোষণাটি হচ্ছে : বাংলার গভর্নরের পদ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান আইনসভা স্বয়ং ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেছেন। এই শাসন পরিচালনার জন্য একটি সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং সেই পরিষদ হেস্টিংসকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন।' কিন্তু তখন কি কেউ জানত যে এই আপাতঃদৃষ্টির মধ্যেই হেস্টিংসের জীবন-এর মর্মন্তুদ ইতিহাস লুকিয়ে আছে?

বারওয়েলের দিকে তাকিয়ে হেস্টিংস এই ঘোষণার কথা বললেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানালেন যে, 'এই ঘোষণার অর্থ হচ্ছে : এতদিন যা ছিল আমার জীবনের স্বপ্ন তা আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে বসেছে। গভর্নর জেনারেলকে নিয়ে এই উচ্চ পরিষদ পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। আমরা দুজন (বারওয়েল ও হেস্টিংস) আর তিনজন আইনসভা কর্তৃক নির্বা-চিত হয়ে প্রেরিত হবে।

এই তিনজনের মধ্যে ইতিপূর্বেই দুজন যে জাহাজে এই ঘোষণাপত্র এসেছে, সেই জাহাজেই এসে পৌঁছেছেন।

সেদিন বৈকালে নবনিযুক্ত দুজন সদস্যকে ডাকলেন গভর্নর জেনারেল। এই দুজনের মধ্যে একজন হলেন জেনারেল ক্লেভারিং, পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বদমেজাজী জেনারেল। তিনি ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও আসেননি এবং ভারতের সব কিছুকেই ঘৃণা করেন। দ্বিতীয় জন হলেন কর্নেল মনসন। ইনি লর্ড মনসনের পুত্র, দুর্বল প্রকৃতির লোক, ভারতের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পূর্ব থেকেই তিনি জেনারেলের প্রভাবে প্রভাবিত।

প্রথম দর্শনেই পরস্পর পরস্পরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গতানুগতিক আলাপ-আলোচনা হল। এরপর হেস্টিংস যখন জানতে পারলেন যে, তাঁরা সবাই তাঁদের স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, তখন পরের দিনই তিনি তাঁদের সকলকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বারওয়েলকে বললেন, 'আমি অনেক দিন মেরিকে দেখিনি, তাকে দেখবার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।'

পরের দিন সন্ধ্যায় সকলেই একত্রে ভোজসভায় মিলিত হলেন। মিসেস বার-ওয়েল সুরুচি সম্পন্না স্ত্রীলোক। তিনি এই আসরে কৃত্রিম তর্জনা করে হেস্টিংসকে বললেন, 'ডিক এখন আমি বাইরে যাচ্ছি

পারবে না—এই বয়সে শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা স্কটল্যান্ড ফিরে যাব আশা করছি। এই ভোজসভায় মারিয়ান এবং কার্লও উপস্থিত ছিলেন গভর্নর জেনারেলের অতিথি হিসাবে।

জেনারেল ক্লেভারিং-এর স্ত্রীর মুখশ্রী অত্যন্ত সংবেদ ও গুরুগম্ভীর। কিন্তু তাঁর অন্তর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ থেকে মনে হয় বদমেজাজী স্বামীকে সব সময় শান্ত রাখার জন্য তিনি মনের দিক দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কর্নেল মনসন-এর স্ত্রী অ্যানে মনসন স্থূলকায়া মহিলা—শিকার সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল অত্যধিক। এই ভোজসভার মেয়েদের মধ্যে সকলেই মারিয়ানকে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। কার্ল একজন সামরিক পদস্থ কর্মচারী, এই সংবাদ জানার পর যাওয়েল কলিন্স প্রশ্ন করলেন, তিনি সেনানিবাসে বাস করেন না কেন?'

'আমার স্ত্রী ও সন্তান একত্রে ঘরের জন্য-মতি কি আমি পেতে পারি না?' কার্ল জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্লেভারিং উত্তরে বলে বসলেন, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে; সব কিছুই এখন বড় টলোমলো হয়ে গেছে দেখছি।'

এইসব কথাবার্তার মধ্যে মারিয়ান লক্ষ্য করলেন, জেনারেলের মুখে কোন বিরক্তির ভাব নেই।

লাট-ভবনের সন্নিকটে একশ গজ দূরে মারিয়ান ও কার্লের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। লাল রঙের বাড়ি, বড় বড় ঘর আর সেই ঘরে অনেকগুলি করে জানালা। বেশ জোলো-জোলাই বলা যায় বাড়িটিকে। আহারে এক সঙ্গে আসবার সময় হেস্টিংস মারিয়ানকে বলেছিলেন যে, তিনি ব্যারোনেস হলেও ভারতবর্ষে তাঁকে মন্ত্রীর মত থাকতে হবে। কিন্তু এখন হেস্টিংস তাঁকে স্পষ্টই বললেন যে, তাঁর আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে, অর্থাৎ এখন থেকে তিনি গভর্নর জেনারেল হিসাবে বছরে পঁচিশ হাজার পাউন্ড করে পাবেন।

এই কথা শোনার পর মারিয়ান হেসে বললেন, 'হেস্টিংসের ডেলসফোর্ডের স্বপ্ন তাহলে সফল হতে চলেছে বলুন? হেস্টিংসের এই বিরাট পরিবর্তনের জন্য তিনি নিজেই নিজের পথ পরিষ্কার করে এসেছিলেন। পার্লামেন্ট কমিশনে সাক্ষী দেবার সময় তিনি জানিয়েছিলেন যে, সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা যদি স্বল্প বেতন পায়, তাহলে অবশ্যই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কারণ, তারা সকল সময়েই সচেষ্ট থাকবে নিজেদের আয় বাড়াবার জন্যে।

কলকাতা মারিয়ানকে মুগ্ধ করল। বিরাট নগর বহু মাইল বিস্তৃত; বিচিত্র আয়োজন আর প্রাসাদতুল্য সব বাড়ি। কোন কোন বাড়ির বয়স একশ বৎসরেরও অধিক। ইংলণ্ডে এত বড় জমকালো বাড়ি সাধারণত দেখা যায় না। প্রত্যহ খুব ভোরের দিকেই মারিয়ান হেস্টিংস ও কার্ল একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুতেন। গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপে মারিয়ানের মুখ তামাটে হয়ে যেত; আবার শীতের কিরকিরে হিমশীতল বাতাস মারিয়ানের কাছে খুবই মনোরম মনে হত—তার মন ডুব দিত ইংলণ্ডের বসন্ত-কালীন আরামদায়ক স্মৃতির মধ্যে।

কার্ল ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ অভিযানেচ্ছু ঘোড়সওয়ার। তিনি নির্বিচারে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যেতেন। বড় বড় খর্ত ও বিপজ্জনক সড়ঙ্গ পার হয়ে যেতেন এক লাফে। কখনও কখনও নীচু গাছের নীচে এসে, ঘোড়া সমেত লাফিয়ে উঠে গাছের ডালপালা ভেঙে ফেলতেন। অপর দিকে মারিয়ান ও হেস্টিংস ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলতেন পাশাপাশি একসঙ্গে। সর্বদাই তাঁদের এই একসঙ্গে থাকাটা সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই দৃশ্য দেখে দুষ্টু লোকেরা নানা রকম গল্প করত, একটু-আধটু অশ্লীল কানাঘুষাও যে না হত তা নয়। ক্রমশ কালের মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। তিনি শহরের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন। কখনও তিনি শহরের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে নাচগান হইহুল্লোড় করতেন, আবার কখনও বা ঘরে বেড়ালের নিঃসঙ্গ একাকী।

সকালের দিকে হেস্টিংস ও মারিয়ানের ঘোড়ায় চড়া ছিল যেন প্রাত্যহিক নিয়মের মত, তেমনি সন্ধ্যার দিকে প্রত্যহ তাঁরা গাড়িতে করে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন। নানা বিচিত্র দৃশ্য তাঁদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলত। বহু দেবদেবীর মন্দির, পীঠস্থান ও যেখানে হিন্দুরা মৃত আত্মীয়দের দাহ করার জন্য নিয়ে আসত—এমনি সব শ্মশানঘাটের সিঁড়ি ও স্থানগুলি তাঁরা অবাক হয়ে দেখতেন। শ্মশানভূমির নীলাভ ধূসর রঙের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে যেত আর মেয়েরা তাদের প্রিয় জনের বিয়োগ-ব্যথায় বুক চাপড়ে কাঁদত—এই করুণ দৃশ্য তাঁদের মনকে পীড়া দিত। কখনও তাঁরা চলে যেতেন সেই সুদূর প্রান্তরে, যেখানে ঊর্ধ্বাকাশে তারকারাজি টিপটিপ করে জ্বলত, আর নীচে জোনাকী-গুলি তাদের অকিঞ্চিৎকর নীলাভ স্বপ্ন-আলো নিয়ে মেতে বেড়াত। সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য-ঘেরা পরিবেশের মধ্যে মারিয়ান হেস্টিংসের কাছে ঘেঁষে বসতেন; তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলতেন, 'এ জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে—' প্রেমের যে একটা রহস্য আছে, সে রহস্যের আর যেন এখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

হেস্টিংস উত্তরে বলতেন, 'মানুষ যখন অন্তরে সুখ অনুভব করে তখন বাস্তব থেকে সবই ভিন্ন মনে হয়।' মুহূর্তের জন্য তাঁর মন মারিয়ানের দিকে ছুটে যেত, ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংস কেমন যেন হয়ে যেতেন, একটা করুণ বিষাদের সুর ধ্বনিত হত তাঁর কানে—নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিতেন তিনি।

সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদের প্রথম সভায় পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চারজন উপস্থিত ছিলেন, কারণ পঞ্চম ব্যক্তি তখনও এসে পৌঁছননি। হেস্টিংস সেই সভায় প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা প্রথমে সারা ভারতবর্ষের একটা পূর্ণাঙ্গ জরিপ করবেন। সম্পূর্ণ ফরাসী ভূখণ্ডের ন্যায় একটা বৃহৎ ভূখণ্ড আমাদের অধিকারে এসেছে, কাজেই সর্বাগ্রে তার পরিমাপ করা বিশেষ প্রয়োজন। আর এই জরিপকার্য যখন সম্পূর্ণ হবে তখন যোগ্য ভারতবাসীর উপর প্রতি জেলার শাসন ভার অর্পণ করা হবে।

হেস্টিংসের এই প্রস্তাবে ক্লেভারিং বাধা দিয়ে বললেন, 'এ ভাবে কাজ করলে আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাব। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এছাড়াও আমার আরও একটা আপত্তি আছে,—আপনি ভারতীয়দের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করার কথা বলছেন; সেটা কিরূপে?'

'ভারতীয়রা যদি যোগ্য হয় তবে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করবার পক্ষে আপত্তি কি?' হেস্টিংস প্রশ্ন করলেন।

'আপত্তি হচ্ছে এই যে, আমরা এদেশ জয় করেছি আমরা এদেশের রাজা; সুতরাং সমস্ত বড় চাকরী আমরা আমাদের হাতে রাখব।' উত্তরে ক্লেভারিং বললেন।

'এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের কাজে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এই বিশাল দেশের উপর এভাবে প্রভুত্ব করতে সক্ষম হবে কী?' হেস্টিংস বললেন।

'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।' জেনারেল জবাব দিলেন। এ ছাড়া তিনি আরও বললেন যে, 'ভারতবাসীরা শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তারা মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারক। আপনি তাদের এক বিন্দুও বিশ্বাস করতে পারেন না। আমি সর্ব ক্ষেত্রেই ইংরেজ নিয়োগের পক্ষপাতী।'

হেস্টিংস বাধা দিয়ে বললেন ইংরেজরাও নানাবিধ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে ও প্রতারণা করছে, জেনারেল! অবশ্য তাদের মাথায় সাদা পাগড়ী নেই আর তাদের মুখ কালো নয়।'

'একি মারাত্মক কথা আপনি বলছেন?' জেনারেল জোরের সঙ্গে বলে ইলিয়টের দিকে তাকালেন। ইলিয়ট হেস্টিংসের পেছনে বসে সমস্ত আলাপ-আলোচনা নোট করছিলেন। জেনারেলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল, যেসব নিরপরাধ ব্যক্তি টানা-পাখা টানছিল তাদের উপর। তিনি অহেতুক তাদের এক ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিজের পৌরুষ বজায় রাখলেন।

হেস্টিংস বললেন, 'যে যাই হোক, আমি প্রস্তাব করি আমরা শিগগিরই ভারতব্যাপী জরিপের কাজ আরম্ভ করব, সময়সাপেক্ষ হলেও, যতটা পূর্ণাঙ্গ হয় সেদিকে আমরা নজর রাখব।'

জেনারেল বললেন, জরিপের কাজ আপনি আরম্ভ করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই, কিন্তু অপদার্থ

অন্যান্য প্রস্তাব আমি সমর্থন করি না। তারপর মনসন-এর দিকে চেয়ে বললেন, 'মনসন, তুমি আমার সঙ্গে একমত?'

মনসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বারওয়েল এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'আমি গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।'

ক্লেভারিং চীৎকার করে উঠে বললেন, 'তাহলে দেখছি ভোট দুই-দুই সমান হয়ে গেল,—এ তো এক অচল অবস্থা!'

'ভুলে যাবেন না, আমার একটা কাস্টিং ভোট আছে।' হেস্টিংস জোর দিয়েই বললেন কথাগুলি।

'কোম্পানীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়াটা খুব বড় বাহাদুরী নয় হেস্টিংস —আমি কোম্পানীর পরিচালকদের নিকট এর প্রতিবাদ জানাব।' এই বলে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ক্লেভারিং সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাড়ীতে জেনারেল ক্লেভারিং আবার সেই কথা তুলে চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না—যেমন করেই হোক হেস্টিংসকে আমাদের নিরস্ত করতেই হবে। কিন্তু কি করে যে তা করা সম্ভব তা আমরা জানি না। তবে যে নতুন লোকটিকে আইন-পরিষদ শাসন-পরিষদে পাঠাচ্ছে তার যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চিত আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন।'

মনসন সম্মতি জানাল।

নানা ধরনের কথার পরে এই সময় লেডী আমেলিয়া বলে বসলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের গভর্নর জেনারেল কতটা সুন্দরী যুবতী মারিয়ানের সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ?—তাঁরা একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে প্রতিদিনই সকালে বেড়াতে যান এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকেন না।'

এই কথা শোনা মাত্রই ক্লেভারিং খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ব্যারোনেসের সঙ্গে আরও খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হোক না।'

লেডী আমেলিয়া বললেন, 'আমার কথা হচ্ছে গভর্নর জেনারেলের মত পদস্থ ব্যক্তির এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত অশোভন। কারণ এখানে আমরা সামান্য মুষ্টিমেয় ইংরেজ সহস্র সহস্র মাইল দূরে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করছি।'

তাঁর কথা শেষ হবার পূর্বেই উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠলেন জেনারেল, 'এ ভয়ঙ্কর ভীষণ অন্যায়।'

এদিকে হেস্টিংস ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন, আর অপর দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় হেস্টিংসের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। হেস্টিংসের শাসন-সংস্কার বণিক সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা অনেকখানি সীমাবদ্ধ করল এবং ব্যবসায় তাদের লাভের অঙ্ক অনেকখানি হ্রাস পেল।

বণিক সম্প্রদায় যখন হেস্টিংসের শাসন ক্ষমতা কোন প্রকারে খর্ব করতে সক্ষম হল না, তখন তারা গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করতে লাগল। মারিয়ানের সঙ্গে হেস্টিংসের অন্তরঙ্গ ভাব দেখেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল এবং হেস্টিংসের নৈতিক জীবন কলঙ্কিত করার জন্য তারা সচেষ্ট হতে লাগল। এমন কি, গভর্নর জেনারেলের অপসারণের জন্য বিলেতে পরিচালকবৃন্দের নিকট দরখাস্ত করতেই উদ্যত হয়ে সাহস করল।

বারওয়েল এই ঘটনায় বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি একদিন দ্রুত দাতব্যে উপস্থিত হয়ে হেস্টিংসকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ওয়ারেন, একটা একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেবেন? ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অবশ্য উচিত নয়, তবে বহুদিন আপনার সঙ্গে একসঙ্গে আছি, সেই কারণে একমাত্র দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসাবেই এ প্রশ্ন করা যায়,—তা না হলে এ প্রশ্ন আপনাকে করতে আমি আদৌই সাহস করতাম না।'

'কি এমন কথা ডিক?' হেস্টিংস ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করলেন।

'প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক দেওয়া না-দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।' বারওয়েল হেস্টিংসের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যারোনেসের প্রসঙ্গ নিয়ে লোকে আপনার সম্পর্কে যে কথা বলে তা কি সত্য?'

হেস্টিংস হঠাৎ যেন কেটে পড়লেন। সামনের টেবিলের উপর হাত চাপড়ে বললেন, 'না, একদম না; তারা মিথ্যা কথা বলে।'

বারওয়েল হেস্টিংসের এই উত্তরে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এ আমি জানি ওয়ারেন তারা এখন সত্য-মিথ্যা বিচার করে না—তবে তাদের এই রকম বিশ্বাস।'

এই কথায় হেস্টিংস উষ্মা প্রকাশ করে বললেন তোদের নিন্দুকদের এবং নিন্দের সামলাক।

বারওয়েল তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত ভ্রূ-যুগল সংযত করে বললেন 'আমি বুঝিয়ে ওয়ারেন, তবে তারা যেসব মেমসাহেবদের রেখে তারা সবই দেশী এবং অধিকাংশেরই জাতের ঠিক নেই উপরন্তু তারা বাজারের বাইরে থাকে, শহরে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ মেলে না, আর আমাদের জাতের মেয়েদের কাছ থেকে তাদের সব সময় আলাদা করে রাখা হয়।'

হেস্টিংস শুনে বললেন, 'আমি স্পষ্টই বলছি বারওয়েল, তারা যা বলছে সবই মিথ্যা।'...

বারওয়েল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন 'মিথ্যা হোক, কিন্তু আপনি যা মনস্থ করেছেন—জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জাতের মঙ্গল, আপনার নিজের ঐকান্তিক মানসিকতার পুনরুদ্ধার—এসবই কি ঐ মেয়েটার জন্যে আপনি নষ্ট করতে চান?'

হেস্টিংস বিরক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালেন বারওয়েলের দিকে। বারওয়েল বললেন, 'হেস্টিংস, আমি আপনাকে অনু-

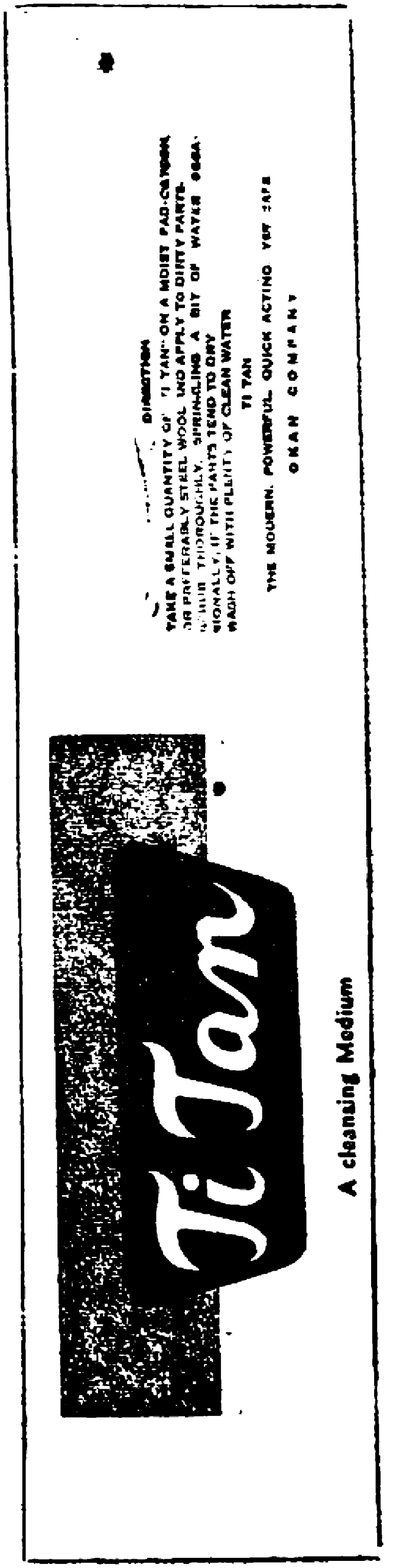

বোধ করছি, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য আপনি মারিয়ানকে সরিয়ে দিন।'

'মারিয়ানকে সরিয়ে দেব!' হেস্টিংস কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'হাঁ, তাঁকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিন।' বারওয়েল উত্তর দিলেন।

মাদ্রাজ যেতে এক মাস সময় লাগে, ছ-মাস লাগবে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে, যদি অবশ্য জাহাজ থাকে, না ডিক, আমি এ চিন্তা করতেও পারি না।' ধরা ভাঙা গলায় বললেন হেস্টিংস।

'তাঁকে সরিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।' বারওয়েল আবার বললেন।

'না তা কখনই সম্ভব নয়।' হেস্টিংস-এর গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

বারওয়েল আর কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। তিনি শুধু মনে মনে একবার ভাবলেন যে হেস্টিংসের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও গভীর ভালবাসার ক্ষেত্রে কিভাবে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। প্রেম অন্ধ।

এক মাস পরে শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে ফ্রান্সিস ফিলিপ কলকাতায় পদার্পণ করলেন। অল্পবয়স্ক যুবক, সুশ্রী, সুসজ্জিত, বলিষ্ঠ চেহারা। তিনি জাহাজ থেকে অবতরণ করেই চতুর্দিকে তাকালেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই আসেননি। তার কারণ কোন্ জাহাজে তিনি আসবেন এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সংবাদ কারু জানা ছিল না।

মাটিতে নেমেই একটি লোককে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গভর্নর জেনারেল এখানে আসেন নি?' লোকটি তাড়াতাড়ি চতুর্দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, কই গভর্নর জেনারেলকে তো এখানে দেখছি না।'

'সমস্তের মধ্যেও তো কলুকে দেখছি না—কি সুন্দর ব্যবস্থা!' ফ্রান্সিস বিরক্ত হয়ে বললেন।

একটি অল্পবয়স্ক যুবক এগিয়ে এল তাঁর কাছে, এসে বলল, 'আমি কি আপনার জন্যে একটা কিরন গাড়ি নিয়ে আসব—আপনি কি গভর্নর জেনারেলের কুঠিতে যাবেন?'

'না। তবে ফ্রান্সিস ফিলিপের থাকার জন্যে কোন বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, দয়া করে খবর নেই খবরটা এক্ষুনি নেবার চেষ্টা করো।'

'এক্ষুনি খবর নিচ্ছি।' লোকটি বললে।

—আর হেস্টিংসকে এ খবরও দিয়ো যে, ফ্রান্সিস ফিলিপস এসে পৌঁচেছেন, কিন্তু তাঁর অভ্যর্থনার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি—এটা ভদ্রতা নয়।'

ফ্রান্সিসের আগমন-বার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হেস্টিংস ফ্রান্সিসের বাড়িতে গেলেন। তিনি দেখলেন, ফ্রান্সিস পেছনে হাত দিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বিরক্তিতে ভরা সেই মুখের কাছে এগিয়ে হেস্টিংস করমর্দনের জন্য হস্ত প্রসারিত করলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

ফ্রান্সিসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হেস্টিংস বললেন, 'আপনার আগমনের সংবাদ যদি আমরা পূর্বে জানতাম তাহলে আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অবশ্যই আমরা জাহাজ-ঘাটায় যেতাম। অন্যান্য সদস্যরাও আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারলে খুশিই হতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন সংবাদই আমরা পূর্বে পাইনি।'

কিন্তু ফ্রান্সিসের রাগ তাতে কমল না' তিনি বললেন, 'হেস্টিংস দয়া করে আপনি এখানে না এসে যদি জাহাজঘাটে যেতেন, তাহলে আমাকে এখানে এতটা কষ্ট করে আসতে হত না।' এবং এই কথা বলেই তিনি পেছন ফিরে দেখলেন, তাঁর দরজার সামনে জেনারেল ক্লেভারিং ও মনসন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ফ্রান্সিস তাঁদের দিকে এক-পা এগিয়ে গেলেন এবং হাসামুখে বললেন 'আরে...কর্নেল না জেনারেল ক্লেভারিং?' বলেই তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁদের দিকে।

'আমি জেনারেল ক্লেভারিং, আর ইনিই আমার সঙ্গে কর্নেল মনসন।' বলে তাঁরা পরস্পরের করমর্দন করলেন।

হেস্টিংসের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বললেন, 'আপনি আমার জন্যে যে বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন তা আমি মোটেই পছন্দ করি না—স্থানীয় দৃশ্যটা মোটেই মনোরম নয়। আসবার সময় রাস্তায় আমি অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখেছি।'

'আপনার নিজের পছন্দমত বাড়ি পরিবর্তনের স্বাধীনতা আপনার আছে।' হেস্টিংস বললেন।

'বাড়ি পরিবর্তনের অধিকারকে স্বাধীনতা বলা যায় না।' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। গভর্নর জেনারেল ও অন্যান্য সদস্যরা পুরোতন কেল্লার একটি বৃহৎ ঘরে উপাসনার জন্য জমায়েত হলেন। সেন্ট অ্যানের গির্জাটি ধ্বসে হওয়ার পর থেকেই এই ঘরটি রবিবারের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হত। ফ্রান্সিস নিজের আসন থেকে গভর্নর জেনারেল ও অন্যান্য সদস্যদের আশেপাশে সুন্দরী, সুসজ্জিতা মহিলা ও তাঁদের বন্ধুদের হাবভাব দেখতে লাগলেন। ঠিক তাঁর পেছনেই একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা বসে ছিলেন। ফ্রান্সিস বার বার মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছিলেন। মহিলাটি আর কেউ নয়, সেই রূপসী, লীলাময়ী, চটুল-চপল মারিয়ান।

গির্জার কাজ শেষ হওয়ার পর, ফ্রান্সিস বাইরে যাবার সময় দরজার পাশে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর মারিয়ানকে লক্ষ্য করে যেন নিজের মনেই বললেন, 'এই গির্জার আমার কোন আকর্ষণ নেই—তার চেয়ে আমার মনে হয়, শহরের অন্যান্য আকর্ষণ অধিকতর মনোরম।'

থাকতে না পেরে, পাশ থেকে মারিয়ানও কথা বলে ফেললেন। বললেন, 'আমার স্বামী কার্ল এ বিষয়ে আপনাকে অনেক কিছু সংবাদ দিতে পারবেন।' কথা কটি কোন রকমে যেন উগরে দিয়েই মারিয়ান এগিয়ে চলে গেলেন।

হেস্টিং মারিয়ানের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর সমস্ত মুখটা যেন অধিকতর বঙ্কিম হয়ে উঠল,—মনে হল, কে যেন হঠাৎ তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্তরে যন্ত্রণাবোধ করলেও, মুখে তিনি এমন ভাব করলেন যেন কোন কিছুই ঘটেনি। শান্তভাবেই এগিয়ে চললেন কোন দিকে না তাকিয়ে—গীর্জা-প্রত্যাগত ধার্মিক ব্যক্তিদের ভঙ্গিমায়।

পরিষদের প্রথম দিনের সভা যেদিন বসল, সে দিনই ফ্রান্সিস হেস্টিংসকে বাধা দিলেন। মিডলটনকে অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে বৃটিশ রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করবেন বলে হেস্টিংস প্রস্তাব করায় ফ্রান্সিস অসম্মতি জানালেন। এ ব্যাপারে ক্লেভারিং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি মনে করলেন তাঁরই কৌশল যেন সার্থক হতে চলেছে।

হেস্টিংস ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্তা হলেও, পরিষদের সংখ্যাধিক্য স্বীকৃত কোন মতামতকে নাকচ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। উভয় পক্ষ সমান হলে, একমাত্র কাস্টিং ভোটই তিনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু ফ্রান্সিস ক্লেভারিং-এর গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ায় বিরোধীদলের স্পষ্ট সংখ্যাধিক্য হল।

হেস্টিংস ফ্রান্সিসের এই ব্যবহারে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন।

জেনারেল ক্লেভারিং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে—সবই ঘটেছে তাঁর এবং মনসনের ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, হেস্টিংসের সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ অতঃপর পুনর্বার বিবেচনা করা হোক।'

ভোট গ্রহণ করা হল। হেস্টিংস পরাজিত হলেন। যদিও তিনি প্রতিবাদ জানালেন এবং বললেন, 'এ সব করতে গেলে অনেক জরুরী কাজের ক্ষতি হবে।' কিন্তু তাতে বিরোধী পক্ষের কেউই কর্ণপাত করলেন না।

তিনজন বিরোধী সদস্যের প্রত্যাবর্তন-এর পর বারওয়েল চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এ এক স্থায়ী অচল অবস্থার সৃষ্টি হল; আমাদের এখন আর কোন কিছুই করবার নেই।'

হেস্টিংস এতক্ষণ এক দৃষ্টে টেবলের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'বারওয়েল, সারা ভারতে আজ যেন ঘোষণা করা হল—হেস্টিংসের ক্ষমতার অবসান ঘটেছে, তার শাসনের যবনিকা পড়ে গেছে, এবং নতুন যে ব্যক্তিটি ভারতবর্ষে এসেছেন, এখন তাঁরই জয়-জয়কার।' হেস্টিংসের জীবনের পট পরিবর্তন হল।

মারিয়ান এ সংবাদ শুনলেন। তিনি দেখলেন হেস্টিংসের মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা—তিনি যেন কিছুই দেখছেন না, কিছুই বলছেন না। তাঁর মুখ বিবর্ণ, ঠোঁট দুটি যেন চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে এক হয়ে গেছে।

মারিয়ান নতজানু হয়ে হেস্টিংসের পাশে এসে বসেন। তাঁর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হেস্টিংসের লম্বা লম্বা স্পর্শকাতর আঙুলগুলির উপর হাত বুলোতে থাকেন। সে এক করুণ দৃশ্য। হেস্টিংস ধীরে ধীরে মারিয়ানের মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এই জন্যেই কি আমি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলুম!' একটা অস্পষ্ট মৃদু হাসি তাঁর চোখের কোল চিবুকে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'আপনি কি পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন?' মারিয়ান প্রশ্ন করলেন।

দৃঢ়তার সঙ্গে হেস্টিংস জবাব দেন, 'না।' তারপর বলেন, 'আমি যদি করি তাহলে ওদের বাধা দেবার আর কেউ থাকবে না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায়, ওরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে।'

মারিয়ান সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হেস্টিংস, তোমার দিন আবার আসবে।' হেস্টিংস মাথা নীচু করে মারিয়ানের হাতের আঙুলগুলি নিজের ঠোঁটের উপর চেপে ধরলেন।

অল্পকালের মধ্যেই ক্ষমতা পরিবর্তনের সংবাদ শহরের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল। যেখানেই লোকজন জমায়েত হয়, তারা এই ক্ষমতা পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করে। ফ্রান্সিস ও তাঁর মিত্রদ্বয় এই সংবাদ প্রচারের সুযোগ নষ্ট করলেন না। ফ্রান্সিস প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতে লাগলেন যে, শিগগিরই হেস্টিংস গভর্নর জেনারেলের আসন থেকে পদত্যাগ করবেন। কারণ তাঁর এখন আর করণীয় কিছুই নেই। ফলে যে-সব লোক হেস্টিংসের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল, তারা এখন আর হেস্টিংসের কাছে যায় না—এমন কি তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপনও করে না। সংসারের এই স্বতঃসিদ্ধ চিরাচরিত নিয়ম এখানেও প্রকাশ পেল।

মহিলা মহলের ধারণা হল, মারিয়ানের সংস্পর্শে আসার জন্যই হেস্টিংসের এই অধঃপতন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত তীব্র ভাষায় হেস্টিংসের আচরণের নিন্দা করতে লাগলেন। একমাত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই এ ধরনের অশোভনীয় আচরণ সম্ভব। তাঁরা মারিয়ানকে 'ভ্রষ্টা' আখ্যা দিতেও কসুর করলেন না।

বারওয়েল তাঁর বন্ধু হেস্টিংসকে পুনর্বার অনুরোধ করলেন, 'মারিয়ানকে আপনি কিছু দিনের জন্যেও কোথাও পাঠিয়ে দিন।'

'মারিয়ানকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে আমার অবস্থার কি পরিবর্তন হবে?' হেস্টিংস জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাহলে অন্ততঃ মারিয়ানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা বন্ধ করুন।' বারওয়েল বললেন। তিনি আরও বললেন, 'ওয়ারেন, আপনি একবার ভেবে দেখুন, আজ আপনার সবই নষ্ট হতে বসেছে—যে 'ডেলসফোর্ড' আপনার জীবনের স্বপ্ন, সেই বাস্তুভিটার কথা একবার ভেবে দেখুন।'

হেস্টিংস তাঁর পুরাতন বাস্তুবাটীর ছবির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বাড়িখানির সংস্কার সম্ভবত এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। হেস্টিংস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এলোমেলো বহু স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল। বারওয়েল-এর দিকে তাকিয়ে হেস্টিংস বললেন, 'মারিয়ানের এই অপমানের আমিও অংশীদার না হয়ে, তাকে কি একাকী, বান্ধবহীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে পরিত্যাগ করতে পারি?'

'না, আমি তা বলছি না।' বারওয়েল বললেন, 'তোমাদের দুজনকে এক সঙ্গে না দেখলে আমার বিশ্বাস ফ্রান্সিসদের মনের পরিবর্তন হবে।'

'আমি তার কোন সম্ভাবনা দেখছি না—এতে আমার কোন সুবিধা হবে না।' হেস্টিংস বললেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মারিয়ানও ঠিক বারওয়েলের মত একই ধরনের প্রস্তাব করলেন হেস্টিংসের কাছে। তাঁরা তখন দুজনে গভর্নর-জেনারেলের বোটে গঙ্গায় বেড়াচ্ছিলেন। দুজন পাগড়ী-পরা দেশী লোক দাঁড় টানতে টানতে এগিয়ে চলেছিল। তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন মন্ত্রোচ্চারণের মত শোনাচ্ছিল—সে এক অদ্ভুত পরিবেশ।

'যদি আমি তোমার কাছ থেকে একটু দূরে যাই তাহলে ভালই হবে বলে আমার মনে হয়। তবে তোমার কাছ থেকে অত দূরে আমি থাকতে পারব না। আমি নিকটে কোন এক গ্রামাঞ্চলে থাকতে চাই।' মারিয়ান হতাশার ভেলা পড়েই যেন বললেন কথাগুলি।

হেস্টিংস অতি সহজভাবেই জবাব দিলেন, 'তুমি একা সেখানে থাকতে পারবে না।'

'ফ্রান্সিস তাহলে শান্ত হয়ে যাবে।' মারিয়ান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি যেন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি তোমার কাছে।'

'বোঝা কাকে বলে তা আমি ভালভাবেই জানি। তবে তুমি নিজেকে বোঝা মনে করলে স্বতন্ত্র কথা।' হেস্টিংস কাতরভাবেই বললেন কথাগুলি।

তারপর উভয়েই নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার মিলিয়ে গেছে—গভীর রাত্রি নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে। পাড়ের তালগাছগুলি নৈঃশব্দের মত যেন অন্ধকারের বুকে চিবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নক্ষত্ররাজীর ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে তাদের দেখা যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। অশ্রান্ত জলস্রোত দুর্নিবার চলেছে, হৃদয়ের অশান্ত চিন্তাস্রোতের মত।

হেস্টিংস মারিয়ানের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। তার পর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে একটির পর একটি আঙুল চুম্বন করলেন। মারিয়ান তাঁর বিষণ্ণ মুখখানিকে হেস্টিংসের মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে হেস্টিংস কেবলমাত্র মারিয়ানের চোখের জলের স্পর্শ পেলেন।

'হে আমার প্রিয়' মারিয়ান বললেন, 'তুমি আমার অন্তরতম—তুমি আমার অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে থাক—এখন আর আমাদের কিছুই করবার নেই!'

'আমি এখন সব সময়ে একটা জিনিস ভাবছি মারিয়ান,' হেস্টিংস গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভারতবর্ষে এসে আমি একটি শিক্ষা লাভ করেছি, একটি সত্য উপলব্ধি করেছি, সে হচ্ছে ধৈর্য। কালের পরিমাপ দিন গুনে বা সপ্তাহ গুণে হয় না—শতাব্দীর গর্ভে সে সত্য নিহিত আছে।'

'তার বহু পূর্বে আমরা আর ইহলোকে থাকব না!' মারিয়ান বললেন, 'কিন্তু আমার ভালবাসা?'

হেস্টিংস উত্তরে বললেন, 'সে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। সৃষ্টির পরিকল্পনা বিচিত্র, তাতে নগণ্য অভিহিত এই পরিকল্পনার মধ্যে তুমি আর আমি দুটি ক্ষুদ্র জীব মাত্র।'

মারিয়ান স্তব্ধ হলেন, তিনি হেস্টিংসের এই মহানুভবতাকে প্রশংসা করলেন কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। হেস্টিংসকে তিনি ভালবাসেন এবং হেস্টিংসও যে তাঁকে ভালবাসেন তা তিনি জানেন। কিন্তু তিনি হেস্টিংসের জীবনের অংশীদার হতে চান,—বিশেষ করে সেই সময় যখন তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্য এসেছে।

কিন্তু এ কি সম্ভব? সম্ভবতঃ নয়, মারিয়ান বিবাহিতা, কার্লের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে সত্য তবে হেস্টিংসের পরিণাম কি?

CENTRAL LIBRARY

যন্ত্রণার বৃত্ত

শৈলেন রায়

এমন করে আর কোনদিন তোমার কথা ভাবিনি। এমন নয় যে ইচ্ছে করেই তোমার কথা ভাবতে বসেছি। অন্য কথা ভাবতে বসেছিলাম। ভাবতে বসেছিলাম ব্যক্তিগত নানা সমস্যার কথা। অফিসের কথা। একটা প্রমোশন পাবার কথা ছিল। কথা না এক-রকম সবই ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ দুম করে বড় কর্তা মারা গেলেন। অনা সময় হলে অর্থাৎ কিনা আমার প্রমোশনের কথা যদি না চলতো সেই সময়ে আমি এমন ঘাবড়ে পড়তাম না। ভদ্রলোকের আত্মা ভালো অন্তত একজন মানুষ ও তাঁর মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে পড়েছে। আমার ধারণা ধারণা না বলে বিশ্বাস বলাই ভালো তাঁর মৃত্যুতে কেউ এমন শোকে মুহ্যমান হয়নি যেমন হয়েছি আমি—নিশীথকুমার আচার্য। বাবা অনেকদিন আগে গত হয়েছেন। সঠিক স্মরণ নেই, তাঁর মৃত্যু নিশ্চয় সাময়িকভাবে আমার মনের উপর একটা শোকের ছায়া ফেলেছিল খুব গভীর না হলে ও অল্পস্থায়ী একটা ছায়া যাকে অবশ্য কোন ক্রমেই শোকে মুহ্যমান হওয়ার পর্যায়ে ফেলা চলে না। সেদিক দিয়ে দীন-বন্ধু চট্টোপাধ্যায় স্বর্গীয় দীনবন্ধু চট্টো-পাধ্যায় একজন কৃতিপুরুষ যেহেতু মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তিনি আমার মত নিরেট একটি ঘাদামের মত মনের ওপর চিড় ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। চিড়টা শেষ পর্যন্ত মিলোবে কিনা জানি না। মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে মিলোবে না থেকেই যাবে। পরে অন্যরকম মনে হতে পারে। হওয়াই স্বাভাবিক। তুমি যেদিন চলে গিয়েছিলে রেখা (এখন তুমি রেখা বর্মন) সেদিনও আমার মনে হয়েছিল শোকে না হোক অন্য কোন ভাবে রাশে ফেলতে অপমানে যেভাবেই হোক না কেন আমি খুব মুহ্যমান হয়ে পড়েছি এবং আর কোন দিন বুঝি মাথা উঁচু করে চলতে পারবো না। একদিকে ছিল লজ্জা অপমান সেই সঙ্গে কোন কিছুটা বা বিস্ময়। অন্যদিকে যেমন একটা অভাব-বোধ। বহুদিনের অভ্যাসে ছেদ পড়ে যাওয়া —তোমাকে যেদিনটি চোখের সামনে দেখতে না পাওয়া কিংবা তুমি যে ছিলে একদিন খুব কাছাকাছি ছিলে একই বিছানায় পাশা-পাশি কখনও বা—পাশাপাশি নয় আর অন্যরকম আলাদা করে চিহ্নিত করতে না পারার মতন সেই যে অভ্যেসটা তাতে ছেদ পড়ে যাবার দরুন একটা অভাববোধ। সেই তুমি সেদিন দূরে সরে গেলে চিরদিনের মত সেদিন আমার মনে হয়েছিল রেখা—রেখা এখন আমি বুঝি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। বাঁচার মত করে বাঁচতে পারবো না। সেই আমি বেঁচে রইলাম। ভাল ভাবেই বেঁচে রইলাম। তোমাকে ভুলেও গিয়েছিলাম প্রায়। এবং সেটাই হতে পারতো বাঁচার মত বাঁচা। কিন্তু আজ অতর্কিতে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। এমন করে আর কোনদিন বুঝি তোমার কথা ভাবতে বসিনি ভাবতে বসেছিলাম অন্য কথা। আমার ব্যক্তিগত নানা সমস্যার কথা। অফিসের কথা হাতের সামনে দিয়ে ফসকে যাওয়া একটা বড় প্রমোশন যা আমাকে নিতে পারতো সুখ ঐশ্বর্য অফুরন্ত আমোদ-আহ্লাদ এবং বেশ খানিক নিশ্চিন্ততা বোধ (লিলির কথা)। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কদিন ধরে ডাক্তারের কাছে যাব-যাব করেও যাওয়া হচ্ছে না কেমন যেন একটা আলস্য ভর করে আছে শরীর ও মনে। ব্ল্যাক বোর্ডে ক্রমাগত গাদা খানিক নির্ঘাৎ লোকেন বোসটা হাত সাফাই করছে অথচ কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। এসব আমার ব্যক্তিগত সমস্যা যা নিয়ে এতক্ষণ মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম আর এই সময় তুমি কিনা এসে দাঁড়ালে একেবারে কাছাকাছি—এত কাছা-কাছি যে এই মুহূর্তে একটু সচেতন হতে পারলে আমি বুঝি তোমার শরীরের সেই চেনা গন্ধটাকে পর্যন্ত অনুভব করতে পারতাম তোমার শরীরের তাপ নিজের শরীর দিয়ে ছুঁয়ে নিতে নিতে বারবার বলতে থাকতাম রেখা; তুমি আমার একান্তই আমার শুধুই আমার। সমস্যা আমার একটা না। বহু। দিন কেরেক ধরে বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করছে। চল্লিশ ছুঁয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে এই ব্যথা ভালো না খুবসিস হতে পারে। মরে যাওয়া অসম্ভব না। মরতে কেউ চায় না। আমি চাই না। আমার সামাজিক মর্যাদা আছে। অফুরন্ত আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে আর আছে পকেট ভর্তি টাকা। লিলিও আছে। লিলিকে আমি ভালবাসি না। ওকে আমার ভালো লাগে: দারুন ভালো লাগে। এরকম মানুষ মরতে চায় না। মরে গেলেই তো সব শেষ আমি এখনই জীবনটাকে এমনিভাবে ফুরিয়ে যেতে চাই না। এই সব কথা নিয়েই মনের মধ্যে নড়াচাড়া করছিলাম। সামনের টি-পয়ের ওপর রয়েছে হুইস্কি ভর্তি গ্লাস মাঝে মাঝে সেই গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি আর সব সমস্যার কথা ভাবছি এমন সময় কোন অন্ধকারের অতল থেকে উঠে এল তুমি এসে আমার মনের দরজায় কাঁপিয়ে পড়লে কালবৈশাখী ঝড়ের মত অতর্কিতে প্রচণ্ড শক্তিতে। সেই আঘাতে আমার সমস্যাগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সমস্যার কথা ভুলে

গিয়ে আমি তোমার কথা ভাবতে বসলাম কেয়া ভাবতে ভালো লাগছে তুমি কেয়া বর্মন না তুমি কেয়া আচার্য অন্তত কয়েক-দিন কয়েক মাস বা বছরখানক আগেও যা ছিলে। সামান্য একটু কৌতূহল সাদা অবাঞ্ছিত অবাঞ্ছিতই বা কী ধরে নেওয়া যেতে পারে খুবই স্বাভাবিক একটা কৌতূহল যেহেতু তোমার কথা ভাবা আমার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক না সেদিন আগেও ছিল না; আমার জানতে ইচ্ছে করছে ভীষণ ইচ্ছে করছে কেয়া এখন এই মুহূর্তে জোৎস্নাধোয়া এই গভীর রাতে তুমি কী করছো কী করছো না কী ভাবছো? তোমার পাশে শুয়ে আছে যে লোকটা ধরে নেওয়া যাক সে এখন ঘুমিয়ে আছে কিন্তু তোমার চোখে ঘুম নেই পায়ের দিককার খোলা জানলা দিয়ে দেখছো তুমি এক টুকরো আকাশ যে আকাশ দেখতে তোমার ভাল লাগতো—তোমার কি মনে হচ্ছে কেয়া সত্যি করে বলো তো মনে হচ্ছে তোমার এমন একটা রাতে—ফুলশয্যার রাত্তিরে একজনের বুকে মুখ চেপে রেখে একটা কথাই বার বার বলতে চেয়েছিলে এ রাত যেন শেষ না হয় মনে পড়ে সেই রাতের কথা? নানা সমস্যা আমার। লিলি বলছে অহরহ বলছে এভাবে আর থাকা যাচ্ছে না। একটা কিছু করা দরকার। একটা কিছু বলতেও আর আলাদা ফ্ল্যাটে ভাড়া গুনতে রাজী না। কিন্তু আমার আপত্তি আছে এই বাড়িতে এই ঘরে এই শয্যায় দুজনে কাছাকাছি আজ কাল পরশু রোজ না সম্ভব না। আমি প্রস্তুত না। অফিসে নতুন বস। কড়া মেজাজ। কথায় কথায় চোখ রাঙায়। যেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু কোথায় যাই? কত সহজে তো তুমি চলে গেলে। তোমার উপায় ছিল। আমার উপায় নেই কোথাও যাবার উপায় নেই। আমি পড়ে আছি। একা। বিরাট একটা জাল—আমারই তৈরী জাল আমার চার পাশে। অতিকায় এক মাকড়সার মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি আমি। নিজেই নিজেকে বন্দী করে রেখেছি। জাল ছিঁড়তে জানি না কখনই বুঝি বুঝতেই চাই না। কী অসহায় কী মর্মান্তিক কী অপরিসীম ক্লেদাক্ত না ক্লেদাক্ত না। অসহায়ত্বের প্রশ্ন ওঠে না। এই মুহূর্তে যদি ইচ্ছে করি আমি সব বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি। কিন্তু আমার তো কোন বন্ধন নেই। যে বন্ধন ছিল মাসকয়েক আগে তা ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি নিজের হাতে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছ। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ কেয়া—কেয়া বর্মন না এই মুহূর্তে এই নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ মৌনতায় আমি খুব নীচু গলায় একবার বলতে চাই তুমি কেয়া বর্মন না তুমি—তুমি কেয়া আচার্য। নানা সমস্যা আমার। এখন নিজের সমস্যা ছাড়া অন্য কথা ভাবতে চাই না আমিও ভাল একজন সাধারণ মানুষ আশ্চর্য মজা বড় মাংসের মানুষ নিজের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবা আমার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এখন যেহেতু আমি বিশ্রী রকমের একটা বিপদে পড়েছি: উপরি পাওনা হিসাবে বেশ কিছু টাকা প্রতিদিন না হোক প্রায় দিনই আমার পকেটে আসতো। কোন হিংসুটে লোক নির্ঘাৎ আমাকে নিয়ে কানাকানি করেছে ওপরওয়ালাদের কাছে। যদিও হাতে-নাতে ধরতে পারেনি একটা সন্দেহ মনে মনে পোষণ করছে ওরা। সেই দিগ্বিজয়ী শাহনশা গোছের লোকটা অহরহ গর্জাচ্ছে দাঁতে দাঁত পিষছে সুযোগসুবিধা পেলেই চিবিয়ে খাবে। আমি ওর ভোজ্যদ্রব্য হতে চাই না। তাই কৌশলে খুঁজে বেড়াচ্ছি কী করে মুক্তি পাব। আর সেই সময় আমার এই চরম বিপদের সময় যখন কিনা মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছি মাথা খুঁড়ে মরছি কোথা থেকে—কোন গহন অন্ধকার থেকে উঠে এলে কেয়া কেয়া বর্মন না আমাকে ভাবতে দাও তুমি যা ছিলে তাই আছ—কেয়া আচার্য। তোমার ঘৃণাভরা মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। থাবা দিয়ে একটা খাবার যতগুলো নোট ধরা সম্ভব সমস্ত তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো উন্মত্তের মত চিৎকার করছো যেন দারুণ সর্বনাশ হয়ে গেছে তোমার বলছো ঘুষের টাকা ছি ছি! কী এমন অন্যায়। সুযোগ পেলে সবাই নেয়। মুঠো ভরে নেয়। আমোদ আহ্লাদ করে বউকে সোহাগ করে শাড়ি গয়না দেয় গাড়ি করে গঙ্গার ধারে বেড়ায় থিয়েটার সিনেমা দেখায় ভালো ভালো খাওয়ায়—কী এমন অন্যায় কী বিরাট অপ-রাধ? নিজের বউকে খুশী করতে কে না চায়? আমি চাই—চেয়েছিলাম। তুমি জেনে রাখো কেয়া বর্মন এতে সব বউ খুশী হতো। সোহাগ করে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরতো সুখের নরম শরীরটাকে তার হাতে তুলে দিত। আর তুমি পিশাচীর মত মুখ করে চিৎকার করেছো ছি ছি! ছিঃ কেয়া তোমার অনেক—অনেক বেশী স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। আর দশজন মেয়ের মত যারা সুখ চায় ভাল মন্দ বুঝতে পারে শুধুই নিজের ক্ষতি কামনা করে না সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজনেরও যে কিনা হতে পারতো তোমার সবচেয়ে অন্তর-গ তোমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। লিলির কথা বলতে পার। লুকোতে চেয়েছিলাম তার কথা ধরা পড়ে গেলাম। ক্ষমা চেয়েছিলাম পেলাম না। সে কি আমার—শুধুই আমার অপরাধ? আর তুমি যে ক্ষমা করতে পারলে না স্ত্রীলোক হবে যে হৃদয়হীন হবে সহানুভূতি দিয়ে যা করা যেত যে সমস্যার সমাধান করা চলতো ঈর্ষার তাড়নায় গড়ে তুললে বিরাট একটা পাহাড় যে পাহাড়টা উঠে দাঁড়ালো তোমার আর আমার মাঝ-খানে আজ কখন করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম দুজনেই। সে কি শুধু রাত আমারই অপরাধে কেয়া—কেয়া বর্মন শুধুই কি আমার অপরাধে? কোনদিন কি জানতে চেয়েছো কেয়া বর্মন মানুষ পুরুষ মানুষ মদ খায় কেন? শুধু ফুর্তি করতে শুধুই আমোদ লুটতে আর কিছু না? গভীর অন্ধকারে মন তখন ঘুমায়ে কাদে চারিদিকের বাতাস যখন হয়ে ওঠে ভারী তখন কি ভেবে দেখেছো কেয়া বর্মন তখন মানুষ সেই বন্ধ-বন্ধ হয়া আসা মানুষটা কীসের আশায় আলোর দিকে মুক্ত বায়ুর দিকে ছুটে যেতে চায় যদিও সে হয়তো জানে না ধরে নেওয়া যাক সে জানেই না কোন দিকে আছে তার খাঁচার বন্ধিমুক্ত তবু তার এই আকুলতা তার বুক ফাটা হাহাকারের লক্ষ কোনদিন কি শুনতে পেয়েছিলে শুনতে চেয়েছিলে কেয়া—কেয়া বর্মন চাওনি। মানুষ কীসের আড়ালে রাতের পর রাত জন্তুর আক্রোশে বুনো বেড়ায় বাজে মেয়েমানুষের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে আশ্রয় খুঁজে মরে বাড়ি যার কাছে হয়ে ওঠে কিংকিংকা নিথর প্রাণ-হীন এক প্রেতপুরী কোনদিন কি তার বুকে চাপা যন্ত্রণাটা বোঝার চেষ্টা করেছো কেয়া তোমাকে কেয়া বর্মন বলেই ভাবতে চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে অন্য কোন রূপে নয়। অন্য কোন নামে নয় অন্য কোন ভাবে নয়। গ্লাস শেষ হয়ে গেল। অনেক সমস্যাগুলি সমস্যাই রয়ে গেল। গ্লাস আবার ভর্তি করা যায়। কিন্তু মন? —যে মন শেষ হয়ে গেছে ফুরিয়ে গেছে নিঃশেষ হয়ে গেছে আশায় কি সেই মন ভরে নেওয়া যায়? যদি জানো সেই মন্ত্র যদি জানা থাকে তোমার আমাকে বলো আমি সেই গুপ্ত মন্ত্র ভিক্ষা চাই কেয়া কেয়া বর্মন নও তুমি তুমি কেয়া আচার্য যেমনটি যা ছিলে যা থাকতে পারতে স্বাভাবিক। সেই গুপ্ত মন্ত্র আমার কানে কানে বলো। বলো বলো বলো।

জগন্নাথ ঘোষ ও কুমারেশ ঘোষের
ছাপা ছাপানো
[সেকাল-একাল]
সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৪·০০
গ্রন্থ - গৃহ
৮এ, কলেজ স্কোয়ার মার্কেট, কলিকাতা-১২

ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬·
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও কয়চিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৩এ, বৃন্দাবন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬·টাকা পাঠালেই অবশ্যগুল্ক ফ্রি

কমখরচে পরিষ্কার ঝলমলে আর চমৎকার কাপড়কাচা সাবান অ্যাস্কোবার

হ্যাঁ সত্যিই তাই। ময়লা কাপড়গুলো কাচার আগে একটু সময় সাধারণ জলে ভিজিয়ে রাখুন.....এরপর অ্যাস্কোবার সাবান দিয়ে কাপড় কাচলে দেখবেন ঠিক যেমনটি আপনার পছন্দ ঠিক তেমনটিই হয়েছে। কাপড়কাচার বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সাবান অ্যাস্কোবার সাবান।

এশিয়াটিক সোপ কোম্পানী ৮, বি.বি.ডি.বাগ ইস্ট, কলকাতা-৭০০০০১

সেই নকশাগুলো

শ্রীলেখা বসু

বাবলির ভারি অদ্ভুত লাগে মাঝে মাঝে, কোনো জিনিসটাই ঠিক নিখুঁৎ নিটোলভাবে কেন পাওয়া যায় না।—এই ধর না কেন তাদের পরিবারে বাবা কাকা জ্যাঠা মিলিয়ে সবসুদ্ধ পাঁচজন। তাহলে বাড়ীতে পাঁচজন পুরুষ (মানে বয়স্কদের মধ্যে আর কি) আর পাঁচজন মহিলা থাকবেন তো? কিন্তু তেমনটি বাবলি কখনো দেখতে পেল না। বড়ো পিসীমা আছেন, কিন্তু জ্যাঠাবাবু নেই। সেজ জ্যাঠাবাবু তো বিয়েই করলেন না সবসময় সেজ জ্যাঠাবাবু আর সেজ জ্যেঠিমা দুজনেই আছেন, আর আছেন বাবা আর মা।

সবচেয়ে ছোটোজন—কাকু, তাঁর ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যবৃতে। তিনি অনেকদিন ধরে বিলেতে আছেন। বাবলির তাঁকে ভালো মনেও নেই। কয়েক বছর আগে তিনি এসেছিলেন, আর বাবলিকে একটা লম্বা প্যান্টুলুন কিনে পেছিলেন। সেটা এতোই সুন্দর যে মা তুলবে সেটা আলমারিতে তুলে ফেললেন। তাতে যে বাবলির খুব একটা দুঃখ হলো তা নয়। কারণ সে কোনোদিনই হাঁড়িকুড়ি পরতে নিয়ে খেলে না। কাঁচের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে প্যান্টুলুনটাকে দেখে সে আর তার অজানা অচেনা কাকার কথা ভাবে।

কেন যে এমন যোগ বিয়োগ হয় কিছুতেই কেন একটা নিখুঁৎ জ্যামিতিক নকশা পাওয়া যায় না। কেমন সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলোর দেখে বাবলি উত্তম সুচিত্রা সাবিত্রী ও অনিল চ্যাটার্জি। কেন? হঠাৎ চ্যাটার্জি কেন? তাহলে তো গোড়া থেকে লিখলেই হয় উত্তমকুমার সুচিত্রা সেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু একজনের পুরো নামটা দিলে খাপছাড় লাগে না? বাবলির মনে পড়লো একবার নেতাজীর বাড়ী গিয়ে একটা ছবি দেখেছিল। আটজন ভাই দাঁড়িয়ে পিছনে আর চেয়ারে বসা আটজন মহিলা। কি ভালো যে লেগেছিল—কেমন একটা পূর্ণতার প্রতীক মনে হয়েছিল ছবিখানা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ক'জন ছেলেরা দেখে বুঝতে চাইছিলো কে বড়ো কে ছোটো—কল্পনায় যেন একটা সুসঙ্গত পরিপাটির লিক এঁকে নিচ্ছিলো নিজেকে—কিন্তু হঠাৎ ছোটটি খেল। নেতাজী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মার পিছনে—সুন্দর লাগলো —কিন্তু নকশাটা তো নিখুঁৎ হলো না। যেন কেউ করে কোণ মুড়ে দাঁড়িয়ে রেওয়া হলো ছবি না?

সবাই বলে, বাবলি তুই বড়ো পাকা মেয়ে। হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে কখনো বৌদিরা কেউ বলেন এইসব বই পড়ো তুমি? কি কাণ্ড, মা কিছু বলেন না? বাবলি কি বলবে ভেবে পায় না কারণ বেশীর ভাগ সময়ই মা সত্যিই তাকে কিছু বলেন না। শুধু এক-আধবার যেমন সেদিন সে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলো ঠিকঠাক মানে কি। মা আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধছিলেন, তাকে বললেন দেখ বইটা। বাবলি একটু এলোমেলো পায়ে খাট থেকে নেমে এলো তার অকারণ মনে কেমন একটা অসহায় অভাব জেগে উঠলো। মা বইটা হাতে নিয়ে প্রথম পাতাটা খুলেই রেখে গেলেন লিখিবেলা আর রাজেনবাবুর দম্পতাজীবনের ইতিহাস পড়ছে তাঁর আট বছরের মেয়ে। কিন্তু বাবলি ভালো করে বুঝতেই পারলো না ব্যাপারটা কি আর বইটা বড়োদেরই বা হতে যাবে কেন। কি সুন্দর ভাষা, কেমন সব ছবি যেমন রোজ হয়—নিজের বাড়ীতে অনেক বাড়ীতে —ঠিক তেমনি। বাবা কিন্তু অমন নয়। তিনি শরৎবাবুর কোনো গল্প থেকে ধরো প্রেমচন্দ থেকেই কোনো লাইনটা বলুন, হয়তো বাবলি তার পরের লাইনটা বলে আর নির্মল সেই কৌতুকে দুজনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসে। বৌদিরা শুনতে পেলে অবাক হয়ে যান। গম্ভীর মুখে বলেন জানো ওদের বাড়ীতে গুরুজনেরা ঐসব বই নিয়ে কখনো ছোটদের সঙ্গে আলোচনা করেন না।

অতএব বাবলি পাকা ভাই সে আর কাউকে মনের ভাবনাগুলো খুলে বলতে যায় না। আর বলবেই বা কাকে? বাবলি তো তার জ্যাঠা কাকা বৌদিদের সঙ্গে একটা বাড়ীতে থাকে না সে থাকে অনেক দূরে পাহাড় অঞ্চলে। মাঝে মাঝে ছুটিছাটার সময় আসে তাদের কলকাতার বাড়ীতে। কলকাতাতে যে তার খুব ভালো লাগে তা নয়। জ্যাঠাইমারা প্রায়ই উপদেশ দেন বা বলেন এখন কেন শুয়ে আছো? বা এখন কেন বই পড়ছো?

CENTRAL LIBRARY

CENTRAL LIBRARY

এ্যা এতো ছাদী লাদী বং পড়ছো? বা এতো দমী দমী বং দিয়ে যেন ওং বজে ছবিটা বং করছো? এছাড়া বাড়ীতে মানুষ বার্বলি অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু মনের গহনে কোথায় যেন খুব একটা অসুখ পায়। এতো লোক...এত লোক চারিদিকে...কেউ আমাদের ছুঁয়েও পারবে না। কেমন একটা ভয়ও পায় বার্বলি অনেকটা সেই রকম যখন রাত্রে আলো জ্বালা ঘরে অনেকে বসে তার ঘোর অন্ধকার পাশেই লম্বা হয়ে শুয়ে বার্বলি ঘুমিয়ে পড়ে। কিংবা যখন অনেক ভোরে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখে যে ঘরে আলো জ্বলছে আর মা রেকর্ড চালিয়ে শুতলক্ষ্মীর ভজন বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছেন, বিছানায় গায়ের মধ্যে মিশে থেকে সেই এক ধরনের নিরাপত্তার অনুভূতি।

তাছাড়া সবাই ভালবাসে বার্বলিকে—এই অনুভবটাই কি কম? সবাই তাকে চায় বলে লক্ষ্মী মেয়ে। কলকাতার বাড়ীতে এলেই বার্বলির মনে হয় যে এখানে সবাই সবাইকে চায়। জাঠাইমারা যখন ঠাকুর চাকরকে বকেন বা নিজেদের মধ্যে কথাকাটাকাটি করেন (ও'রা ঝগড়া করলে মা বলেন কথা কাটাকাটি) কিংবা বৌদিরা যখন নিচুস্বরে মাথা কুটে হাসে নিজের নিজের শাশুড়ীর নিন্দা করেন সে সবই কেমন মিলেমিশে থাকা। কোনো বাপারটাই খাপছাড়া লাগে না মনে হয় না যে কোনো ছন্দপতন হলো। অনেক লোক বাড়ীতে সর্বদাই যেন বাড়ীটা প্রাণচঞ্চল হয়ে আছে। সকাল হতে না হতে কোথায় ভেসে যায় ঘুমটা। সবাই জেগে ওঠে। সারাক্ষণ বাড়ীটা যেন জেগেই থাকে।

তাদের পাহাড়ের বাড়ীটা কেমন স্তব্ধ মনে হয়। বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় মস্ত বড়ো বাগানের কিস্তৃতির নির্জনতায় যেন একটা দ্বীপ। বিশাল সেই ঠাণ্ডা ঘরগুলো ঝিমিয়ে থাকে। সেই ছায়া ছায়া শীতল ঘরে বার্বলির কেমন ভয় করে ওঠে সে বাগানের কোণাদুয়ে চলে যায় কিন্তু ঘাস সেখানে শিশির ভেজা। মালী বলে বেড়ী, একটা কুরসি এনে দেব? আর দুপুরে খেলার একটা উদাস হাওয়া ঘাঁকরে পড়ে চারিদিকে। ছোটো ছোটো অজানা পাখীর ডাক, পাতার মর্মর শুনতে শুনতে বার্বলি ভাবে কোনো একটা অচেনা পাহাড়ের পথ ধরে সে একদিন চলে যাবে বহুদূর যাওয়া যায় কিন্তু কোনোদিনই যাওয়া হয় না তার। বার বার সেই একই চেনাজানা পথ ধরেই আনাগোনা করে। সেই পাহাড় অঞ্চলে যেন সবাই একা। বাবা একা মা টেনা তার কনভেন্টের শুভ্রবাস সিস্টাররা একা। বার্বলির ভালো লাগে এই একাকিত্ব কিন্তু শুধু একজনকে নিয়ে কি কেউ কোনো নক্সা বানায়? আর বিশেষ করে যেখানে একজনের থেকে আরেক জনের মধ্যে এতো-টাই বেশী যে ইচ্ছে মত অদল বদল করলেও কিছুই যায় আসে না। সেখানেই তো নক্সা টাঁকতে সুখ সেখানে অনেক জনের মধ্যে-কারোর কাছাকাছি অবস্থান যেখানে একটা চতুষ্কোণ মুছে ত্রিকোণ করলে পুরো নক্সা-টাই নষ্ট হয়ে যায়।

বার্বলি দুধ খেয়ে নাও, মা বললেন একটুপি কলকাতা এসে যাবে। দুধ খেতে বার্বলির মোটেই ভালো লাগে না। অনেকক্ষণ রেখে রেখে ঠাণ্ডা করে খায় সে। সর পড়ে আরো বিশ্রী হয়ে যায় দুধটা তখন সবটা ছেঁকে নেবার অজুহাতে আরো খানিকটা ফেলে দেয় সে। তারপর হয় নাকমুখ সিটকে খেয়ে নেয় অয় ন্যাতো এদিক ওদিক দেখে সোজা বেসিনে উপুড় করে দেয়, কলকাতার বাড়ীতে অবশ্য তা হবার জো নেই আশেপাশে এতো লোক রয়েছে যে পাস হতে টিপ-টিপ পায়ে বেসিনের দিকে এগোবার কল্প-নাটাই হাস্যকর মনে হয়। তাছাড়া সাঁতা বলতে কি কাঁসার ফুকোটা বেকাবিতে মুচি ভরকারি সহযোগে মস্ত কাঁসার গ্লাসে ভর্তি ঘোলা ওঠা দুধ খেতে দিব্যি লাগে তার। সবাই-কার সামনে রোদে বেরুনো দালানটায় বসতে কি আরাম নিজেদের বাড়ীর সেই ঠাণ্ডা কনকনে পাথরের চৌহদ্দির কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে বার্বলির।

কিন্তু বিপদ হয় একটু পরে। সকাল দশটার সময়টাকে সবচেয়ে বিশ্রী লাগে তার। স্কুল থাকলে এক রকম আর নইলে ওই সময়টা নিয়ে যে কি করবে তা বার্বলি ভেবে পায় না। পাহাড়ের বাড়ীতে অনেক সময় পেন্টিং-এর সরঞ্জাম পেড়ে বসে কিংবা বাগানে ঘোরে একটু। ছোবাটা অবশ্য বেশী হয় না কারণ বাগানে ঘুরেছি এই কল্পনাটাকে বার্বলি যত ভালোবাসে না মোটেই। তবে কোনো একটা কোণে বসে চারিদিক দেখতে খুব ভালো লাগে তার। পাহাড়ের সারির পর সারি চলে গেছে তাদের মাথাগুলো প্রায়ই মেঘে ঢাকা। কি যেন রয়েছে ঢেকে মাথে সেই চূড়োগুলো। খানিকক্ষণ দেখে বার্বলি ভাবে যেন ওই নিরালা পথ বেয়ে ও যাচ্ছে অনেক উঁচুতে যেখানে আর কেউ নেই; চেনাজানা কিছু নেই। তারপর মুখ নীচু করে মন রাখে কোলের বইটাতে আর একটু পরেই তার অজান্তেই জল হাতের আঙুলে চলে যায় তার মুখের মধ্যে।

সবাই বকে আর সাঁতা বার্বলির নিজে-রও তারি লজ্জা করে। এ কি কাণ্ড। এদিকে এমন পাকা মেয়ে ওদিকে আঙুল-চোষা অভ্যেস গেলে না! বেশী কথা কি, বার্বলি নিজেই যখন নিজের মূর্তিটি কল্পনা করে—কোলে একটা লম্বা-চোড়া বই আর এদিকে মুখে আঙুল—তখন আপনিতেই এমনই প্রকট হয়ে ওঠে যে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বই পড়ার সঙ্গে অভ্যেসটা কেমন যেন জড়িয়ে গেছে চেষ্টা করেও ছাড়তে পারে না। অবশ্য সাঁতা বলতে কি তাদের পাহাড়ের বাড়ীতে চেষ্টা তেমন করেও না। শুধু কলকাতার বাড়ীতে যেখানে নিরালা একটা কোণ খুঁজেই পাওয়া যায় না, সেখানে বার্বলি অন্যমনস্কতে না পড়তে প্রাণ-পণে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায়ই ধরা পড়ে যায়, আর কি অমনি হাতের আঙুলে চলে যায় তার মুখের মধ্যে।

কিন্তু বিপদ হয় একটু পরে। সকাল দশটার সময়টাকে সবচেয়ে বিশ্রী লাগে তার। স্কুল থাকলে এক রকম আর নইলে ওই সময়টা নিয়ে যে কি করবে তা বার্বলি ভেবে পায় না। পাহাড়ের বাড়ীতে অনেক সময় পেন্টিং-এর সরঞ্জাম পেড়ে বসে কিংবা বাগানে ঘোরে একটু। ছোবাটা অবশ্য বেশী হয় না কারণ বাগানে ঘুরেছি এই কল্পনাটাকে বার্বলি যত ভালোবাসে না মোটেই। তবে কোনো একটা কোণে বসে চারিদিক দেখতে খুব ভালো লাগে তার। পাহাড়ের সারির পর সারি চলে গেছে তাদের মাথাগুলো প্রায়ই মেঘে ঢাকা। কি যেন রয়েছে ঢেকে মাথে সেই চূড়োগুলো। খানিকক্ষণ দেখে বার্বলি ভাবে যেন ওই নিরালা পথ বেয়ে ও যাচ্ছে অনেক উঁচুতে যেখানে আর কেউ নেই; চেনাজানা কিছু নেই। তারপর মুখ নীচু করে মন রাখে কোলের বইটাতে আর একটু পরেই তার অজান্তেই জল হাতের আঙুলে চলে যায় তার মুখের মধ্যে।

সবাই বকে আর সাঁতা বার্বলির নিজে-রও তারি লজ্জা করে। এ কি কাণ্ড। এদিকে এমন পাকা মেয়ে ওদিকে আঙুল-চোষা অভ্যেস গেলে না! বেশী কথা কি, বার্বলি নিজেই যখন নিজের মূর্তিটি কল্পনা করে—কোলে একটা লম্বা-চোড়া বই আর এদিকে মুখে আঙুল—তখন আপনিতেই এমনই প্রকট হয়ে ওঠে যে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বই পড়ার সঙ্গে অভ্যেসটা কেমন যেন জড়িয়ে গেছে চেষ্টা করেও ছাড়তে পারে না। অবশ্য সাঁতা বলতে কি তাদের পাহাড়ের বাড়ীতে চেষ্টা তেমন করেও না। শুধু কলকাতার বাড়ীতে যেখানে নিরালা একটা কোণ খুঁজেই পাওয়া যায় না, সেখানে বার্বলি অন্যমনস্কতে না পড়তে প্রাণ-পণে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায়ই ধরা পড়ে যায়, আর কি অমনি হাতের আঙুলে চলে যায় তার মুখের মধ্যে।

সবাই বকে আর সাঁতা বার্বলির নিজে-রও তারি লজ্জা করে। এ কি কাণ্ড। এদিকে এমন পাকা মেয়ে ওদিকে আঙুল-চোষা অভ্যেস গেলে না! বেশী কথা কি, বার্বলি নিজেই যখন নিজের মূর্তিটি কল্পনা করে—কোলে একটা লম্বা-চোড়া বই আর এদিকে মুখে আঙুল—তখন আপনিতেই এমনই প্রকট হয়ে ওঠে যে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বই পড়ার সঙ্গে অভ্যেসটা কেমন যেন জড়িয়ে গেছে চেষ্টা করেও ছাড়তে পারে না। অবশ্য সাঁতা বলতে কি তাদের পাহাড়ের বাড়ীতে চেষ্টা তেমন করেও না। শুধু কলকাতার বাড়ীতে যেখানে নিরালা একটা কোণ খুঁজেই পাওয়া যায় না, সেখানে বার্বলি অন্যমনস্কতে না পড়তে প্রাণ-পণে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায়ই ধরা পড়ে যায়, আর কি অমনি হাতের আঙুলে চলে যায় তার মুখের মধ্যে।

করবে তা ভেবেই পায় না।

তাছাড়া, সকাল দশটায় সময় কলকাতার বাড়ীতে কেউ গল্পের বই নিয়ে বসে নাকি? কত রকম যে আওয়াজ হয় এই সময়টা জানে কতগুলা ডালপুরি শব্দ হয় বাসন সরানোর আর বাসন ধোয়ার শব্দ হয়, বাচ্চারা চেঁচায় বাড়ীর গিন্নিরা চাকর বামুনকে বকেন। বার্বলি যেন এই সময়টা দিশেহারা হয়ে যায়। তার সমবয়সী তেমন কোনো বন্ধুও নেই বাড়ীটাতে। মাঝে মাঝে কোনো আত্মী-য়ার আসে ঘটে কিন্তু বার্বলির মনে হয় সে যেন তাদের থেকে কেমন আলাদা। কোনো নির্জনতার অধীশ্বরী মানুষ অনেক বিষয়ে অবাধ থেকে যায়। ছবি, বই, আর পাহাড়ী কনভেন্টের জগৎটা কেমন যেন আবছা আর অবাস্তব, কলকাতার এই সজীব বাড়ীতে বসে সেই জগতের বাসিন্দা যেন নিজেকে খুঁজে পায় না।

কিন্তু দ্বিপ্রহরের সেই স্তব্ধ শান্ত ঘন্টাগুলোয় কলকাতা আর পাহাড়ী অঞ্চলের সীমারেখাটা যেন মুছে যায়। বই হাতে বার্বলি এ-ঘর ও-ঘর করে, বারান্দায় এসে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয় উঁচু নীচু ছাত-গুলোর উপর দিয়ে। বাড়ী...কত বাড়ী, কেবীর জন্যই সৃষ্টি নয় তবু দুপুরের এই অলস মুহূর্তে তারাও যেন সুন্দর হয়ে ওঠে। সাদাটে নীল আকাশে দু একটা ঘুড়ি ওড়ে আর নীচের গলি দিয়ে ফেরিওলা ক্লান্ত টানা সুরে ডাক দিয়ে যায়। কি জানি কোন না না জানা দুঃখে বার্বলির মন ভরে যায়। আর যখন বিকেলের আলোর রঙগু-লোর আমেজ মিশে যায় তখন সেই পাহাড় অঞ্চলের এককীত্ব ফিরে আসে যেখানের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে ফিরে আসে। এতো লোক বাড়ীতে তবু কেন এমন মনে হয়? বার্বলি তাড়াতাড়ি চলে যায় কোনো এক বৌদির ঘরে বা মা-র ঘরে। তাও ভালো লাগে না এমন কোনো কথাতেও জোর করে হাসি দেয়। অনেক কথা বলে আর অবাক হয়ে দেখে সন্ধেবেলা আলো যতক্ষণে ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠেছে ততক্ষণে বার্বলির মনও কল্পনায় প্রস্তুত হয়ে গেছে। আশপাশের লোকেদের নিয়ে নিশ্চিন্তে সে নক্সা গড়ে চলে।

অনেকদিন আসেনি বার্বলি কলকাতায় এবারে তাই তার বড় ফুর্তি তত সঙ্গে। জামাটামা টেলেটুনে সুন্দর হবার চেষ্টা করছে সে, গলায় আওয়াজ আরো মিষ্টি এনে সভ্য হবার চেষ্টা চলছে। কি করলে সবাই দেখবে বার্বলি যেন একটু নতুন হয়ে গেছে, সেই বিষয়টুকু উপলব্ধি করার জন্যে কি করা উচিত বার্বলি সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। আঙুলটা যেন মুখের ধারে-কাছেও না আসে—বাড়ীতে তাইপো ভাই-ঝিরা আছে না?—বার্বলি দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লো।

এবারে বাড়ীতে কত লোক থাকবে, তার এক হাদিস দিয়ে। দিয়েছে বার্বলি তার লাল রংপোলী বেলোয়ারী চাড়ীটা। পরবে আর আনন্দে। আর দুলদুলো কানের দিয়ে

কোকড়া করবে যেমন স্কুলের নাটকের সময় মিস চ্যাটার্জিরা করে দিয়েছিলেন। সেই নট-ঘরে মস্ত আলো আর উত্তেজনা থাকবে ঠিকই আর তেমনি রোমাঞ্চ। কিন্তু নাটকে মস্ত পার্থক্য সকালে ঘুম ভেঙেই একটা মস্ত স্যুটকেস বওয়ার হাঙ্গামা আছে বয়ে হবে না, এ রোমাঞ্চ চলবে কতদিন ধরে। নতুন জোড়া জুতোর নতুন বো মায়াভরা এক আবেষ্টনী আনবে আনবে উৎসাহ দিন ও রাত্রি এক হয়ে যাবে। কোনো সময় অন্ধকার হবে না, বারান্দায় ঠাণ্ডা হিম-হিম করে একা থাকতে হবে না।

বাড়ীতে পা দিয়ে একটু অবাক হলো বার্বলি, কি চুপচাপ সেখ, বিয়েবাড়ী বলে মনেই হয় না। তখনই ভাবলো, মা তো এখন সব জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা করতে করতে উঠবেন। কি বিরক্তিকর! কতক্ষণে যে স্যুটকেস খুলে বার্বলির জামাকাপড় বের করে দেবেন তবে বার্বলি চেঞ্জ করতে যাবে তার ঠিক নেই। তাকে নিয়ে মা বাড়ীতেই এলেন। চুল কা- কুচ কুচে কালো চুলটা এলিয়ে দিয়ে কাঁধের ওপর—কতো লম্বা হয়েছে দেখছে সবাই।

তারপর বার্বলি যেই একছুটে বেরুতে যাবে, মা তার হাতখানা ধরে ফেললেন। বললেন, এই দু'খানা ঘর আর নীচে বেডরুম ছোটবেলার স্মৃতি জড়ানো ঘর ছিলো এই ঘরগুলো আমাদের মনে রেখে। আর হ্যাঁ, খবার সময় এখানেই চলে এসো। ওরেই খাবে। কেন মা? খাবার নয় কেন? সেই ছোট্ট থেকে খাওয়া ছেড়ে এই ঠাণ্ডা লোবার ঘরে কেন? মার শান্ত চোখে একটু দুষ্টুমির ছায়া দেখল। এখন সবাইকার আলাদা ঘর হয়ে গেছে। তাদের সবাইকে যাও জ্যাঠাই মনের প্রশ্রয় করে এলো। কেমন একটা ভার পড়লো বার্বলি মনে সেই চেনা অনুভূতিটে এসে তার হাত পা ঠাণ্ডা করে দিল। টিপি-টিপি পায়ে গেল সে সেজ জ্যাঠাইমার ঘরে... নিশ্চিন্তে বসে আছে সবাই, কাজ করছে যেমন রোজকার কাজ হয়। বাপ্পাবৌদি তুমি আলপনা দেবে না? স্রেফ করে তবু সাজাবে না? কি সুন্দর সাজাও তুমি? বৌদি হেসে বললেন, না ভাই ও তোমার বড়োবৌদিই দেবেন। কিন্তু বড়োবৌদি তো ভালো পারে না তোমার মত সুন্দর তো কেউ পারে না। বৌদি খুশি হলেন। তাতে করে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, ওঁরা না ডাকলে তো ওদের ঘরে গিয়ে কাজ করতে পারি না, ওঁরা পছন্দ করবেন না।

ওঁরা আবার কে? বার্বলি আরো অবাক হলো, সেজ জ্যাঠাইমাকে জিজ্ঞেস করলো, নিশ্চিতই এখনো আসেনি সেজমা? কখন আসবে? না-সে সেজজ্যাঠাইমা নিশ্চিন্তে উত্তর দিলেন, সাজগোজ করলে কখন আসবে যোগেশ্বর গায়ে হলুদের সময়। অনেক নাটক পড়ে থাকা বার্বলি বললো, বঃ, ভাইয়ের বিয়েতে একদিন আগে আসতে পারে না? ওই থাম তো শুধু মেয়ে ভাইয়ের বিয়ে। জ্যাঠাইমা বিরক্ত সুরে বললেন, বলে নিজের ভাইয়ের বিয়েতেই লোকে আসতে পারে না, ও লছমন পাতার ভাই।

লছমন পাতার ভাই, বার্বলি থমকে গেল। হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, আমিও তো নিজের বোন নয়। ওইরকমই একটা বোন। আমার বিয়ে যখন হবে—কথাটা অস্পষ্টভাবে ভাবলো—তখন বাপ্পাবৌদি এমনিই নিজের ঘরে বসে ছেলেকে দুধভাত খাওয়াবে, নিশ্চিতই আসবে না, আর জ্যাঠাইমা নিশ্চিন্ত মনে বসে পুজো করবেন —বলি না বলি না মা ওদের ডেকে পাঠাবে। তেমন গাছিয়ে ভাবতে পারলো না বার্বলি কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে। সমস্ত নকশাটা কোথায় কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, ডালিমফুলের ছোপ ছোপ নিষ্প্রাণ কাঁচের মতই লাগছে। আর অনেক লোকে ভরা এই বাড়ীটার ওপর পাহাড়ী বিষণ্ণ আক্রমণ নেমে আসছে।

ঠাণ্ডা কনকনে আবহাওয়া। এতো লোক বাড়ীতে কিন্তু বার্বলিদের পাহাড়ের বাড়ীটার মত সবাই যেন নিজেদের চারদিকে একটা সভ্যতার বাগান বানিয়ে দিয়েছে। সেই বাগানের বিস্তৃতির মধ্যে এক-একজন যেন নির্জনতার এক-একটা দ্বীপ। বিয়েবাড়ীটা যেন সাজা একটা নাটকের অভিনয়। শেষ হওয়া মঞ্চ সাজ খুলে রাখা আর পরদিন সেই বকেয়া হতাশা সব ফুরিয়ে যাওয়ার হতাশা। নিঃসীম আর গভীর।

একা একা বার্বলি সিঁড়ি দিয়ে উঠলো। 'ওপর' বলে চিহ্নিত এলাকায় এসে বারান্দায় দাঁড়ালো।

ইউনাইটেড অসমান ছাতগুলো সামনে ঢেউ খেলিয়ে গেছে দ্বিপ্রহরের সেই অবসন্ন মায়াবী স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়েছে। ভীষণ নির্জন লাগলো বার্বলির ভীষণ একা। তার মনের গহন কেউ তাকে জানিয়ে দিল যে এ নির্জনতা সন্ধ্যার আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাটবে না, এ একাকিত্ব পাহাড়ের নিঃসঙ্গতার চেয়েও গভীর। হঠাৎ মনে হলো বার্বলির যেন সেই অচেনা অজানা পাহাড়ী পথটা বেয়ে উঠতে উঠতে সে—সে কিছু চেনে না সেখানে ওপরে মেঘে ঢাকা চূড়ো যেন কালো জমাট একটা রহস্য। অজানা, অচেনা, অনির্দেশ্য কোনো অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলো তার ছোট্ট হৃদয়, কেউ দেখতে পাবার সম্ভাবনা নেই জেনেও হাতে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো সে।

CENTRAL LIBRARY

শীতে সাবধান

সে আসে। বাতাসের হাতে লোহার ছাঁচ কোটা খেলে। কোন কুকুর ডেকে ওঠে না এই আততায়ী প্রবেশের মুহূর্তে। কিন্তু আজকাল আমার ঘ্রাণশক্তি কি কুকুরের চেয়ে বেশি? সে এলে ঠিকই টের পেয়ে যাই। ছেঁড়া জানলায় অনেক কষ্টে মুখটা বাড়াই। দেখতে পাই, হ্যাঁ—সে আসছে। খুব আস্তে, নিঃশব্দে নিচের ঘেট খুলে সে ঢুকে পড়েছে। এবাড়ির কোন ফ্ল্যাটেরই কারো গাড়ি নেই, কিন্তু একটা গাড়িবারান্দা আছে। তার তলায় সে হারিয়ে যায়। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতে আমার এক সেকেণ্ডও দেরি লাগে না। ওই তো সে, এইভাবে মুখ নিচু করে চলতে চলতে ধাপ পার হল! কাঁড়-বেতে ঢুকে একবার ওপরের দিকে তাকাল—এটা তার অভ্যাস। নাকি দোতলার মিসেস ডিসুজার অ্যালসেশিয়ানটাকে সে ভয় পায়? ওই ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে চার নম্বরে সে ঢুকবে। চার নম্বরের দরজায় নেমপ্লেট আছে : মিঃ এণ্ড মিসেস ডি চৌধুরী। সে নেমপ্লেটের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর ঘণ্টার বোতাম টিপল। একটা মিষ্টি সুন্দর শব্দ পিয়ানোর মতো বেজে ওঠার কথা—এবং এই মুহূর্তেই আমি প্রায় হুমড়িখেয়ে ছমড়িখেয়ে হই। সুন্দর মিষ্টি শব্দ তার আঙুলের ছোঁয়ায় পলকে হয়ে উঠল একটা ভয়ঙ্করের বিস্ফোরণ। আমি বজ্রাহতের মতো বিছানায় পড়িয়ে পড়ি। কিছুতেই নিজের ফুসফুসের খেপুনি থামাতে পারি না। মনে হয় সব বাতাস এই বিস্ফোরণে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

কতক্ষণ অসহায়ভাবে চুপচাপ পড়ে থাকি। নিজেকে বলি, সহ্য করতে শেখো বন্ধু। তুমি এখন যেখানে বাস করছ, তা একটা ধারালো মালভূমিসংকুল পাহাড়। এবং একটা সহ্যাগ্নিবিশেষ। তার চূড়া-গুলো একটার পর একটা তোমাকে পার হতে হবে। গত মার্চের আঠারো তারিখে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গ্রেভ রোডের মোড়ে যখনই সেই ধূর্ত কালো এ্যামবাসাডারটা তোমাকে অন্যমনস্কতার জন্যে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছিল, তখনই তুমি ছিটকে উত্তীর্ণ হয়েছিলে সহ্যের প্রথম চূড়াটা। ডানপায়ের নিচেটা ফেটে গেল। হাড় ভাঙলে নিশ্চয় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তুমি সহ্য করতে পেরেছিলে। তারপর একটা থেকে আরেকটা সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে তোমার যাত্রা হল শুরু। এখন তো বাবা, দিব্যি আরামে শুয়েছো, তোমার চেতনার এই ঘর—ছোট্ট কিন্তু পুব-দক্ষিণ হু হু খোলা। জানলার বাইরে সব বসন্তকালের কাড়িপাড়ি করা নতুন জন্মা গায়ে চিকন-চিকন সব গাছ। লাল শিরস্ত্রাণ পরা অদ্ভুত পত্তনদের মতো দলে দলে শিমুল ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বসন্ত-সেনারা। ওই যে ওখানে একটা পুকুরও আছে—যার জলের বড় সবুজ। এবং ধোপা মেয়েটা দেবরাজ ইন্দ্র আবসেন বলেই কি অজস্র ঐরাবত পাহারা দিচ্ছে? দ্যাখো ওই ধোপা মেয়েটার যৌবন এখন জলের মতো ঝিলিক দিচ্ছে বলে তিনজন গালব মস্তান কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল, অন্ধের মতো। হ্যাঁ তিন অন্ধের মতো তিনটি যুবকের দেহের ভিতর থেকে প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে দিতে তুমি দেখলে। ওরা বলল, দয়া করে...

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আর এই বসন্তে মুন্দিটারও ছুটি হয়েছে। ছাইচাপা ঘাসের মতো তার শরীর। রাস্তার কলের ধারে সে গলে লাইফবয় ঘষছে। সে সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে। একটু পরে তাকে অঙ্গ মুদি এবং বাটা-পারার বাটপাড় কিংবা নির্ভেজাল ভেজাল-কারী বলে একটুও চেনা যাবে না। তুমি নিশ্চিন্তে জেনো সাড়ে চারশো মানুষকে ভেজাল চেলে খাইয়ে পলাতু করেছে বলে পুলিশ তাকে — অন্তত এই বসন্তকালে আর গ্রাহ্যের ঘোরাচ্ছে না গলায় জুতোর মালা তো নয়ই। বরং এখন বসন্তকালে কলকাতায় পুলিশও অসম্ভব ভদ্র হয়ে ওঠে। ওই যাখো, খুব আস্তে, প্রায় নিঃশব্দে দুজন সশস্ত্র পুলিশ মাথা নিচু করে হেঁটে গেল। তাদের হাতের রাইফেল দুটো দুটি শিশুর প্রতীক — কারণ ওরা ছেলেপুলের বাপ।...

হ্যাঁ, এবার এইসব ভেবে আমার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসতে গিয়েও আটকে যায় সব কৌতুক কিংবা উইট। ঠিক এই ঘরটার নিচেই সেই লোকটা এখন আছে। তার কথা মনে পড়ায় চকিতে আমার দৃষ্টি মোজাইক করা নিচের ঘরে পৌঁছয়। ঘরের দরজা-জানলাগুলো পুরু পর্দা থাকায় আলো এত কম ষড়যন্ত্রময় কী অন্ধকার সেখানে। ওপরের খোলামেলা আলোয় অভ্যস্ত দৃষ্টিতে প্রথমে কিছু দেখতে পাওয়া কঠিন। তারপর আবছা একটি পুরুষ ও একটি মহিলাকে আমি দেখতে পাই অথবা অনুমান করি। আরও অনুমান করি তারা নিম্নস্বরে সোফার পাশাপাশি বসে কথা বলছে। তারা কি এত অজ্ঞ হতে পারে? বিশেষ করে মিসেস চৌধুরী—রুমা চৌধুরীর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছে। সৌন্দর্যকে পাপেরও সাধ্য কী যে ছুঁতে পারে। তাদের পাশেই ডবল খাটের বিছানা সুদৃশ্য তাতের বেডকভারে মোড়া— সেখানে আমি যথাযথ পবিত্রতা আশা করছি। নিজেকে বলি, তুমি হীনচেতা হয়ো না। মনে শুদ্ধতা রাখো কারণ এখন বসন্তকাল এবং তুমি একজন শয্যাশায়ী প্রায় অক্ষম মানুষ। এখনও তিন মাস পায়ে প্ল্যাস্টার নিয়ে তোমাকে পড়ে থাকতে হবে।

অথচ আমার মনে শুদ্ধতার উজ্জ্বল রোদ ছেয়ে একটু ঘোলা আবছাওয়া নিয়ে আসে একজন টেকো লোক। ভীতু, বিনীত, ভয় তার, চলচলন। সেটাই স্বাভাবিক। রোদ খুন করে ফেলে যে আততায়ী মেঘ সে আকাশে নিচু হয়েই তো আসে! ওই নম্রতাই তার শত্রুতানি। আর আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, টেকো শত্রুতাটা বৃষ্টি দিয়ে মেঘ যেমন পৃথিবীকে ছোঁয়, তেমনি করে ইচ্ছেকামনার ভাবে নিচু হতে-হতে ছুঁয়েছে পদ্মদীঘিকে এবং কোথাও বৃষ্টি-পাতের মতো তাদের রক্তের ভিতর যে ইচ্ছে-কামনার অশ্বগুলো লড়বড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে টের পাই। ওরা কি পরস্পর চুম্বনরত হল? ওরা কি প্রেমের বিষন্ন কুসুমটি ফোটিয়ে কামনার বঙ্কিম ফলে নিজেদের উত্তীর্ণ করল?

...তুমি চুপ করো, শুভময়। তুমি অশ্লীল কথা ভাবছ। তোমার ভিতরটা টানা অবস্থা পচ ধরে গেছে। তুমি একটা পচা আহত—তাই তৈমুরলঙ্গের মতো লুণ্ঠন অগ্নিকাণ্ড রক্তপাতের বীভৎসতায় ভগোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ দাবি করছ।

একটু পরে দেখি আমার গা ঘেমে ভিজে গেছে। একটা বোবা অসহায় দুঃখ-বোধ কাঁচের কফিনে রাসায়নিক তরলপদার্থে ভাসিয়ে রাখা আধুনিক যুগের মমির মতো আমাকে শুধুই একটা দেহে পর্যবসিত করে ফেলেছে।

ওই টেকো লোকটাকে আমি জানি না। তাকে আজ পরপর মাত্র তিন দিন ঘরে আসতে দেখেছি—ঠিক দুপুরের দিকে, যখন মিঃ চৌধুরী আপিসে থাকেন। আগে তাকে দেখার সুযোগই পাইনি, কারণ তখন আমারও আপিস ছিল। আর বিছানায় এই-ভাবে শুয়ে দিনরাত্রি কাটে না বলেই মাথার কাছের জানালা দিয়ে বেশ কষ্ট হয় এবং উচিতও নয়—তবু বাইরে কী সব ঘটছে দেখবার চেষ্টা করি। সময় কাটানোর ছল এছাড়া আরও কিছু-থাকে অবশ্য। বই পড়া, রেকর্ডে গান শোনা, কিংবা কখনও কারো সঙ্গে কথাবার্তা। কিন্তু সবচেয়ে ভালো সময় কাটে বাইরে তাকিয়ে। খুঁটি-নাটি দেখি। মুখস্থ হয়ে যায়। রাস্তা, গাড়ি, লোকজন, গাছগুলো কাকগুলো এবং অনেক সময় আরো অনেক রকম পাখিও আসে। তার মধ্যে একটি টেকো লোকের আসা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো।

প্রথম দিকে টেরই পেতাম না যে ও চার নম্বর ফ্ল্যাটে আসে। একদিন রুমা চৌধুরী ওকে গেটঅবধি এগিয়ে দিলেন। তখনই আমি চমকে উঠেছিলাম। না—খুব সহজ-ভাবে নিই নি। দুজনের পারস্পরিক বিদায় অনুষ্ঠানে (অনুষ্ঠানই! সজ্ঞানে বলছি) একটা কিছু ছিল, যা সহজ নয়। যা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে থাকার কথা। যার মধ্যে আনন্দ ও দুঃখের যুগপৎ ব্যঞ্জনা আছে। কারণ যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেতে হচ্ছিল টেকো লোকটিকে।

ব্যাপারটা খুব ঘোরালো হয়ে গেল। কিন্তু আপাতত আমি তত্ত্বভাবেই এই বিষয়টি নিয়ে স্বগত আলোচনায় রত হতে চাই। কারণ আমি নিজেকে ভদ্র সভ্য মানুষ বলে বিশ্বাস করি। অন্যের ফ্ল্যাটে অন্যের সুন্দরী স্ত্রীর কাছে অসময়ে ইন্দ্র-চুম্বিতময় মাথা নিচু কেন পরুষ যাক, তাতে আমার মাথা ঘামানো উচিত নয়।

কিন্তু আমার স্বভাবের এই সমস্যা—আমি লোভনতা ও সম্পদের পক্ষপাতী। রুমা চৌধুরীর সঙ্গে ওই টেকো লোক-টাকে মানায় না — একটুও মানায় না। তার গায়ের রং এত চাপা নাকটা এত লম্বা, চোখ-দুটো জ্বলজ্বলে নীল এত বেমানান সে—আর সুমিষ্ট রং উজ্জ্বল গৌর, ঘন একরাশ চুল—যদিও খানিকটা ছাঁটা, মনে হয় হঠাৎ খামখেয়ালে নাকপথে এক সোনালি প্রপাত মিসেস চৌধুরীকে চাবডীয় রুক্ষ বলতে পারি।

একজন নিগ্রোর সঙ্গে সাদা চামড়ার মেয়েকে প্রেম করতে দেখলে কু-ক্লুক্স-ক্লানের সদস্য হোক বা না হোক, যেমন ইয়াংকি বাচ্চার মেজাজ খিঁচড়ে যায় এবং নানাকথা খিস্তি করে পিস্তল তোলে—আমার প্রতিক্রিয়াও অবিকল তাই। দুঃখের বিষয় আমার কোন পিস্তল নেই। জঙ্গল ফুলে অসহায় বঙ্গসন্তান পিস্তলের নলচে বানায় এবং কপালের শিরা ফোলায়। কানের লতি লাল ও গরম হয়ে পড়ে। দাঁতে দাঁত নেমে আসে। আমি যদি সুস্থ শরীরের থাকতাম সোজা গিয়ে বলতাম—কোথায় যাবেন আপনি? খবর্দার এবাড়ির ছায়া মাড়াতে দেখলে আপনার ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

কিম্বা পুরো পাড়ার মস্তান হয়ে একটা বাঁকা শিস দিয়ে এগোতাম। আচমকা কাঁধে হাত রেখে বলতাম—কী রে শালা? ঘেন্টি ফুক করে দেব- শালা চুটকু বাড়ির আর জায়গা পও নি?

এই সময় আমি দোতলার জানলায় মিসেস চৌধুরীর মুখ দেখতে পেতাম। কী দেখতাম মুখে? ঘৃণাময় ক্রোধে সুন্দর মুখটা লাল? সোনালি চুলে ঝড়? ঠোঁটের রেখায় বাঘা

সত্যি শুধু নিখাদ স্তম্ভিত দুর্বল বিস্ময়! তুমি শুভময়, তুমি! উনি কি বলে উঠতেন—আমি ভাবি নি এমন ভাবি নি শুভময়বাবু, আপনি!!

...দুঃখিত মিসেস চৌধুরী—ভেরি সরি। ক্ষমা করবেন। বুঝতেই পার-ছেন, যা দিনকাল পড়েছে। আজকাল দুপুর-বেলা কত সব ফ্ল্যাটে খুনখারাবি চুরি ডাকাতি হচ্ছে। কখন কে কী বেশে আসে—

হুই...হেঁ হুঁ হেঁ মিসেস চৌধুরী, নিয়াতি—আজকাল হয়ে উঠেন ঐ আপনার পর্ণিতির, মানে আপনাদের ফ্ল্যাটে আসেন ...হুঁ হুঁ বড় চুপ হয়ে গেছে—

আমি কাঁদ হয়ে পড়ে থাকি। ওঃ পাই কত অসহায় আমি! পৃথিবীর এই একটা সামান্য ব্যাপারেও কিছু করতে আমি পারি না। দিন যায়। রাত আসে। একটা করে দুপুরে আসে ফের। একজন ইটেলি লোক গেট খুলে মাথা নিচু করে ঢুকতে আসছে এ-বাড়িতে ঢোকে। কতক্ষণ আমার নিচেই একটা ধরে কাটিয়ে চলে যায়। গেটের বাইরে গিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায় মিসেস চৌধুরীকে। এবং এইসবও আমাকে সহ্য করতে হয়। এখন আমি সহ্য করার মাটিতে হাঁটছি।...

তারপর যত দিন যায়, আমি আপো-চের পথ ধরলাম। মনে মনে ওর সঙ্গে আলাপ করেও ফেললাম। আমাদের মধ্যে নিবিড় কথা বলা, শুধু হেসে — পৃথিবীর আগোচরে। মিসেস চৌধুরীও আড়ালে।

—এই যে, এলেন দেখছি!

—হ্যাঁ। না এসে পারি নে। আপনি কেমন আছেন আজ?

—চমৎকার। ভালো। আপনি?

—মোটামুটি।

—যান, মিসেস চৌধুরী একা আছেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—তাই বুঝি! হ্যাঁ, ঝুমা খুব ভালো মেয়ে। ওর মনটা ভালো! এত কষ্টের পর এখনও আমাকে ও...

—প্লীজ, একদিন আসুন না আমার এখানে। আপনার সব কথা আমি শুনবো।

—কী হবে কথা শুনে! এ ট্রাজেডি তো সবার বরাতেই ঘটছে আজকাল।

—প্লীজ, আসুন একদিন:

—যাবো। আপনার পায়ের হাড় জোড়া লাগতে আর কদ্দিন?

—ডাক্তার বলছেন, আরও একটা মাস। তারপরেও কিছুদিন ক্রাচ ব্যবহার করতে হবে।

—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, ভাই। কী করবেন?

—আপনি কি ঈশ্বরবিশ্বাসী?

—নিশ্চয়। কেন—আপনি নন?

—ভেবে দেখিনি।

—ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবেন।

—কী পাব, বলি?

—উঁ? কী পাবেন? সব পাবেন—শান্তি, আই...

—আপনি কী পেয়েছেন বলুন তো!

.....(দীর্ঘশ্বাস)

—বলুন, চুপ করে কেন?

—হয়তো পেয়েছি, হয়তো পাইনি।

—কী? প্রেম? বুঝা চৌধুরীর ভালোবাসা তো?

—কী যে বলেন!

—ভদ্রলোক প্রতিদিন আসেন ওঁর কাছে?

—ওটা অভ্যাস।

—কী? কী বললেন?

—অভ্যাস।

—অভ্যাস?

—হ্যাঁ, না এসে পারি না। নিছক অভ্যাস। (একটু চুপ করে থেকে) হয়তো প্রেম একটা অভ্যাস। তার বেশি কিছু নয়।

—দেখুন, একটা কথা বলব?

—স্বচ্ছন্দে।

—আপনার এ অভ্যাসের ফলে ওঁদের দাম্পত্যজীবনের শান্তি...

—হঃ হাঃ হাঃ। হাসালেন ব্রাদার! দাম্পত্যজীবন! ছিঃছিঃ—আমি যেন কতকটা বলতেও আসি হয়েছি—ঝুমা, তুমি কী সুখে আছ, তাই দেখতে এলাম। হাঃ—আমি আসলে, বুঝলেন? আমি আসলে দেখতে আসি ঝুমা তার দাম্পত্যজীবনে কী সুখে আছে!

—মিথ্যে বলবেন না। আমি জানি আপনি কেন আসেন!

—কেন?

—আপনি ওকে চুমু খান—ওকে...

—আপনি উত্তেজিত। ওতে পায়ের যন্ত্রণা বাড়বে। শরীর দুর্বল হবে।

—আপনি...আপনি একটা মৃতলম্পট—জঘন্য মানুষ। আপনি কল্পনাবিলাসী, চরিত্রহীন হতে আসেন মাত্র।

—প্লীজ, প্লীজ! কেন আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন?

—আমি সব বলে দেব মিঃ চৌধুরীকে। থাকুন, আপনাদের গুপ্ত প্রণয়লীলা আমি ফাঁস করে দেব।

—আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছেন না তো!

—গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার। আজই এই একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। চৌধুরী আসুক।...

হাঁফাতে হাঁফাতে আমি জানালার রড আঁকড়ে ধরি। ও মিটিমিটি হাসে দেখতে পাই। বলে, বেশ। কিন্তু ব্রাদার, আপনার কেন এত মাথাব্যথা? আপনি কেন আমার ঘরে ও'ৎ পেতে পড়ে থাকেন? কেন আপনি আমাদের ব্যাপারে এত কষ্ট পান? জবাব দিন। চুপ করে থাকবেন না। এটা কি আপনার নিতান্ত ব্যক্তিগত বোধ—সামাজিক বিবেকের তাড়না? প্রিয় সমাজ-পতি বন্ধু, বলবেন খুলে? উঁহুঁ—আমি জানি। এ আপনার ঈর্ষা। আপনিও আমার মতো ঝুমার প্রেমে বিপন্ন।

—না, না!—চিৎকার করে উঠি। গলা শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড কাশতে থাকি। আমার বেন তপতী দৌড়ে আসে পাশের ঘর থেকে।

আমি জানি না, আমি জানি না, কিন্তু ঝুমা চৌধুরী কেন বিকেলে তপতীর কাছে এসে একবার আমার ঘরে ঘুরে যান। একটুখানি মাত্র দাঁড়িয়ে শুধু বলেন—কেমন আছেন আজ?

আমি মাথা নাড়ি। একটু হাসি। আমার মন ভরে ওঠে, আমার মন জুড়িয়ে যায়। মনে মনে বলি—লক্ষ্মী মেয়ে কেন আপনি এমন হবেন? আপনি একটি সৌন্দর্য—আপনার বহুমাত্রিক সত্তা নেই, তা আপনি জানেন না—এবং তাই অন্ধ একটি অভ্যাসের দাসত্ব করছেন। ছিঃ আপনার কি ওই দেহের সান্নিধ্যে ক্লান্তি আসে? হা! পারোপার্টি আপনি একটি সুচারু সৌন্দর্য। দুর্লভ ভালোবাসার ঘরে কিছু নানা রঙের পরাগ বিপন্ন হতে দেওয়া মানে একটি সুগন্ধের মৃত্যু। আপনার কি হাত কাঁপে না আপন মনে সাজানো ওই বর্ণ ও গন্ধকে খুন করতে?

উনি চলে যান। আমার ঘরে রেখে যান সেই সুন্দর অল্প হাসিটি, এবং কিছু সুগন্ধ, এবং কিছু বিমর্ষ ক্লান্তি। ঘর ভরে ওঠে। একসময় আস্তে আস্তে সেই ঘনতা বিমর্ষ রূপ ও গন্ধের মধ্যে আমি আমার বাঁচিটা কাটিয়ে দিই। ক্ষমা করি ঝুমা চৌধুরীকে। ঈশ্বরকে খুঁজতে খুঁজতে বলি, যদি উনি পাপী হন, ওঁর সব পাপ আমার যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ক্ষমা করে দিও, কেমন? আর ন্যাখো ঈশ্বর—তুমি বুড়ো হয়ে গেছ বড়, তোমার আল-খেল্লাটাও তাই জীর্ণ, ওটা বদলে নিও—কারণ, সম্ভবত এখন থেকে প্রেম সৌন্দর্য বিবেক এইসব চমৎকার গুণগুলোর দিকে তোমার অনাচোখে তাকানো দরকার। তোমার পৃথিবী এবং মানুষও তো অন্যরকম হয়ে গেছে। ওহে বুড়ো বন্ধু তুমি জানো না—তুমিও সময়ের এক ক্রীতদাস।...

তারপর দিনগুলো যায়, রাতগুলো যায়। হঠাৎ একদিন দেখি, সেই টোকো লোকটা আর আসে না। আর আসেই না। আমি বিছানা ছেড়ে রাস্তে হাঁটতে শুরু করি। অথচ যার পাত্তা নেই সেই নির্জন দুপুরের প্রেমিকের। কী ঘটল? ব্যস্ত হয়ে উঠি। রাতে তার দিয়ে সোজা নেমে যাই লোহালের চাঁদ বরাবর রাস্তে। ঘুরে ঘুরে ফুটার অবধি টিপি। ঘুমা চৌধুরী দরজা খুলে বলেন, আপনি! আসুন—আসুন। হাঁটতে গেছিলেন তাহলে।

—বসুন। যা গরম পড়েছে! কোল্ড ড্রিঙ্ক কিছু। বলে উনি ফ্রিজের দিকে হেঁটে যান।

—মিসেস চৌধুরী!

—উঁ? ফ্রিজের হাত ধরে উনি সাড়া দেন।

—সেই ভদ্রলোক আর আসবেন না?

—হয়তো না। কেন?

—খুব চেনা মনে হত। কোথায় যেন দেখেছি।

—দেখবেন। যা গরম পড়েছে! কোল্ড ড্রিঙ্ক কিছু। বলে উনি ফ্রিজের দিকে হেঁটে যান।

—মিসেস চৌধুরী!

—উঁ? ফ্রিজের হাত ধরে উনি সাড়া দেন।

—সেই ভদ্রলোক আর আসবেন না?

—হয়তো না। কেন?

—খুব চেনা মনে হত। কোথায় যেন দেখেছি। তাই ভাবছিলুম, আলাপ করে জেনে নেব।

—আরে, সে এক কাণ্ড! তখনকার টাইপ—চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাল। বাস তিনেক হল কলকাতায় ফিরেছে। একদিন এসে বলল, তুমি তো স্প্যানিশ শিখতে ইঠেপড়ে লেগেছ। আমি তোমাকে শেখাব। আসতে লাগল। মাই গুডনেস! কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম—চালিয়াত! আমি যেটুকু জানি, তাও জানে না! মাঝখান থেকে এক কাঁড়ি টাকা দেনা দিল! আমার কর্তা তো ক্ষেপে আগুন। বিলেটাকে তুমি পাত্তা দিলে কেন? কী মুসকিল! তাকে কী করে বলুন তো! সম্পর্কে ওর আত্মীয় হয় পরে... এই নিন।

হাসতে হাসতে চমৎকার ঠাণ্ডা এক বাটি আইসক্রিম আমার হাতে তুলে দেন রুমা। উনি কি মিথ্যে বললেন? উনি কি সবটাই সত্যি বললেন? আমার সব সংশয় ঈর্ষা

সবিনয় নিবেদন

গত চোদ্দ বছর ধরে প্রকাশিত অমৃতের গল্পের ভিতর থেকে একটি নির্বাচিত সংকলন এবার উপহার দেব, একথা ঘোষিত হবার পর আমাদের পাঠকবর্গের কাছ থেকে অজস্র উৎসাহ আমরা পেয়েছি, এবং সেজন্যে অমলা কৃতজ্ঞ।

কিন্তু কাজটি শুরু করেই আমরা এমন কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বা অনেক চেষ্টা করেও ঠিকমতো সমাধান করে উঠতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। প্রথমত বর্তমান কাগজ-সংকটের জন্যে সংকলনের আকার সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি, যার ফলে গল্প-সংখ্যাও ৩৮টির বেশি করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত কয়েক হাজার গল্প চোদ্দ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে বলে বেশির ভাগ গল্পেরই মূল্যায়ন করার জন্যে পুনর্পঠনের প্রয়োজন ছিল। সে-চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। কিন্তু একজনের পক্ষে সবগুলো গল্প পড়া সম্ভব ছিল না বলে গল্পের উৎকর্ষ বিচারের কোনো সাধারণ মানদণ্ড রক্ষা করা গেছে কিনা সন্দেহ। এমন ঘটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, একই লেখকের একাধিক প্রকাশিত গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনাটি আমরা সংকলিত করতে পারিনি। কিম্বা এমনও হতে পারে যে, একজন অপেক্ষাকৃত ভালো লেখকের গল্প বাদ দিয়ে তুলনামূলকভাবে কম-ভালো লেখকের লেখা স্থান পেয়ে গেছে। এমনকি এরকমও হতে বিচিত্র নয় যে কয়েকজন সম্পাদকের মত লেখকের গল্পও আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে মনে পড়ছে স্বর্গত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী লীলা বসুর গল্পও অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সময়মতো খুঁজে পেলাম না। একেবারে হাল আমলের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখকের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটেছে, সেজন্যে আমরা দুঃখিত।

গল্পগুলি সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ রীতি অনুসরণ করা হয়নি। একেবারে প্রথম দুটি ছাড়া লেখকদের বয়স বা আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের কথাও ভাবা হয়নি। নিতান্ত পড়ার সুবিধের কথাই মনে রেখেছি আমরা। অমৃতের সমস্ত লেখকই আমাদের কাছে সমান সম্মানের পাত্র।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমরা সেইসব প্রতিভাবান লেখকের কাছে—যাঁরা নিয়মিত সাধনার সঙ্গে সপ্তাহের পর সপ্তাহে অজস্র গল্প উপহার দিয়ে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের গল্প এই সংকলনে প্রকাশ করতে না পারলেও ভবিষ্যতে অনুরূপ কোনো সংকলনে নিশ্চয়ই তাঁরা সসম্মানে স্থান পাবেন।

আমাদের ত্রুটির বিষয়ে আমরা সচেতন। কিন্তু এত বাধা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমাদের পাঠকসাধারণকে যদি আমরা কিছুমাত্রও আনন্দ দিতে পেরে থাকি, মনে হবে

কোনো পরিবর্তনে রেখা না ওর মধ্যে। জল পেয়ে যাই। একথা ওকথার পর দম করে বলে ফেলি—আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আগে কুয়াশার ওপারে দেখতাম—এক ভদ্রলোক মাথায় টাক...

কথা কেড়ে নেন রুমা। কিন্তু নির্বিকার বলেন—দেখতেন বুঝি? হ্যাঁ,— ও একজন, ইয়ে—মানে, চেনা জানা কী। আত্মীয়ও তো—বলতে পারেন। কেন?

—না, মানে, তেমন নয়। প্রায়ই দেখতে পেতাম—তাই বলছি।

দেখছি। তাই ভাবছিলুম, আলাপ করে জেনে নেব।

—আরে, সে এক কাণ্ড! তখনকার টাইপ—চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাল। বাস তিনেক হল কলকাতায় ফিরেছে। একদিন এসে বলল, তুমি তো স্প্যানিশ শিখতে ইঠেপড়ে লেগেছ। আমি তোমাকে শেখাব। আসতে লাগল। মাই গুডনেস! কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম—চালিয়াত! আমি যেটুকু জানি, তাও জানে না! মাঝখান থেকে এক

পলকে রুমা চৌধুরীর ঠাণ্ডা মাথাকে কব্জা করে ফেলেছে টের পাই। আমি নিঃসাড় হয়ে পড়ি। আঃ, সৌন্দর্য, আপনি এমন শীতল! আপনি কি এমনি বোধশূন্যতার দিকে ঠেলে দিতে অভ্যস্ত মানুষকে?

সেই সোনালি হাতের দেওয়া কাঁসার বাটিটা বোধশূন্যতায় তবু পিপাসী ঠোঁট রাখি—আনন্দে।

তোমারই জন্য

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

এক নির্জনে গা ছমছম করার কথা সোমা গাঙ্গুলির। কিন্তু তা করছে না। উল্টে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে চোখে মুখে মাথায়। বাতাসে গাছের পাতার সড়সড় শব্দটুকুও চমকে উঠার মতো। দুদিকে ঘন গাছ-গাছড়া মাঝখানে পাকা রাস্তা। ঠিক কোন জায়গায় এসে গাড়িটা বিকল হয়েছে ঠাওর করা যাচ্ছে না।

নির্জন পথ ধরে চলতে চলতে গাড়িটা এখানে এসে হঠাৎ থেমেছে। নিজে থেকে থামেনি, থামানো হয়েছে। নিচের দিক থেকে ঘটঘট শব্দ আসছিল একটা, শব্দটা বাড়ছিল। আর তাই শুনে পাশের লোকের ঘুমের মধ্যে জাঁক পড়ছিল। কিসের শব্দ, কেন শব্দ সোমা জানে না। গাড়ির মেকানিজম্ কিছু জানা নেই তার।

গাড়ি যে চালাচ্ছিল, অর্থাৎ পাশের লোকটা এখানে হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে নেমে গেছে। তারপর উপুড় হয়ে গাড়ির নিচে মাথা ঢুকিয়ে দেখতে বা বুঝতে চেষ্টা করছে কি হল। বুঝেছে বোধহয় কোথায় কি গণ্ডগোল হয়েছে। বেরিয়ে এসে পিছনের কার্বিয়ারের ঢাকনা খুলে বড় বাক্স শিটটা আর কিছু যন্ত্রপাতি বার করল। গাড়ির তলায় ঢোকার শিটটা বিছিয়ে যন্ত্রপাতিটা হাতে নিয়ে নিজেও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপরেই মেশিনটের ঠুকঠাক শব্দ কানে আসতে লাগল।

আর সেই মুহূর্তে চোখে মুখে মাথায় ঝলকে ঝলকে তপ্ত রক্ত উঠে আসতে লাগল সোমা গাঙ্গুলির। সামনের ড্যাশ বোর্ডে চাবিটা ঝুলছে। খুব নিঃশব্দেই একটা মোচড় পড়তে পারে ওটাতে। তারপর যেটুকু সেটা চোখের পলকের ব্যাপার। মাথায় যা এসেছে তা করে ফেলার মতো এতবড় সুযোগ আর এমন পরিবেশ জীবনে পাবে না।

খুব সন্তর্পণে নিজের পাশের জানালা দিয়ে সোমা গাঙ্গুলি নিচের দিকে গলা বাড়ালো। কিছু দেখা গেল না। দেখা যাবেও না এইদিক থেকে লোকটার মাথা—জানে। খুব নিঃশব্দে নিজেকে টেনেটুনে নিয়ে গেল পাশের ড্রাইভারের আসনে। আড়চোখে পিছনের জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে উঁকি দেখল। ...এদিকে হাঁটুর নিচ থেকে পা পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। লম্বা মানুষ, তাই থাকার কথা।

সোমা গাঙ্গুলি মাথা নামিয়ে নিল। হাতে আর কটা মুহূর্ত সময় আছে জানে না। সন্তর্পণে এনার্জিনের চাবিটা ঘোরালো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সেই কাজটা করে ফেলল—ফেলতে লাগল।

...গর্জন তুলে গাড়িটা পাঁচ সাত হাত সজোরে এগোচ্ছে আবার পাঁচ সাত হাত পিছিয়ে যাচ্ছে।

...আবার সামনে যাচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে।

...আবার। আবার আবার আবার।

প্রত্যেকবার একটা দেহ চাকার নিচে গুঁড়িয়ে গাড়িয়ে পিষে পিষে যাচ্ছে টের পাচ্ছে। তবু থামছে না সোমা গাঙ্গুলি। থামার উপায় নেই। গাড়ির নিচে ওই ছোবড়া ছাড়ানো মাংস চামড়া হাড়ির সালো মিশে না যাওয়া পর্যন্ত এই করে যেতে হবে তাকে।

...গাড়িটা এখন থেমে আছে। চালকের আসনে বসে সোমা গাঙ্গুলি কাঁপছে ঠকঠক করে। এবারে কি করবে? যা করার তা হয়ে গেল—এখন? কোথায় যাবে? কেমন করে পালাবে?

গাড়িটা নিয়ে পালাবার কোনো প্রশ্ন নেই কারণ সোমা গাঙ্গুলি গাড়িই চালাতে জানে না.....

কি আশ্চর্য! গাড়ি চালাতে জানে না তো এ-কাজটা সে করে উঠল কি করে? উপর্যুপরি ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড ড্রাইভিং...।

ধড়মড় করে উঠে বসল সোমা গাঙ্গুলি। না, বন-ভূমির কোনো বিজন প্রান্তে নয় কোনো গাড়িতেও নয়—সে তার বিছানায় বসে আছে। হাড় হাড় ঠকঠক কাঁপুনি এখনো। গায়ে দরদর ঘাম। গত ঘন্টার ধড়ফড় শব্দ বেরুচ্ছে তার নাক দিয়ে। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে তাইতেও।

সত্যি নয়, সোমা গাঙ্গুলি স্বপ্ন দেখেছে। তবু চোখের সামনে একটা তাজা মানুষের হাড়গোড় চামড়া মাংস বিধ্বস্ত মুণ্ডটেছ যাচ্ছে তার। অর্ধবৃদ্ধ—অর্ধবৃদ্ধ গাঙ্গুলি। মশারির ভিতর থেকে বাইরের জানলার দিকে তাকালো। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে ভোরের আলোয় আভাস। জাগছে।.....ভোর রাতের স্বপ্ন তাহলে। গোটা দুনিয়ার ওই একটা মানুষের একেবারে শেষ দেখতে পেলে সোমার আপত্তি নেই। কিন্তু যা সারা স্বপ্নে যা দেখল তেমন কোনো লক্ষণ হাসল কষ্ট করে ওঠার মতো মুখের পেশী ও নেই। অত স্বপ্নের মধ্যে ঠিক পেরেছে—কবিন আগে বিবৃতি ছবিতে যেমন দেখেছিল, হুবহু তেমনি পেরেছে।

গেল সপ্তাহে বরুণ চক্রবর্তীর ঘরে বসে দেখে এসেছিল ওই নৃশংস ইরোটিক ছবিটা। স্বামীর অত্যাচারে হতভাগা এক শ্বেতাঙ্গ রমণী ঠিক ওইভাবে প্রতিশোধ নিয়েছিল আর শেষ পর্যন্ত তার হাতেও নিহত হয়েছিল। ছবির সেই প্রতিশোধের দৃশ্য দেখতে দেখতে বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল সোমার। পাশ থেকে বরুণ চক্রবর্তী সেটা টের পেয়েছিল কিনা কে জানে। কিন্তু একটা বাড়তি অনুভব করছিল নিশ্চয় নইলে অন্ধকারে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল কেন ওর দিকে। ছবি শেষ হবার পরেও লালচে মুখ সোমার। বরুণ চক্রবর্তী ওকে একটা ভালো রেস্তোরাঁয় বসিয়ে খাইয়েছিল তারপর। কিন্তু ছবির ওই বীভৎস দৃশ্যটা কিছুতে মন থেকে সরাচ্ছিল না সোমার। ছবির নায়িকা যখন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী উঠেছিল হো—একেবারে যেন একাত্ম হয়ে গেছিল তার সঙ্গে।

.....মোহন মধ্যেও যে একটা খুনী বাসা বেঁধে বসে আছে কে জানত! আছেই—নইলে হুবহু এ-রকম স্বপ্ন দেখে উঠল কি করে? ছবির নায়ক যত অকরুণ অত্যাচারীই হোক সে একটা পুরুষ মানুষ। ক্ষমা-সুন্দর নির্দয় পুরুষ। অমন গাঙ্গুলি সেই সুঠাম জোয়ান পুরুষ হলেও ভিতরে ভিতরে এত নৃশংস হয়ে উঠে কি করে? বোধহয় না। এই লোভ পাকুড়ে মানুষই না। কাপুরুষ—ঠক প্রবঞ্চক ভাঁওতাবাজ। ভগবান্ মিতে ভুলিয়ে ওর জীবনটাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। যশ পুনাম ছিনতাই করে নিয়েছে। এই কারণেই ছবির ওই নায়কের থেকেও ঢের ঢের বেশি রাগ বুকের ভিতর জমে জমে পাথর হয়ে আছে। আর এই কারণেই যে মেয়ে নিজের হাতে একটা মশা মাছি মারতে পারে না—সে এইরকম স্বপ্ন দেখেছে।

তবু বিচ্ছিরি একটা অস্বস্তিতে ভিতর ছেয়ে আছে। স্বপ্নে দেখা ওই নোংরা কিছু একটা করে বসার মতো তপ্ত রক্ত মাথার দিকে উঠে ফাটতে চাইছে আবার প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতিতে গলাও কাঁপছে। ছেলের নাকের ঘড়-ঘড়ানিও বিশ্রী মনে হচ্ছে—স্বপ্নে শোনা গাড়ির এনার্জিনের আওয়াজের মতো কানে লাগছে।

দুহাতে ঠেলে ছেলেকে ও-পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার এক ঝলক রক্ত উঠল মাথায়। বিছানা ছিটকে একলা করেছে। ঘুমন্ত ছেলের পিছনে ঠেস-সই করে বড় বসিয়ে দিল সোমা। ছেলেটা ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠল। দুহাতে সোমা ওকে ধরে রেখে সাবধানে বালিশ পড়পড় করে উঠল আবার কান্না ঘুমে ভরে ছেলেটা জেগে যাচ্ছে—যা সন্দেহ যা, সর্বনাশ—

সামনের ঘর থেকে বাবার ঝিমুনি-মাখা গলা ভেসে এলো, ভোর না হতে ছেলেটাকে ঘুমধর করে কি...কি হয়েছে?

এ-ঘর থেকে বাবার ওপরেও মুখ খামটা দিয়ে উঠল সোমা। —খুব ওষুধ দিয়েছিলে কাল রাত্তিরে—বিছানাপত্র ভাসিয়ে দিচ্ছে—পুরিয়া-টুরিয়াগুলো সব দূর করে ফেলে দিচ্ছি আমি!

সত্যেন্দ্রর অনাথ সহ হালদার প্রায় রাত থাকতে শয্যা ছেড়ে ওঠেন। তার আগে পরে মুখে মিনিট কতক ইষ্টনাম স্মরণ করে থাকেন। আজ অতে বাধছে ঘটল। কান্না ভরে সকাল না হতে মেয়ের এই ছেলেকে দেখে তাঁরও ভিতরটা তিরিক্ষি হয়ে উঠল। প্রায়ই বিছানা নষ্ট করছে বলে নাতির ওষুধ নেয়ে ওষুধ দেওয়াচ্ছেন সত্য হালদার—নাতির ভেতর-বার সব জানা, ওষুধ অব্যর্থ না হবার কোনো কারণ নেই। রাত্রিতে মেয়ের হাতে কটা পুরিয়া দিয়ে বলেছিলেন রাতে শোবার আগে একটা করে খাইয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোগে যা।

নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর ফল এই। গজগজ করতেই থাকলেন সত্য হালদার। তাই ছেলে ফেলেন তিনিও। রাগের আরো কারণ ইদানিং সব ব্যাপারে মেয়ের সাহসকেই বাড়তি দেখেছেন তিনি। দুনিয়ার সবকিছু যেন তার কাছে দোষ করে বসে আছে। এখন আবার বাপের ওষুধের ওপর আস্থা।

CENTRAL LIBRARY

CENTRAL LIBRARY

শোয়া থেকে উঠে বসলেন সত্য হালদার। গলা চড়িয়ে বললেন ওহুদ ফেলে দিয়ে যে—পয়সা দিয়ে হো আর কিনতে হয়নি যায়ে লাগবে কেন! আবার একটা ওহুদ চাইতে এসে দেখবি আমার কাছে—একটা বাচ্চা ছেলেও জানে হোমিওপ্যাথী ওষুধে প্রথমে একটু বাড়ে তারপর কমে—তোর সন্দেহে একেবারে মাফ চাই—এত অধৈর্য বলেই এই দশা!

শেষের মন্তব্য রাগের মাথায় মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে। মনে মনে প্রমাদ গনলেন সত্য হালদার। কাক-ডাকা ভোরে এবারে এক দফা রাগারাগি কান্নাকাটির আশংকা ঝেড়ে ভয়ে ভয়ে মাটিতে পা দিলেন তিনি।

বাবার শেষের খোঁচাটাও সোমার কানে ঢুকেছে ঠিকই। এই দশা বলতে কোন দশায় খোঁটা দিল সেটা হাড়ে হাড়ে জানে। আর এই কারণেই এ ধরনের শেষের মুখ বুজে হজম করে উঠতে পারে না। কিন্তু এই ভোরে সেই নৈর্ব্যক্তিক অশান্তির মধ্যে ভাঙা-ভাঙা হবার দিকে এগোতে মন চাইল না। আসলে সকলে ও-রকম একটা কাণ্ড করে ওঠার ফলে স্নায়ুগুলো সব অবসন্ন হয়ে আছে এখনো। একটা ঝাঁকা মেরে চুমুক হয়ে মাটির সঙ্গে মেশার দৃশ্যটা চোখ থেকে সরানো যাচ্ছে না। নিজের ভিতরের এমন বীভৎস দিকের রূপটা সোমার কল্পনার মধ্যে ছিল না।

সেই কারণেই ঘাবড়েছিল। রাগলে কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না নিজেও জানে। কখন কি যে করে বসে তার ঠিক কি? ভোরের স্বপ্নের কি-ফল? বাবাকে খোলাখুলি সব বলতে পারলে পাঁজির দিনক্ষণ গ্রহ-নক্ষত্র দেখে বাবা হয়তো স্বপ্নের একটা শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা সামনে তুলে ধরবে। কিন্তু বাবাকে বলার মতো স্বপ্ন নয় এটা। প্রতিহিংসায় ঝিকিয়ে আছে ভিতর-বার এ সোমা নিজেও অস্বীকার করে কিন্তু এই পৃথিবীতে কেবল একটা মায়া মমতা ভালবাসা দেখতেই চায় সে। কিন্তু তা বলে এমন কিছু করতে চায় না যার ফলে নিজেই আবার নতুন কোনো বিপাকের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে। তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ছেলেটা তাহলে ভেসেই যাবে।

হাত বাড়িয়ে ছেলেকে নিজের শুকনো জায়গায় টেনে নিয়ে এলো। ওর পরনের প্যান্টটা [redacted] বাইরে ছড়ে ফলে [redacted] মুখটা দেখল একবার। [redacted] সোমা হেসেই ফেলত। এই টানা হেঁচড়ার ফলে পাজীটার চোখের হিসীমানায় ঘুম নেই আর—আবার সাগারাগি করার ভয় প্রাণপণে চোখ মুখে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। কিন্তু আজ হাসির বদলে থমথমে মুখ সোমার। আবার দমা করিয়ে দিতে ইচ্ছে করল তার। সঙ্গে দোষ যারে ভোলায় এটুকু ছেলেও এরই মধ্যে ভন করতে শিখেছে। মিহোদ মধ্যেও আঁটতে শিখেছে। এই একটা ছিপ্টে মাথার রোগের [redacted] ছেলে ওই ছোট্ট শরীরে [redacted] ইপলিয়া ফেলে [redacted] পর এক চুমুকে [redacted] কোনো [redacted] পেলে সোমা পাগলামি [redacted] করতে শোবার।

মুখ হাত ধুয়ে গিয়ে একেবারে স্নান সেরে নিজে কাপড় [redacted] ছেলে বাথরুম থেকে বেরোলো। বাথরুম [redacted] ঢাব [redacted] একটা-খানি। ওখানে কাপড় [redacted] ভুলে [redacted] কাপড় [redacted] ভেজে। [redacted] মতো [redacted] ফোয়ার ফোস [redacted] খানিকটা [redacted] ভ্রাশ- [redacted]। [redacted] [redacted] [redacted]

এখন আর হয় না। হয় না কারণ পুরুষ মানুষের বাসনার নিষ্ঠুর দৃষ্টিটা তার চেনা হয়ে গেছে। হাতের সম্বল হাতে থাকা ভালো। এই দিয়ে জীবন সে আর খুব বেশি দিন বরদাস্ত করবে না সেটা একরকম ঠিকই করে ফেলেছে।

হাতের আধখানা চিরুনি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুল আটকানো বাকি আধখানা নিয়ে কাজ করতে লাগল সিঁদুরশূন্য ফাঁকা কপাল একটু বেশি চওড়া দেখায় আর সিঁথিটাও কেমন ধবধবে সাদাটে মনে হয়। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত বেশ যত্ন করে সিঁদুরের টিপ পরত একটু মোটা করে সিঁথিতে বাড়াতো। আসলে তাতে নিজের কাছে নিজেকে একটু বেশি সুন্দর লাগত। কিন্তু ওকজনের স্নেহ আশীর্বাদও নির্মূল করার তাড়নায় সিঁদুর বাতিল করেছে। যে মেয়ে এতটা পারে সে-যে অনেকটাই পারে সেটা একজনকে খুব ভালো করে বোঝাতে পেরেছে। কপাল আর সিঁথি সাদা দেখে স্কুলের এয়ো সহ-শিক্ষয়িত্রীদের এখনো চোখ কটকট করে। আড়ালে আবডালে কত সময় কত কথা বলে তারা সোমা তাও ঠিক বুঝতে পারে। তাছাড়া চুপিচুপি নমিতাদিও সতীধর্মের টিকাটিপ্পনীর কথা ওর কানে তুলে যায়। নমিতাদিকে কোনো টিচার দুচক্ষে দেখতে পারে না। যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব তার। বয়সে বছর খানেকের বড় হবে সোমার থেকে। বলতে গেলে প্রায় একই দশা দুজনের। দশ বছর হয়ে গেল নমিতাদিরও স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তার স্বামীটা লম্পট এক নম্বরের। সিনেমার কাজে ঘোরে পাঁচ রকমের মেয়ে নিয়ে কারবার তার—নমিতাদিকে মনে ধরবে কেন।

...কিন্তু নমিতাদি সিঁথির আর কপালের সিঁদুর মোছেনি। তার সহজ কারণও সোমা অনুমান করতে পারে। ওটুকু না থাকলে দেখতে আরো বিচ্ছিরি হবে। তাছাড়া জীবনে কোনো পুরুষ মানুষ আসেনি এও হলফ করে নমিতাদি কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। কিন্তু সোমা সিঁদুর মুছে ফেলতে ওই নমিতাদিই মনে মনে সব থেকে খুশী সেটুকু আঁচ করার মতো বুদ্ধি সোমার আছে। কারণ যে একজনকে সে জীবন থেকে বাতিল করেছে সেই একজনকে নমিতাদির ভালো ভালো বেশ পছন্দ। পছন্দের মাত্রা ইদানীং বেড়েই চলেছে মনে হয়। সোমা কিছুই না জানা না বোঝার ভান করে থাকে। আর ওই লোকের বিরুদ্ধে নমিতাদিকে একটি কথাও বলে না। মজুক, মজুক, খুব ভালো করে মজুক—আর তারপর কতবড় অপদার্থ মানুষের খপ্পরে পড়েছে জেনে ওর মতোই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক।

অত চুলের গোছা আধখানা চিরুনি দিয়ে বলে আনার চেষ্টায় ওরও শরীরের ওপরের আধখানা পিছন দিকে বেঁকে যাচ্ছে। হঠাৎ সেন নিজের দিকেই চোখ গেল সোমার। সুন্দরই লাগছে। বুকের একদিকের কাপড় সরে সরে যাচ্ছে। তার ফাঁকে ফাঁকে ব্লাউসের ওপর দিয়ে নিটোল যে বস্তুটি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সে-দিকে চোখ পড়তেই একটা তিক্ত স্মৃতি মনে ভেসে এলো। .....কিন্তু সেদিনের সেই স্মৃতি আর যা-ই হোক তিক্ত ছিল না মোটেই। সর্বাঙ্গে বয়ে একটা অনভূত কাঁপুনির নেশা জেগে-ছিল। আর আগে আয়নায় নিজেকে একটু ভালো করেও যে তাপটুকু অনুভব করেছে তাতে শুধু রোমাঞ্চ ছিল আর কোনরকম জ্বলুনি ছিল না।

.....সামনে তখন এই ড্রেসিং টেবিল ছিল না, ওই দেয়ালে তখন মকবুল সাইজের আয়না ঝুলত একটা। সে-দিন এক সরস্বতী পুজোর দিন। খুব ভোরে স্নান সেরে পরনের শাড়িটা শুধু গায়ে জড়িয়ে মাথা আঁচড়ে নিচ্ছিল সোমা। সোমা পালটুলি নয় তখন, সোমা হালদার। মাথা আঁচড়ে দিঘির আসার আগেই পুকুরের সাজ-টাজ সেরে রাখার ইচ্ছে।

...সেদিনও কেন যেন আধখানা চিরুনি ছিল হাতে। মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে শরীরের ওপরের দিকটা এই রকমই বেঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিন ছিল আদুড় গায়ে শাড়ির আঁচল জড়ানো। সেই আঁচল সরে যেতে একদিকের যে বস্তুটি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল সোমা নিজেই সেদিকের লোভীর মতো তাকাচ্ছিল আর মিটিমিটি হাসছিল। কারো এসে পড়ার ভয় নেই এই সকালে, পাড়ার আর ঘরের দু-দুটো পুজো সারতে হবে বলে বাবা সেদিন সরকারদের বড় পুকুরে চান করতে গেছে। তাছাড়া পিছনের দরজা দুটোও ভেজানো।

নিজের দিকে চেয়ে বেশ মজাই লাগছিল সোমার। হাসি-হাসি মুখে আরো বেশি বেঁকে-চুরে পিছনের চুলের বোঝা পাট করছিল—হাসি-মাখা চোখ দুটো নিজের বুকের ওপর।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের ফলে অস্ফুট একটা আর্তনাদই বেরিয়ে এসেছিল নিজের গলা দিয়ে। কিন্তু বিপদের যেটুকু ঘটার তার আগেই ঘটে গেছিল। তখনো সিঁদুরশূন্য দুই হাত মাথার পিছনে, শাড়ির আঁচলশূন্য বুক। আয়নায় চোখ পড়তে সেই প্রথমবারেই বিদ্ধ কয়েক মুহূর্ত। সে দেখছে কি দেখছে না তাও বুঝছে না যেন। ...আয়নায় দেখছে পিছনের ভেজানো দরজা খানিক ফাঁক, আর সেই ফাঁক দিয়ে একখানা আধাবিবস্ত্র মুখ।

চোখে চোখাচোখি, তারপরেই হাতের সিঁদুর ছুঁড়ে ফেলে সোমা পড়িমরি করে ঘরের অন্য কোণে আড়াল নিয়েছে। বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি। শাড়ির আঁচলটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েও বে-আব্রু লাগছে নিজেকে। সমস্ত মুখ টকটকে লাল।

বাইরে থেকে একটা আবেদন কানে এসেছে, ভিতরে আসব?

—না না না! বিশেহারার মতো ছুটে গিয়ে একটা ব্লাউজ টেনে নিয়ে কিনারার ঠিকঠাক পিছন দাঁড়িয়ে চোখের পলকে পরে নিয়েছে। তখনো কাঁপুনি যায়নি, আর তখনো চট করে এসে দরজা খোলা যায়নি।

একটু বাদে দরজা খুলে চোখে এক কাঁড়ি গাঁদা ফুল হাতে লোকটা সামনে

প্রকাশিত বই

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাঙলার কীট পতঙ্গ ২০৲

কমল চৌধুরী

সায়গনের নরকে ১২৲

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ ২০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমের চোখে পরাশর ৭৲

আশা প্রকাশনী

৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা-১২

দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, ওই মূর্তি দেখেই মুহূর্তের জন্যে ভেবে উঠতে পেরেছিল বটে সোমা।—এত সকালে আপনার ফুল নিয়ে আসার কি দরকার পড়েছিল—আর এনেছেনই যদি ডাকা না ডেকে বাইরে থেকে ডাকেন নি কেন?

মুখের দিকে চেয়েই লোকটা যেন কেন এক অস্বস্তির ঘর্ডাই থেকে উঠে এসেছিল। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, আমার কপাল মন্দ, সাধ করে কে আর এমন বিপদ ডেকে আনে।

জবাব শুনে ভেবাচাকা খেয়ে গেছল সোমা। তখনো ছোটটি নয় একটুও। বি-এ পাস করে উঠেছে। বয়েস তেইশ গড়িয়ে চব্বিশে ঠেকেছে। কিন্তু এই জবাবের কোনো তাৎপর্য বোঝা গেল না। মুখভাব সত্যিই বিপন্ন লোকের দেখছে।

কিন্তু সোমার মুখ লাল তখনো। হাত বাড়িয়ে ফুলের কুপাড় হাতে নিয়ে হনহন করে পুজোর ঘরে চলে গেছে। সোমার পুজোর অঞ্জলি যা হয়েছে সেদিন সে-ই জানে। দিদিরা পর্যন্ত ওকে লক্ষ্য করে বলেছে, কি রে, তোর মুখ অত লাল-লাল কেন—সকালে চান করে আবার জ্বরজ্বালা ডেকে আনিস নি তো!

সোমা তাদের চোখ বাঁচিয়ে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছে—কারণ ওই লোকের সঙ্গেই যোগসূত্রের এই উদ্বেগ। বাবা তাকে ডেকে কাছে বসিয়ে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে রেখেছে—সে নড়চড় হবে কেন? কিন্তু আড়চোখে সোমা যতবার লক্ষ্য করেছে ওই মানুষকে ততোবারই যেন একটু উদাস ভাব চোখে পড়েছে। পেটে পেটে যে বেশ দুষ্টুবুদ্ধি তখন কি তা বুঝেছে! অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই ওই লোকের হাবভাব থেকে তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে আসছিল সোমার কাছে। স্বাভাবিক বাবার এত বড় ভক্ত আর সমঝদার হওয়াটার কারণ বাবা থেকেও ঢের আগে সোমা বুঝেছিল। বাবার কোনো কাজে লাগা বা তার কোনো উপকারে আসার জন্যে সর্বদা কেন এক পায়ে প্রস্তুত। আর বাড়িয়ে তখন ওই লোকের এত প্রশংসা যে সোমার সহ্যও লাগত ভালও লাগত। আরো বেশি ভালো লাগত এই কারণে যে লোকটার দুর্বলতার আঁচ একমাত্র সেই পেত। জ্যোতিষবিদ্যার আর হাত বিচারের ফলে বাবা চব্বিশ পেরুনোর আগে সোমার বিয়ে দেবে না ঘোষণা করে রেখেছিল। সেই চব্বিশে পা দিয়েছে তখন। এ বছরটা পেরুলে সোমা যে কোথায় কোন্ ঘরে পড়বে সে-দুশ্চিন্তা ভিতরে ভিতরে ছিলই। কারণ প্রথম তিন মেয়ে বিয়ে দিতেই বাবার সামান্য পুঁজি একেবারে ফাঁকা। আয়ও দিনকে দিন কমছিল বই বাড়ছিল না। তখন মাঝখানে পড়ে ওই লোক, অর্থাৎ ওই অরবিন্দ গাঙ্গুলিই বাবার মনে আর একদফা ভাগ্যের জোয়ারের আশ্বাস এনে দিয়েছিল। তখন কি তাই একবারও ভাবতে পেরেছে সোমা? বাবাই বড় রকমের একখানা টোপ ফেলে বসে আছে: সেই টোপ অরবিন্দ গাঙ্গুলিও গিলেছে, সোমাও গিলেছে।

...সেই সরস্বতী পুজোর দিনে খেতে বসার দৃশ্যটাও ভোলবার নয়। প্রথমে পর পর তিন জমাইবাবু খেতে বসেছিল, তাদের পাশে বাবা, তার পাশে অরবিন্দ গাঙ্গুলি। উল্টো দিকে দিদিদের ছেলেমেয়েরা। পরিবেশন [illegible] করছিল বেশির ভাগ দিদিরা সাহায্য করছিল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি [illegible] না, খুবই নাড়াচাড়া করছিল আর মুখখানা বেজার করে বসেছিল। দিদিদের আসল চোখ তাদের বরের আর ছেলেমেয়েদের দিকে—লোকটার সেই বাতিক্রম শুধু সোমাই লক্ষ্য করছিল। ওদিকে বাবা তো কোনদিকে খেয়াল না করে বকর বকর করেই চলেছে। মাঝে মাঝে অকারণে রেগে উঠতে চেষ্টা করছিল সোমা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি কেন এক কৌতুকের করুণা বইছে তার। আড়ে আড়ে ওই মানুষকে বার বার লক্ষ্য করছিল, অরবিন্দ গাঙ্গুলিকে। তারপর সকলকে শুনিয়ে হঠাৎ মুখ ফসকে দিয়ে বলে উঠেছিল, কি হল আপনার কিছুই খাচ্ছেন না যে?

সকলের চোখ তার থালার দিকে গেছে। সত্য হালদার বলেছেন, সত্যিই তো কিছু খাচ্ছ না দেখি—কি হয়েছে?

বিমর্ষবদন অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছিল, কি জানি—

শুনে সকলেই অবাক। সত্য হালদার জিজ্ঞাসা করলেন খাওয়ার মধ্যে মরার কি লাভ কি!

—না, মানে বলছিলাম কদিনের জন্যেই বা—

নিজের থালা ফেলে সত্য হালদার ঘুরেই বসেছিলেন তার দিকে। বলেছেন, খেতে বসেও মুখ এত শুকনো কি ব্যাপার? কদিনের জন্যে মানে কি?

জবাব শুনে ধাঁধা ছেয়ে ভেবেছিল সোমা সেদিন। মুখখানা আরো বিমর্ষ করে বলেছিল, ইয়ে ভাবছিলাম কদিনের জন্যেই এ-সব আনন্দ আর খাওয়া দাওয়া—এ-রকম আর ভবিষ্যৎ.....

দু চোখ বড় বড় করে বাবা লক্ষ্য করেছে তাকে।—কে কি বলেছে তোমাকে—কি-রকম ভবিষ্যৎ?

—আত্মহত্যা-টত্যা.....

এক সোমা ছাড়া আর সকলেই বেজায় চমকে উঠেছিল। ভুরু কুঁচকে বাবা তার মুখের দিকে চেয়েছিল খানিক। মাত্র পাঁচ-সাত দিন আগেও বাবা যে নিশ্চিন্ত মনে ঠিকুজি দেখেছে তার সোমা জানে না। তার মুখ টকটকে লাল। আত্মহত্যার বিধিলিপির অর্থ একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

সত্য হালদার আদেশ করলেন, বাটিতে ওই ডান হাতটা ধুয়ে সামনে ধরো তো—

নির্লজ্জ বেহায়া তাই করল।

হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী বাবার পেশা আর জ্যোতিষী নেশা। এই পেশা আর নেশায় বহুবার একাধারে হতে দেখেছে মেয়েরা। পেশার দৌলতে রোজগার না হলে অনেক সময় নেশার দৌলতে হয়

সত্য হালদার ঝুঁকে করলেখা দেখতে লাগলেন। তারপর আধা গর্জন করে উঠলেন, কোন আহাম্মক এ-কথা বলেছে তোমাকে, অ্যাঁ? আয়ু রেখা বৃহস্পতির মাথায় উঠে বসে আছে, শুকতারার চাঁদের ক্ষেত্র ডিবির মতো উঁচিয়ে আছে—আত্মহত্যা-টত্যার কথা কোন উল্লুকে বলেছে তোমাকে? তাছাড়া এই সেদিন না ঠিকুজি দেখে সামনের তিরিশ বছরের ভবিষ্যৎ বলে দিলাম তোমার। কিছু কিছু ঝামেলা অবশ্যই আছে, কিন্তু এরকম কোনো কথা তোমাকে আমি বলেছি?

মুখখানা একটু তাজা করে তুলতে চেষ্টা করে অরবিন্দ গাঙ্গুলি আশ্বাস ভিক্ষা করেছে যেন। —আত্মহত্যার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে?

সম্ভাবনাটা বাতিল করার তাগিদে সত্য হালদার বলে উঠলেন, না—নেই ইচ্ছে করলে তুমি হত্যা করতে পারো—আত্মহত্যা-টত্যা নয়! যে বলেছে সে একটা ইডিয়েট আর তুমিও একটা ইডিয়েট—নাও, খাও এখন বসে!

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই বেহায়া সোমার দিকে ফিরেছে।—আর এক টুকরো ইলিশ মাছ দেবে?

সোমা এরকম ছুটেই পালিয়েছে সেখান থেকে। ইলিশ মাছ দিদিদের একজনের হাত দিয়ে পাঠিয়েছে, ওর সেই আরক্ত মুখ দিদিদের গবেষণার বস্তু হয়ে উঠেছিল।

...সোমার হাতে তখনো ভাজা চিংড়ি। আয়নার দিকেই চেয়ে আছে।...তারপরেও সেই লোকের জুলুম কত না দুর্বার অথচ লোভনীয় মনে হয়েছে। সে-কথা মনে হলে এখন যত ঘেন্না তত্তো জ্বালা।...বিয়ের পরে পরেই কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে ক্যামেরা ধার করে নিয়ে এসেছিল একটা। ছোট্ট করে ওমনি আদুড় গায়ে চিংড়ি হাতে এই আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে ওকে—মাথা আঁচড়ানোর ঢঙে বেঁকে-চুরে দাঁড়াতেই হয়েছে। আর পিছন থেকে ফটাফট ক্যামেরা চালিয়েছে সে। পিছন থেকে হলে কি হবে আয়নায় তো সামনেটাও পাচ্ছে। কি বিচ্ছিরি কি বিচ্ছিরি—সেই সব ছবি দেখে সোমা লজ্জায় বাঁচে না।

তখন লজ্জা। এখন শুধু ঘেন্না। শুধু রাগ।

হঠাৎই বিষম ধাক্কা আবার একটা। পিছনের দরজা দুটো খোলাই ছিল। আর সোমার গায়েও ব্লাউজ ছিল আজ। আয়নার ভিতর দিয়ে দরজার ওধারে যে বিহ্বল মূর্তি চোখে পড়ল সেটা অপ্রত্যাশিত। সোমা সম্পূর্ণই বিমনা হয়ে পড়েছিল আর নিজেকে ভুলেছিল। দরজাটা সোজা পিছনে নয়, একটু আড়াআড়ি। ঘাড়টা খানিক বাঁয়ে ঘোরালে তবে চোখে পড়ে। আয়নার ভিতর দিয়ে হঠাৎ চোখোচোখি। না, আজ

সোমা চমকে পেছনে ঘুরে ধাক্কা খেয়ে আয়নার ভিতর দিয়েই থমকে তাকিয়েছে।

বরুণ চক্রবর্তী।

...এই মুহূর্তে এসে দাঁড়াল মনে হয় না। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা হবে। চোখাচোখি হবার পরেও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

হঠাৎ চমক ভাঙতে বিশেষভাবে মুখে যে মধ্যে পেটা বন্ধক বসন্তের দাগ। হাসি-হাসি করে কিছু একটা বলতে চাইল, কৈফিয়ত দিতে চাইল বোধ হয়। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। বশকে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে বাবার দপ্তরের দিকে ছুটল আবার।

পায়ে পায়ে সোমা সোফাগোড়ায় এসে দাঁড়াল না বাবার ঘরেও ঢোকে নি বাইরে দাঁড়িয়ে বাবাকে কিছু একটা বলে পালাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। সেই সঙ্গে এদিকেও ঘাড় ফিরিয়েছে।

আবার চোখেচোখি।

সোমা চক্ষু কপালে তুলে তাকালো। তার পর একটা আঙুল তুলে বাবার ঘরটা দেখিয়ে দিল।

বরুণ চক্রবর্তীর পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেছল। আদেশ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সড়সড়ে কন্যা হালদারের দপ্তরে ঢুকে গেল।

হাঁটুর চামড়ার জল চড়িয়ে সোমা আবার এসে ঘরে ঢুকল। ঠোঁটের কাঁকে সামান্য একটু হাসি ঝুলছে। ভোর রাত থেকে একটা অস্বস্তিকর অশান্তির মতো বুকের ওপর চেপে বসেছিল। একটুখানি খুশির ছোঁয়ায় সেটা হালকা হল।

মশারি সরিয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে টেনে তুলল। দ্বিতীয় দফার জরী ঘুম ভেঙে সে উঠতে নারাজ। তাছাড়া সকাল সোয়া ছটা তখন। কিন্তু ছেড়ে দিলে আটটা নটা পর্যন্তও ঘুমোতে পারে। এটা মনে হওয়া মাত্র ভিতরটা টক হয়ে উঠল আবার এক ধক্কা।...আর একজনেরও এই স্বভাব রাতে চোখের তারার জোনাকি জ্বলে সকালে বিছানা ছাড়ার নাম নেই। হাত পা ছুঁড়ে ছেলে আবার শোবার উপক্রম করতে মৃদু কাঁধ ধরে বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে শোয়ার চেষ্টা সিকেয় তুলে দিল। —ওঠ দিগগীর, নয়তো গায়ে জল ঢেলে তোর ঘুম যায় করছি আমি।...দাদুর বাইরের ঘরে বড়পেকাকা বসে আছে দেখগে যা?

শেষের সংবাদে ছেলের আলস্য গেল। তার বিবেচনায় কিঞ্চনসোমে একমাত্র ধরাক্ত দাতা হল গিয়ে বড়পেকাকা। যখনই আসে, হাতে ওর জন্যে কিছু না কিছু থাকেই। তড়াক করে খাট থেকে নেমে ছুটতে গেল। কিন্তু তার আগেই মায়ের শক্ত হাতে তার একখানা বাহু আটকা পড়ে গেল।

জল হতেও আঙুল তুলে গম্ভীর শাসনের সুরে বাথরুমের দিকটা দেখিয়ে দিল। —আগে ওই দিকে। এক কথা কত বার বলতে হবে তোকে?

প্রকাশিত হল
ভারবি পঞ্চাশ সাহিত্য

বাল্মীকি-রামায়ণ

পূর্ণাঙ্গ গদ্য : পাঁচিশ টাকা

পণ্ডিত সুমঙ্গল ভট্টাচার্য-কৃত বহু সমাদৃত সর্বশেষ বঙ্গানুবাদখানি দীর্ঘদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর এই নতুন সংস্করণে শ্রদ্ধেয় মূলের সৌকর্যসহ প্রকাশিত হল। পঞ্চাশৎ পালটী শ্রীসুনীলমাধব সেনের আঁকা বহু অপ্রকাশিত চিত্র-সম্বলিত এই নতুন সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। নতুন গ্রাহক হবার সুযোগ আরো কিছুদিন বাড়ানো হয়েছে। গ্রাহকদের জন্য পাঁচটি খণ্ড কুড়ি টাকা।

উপন্যাস ও গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
চলে নীল শাড়ি ১০-০০
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ৪-৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
পক্ষপাতার দিন ৪-৫০
প্রতিভা বসুর
আলো, আমার আলো ৯-০০
প্রণয়ীর সংখ্যা পাঁচ ৩-৫০
অমিয়ভূষণ মজুমদারের
নয়নতারা ৮-০০
দীপক চৌধুরীর
নেশা ৫-০০
সমরেশ বসুর
পাপ-পুণ্য ৩-৫০

প্রবন্ধ ও আলোচনা

বুদ্ধদেব বসুর
কবি রবীন্দ্রনাথ ৫-০০
বিষ্ণু দে-র
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৭-০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
কবি জীবনানন্দ দাশ ৭-০০
সুধীরঞ্জন খাস্তগীরের
বিজ্ঞানের স্বরূপ ৬-০০
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের
স্মৃতিরঙ্গ ৩-৫০
গোপীমোহন সিংহরায়ের
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী ১৮-০০
(প্রথম খণ্ড : উপন্যাস)

সেরা কবিতা সংকলন

অমিয় চক্রবর্তী ৮-০০ ॥ জীবনানন্দ দাশ ৭-৫০ ॥ মোহিতলাল। প্রেমেন্দ্র মিত্র। অজিত দত্ত প্রতি খণ্ড ৭-০০ ॥ দিনেশ দাস। অরুণ মিত্র। মণীন্দ্র রায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অরুণকুমার সরকার। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রাম বসু। শঙ্খ ঘোষ। আলোক সরকার। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতি খণ্ড ৬-০০ ॥

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির ৪-০০। অমিয় চক্রবর্তীর হারানো অর্কিড ৩-৫০। বুদ্ধদেব বসুর মরচে-পড়া পেরেকের পাপ ৩-৫০। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাল মধুমাস ৩-৫০। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সোনার মাছি খুন করেছি ৩-০০। অন্নদাশঙ্কর রায়ের হেরফের ৩-৫০। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বিষকন্যার বিষ ৩-০০। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কেবল দেখেছি ৩-০০। সুনীল বসুর ফুটপাথ (ছোটদের কবিতা/কবিতা) মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিমালয় অভিযান ভূগোল ৩-৫০।

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা ১২। ফোন ৩৪৬১৬৭

তাড়া খেয়ে ছেলে সেই দিকেই চলল। এই মায়ের জন্য যেন যন্ত্রণার শেষ নেই—এমনি মুখ।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে মশারি বালিশ সরিয়ে বিছানা ঝেড়েঝুড়ে ঢকা দিয়ে সোমা বেরিয়ে এলো। ঝি এসে উনুনে আঁচ দিয়েছে। নাকে ধোঁয়ার গন্ধ আসতে চোখে মুখে বিরক্তির ভাব। কত দিন ধরে ভাবছে বাড়িতে গ্যাস আনবে। কিন্তু শুরুতেই চার পাঁচশ টাকা খরচ—এ জন্মে আর হবে না বোধহয়। কিন্তু সংসার সংসার না হওয়ার চিন্তাটাও বাতিল। সব হবে—আর এ জন্মেই হবে। সোমার মন স্থির হয়ে এসেছে প্রায়—কোন কিছু না হওয়ার সংসার তার আপোস নেই।

চা করল। ঘি-চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে চটপট তিন বাটিতে সাজালো। তারপর কিছে বাইরের ঘরে সব নিয়ে যেতে বলে নিজে সেদিকে পা বাড়াল।

—টাকা পয়সার দিক থেকে তোমার এখন সময়টা ভালো, বুঝলে!...কর্মপতি ভাগ্যপতির জুটিতে একাদশ রাহু...রূপ-রূপ অনেক টাকা পাবে।

ঘরে ঢোকার আগে কথার গন্ধনা কানে আসতে সোমা দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে গেল একটু। তোতার নরম গলাও কানে এলো। —রাহু-টাহু শুনলে তো ভয় করে...

—আরে না না ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। একাদশের রাহু—চন্দ্র-সূর্য যিথুনে বসে থাকে দেখো না!

চা জলখাবার নিয়ে ঝি আসছে। সোমা ভিতরে ঢুকে গেল। টিপ্পনী কেটে বলতে ইচ্ছে করল চন্দ্রসূর্য মিথুনে কি লাভ, পেটে তো যায় না, তার আগেই কাটা-পলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। বলল না এ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চুরি-ধরা-পড়া মুখ লোকটার। সে পাশের বেঞ্চিতে বসে আর সানু অর্থাৎ ছেলে সঞ্জন তার কোলে শুয়ে একটা রঙিন ছবির বই দেখছে।

মাথা একটু নুইয়ে চশমা আর কপালের ফাঁক দিয়ে মেয়ের মুখখানা একবার ভাল করে দেখে নিলেন সত্য হালদার। মেজাজের সঠিক হদিস পেলেন না বোধহয়। বললেন কি রে, আজ চা-টা দিবি না—

জবাব দেওয়ার দরকার হল না। সব নিয়ে ঝি ঘুরে ঢুকেছে।

সাড়া পেয়ে ছবির বই হাতে সানু তড়াক করে উঠে বসল। খুশি-ভরা মুখ। মা বলেছে আমার জন্য ছবির বই এনেছে তার তোমার জন্য একরাশ মাছ—ফাস্‌কেলাস!

নাতির ফাস কেলাস-এর উচ্ছ্বাস দেখে সত্য হালদার হাসতে লাগলেন। কিন্তু তার মেয়ের কপালে ভ্রূকুটি দেখে রঙ্গন চক্রবর্তীর হাসির চেষ্টাটুকুও বাধ যেন। মুড়ির বাটি সমেত চায়ের ট্রে সামনের টেবিলে নামিয়ে দিয়ে কি চলে যেতে সোমার দু চোখ বাবার চেয়ারের পাশে রাখা ব্যাগটার ওপর গিয়ে পড়ল। ছেলে এই ফাঁকে একটা মুড়ির বাটির ওপর হাত নিয়েছে। সত্য হালদারও একটা টেনে নিলেন। তৃতীয় বাটি রঙ্গন, চক্রবর্তীর সামনে ধরে সোমা রুক্ষ স্বরেই বলল, রোজ রোজ এত মাছ আনার তো দরকার পড়েছে—এদিকে কি দিনে পয়সার পাওয়া যাচ্ছে না?

রঙ্গনের কারণ আর কিছু কিনা বলা চক্রবর্তী নিঃসংশয় নয়। মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে জোর করেই হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিল, আমার তো পয়সা সত্যিই লাগে না—লাভ থেকে কাটান যায়।

—লাভ থেকে কাটান গেলে সেটা লোকসান নয়—কেমন? মেজাজ কেন যে সত্যিই তেতে উঠল সোমা নিজেও জানে না—কেন আপনি রোজ রোজ এত আনবেন—স্কুল মাস্টারি ছেলে-পড়ানো—আমারই বা এত বেশী বেশী করার সময় কোথায়?

গেল সপ্তাহে দু দিন মাছ এনেছিল এ-সপ্তাহে এই শুরু, তার মানে রোজ আনা নয় এটা বলা যেতে পারত। কিন্তু মুড়ির বাটি হাতে খাবি খেতে খেতে রঙ্গন চক্রবর্তী নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা দেখল। বলল, ইয়ে—সুবিধে পেলে উনি আনতে বলেছিলেন—তাই—

উনি অর্থাৎ বাবা। সোমা রুষ্ট নেত্রে তার দিকে ফিরল। বাবার এই স্বভাব জানা আছে। যেখানে সুবিধে সেখানে সেই রকম চলে বসে। মুড়ি চিবুতে চিবুতে কিঞ্চিৎ মুখ করে সত্য হালদার বললেন সামান্য ব্যাপারে তুই এত মেজাজ দেখাস কেন আজকাল হাটা সুবিধে হলে মাঝে মধ্যে আমিই তো আনতে বলে দিয়েছি—ও এই রকম করে ওকে বলব না তো কাকে বলব।

—কেন বলবে? সোমার ঝাঁঝালো প্রশ্ন কিনে পয়সায় আমাদের এত মাছ খাওয়ানোর কি দায় পড়েছে ওর?

মেজের অনুযোগনায় সত্য হালদারও তেতে উঠছেন। —দায় আবার কি ও আমাদের পর ভাবে না আমরা ওকে পর ভাবি—আপনার লোকের জন্য এরকম অনেকেই অনেক করে থাকে। এই যে সকালে উঠেই ঠিকুজি দেখে ওর পিসিকে বাসো ধরার কথা বলে দিলাম আর তার জন্য ওষুধও দেব বলেছি—সেই সঙ্গে থেকে থেকে টাকা পাবে জানিয়েছি—এসবের জন্যে আমি ওর কাছ থেকে কোন রকম কী আদায় করছি! নে—চা চাল—এবেলা না পারিস তো সাতলে রেখে দে ওবেলা হবেখন।

দু পেয়ালা চা ঢেলে সোমা পট আর নিজের পেয়ালা নিয়ে ভিতরে চলে এলো। মাথা কেন যে এত অল্পতে গরম হয়ে যায় আজকাল ভেবে পায় না। কেবল মনে হয় কেউ সোজা হাঁপছাড়া চলছে না ভিতরে ভিতরে সকলেই যেন এক-একখানা জটিলতার স্তূপ।

রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া সরেনি এখনো। বাইরের দাওয়ায় সোমা নিজের চা নিয়ে বসল। বিটা বাসি ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। তাদের কাজ শেষ হলে সেও এক গেলাস চা নিয়ে বসবে আর ইনিয়ে-বিনিয়ে পাঁচটা সুখদুঃখের কথা শোনাবে ওকে।

এক হাতে মাছের থলে অন্য হাতে মুড়ির বাটি নিয়ে সানু মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মাছ খেতে তার ভালো লাগে মা যে কেন রাগ করল বুঝতে আসে না। অনেকটা মাছ জিনিসটা মায়েরও অপছন্দ নয়। বাপুর কথায় থলেটা নিয়ে এসেছে এও মায়ের পছন্দ হবে।

কিন্তু মা কিছুই বলল না দেখে থলেটা রান্নাঘরের দরজার সামনে রেখে সানু একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল—একেবারে কেটেকুটে টুকরো করে এনেছে তোমার খুব কষ্ট হবে না মা।

বলার পরেই বুঝল ভুল হয়ে গেল। মায়ের দু চোখ তার দিকে ঘুরল চাউনি সদয় মনে হল না। গেল বারে বড়পিসী আস্ত মাছ আনার দরুন মা তাকে গজগজ করে কি বলেছিল মনে হতে এই আশ্বাস দিতে গেছল।

—খাওয়া হয়েছে?

সানু বাড় কাত করল। হয়েছে।

—জল খেয়ে বই নিয়ে বোস আমি আসছি।

পিঠে আজ দুই এক ঘা পড়ার সম্ভাবনা আঁচ করে বেজার মুখে ছেলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পেয়ালাটা শেষ করে সোমা আর একটু চা ঢেলে নিতে যাচ্ছিল তার আগেই সোজা মুখ তুলে তাকালো একবার। পায়ে পায়ে বড়পিসী আসছে। চোখাচোখি হতে থমকে দাঁড়াল একটু। অপরাধী মুখ।

আসবে সোমা জানত। বলতে গেলে অপেক্ষাই করছিল। লোকটা চা না খেয়েই চলে যাচ্ছিল ভয়ে। তাতে বাধা পড়েছে যখন আর একবার না এসে পারবে না জানা কথাই। লোকটার এই মুখ দেখে হাসি পাওয়ার কথা সোমার কিন্তু হাসির সঙ্গে যেন সম্পর্ক ছুটে গেছে তার।

দ্বিধা কাটিয়ে বড়পিসী সামনে এসে দাঁড়াল। জবাবদিহি করার সুরে ফস করেই বলে ফেলল, চায়ের তাগিদ দেবার জন্য তোমার বাবাই তখন আমাকে ভিতরে পাঠিয়েছিলেন—

মানুষটা স্পষ্ট বোধ করল না জেনেও সোমা তার মুখের ওপর দু চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল তাতে কি হয়েছে?

—না ইয়ে...তুমি রেগে গেছ নিশ্চয়।

—রাগব কেন আপনি কি করেছেন?

জবাব হাতড়ে পেল না বড়পিসী। তার হাসিহাসি দশা দেখে সোমার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি এসেই গেল একটু। আর যেন সংসারটা সাদা রাখল না তাকে। বলল আপনি এত ভীতু কেন?

—ভী-ভীতু কে বলল?

—আমি। চা না খেয়ে চলে যাচ্ছিলেন কেন?

একবার চট করে জবাব দিতে পারল না বরুণ চক্রবর্তী। কিন্তু তার ভেতর থেকে একটা দাঁড়িওয়ালা বেঁটা লোক যেন বলে। হাতের কাছে একটা মোড়াটোড়া পেলে এক্ষুনি সোজা ইস্কে। নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বেঁটে-বেঁটে মাথা আঁচড়ানোর লম্বাটা তাকে যেন কাচপোকার মতো আটকে ফেলেছিল। কখন কাল ভুরুটা দেখছিল সে। এই মেয়ে অতটা খেয়াল করেনি যা পরিষ্কার কিছু ভাবেনি মনে হতে আরম্ভ করে। কাল আর একটু থাকার জোড় আবার একটা বেশার জোড়। বলল—তোমার মেজাজের ঠিক পাইনে তাই—নইলে আমাকে ভীতু কে বলে—মাস্তের ব্যাপার এই একসময় কত ঝিসক নিই জানো?

ছেলেমানুষের লম্বাই মতো কথাগুলো ভাল লাগল না সোমার। কিন্তু কিছু বলার আগে কি এসে পড়ল দাঁড়াল। শাড়ী তুলে ভিজে সেজ নিয়ে সোমা বলল—নিয়ে যা—

শট তুলে নিয়ে কি প্রস্থান করল। সোমাকে দেখাবার মতো মনে হয়ে যাবে কেবলই আবার বলল ঠিকই বলে তুমার যারা বলেছেন সামনে নাকি খুব ভালো সময় আমার—

যাবার পথনার এক শর্ত ও আর বিশেষ কথা না সোমা। এই পাগলকে ঘাঁটানো ঠিক ৫৭বছর বয়েস পর্যন্ত ওর বিয়ে হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর তারপর আর এক-একবার সপ্তর্ষিও এমনি মস্ত ডানায় ভর করেছিল। সপ্তর্ষিরা একেবারে পরনা নক্ষত্রের নক্ষত্রমণ্ডল নয়। আমার বিশ্বাস নিজের ভবিষ্যতে আমাদের যেমন যেমন তেমনি ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে তারা।

টিপনটির সুরে বলল—পিঁপড়ে খাওয়া ধরবে সেই ভালো সময়?

বিদ্রূপ করেও কিন্তু ভারি ভালো লাগল কেবলই আবার নিজ ব্যবসার ছোটোখাটো কথা বাওয়া-বাওয়ার সময়ের ঠিক নেই—এই পাগলের মেজাজ হাতেই পারে—একটা ফুন স্টোরও খুলব করতে বলেছেন উনি।

এই ঘটনাকে উপন্যাসিত মুখখানা একবার দেখে নিল সোমা। —মন স্টোন আপনি

মহান লেনিনের জন্মদিনে নবজাতকের দুঃসাহসী ঘোষণা

প্রায় অর্ধ শতাব্দী কালের গৌরবময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভারতবর্ষের বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিনিয়তই তীব্রতর রূপ নিচ্ছে। মার্কসবাদের পথেই এই আন্দোলন পরিচালিত। তাই এই আন্দোলনের যারা কর্মী যারা দরদী প্রত্যেককেই সেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবতত্ত্বের সাথে পরিচিত হতে হবে।

সেই উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এর

আশিস নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এক মহান গ্রন্থের প্রকাশ। সেই গ্রন্থ হল :

স্তালিন রচনাবলী (বাংলা ভাষায় জীবনীসহ চোদ্দ খণ্ডে সম্পূর্ণ)।

বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পাঠকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই উক্ত রচনাবলীর সাতটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অষ্টম ও নবম খণ্ড যে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি ১৯৭৫-এর মধ্যেই বাকী খণ্ডগুলিও প্রকাশিত হবে। পাঠক পাঠিকাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী কালে

মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী (ইংরাজী ও বাংলায়) দুটি ভাষাতেই

৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি। ইংরাজীতে দুটি খণ্ড ও বাংলায় একটি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বাকী খণ্ডগুলি ১৯৭৫-এর মধ্যেই প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনও গ্রাহক করা হচ্ছে ও সেই সঙ্গে প্রকাশিত খণ্ডগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের বিশেষ অনুরোধে ও তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান নায়ক মহামতি লেনিনের জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে এক দুঃসাহসিকতম পরিকল্পনা হাতে নিয়ে প্রকাশ করতে চলেছি।

লেনিন রচনাবলী

(বাংলা ভাষায় ৫০ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

গ্রাহক হবার চাঁদা ১০·০০ (দশ) টাকা। আমাদের পূর্ববর্তী রচনাবলীর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫·০০ (পাঁচ) টাকা।

১ম খণ্ড এ বছরের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হবে। যাঁরা গ্রাহক হবেন কেবল তাঁরাই প্রতি খণ্ড নির্ধারিত মূল্যের শতকরা ২৫·০০ টাকা হারে কমিশন পাবেন। আজই আপনার নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করুন।

গ্রাহক সংগ্রহকারীদের বিশেষ সুযোগ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তদনুযায়ী গ্রাহক হয়ে বই সংগ্রহ করতে পারেন, তাঁর মাশুল স্বতন্ত্র। গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই, ১৯৭৫।

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট/কলিকাতা—৭০০০১২

চেনেন? কেন ধরব কথা হয় ওটা আপনি জানেন?

—না। চাঁদের ব্যাপার-ট্যাপার হবে... তোমার বাবাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কিনে দেবেন বললেন।

এই রকমই হবে সোমা জানত যেন। বাবার পকেটে কিছু কমিশন আসবে। অকুস্থলের রাহুর কোপ উপশমের জন্য আর একজনকেও নিশ্চিত রামী গোমেদ কিনে দেওয়া হয়েছিল। সেই গণনা অবশ্য খুব একটা ভুল ভাবছে না সোমা কারণ রাহুর ধাঁটি-পাঁটি কিছু মানুষের স্বভাব একেবারে হয় না— কিন্তু সেই লোকের বেলায় সোমার নিক্ষল হয়েছে।

চাপা রাগের নিজে বলে উঠল কিছু বলার করতে হবে না—চাঁদের কোপ ধরে থাকে তো কোপ বাড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবেন খানিকক্ষণ করে। হাসি চেপে উঠে দাঁড়ান।—আমার এখন অনেক কাজ—এরপর আর কিছু করতে পারব না, আপনি রাতে এসে মাছ নিয়ে যাবেন।

ভিতরে ভিতরে বিপর্যস্ত বরুণ চক্রবর্তী সম্ভব হলে হাত ধরে আটকে রাখতে তাকে বলতে আরো খানিক থাকব—আরো একটু বলতে হবে তোমাকে। না অত সাহস নেই।

—আচ্ছা আচ্ছা। উল্টো দিকে পা বাড়িয়ে আবার কি মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়াল। কাঁচুমাচু মুখ। বসন্তের গুরু সঙ্গে নিজেও যেন ভিতরের বিড়ম্বনায় হাঁসফাঁস করছে। —রাগ না করো তো একটা কথা বলি?

মুখে হাঁ না কিছুই বলল না সোমা। কণ্ঠস্বরে তাকে বলে দিচ্ছে যা শুনবে তাতে রাগ হবেই।

না বলারও এরপর রাগ যে হবেই ওর মুখের নিরুপায়ের মতোই বরুণ চক্রবর্তী বলে ফেলল আসার সময় পথে অর্ধচন্দ্রের গুরুত্ব দেখা...কিছু টাকার দরকারে আমার ওখানেই যাচ্ছিল...

আর বলতে না দিয়ে সোমা ফুঁসে উঠল। —আপনি টাকা দেবেন?

—না না—আমার সঙ্গে টাকা ছিলই না—পরে বাড়ি গিয়ে বলল—

তেমনি তপ্ত মুখে সোমা বলে উঠল আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি এক পয়সাও দেবেন না—কিন্তু বিয়েছেন শুনলে আপনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

আগেও এক হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে শুনে এই রকমই অভিব্যক্তি দেখেছে সোমার। আর এই লোকেরই কঠিন পরুষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল না না—কিছু দিইনি দেবও না—আমি সেকথা বলছিলাম না—

এবারে নীরব জিজ্ঞাসায় সোমার মুখ চোখ তার মুখের ওপর স্থির একটু। আমতা আমতা করে বরুণ চক্রবর্তী জানাতে নিজে ইচ্ছে... মাছের অসুখ যাচ্ছে দেখে ওরা বলছিল অনেকদিন ভালো মাছ খেতে সেদিন পার্সি তো খানকতক মাছ ভাজিয়ে তোয় করে এনে রাখিস...

মুখে আবার কঠিন লালের আভা ছড়াতে লাগল সোমার। সেই লাল কানের তলা বেয়ে চোখের কোণ পর্যন্ত উঠে আসছে। বরুণ চক্রবর্তী থামতেই গেল।

সোমার গলায় স্বর চড়ল না একটুও: বলল—সেদিন যে বীণপানি সঙ্গে করে ইংরেজি ছবিটা দেখে এলাম মনে আছে?

বিমূঢ় মুখে বরুণ চক্রবর্তী মাথা নাড়ল। মনে আছে।

—কাল ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলাম পার্তির চাকার নিচে একজনকে পেষে আমি নিজেও ওই করছি—

বরুণ চক্রবর্তী আঁতকে উঠল প্রায়। কা-কাকে?

—আপনাকে নয়। আপনার ইচ্ছে হয় বাঁচা মাছ নিয়ে যান।

এই মুখ এই চোখ দেখে আর এই কথা শুনে বরুণ চক্রবর্তীর যেন ওঠার থাকল। সে প্রস্থান করে বাঁচল।

বেলা সাড়ে দশটা তখন। ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে তৈরি করে এবং নিজে খেয়ে তৈরি হয়ে সোমা বেরুবার জন্য প্রস্তুত হল। ছেলের এগারোটায় স্কুল, নিজেরও তাই। সানুকে তার স্কুলে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সাত আট মিনিট হাঁটলে তার স্কুল। ঘর বন্ধ করার আগে আয়নার সামনে দাঁড়াল একবার। ভিতরের বন্ধনা বাইরের রূপ প্রসাধনের তলায় ঠিক-ঠিক ঢাকা পড়েছে কিনা তাই দেখে নেয় হয়ত।

ঘর তালাবন্ধ করে চাবিটা আবার হাতে নিয়ে আসতে গিয়েও ভিতরে ঢুকতে পারল না। ভিতরে বচসা শুরু হয়েছে। কোনো এক বোর্ডী অথবা তার বিরুদ্ধে। বাবার গুম্ফ গলা কানে এলো। বিশ্বাস চলে গেলে থাকে তো যে চুলোয় খুশি যাও—কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

যে এসেছে তারও চড়া গলা।—পেশ হপ্তায় এক টাকা কমি আর এক টাকা ওষুধের দাম আমি গুনে দিয়ে গেছি—ওই সঙ্গে ভাবিছ তো আপনি নিজে সেধে দিয়েছেন—তুমি অবশ্য আরো আট টাকা আপনার পাওনা হয়ে গেল! ও-টাকাটা না পেলে আপনি ওষুধ দেবেন না এ কি মগের মুলুক পেয়েছেন?

—হ্যাঁ পেয়েছি মগের মুলুক, বাপবাছা করা করব, আট টাকা দিতে না পারো চার টাকা দাও, নেহাৎ অপারক হলে দু টাকা দাও—তা না করে তুমি মেজাজ দেখাতে এসেছ কেন হে? এক সপ্তাহের মধ্যে হাতে-নাতে ফল পেয়ে এখন সিংহ অবতার —কেমন? সাত দিন আগে তো চি-চি করছিলে, অবিশ্বাস করার সাহস থাকে তো চলে যাও—

বাইরে ৮ বছরের ছেলেটা উৎফুল্ল উত্তেজনায় মায়ের দিকে তাকালো।—বাবুর সঙ্গে কেমন দেখে যা, দেখে আসবে?

চোখ বুজেই সোমা ছেলেকে বলতে নিল একেবারে। তারপর চাবি তার হাতে দিয়ে বলল বাবুর ছাড়তে দিয়ে এস, এক সেকেণ্ডও দাঁড়াবি না!

ছেলের হাত ধরে হাজরা রিপোর্ট নিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল সোমা। কিছুদিন ধরে যা ভাবছে সেই সমস্যাটাই মাথায় এলো আবার। ছেলেটাকে এখানে এই পরিবেশে রাখা ভুল হচ্ছে। এখানে রেখে ওকে মানুষ করা মুশকিল ভাবছে। এ ব্যাপারে বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে একদিন। সে বলছিল, নরেন্দ্রপুরে না কোথায় ভালো আবাসিক স্কুল আছে একটা, আর তার সঙ্গে চেনা-জানাও আছে—ছেলেদের বোর্ডিংএ রেখে ভালো মাছ সে-ই সাপ্লাই করে—চেষ্টা করে দেখতে পারে।

সোমা মন স্থির করে উঠতে পারেনি। খরচেরও প্রশ্ন আছে। বি টি পাস না হওয়ার দরুন সামান্যই মাইনে পায়। ওখানে রেখে পড়াতে হলে অর্ধেক ওতেই বেরিয়ে যাবে।

তবু প্রায়ই একটা করে দিনের কথা ভাবছে বরুণ চক্রবর্তীর মারফত। মন থেকে জানে, সরাসরি আপত্তি, বছরের মাঝখানে তো অঙ্ক হবে না কিছু।

ছেলের হাত ধরে চলার গতি বাড়লো। হাতে আর মিনিট কুড়ি সময় আছে হয়তো। সোমার একটা হাত-ঘড়ির সখ, কিন্তু এ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠল না। বাড়িতে বাবার একটা অ্যালার্মের ঘড়ি আছে তাই দেখে ওঠা-বসা। এ-সব কথা মনে হলেই অসহিষ্ণুতা বাড়ে।

—এত জোরে হাঁটছ কেন...দাদুর সঙ্গে কত আস্তে আস্তে ফিরি।

তিনটের ছুটি ওদের। সে-সময় দাদু নিয়ে আসে নাতিকে। জবাব না দিয়ে সোমা তেমনি দ্রুতই চলল। আসলে ওর রাস্তায় যা-কিছু সব দেখতে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে জানে।

—বোলো হরি—হরি বো-ও-ল।

মড়ক নিয়ে আসছে কারা। সামনের দিকে চেয়ে অভ্যাসবশত সোমা কপালে একটা হাত তুলতে গিয়ে থমকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো মুখে। গায়ে আধ-ময়লা গেঞ্জি মাথাকোঁচা মারা কোমরে গামছা বাঁধা মুখে বিড়ি—খাটিয়ার সামনের একদিকে কাঁধ দিয়ে শব নিয়ে আসছে যে লোকটা—এই উৎসবে কারব সে।

অবধিহীন গুলাবালি।

ঘর থেকে সোমাকে আর ছেলেকে দেখেছে সেও।

সানু সানন্দ বিস্ময়ে বলে উঠল মা—মামা।

পাগলা মায়ের হাত ছাড়িয়ে সেদিকে ছোটে। সোমা শক্ত হাতে ধরে নিয়ে চলল তাকে। ফিরে অন্য ওদিকে তাকানোও যাচ্ছে নয়। এ-রকম পরোপকার দেখে চোখে খুন-চোখ পড়ে গেছে তার। কোন বাড়ি থেকে

দেশের সেবায় নিত্য

গাঙ্গুরাম গ্যাণ্ডসন্স

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক

কালীঘাট	ভবানীপুর	চিত্তরঞ্জন এভিন্যু
৪৬-৬১৩০	৪৭-২৩৭৭	২৩-৮৪১৮

কে যেন এখন আর সে-কোনোদিনও হয় না। সেদিন জন্মে হোক বা শবদাহের জন্য হোক চেনা আধা-চেনা যে-কোনো বাড়িতে যে কেউ ডাকলেই হল। ডাকতেও হয় না সব সময়, খবর কানে গেলেই হাজিরা দেবে যতটা সম্ভব সর্বাত্মক করতে। বাহাদুরি নেবে। সে উপস্থিত না থাকলে কোথায় কার কি কাজ পড় হচ্ছে কেউ নিজেই আর দশজনকে তার 'রিপোর্ট' শোনাবে। নিজের গুরুত্ব জাহিরের ফলে কেউ খুশী হয় না উল্টে বিরক্ত হয় সকলে। কারু জন্য টাঁচা তিনারা করে টিকা-টিপ্পনী কাটে—কিন্তু তা হলেও সকলে যাবে কোথায়। নিজেকে পাঁচজনের বড় করে দেখানোটা একটা রোগের মতো।

সোজা না তাকালেও সোমা বাঁ চোখে লক্ষ্য করছে। ...তার জায়গায় আর একজন ঘটনার কাঁধ দিচ্ছে। মুখোমুখি হতে লোকটা এদিকেই আসছে এবার। কোনরকম বেকায়দায় ইচ্ছে নেই বেরোনোর জন্যেই কমিন মুখে সোমা ফুটপাথের ওপর দিয়ে ঘেঁসে চলতে লাগল।

কিন্তু যে আসছে সে-ও নাছোড়বান্দা। ফুটপাথে উঠে সোজা মুখোমুখি পথ আগলে দাঁড়াল। হাসি-হাসি মুখ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি কদম ছাঁটে কুলিয়ে নিয়েছে। বলল আজাই বক্সর কোলাপুরে পড়ে বীথির মা-টি গেল...তোমার কাছে টাকা হবে গোটাকতক?

কত বড় নির্লজ্জ অমানুষ হলে ওর কাছেই এসে এভাবে টাকা চাইতে পারে সে-কথা সোমাই জানে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়ল। টাকা হবে না। সরলেন পা বাড়ালো অর্থাৎ লোকটাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

ছেলেটা ওমনি নিজে বুক ফুলিয়ে চওড়া করে বলে উঠল আমার কাছে চার জনা আছে। নেবে?

দিন কয়েক আগে জামা পরতে গিয়ে একটা সিকি পড়ে গেছল ব্লাউজের পকেট থেকে। সানু ছুটে গিয়ে সেটা ওপর বগল নিয়ে ছুটে। গাধু উদার হয়ে সিকিটা ছিনিয়ে দিয়েছে ওকে। স্কুলে কিছু কিনে খাওয়ার ব্যাপারে মায়ের কড়া নিষেধের ফলে সিকিটা এখনো আস্তই আছে। রোজ স্কুলে যাবার সময় দুটো পকেটে করে নিয়ে যায়, ছেলে-দের দেখায় তারপর আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

আজিবন্দ গাজুলি ছেলেই ছেলে উঠল। হাত বাড়িয়ে ছেলেকে একটু আদর বুলিয়ে দিল তারপর। ক্ষুব্ধ সোমা এক ঝটকায় টেনে ছেলেকে টেনে নিয়ে ছোঁয়া বাঁচাল। মারা ঘাটিয়ে না করলেও ছুঁতে ইচ্ছে কিনা সন্দেহ। পাশ কাটিয়ে ছেলের হাত ধরে হনহন করে চলে আসা। ছেলে ফিরে যেতে চাইছিল, একটা ঝুঁকুনির ফলে সামলে নিতে হল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ছেলেকে ইস্কুল কাটিয়ে সোমার। তার ওপর সানু আবার বলে বসল, বাবা টাকা দিল টাকা দিলে না কেন মা?

—টাকা নেই! ছেলে একটা কথা বললে ছেলেকে আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে পিটব একবার!

নিজের অপরাধ সম্বন্ধে ছেলেটা বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। কেবল এটুকু বোঝে বাবাকে মা দুচক্ষে দেখতে পারে না। তার এও শিখে জানে, মা সত্যি কথা বলল না। মায়ের ব্যাগের ওই বটুয়ায় কয়েকটা টাকা সর্বদাই থাকে। কিন্তু এর পর আর সে-কথা বলার সাহস নেই।

সোমা তখনো জ্বলতে জ্বলতে পথ চলেছে। কে বীথা আর কে তার মা যখন ছোটো কাকাই জানে। আধ মাইল দূরের ওই এটচার বাড়িতে মেয়ে আর ভটচায বাড়িগ বউ। আধবুড়ো ভটচায মশাই মাড়ি চাপা পড়ে মরে অতবড় সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। তার একটা ভাইপো নিয়ে এই লোকের অর্থাৎ অরবিন্দ গাঙ্গুলির প্রাণের বন্ধু। ভটচায মশাই মারা যাবার মাস দিনেকের আগে সেই ছেলে পুলিসের মুখ খেয়ে ঘরেছে। এই থেকেই বোঝা যায় কেন দলের সঙ্গে বোমসাজস ছিল তার। কিন্তু বীথাকে বলতে জিভে জল আসত ঘরের লোকের। ভটচাযের ওই ভাইপো বন্ধু নয় ছিল বীথার। গলদা চিংড়ি খেতে ভালো বাসে সে দুচক্ষে বিষ ছিল। সে নাকি বলে গেছল, যারা থাকল তাদের দেখিস একটু।

এই দেখার বাড়াবাড়িতে সোমা ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছিল ক্রমশ। নইলে ওই অভিশপ্ত গাড়ির ঘানরসলের জন্য তারও গোড়ায় গোড়ায় একটু দরাজ্জা ছিল না এমন নয়। দু দুটো অ্যাটেনের পর ওই ভটচায্যি বউ আর তত বড় মেয়ে বীথা ঐ বাড়িতে থাকবে। ওদিকের ঘানা মুছেছে। আর কোন মুখে?

...মেয়েটার মধ্যে কিন্তু, বরং ছিল। দেখতে শুনতে স্রোটামুটি কিন্তু বাইরের চটক ছিল কিছু। মেয়েদের বইয়ের ইলেকের স্কুল থেকে। এখন সেবার এক-ত্রিশিদ, তার আটাশ হবে। মেয়েটা কলেজের মুখ দেখেছিল কিন্তু বাপ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে-পাট চুকে গেছে। ভালো গান গাইত। এখনো ছোট মেয়েদের গান শিখিয়েই বা সামান্য রোজগার করে - শুনেছে।...সেই গানই কাল হয়ে ছিল মেয়েটার। সোমার নিজের এক বন্ধুর মাধ্যমেই সেই ঘটনা। মুটিলালের কাছে বিনা পয়সায় গান শিখতে তানপুরা নিয়ে কতদিন তাকে এই পথে যাতায়াত করতে দেখেছে।

ওর মা চলে যাবার একদিন বাদে এসে বুক চাপড়ে কেঁদে গেছিল। তার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই রাতে বাড়ি বাড়ি ফেরেনি। পরদিন সকালে কে একজন নাকি একটা চিঠি দিয়ে গেছে, তাতে মেয়ে নিখোঁজ ভবিষ্যতে চিন্তা করেই সে বাড়ি ছেড়েছে। আপাতত তার খোঁজ না করাই ভালো। সময় হলে সে-ই জানাবে।

তাই শুনে ঘরের লোকের এমন দিশে-হারা ভাব কেন তাকেই মস্ত বিপদ ঘটে গেছে-একটা। ছোটাছুটি করে যে খবর সংগ্রহ করে এসেছে তার সারমর্ম, বীথা একাই নয় তার গানের মাস্টারমশাই এক-জনেরও সন্ধান মিলছে না। সেই লোকটি সুবলাক্ষের নয়, কায়স্থ। তার বাড়ি বেনারসে।

দিন বারো চোদ্দ বাদে বীথার মা আবার একখানা চিঠি হাতে করে এ-বাড়িতেই এসে কেঁদে ভাসালো। বীথার চিঠি। বেনারস থেকে এসেছে। লিখেছে, এভাবে পালিয়ে এসে দুজনেই একটা ভুলই করেছে সে। যে লোককে বিশ্বাস করেছিল সে বিশ্বাস-ঘাতকতার পথে পা দিয়েছে আঠি বছর মায় সে বেনারসের জন্য আতুরে সরে এসেছে। এই লোক তাকে বিয়ে করবে বলেছিল। প্রায় তার বেনারসের বাড়িতে রেখে টিচারি সংগীতে তালিম অনেক দূর এগিয়ে দেবে আশ্বাস দিয়েছিল। একজন শিল্পী এতবড় হীন আর নীচ হতে পারে সে কল্পনা করেনি। যাই হোক, অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে ওখানকার এক আশ্রমে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানেও কারো কারো মতি-গতি সে ভালো দেখছে না। এই অবস্থায় পত্র-পাঠ উদ্ধারের ব্যবস্থা না করলে... ইত্যাদি—

সেই চিঠি পড়ে ঘরের লোক সোমা বা তার বাবার সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই ওই রাতেই বেনারসের গাড়ি ধরেছে। হাতে টাকা ছিল না আর সোমার কাছেও টাকা চেয়ে পায়নি সেই জন্যে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে কিভাবে টাকা সংগ্রহ হয়েছে পরে জেনেছে। বন্ধু চক্রবর্তীর কাছ থেকে। বেনারস ছুটেছে আর তিন দিনের মধ্যে বীথা ভটচাযকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর রিপোর্ট বদলে করে ফিরেছে। নিজেই সতেরবার করে বলেছে, মেয়েটার বড় রকমের কাঁসে ফাঁড়ি হয়নি, বুঝলে। চন্দ্রাবতীর ঘরে তো...ঘুরে বেঁচেছে।

শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেছে সোমার। এতবার করে চাক পিটিয়ে বলার ফলেই হয়ত দৃঢ় বিশ্বাস ফাঁড়ি না হবার হয়েই গেছে। সে অত—পথ তুলিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে সে ওই মেয়েকে ধর্ষণ করেনি। কিন্তু সব থেকে রাগ হয়েছে তার এই লোকের আত্মিশোভা দেখে। যেন নিষ্পাপ সীতা উদ্ধারের গৌরব নিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

সেই মেয়েটা মেয়ে তার পরেও দুচার-বার হাসি মুখেই এ-বাড়ি এসেছে। তার-পর সোমা বা তার ঘরের মনোভাব বুঝেই আসা বন্ধ করেছে। ও-বাড়ির সঙ্গে এত বছরের-মধ্যে আর টানের জলোচ্ছ্বাস এত আঘাতের সবটাই সোমা সরল চোখে

পেখেনি। মৃত বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষায় ভাগ্যদেবী এতটা করছে তাও ভাবেনি।

...বাবার মা মারা গেল তাইতেই মা সোমার মন খারাপ হবে কি করে। সে শেষ কারণটা উপলক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদই ঘটে গেল এই লোকের সঙ্গে—তখনো এই মর্মান্তিক অসুখের লোহাই-ই দেওয়া হয়েছিল।

ছেলের স্কুল এসে যেতে অপ্রীতিকর সেই চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে দিল সোমা। হাসি মুখে একটা গরম নিঃশ্বাসে যেন বুক নিয়ে নিজের স্কুলের দিকে পা বাড়ালো সে।

মাথার ওপর সূর্য আগুন ঢালছে। গনগনে রোদ। সোমার মুখ ঘেমে লাল। ছাতা একটা আছে, কিন্তু সেটা নিতে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা ধরে চলছিল বেয়াল নেই। পিচ গলতে শুরু করেছে। এই উত্তপ্ত মুহূর্তে হঠাৎ মনে পড়ল এই লোকগুলো সব খালি পায়ে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে। সকলে কিনা জানে না, এদের অনেকে খালি পা দেখছে। ইচ্ছে করলেই চারটে পয়সা পেতে পারত, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে লোক-দেখানো গোঁড়ামি ষোল আনা। বেলা এগারোটা বাজে, শ্মশান থেকে ফিরতে কম করে চারটে হবে। তার পরেও যে আবার খাবার সাজিয়ে বসে থাকবে। সোমার মনে হল বন্ধুর চতুর্থীর দিনে খানকতক মাছ ভেজে দিলেই হত।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা ছোটে নিজেই চেষ্টা করল। না, দরকারও নয়। ওই লোকটার এত ঢলানির পর দয়ানায়া কারো থাকতে পারে না। সোমা তার সম্ভবত একদম ভাবে। সকলের জন্যেই ভাবতে পারে।

মন যেটুকু নরম হয়েছিল স্কুলে পা দেবার এক মিনিটের মধ্যে সেটুকু গেল। ঢং-ঢং ঘন্টা বাজতে তখনো মিনিট চারেক বাকি। নীলাঞ্জনা-নীলতা বোস কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, তোমার কে মাসি-শাশুড়ী মারা গেছেন শুনলাম, তুমি আজ স্কুলে এলে কি ভাবে?

মাসি শাশুড়ী কথাটা সোমার হয়ে গেল। যত জোরে বলার সে তত জোরে বলা যায়নি।

—ও মা, আজ তোর বরেই তো মরা পালন, এমন অবস্থায় শুনলাম যে পর তোমার টাকা নেই হাতে—অরবিন্দবাবু নিজের মুখেই তো বললেন। আমার কাছে মাত্র দশটা টাকা ছিল তাই দিয়ে দিলাম—

নীলতা বোসের হাত দিয়ে দশ টাকা দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। এত বড় উপকারের এই সংবাদ সে না দিয়ে পারবে কি করে। কিন্তু শোনার পর সোমার ধৈর্যের বাঁধ খানখান। কঠিন মুখে ঘটনা খুলে দশ টাকার নোটটা বার করে তার দিকে এগিয়ে দিল, ধরো—

সাতাই নীলতা বোস হাত পেতে টাকাটা নেবে ভাবেনি। তাকে জব্দ করাই হয়তো ইচ্ছে ছিল সোমার। কিন্তু নীলতা বোস কিছুটা যেন ঘাবড়ে গিয়েই টাকাটা নিল। মুখে বলল, এ টাকা তুমি ফিরে নেবে।

চাপা ক্রুদ্ধ গলায় সোমা বলল, আমার মাসি শাশুড়ী যখন তুমিই বা দিতে গেলে কেন? একটা কথা তোমাকে বলে রাখি নীলতাদি, আমার মাসি-শাশুড়ি-ননদী কোনো শাশুড়ীই নেই—এরপর টাকা ফিরে আমাকে সে-কথা জানাতে এসো না।

ক্লাসের ঘন্টা বাজল। বিপন্ন মুখে নীলতা বোস জিজ্ঞাসা করল, কেউ মারা যায়নি বলছ?

—আছে। আমার মাসি-শাশুড়ি-ননদী কেউ মারা গেলে তোমার যেমন শাশুড়ী হত, সে-রকম কেউ।

হন হন করে সোমা নিজের ক্লাস রুমের দিকে চলল।

অবিবাহিত জীবনে যতটুকু ঘায়েল পাত্রর ছিল। সোমা তো বর মাসির মানুষ। উপ-যাচিকা হয়ে আসবে আর তার প্রতারণা সইতে পারে? ভীষণ মনুষ্য প্রকৃতির হয়েছে আবার সন্দেহও নেই কিন্তু অভিনয় নৈপুণ্যে ওকে হারানো মোটেই সুকঠিন ব্যাপার হেডস যদি টাকা নিয়ে নিত?

সোমার ক্রোধ তাই ঘটেছে একটুও কম নয় তার থেকে।

বিয়ে হয়েছিল চাঁদনের মাকামাঝি। ছেইলের মাকামাঝি বি-এ পাশ করে ঘরে বসেছিল। অল্প বয়সে মা মারা গেছেন। আঠের উনিশের মধ্যে তিন তিনির বিয়ে হয়ে গেছে। একটা সময় বাবার রোজগার বেশ ভালই ছিল মনে হয়। সে-সময় লন্ডা-বন্ডার বাজারে ওদের বুদ্ধিমতী মা বেশ কিছু টাকার সোনা কিনে চার মেয়ের নামে জমা করে রেখে গেছলেন।

তখন বাবারও দরাজ হাত ছিল বেশ। প্রথম তিন মেয়ের বিয়ে আটঘাট বেঁধে করেই দিয়েছেন সত্য হালদার। কিন্তু তৃতীয় মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই দিন পড়ে আসছিল তাঁর। নব কলোনীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাল-করা ডাক্তারও এদিকে বানা দিয়েছে। অনেক আলোপ্যাথি ডোকান বসেছে। দেখতে দেখতে এক-একটাকে জমজমাট হয়ে পাকা দালান উঠেছে। চলাচলের সুব্যবস্থা হতে হু-হু করে জমির দাম চড়েছে। বর্তমানের এই বাড়ির সঙ্গেই লাগা আরো খানিকটা জমি ছিল। সোহার বিয়ের সময় সেই বাড়তি জমি কাটা দিয়েই গেছেন সত্য হালদার।

কিন্তু নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়লে পরে এই বুদ্ধি মাথায় এসেছিল। তৃতীয় মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই দিনকাল খারাপ। বড় ডাক্তার এ-ধারে ও-ধারে আরো দুজনেক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মিসপেনসারি সাজিয়ে বসেছে। নামের পিছনে তার লম্বা টাইটেল ঝুলিয়েছে। কেউ কেউ আবার পাল্টি-কোট চড়িয়ে কদর বাড়াবার চেষ্টা করছে। বগলে ব্লাড প্রেসারের যন্ত্র নিয়ে আর গলায় স্টেথসকোপ ঝুলিয়ে রোগী দেখতে যাওয়ার ভড়ং করছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার এ-সব জিনিস লোকের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কি?

কিন্তু তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে নিতান্তই কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ছিলেন সত্য হালদার। জেদ্দিবী চাঁর জোক ছিল বরাবর। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্যে এই বিদ্যেটা প্রাণপণে টেনে আনতে চেষ্টা করেছেন। এখনো তাই করছেন। দিন যতই যাক আর সাধারণ মানুষের চোখ যতই খুলুক, কম-বেশি অন্ধবিশ্বাসটুকু প্রায় সকলেরই। এই দু সোঁকার পা দিয়ে অনেক জন্মের জোক-ডাল সামলে-সুমলে টাকে এক-রকম করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সত্য হালদার। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুটা বা উৎসাহের গরম কোপ কুমে কোপ মারার বিক্রমটা যে কমে আসছিল এও সত্যি কথাই।

এদিকে মেয়েগুলোর বড় হল। খোলা হাত। অন্তরে মন ওঠে না। এ জন্যে নারী অনেকখানি হালদার মশাই নিজেই। অকোলের বাজারে তৃতীয় মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে প্রায় কতুর হয়ে গেলেন তিনি। স্ত্রীর লাখা সোনার ভরসার গয়নাও চার ভাগের তিন ভাগই ছেড়ে দিতে হল। প্রয়োজন হালদার দিলেন, ওকে আর ঠকান না, সবটা সব তুলে দেব।

কিন্তু সে-সময় আর দেবার লক্ষণ দেখা গেল না। আকাশ বয়স বেড়েই চলেছে। তিন মেয়ের বিয়ের পর সংসার ছোট হয়েছে, কিন্তু তাও সামলে উঠতে পারছেন না। নিজের অগোচরেই ভাগ্যগণনামিশ্রিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ঝোল-চালের ঝাল বেড়ে চলেছে। এক লোক কতদিন ঠকবে, কতবার ঠকবে?

সোমার লম্বা গড়ন মোটামুটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। শাড়ি পরার ফলে বোল না পেকুতে উনিশ মনে হয়। দিদিদের তখন থেকেই ওর বিয়ে নিয়ে চিন্তা। ওর মা নেই, চিন্তা স্বাভাবিক। ওদিকে দিনকাল খারাপ, পাড়ার উঠতি মাস্তানরা আশপাশে ঘুরঘুর করে, সুযোগ সুবিধে মতো লিস-টিস দেয়। সোমার আঠেরর পা দেওয়ার আগেই বড় দুই দিদি বিয়ের তাগিদ দিয়ে বাবাকে উতাক্ত করতে লাগল।

গম্ভীর মুখে সত্য হালদার একদিন ঘোষণা করলেন, সোমার খুব ভালো বিয়ে হবে কিন্তু সাইত্রিশের আগে হবে না। ও বয়েস টয়ের আগে বিয়ে দিলে খুব কষ্ট হয়ে যাবে—স্বাস্থ্যের দিক থেকে ফাঁড়া আছে।

বাস, মেয়েদের মুখ বন্ধ, তাগিদ বন্ধ।

সেই বাইশ বছরও এসে গেল একদিন। সোমা তখন উৎসুক নেত্রে বাবার হাব-ভাব লক্ষ্য করে। পাড়ার কিছু কিছু ছেলেই তখন রোগী নিয়ে আসে বাবার কাছে। তাকে প্রেসোলাই মেসেজশাই করে। কী দিয়ে ভাগ্য গোনাবার জন্যেও খদ্দের ধরে আনে। আর ফাঁক পেলেই তারা অন্দরের উঠোনে এসে হানা দেয়। বইয়ের ও-ঘরে একেই অনেকের ধনখন জল তেষ্টা পায়।

সোমা মনে মনে হাসে। এ বাড়ির সাদা ছেলেগুলোর অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টাটা কেন সেটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারে। বাবা বুঝতে পারে কিনা কে জানে। হ্যাঁ। একজনের কাছ থেকে দুটো চিঠিও পেয়েছিল এই সময়ে। সে-যে কার মনের কোন্ জায়গায় বসে আছে সেই মিস্টিরিস্ট। সেই দুটো চিঠি সোমা চুপি চুপি ছোড়দিকে দেখিয়েছিল। বিয়ের পর ছোড়দিটা যে এত নীতিবতী হয়ে উঠেছে কে জানত। সে অবশ্য নির্দেশের সেই চিঠি দেখিয়েছে তারপর সকলে মিলে বাবার উপর এসে চড়াও হয়েছে। বোনের বিয়ে এবারে না দিলেই নয়।

কিন্তু সত্য হালদার তখনো নির্লিপ্ত, নির্বিকার। না, বাইশ পেরুনো ছোট মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই। চব্বিশের আগে হবে না। নিজের গণনায় ঘটকা লেগেছে। এক তিয়াী আধ তিয়াীর তফাতে দুচার বছর এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। নিশ্চিন্ত হতে হলে চব্বিশের ওদিকে বিয়ে দেওয়াই নিরাপদ। মেয়েকে আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু ভাবিস না ছোড়দের কারো থেকে খারাপ বিয়ে হবে না ওর।

সেই বাইশ বছর বয়স থেকেই সোমার মনে কি রকম ঘটকা লাগতে শুরু করেছিল। মনে হয়েছে আসলে টাকা পয়সাটা অন্যদের দরুন বাবা এখনে সাবধ দিচ্ছে। তাদেরও [redacted] গেলে বরাবাবা করে কে আগলাবে—সেদিকটাও এই চিন্তার মধ্যে বোধহয় থাকা আছে। বাবার বাইরের ঘর আর তার ভিতরের ঘরের * দেয়ালের এক ধারে ছোট ঘুলঘুলি আছে একটা। এ-ঘরে বসলে জানালা বন্ধ করে বা রাতে আলো না জেলে সেখানে দাঁড়ালে বাইরের ঘরের সব দেখা যায় কিন্তু এ-ঘরের কিছুই দেখা যায় না। সোমা অনেক সময় সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবার খদ্দের সুদ্ধ মক্কেলদের দেখে হাসির কথাবার্তা শোনে বাবার চিকিৎসার ভড়ং-চড়ং দেখে আর হাসে।

এর মধ্যে কম বয়সী কোনো-সুশ্রীকে ঘরে ছেলে এসে গেলে আর সত্যবাবুর শুনলে বাবার হাব-ভাব অন্যরকম। সাথ ঘরের যাবতীয় খবর নিতে বসে তখন। একবার একজনের ওই রকম সব খবর নেবার পর মক্কেলটি বিদায়ের শুনে বাবার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। ঘুলঘুলির এধারে সোমা হেসে বাঁচে না।

কিন্তু ওরও মুখের হাসি কমে আসতে লাগল ক্রমশ। বয়স চব্বিশে এসে ঠেকল। বি-এ পাশ করে ঘরে বসে আছে। এম-এ পড়ার ইচ্ছে বাবাই বাতিল করে দিয়েছে। আসল কারণ কোথায় এম-এ পাশ করলে বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে—এই জন্যে। কিন্তু বিয়ে নিয়েও তাকে তেমন উঠে পড়ে লাগতে দেখছে না। আগের সন্দেহটাই বদ্ধমূল এখন। প্রথম কথা টাকা নেই দ্বিতীয় ও স্বশুরবাড়ি চলে গেলে তার চলবে কি করে। ঠিনুজী গণনার ফাঁড়া এবারে চব্বিশ থেকে বাইশে পড়লেও আশ্চর্য হবে না।

ঠিক এই সময় আর একজনের আনা-গোনা শুরু হল বাড়িতে। এমনিতেই নম্র-নম্র শুদ্র কিন্তু মুখে বিচ্ছিরি গোটা কতক বসন্তের দাগ। বয়সে চক্রবর্তী। গোড়া মায়ের চিকিৎসার কারণে প্রথম পদার্পণ এ-বাড়িতে। কী শুনে বাবাকে তিন-চারবার দেখাতে নিয়ে গেছল। সেই যা ভোগ হয়েছে। তারপরেও বাবা তাকে যখন তখন বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছে। কোনো দিন অন্দরে এনে বসিয়েছে। সোমাকে চা করতে বলেছে। কখনো বা প্রায় অকারণেই বাইরের ঘর থেকে সোমার ডাক পড়েছে। বাপ ছেড়েছে।

তারপর অবাই একদিন হঠাৎ ওকে বলেছে এ ছেলেটা মন্দ নয় বুঝলি।... বি-এ পাশ কেস তবু ছেলে। চাকরির চোটপাটে না পেয়ে এখন ব্যবসা শুরু করেছে। আর খুব উদ্যমী ছেলে। দু পয়সা কামাচ্ছেও। ঘুলঘুলির জোর থাকলে আরো বেশি রোজগার হত—আস্তে আস্তে হবেও।

একে মুখে বসন্তের দাগ তার ওপর কিসের ব্যবসা ওই ছেলের শুনে তো চক্ষু-স্থির সোমার। মাছের ব্যবসা। ভোর রাত বারোটায় কার্নিং-এর বাজারে হাজিরা দেয়। সেখানে মাছের ডাক হয়। নৌকোয় আর লঞ্চে সেই সব মাছ আসে মাতলা নদী দিয়ে। যার যেমন টাকার জোর সে সেই রকম মাছ তোলে নেয়। বড় কারবারীরা মাছ তোলে নিয়ে ট্রাক বা লরি করে সেই মাছ

সকালের মধ্যে শহরের নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। এই ছেলের সেই সংগতিও নেই। মাছ কিনে ট্রলির মাথায় বা ঠেলায় চাপিয়ে এখানে সেখানে পাঠায়। সময়মতো ভাগে লাভ বা টেন জাড়া করে।

বাবা শেষকালে ভদ্রঘরের একজন ছেলে ধরলে ছোট মেয়ের জন্য এ সে কল্পনাও করেনি। বাবার আসল মতলবটা ফুটেই ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লেগেছিল সোমা। এখানে ছোট একটা ঘর ভাড়া দেয়া আছে ওই ছেলের। ওখানে বিয়ে হলে সেটাও আর রাখার দরকার নেই—জামাই এ-বাড়িতেই থাকতে পারবে। আবার সোমার তাহলে কোন-দিন এ-বাড়ি থেকে নড়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই ভাবেই নিশ্চিন্ত হতে চায়।

মুখে বাবাকে কিছু বলতে পারেনি সোমা। কিন্তু আড়ালে মনোভাব গোপনে করেনি। এক কটকায় উঠে চলে গেছল সেদিন। পরেও ঘরে ডাক পড়লে বাইরে থেকে সাড়া দিয়েছে ফিরতে চায়নি। কিন্তু এও জানে বাবার মাথায় একবার কোনো সংকল্প ঢুকলে সেটা হটানো সহজ। বাবা ঠিক তার নিজের বিবেচনার রাস্তা ধরেই এগোবার মতলবে আছে।

এমন দিনে অন্য একজনের আবির্ভাব। অরবিন্দ গাঙ্গুলি। বন্ধু চক্রবর্তীর সঙ্গেই এ-বাড়িতে প্রথম পদার্পণ তার। ছেলেবেলার বন্ধু দুজনে। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে এক-সঙ্গেই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে। কলেজে উঠে ছাড়াছাড়ি। ছাড়াছাড়ির কারণ অরবিন্দ গাঙ্গুলির বাবারা দুবেলা খাওয়া-দেয়া কলোনীতে নাকি মস্ত বাড়ি হাঁকড়ে বসেছিল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি তখন সোদপুরে কোন কলেজে নাম লিখিয়েছে। সেই থেকে দীর্ঘকাল দুজনের ছাড়াছাড়ি একরকম। এই নব কলোনীতে এসে আবার যোগাযোগ। বন্ধু চক্রবর্তী নিজেই গল্প করেছে স্কুলে অরবিন্দ নাকি তার থেকে ঢের ভালো ছাত্র ছিল।

রাস্তায় বেরিয়ে এই লোককে সোমা এর মধ্যে অনেক দিন বন্ধু চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্প করতে দেখেছে। ও পাশ কাটিয়ে যেতে দুজনেই লক্ষ্য করেছে ওকে। সোমা তাকে একলাও দেখেছে অনেক সময়। এপাড়ার আলোপাথী দোকানগুলোতে তার বেশ যাতায়াত। হাতে মস্ত একটা ব্যাগ থাকে তখন। পরনের পোশাক-আশাক বেশ শৌখিন। চকচকে প্যান্ট-শার্ট। ভারিক্কি লোকটাকে মন্দ দেখায় না। গায়ের রং কালো কিন্তু মুখখানা সুশ্রী। আর সর্বদা হাসি-মাখা দুটো চোখ। বন্ধু চক্রবর্তীর বন্ধু জানার আগেও যাতায়াতের পথে অনেকদিনই তাকে দেখেছে সোমা। আর ওই লোকও যেন প্রায় পরিচিতের মতোই মুখ তুলে তাকিয়েছে ওর দিকে।

তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে সোমা একটা অঙ্কুতসিদ্ধ নিয়েই বন্ধুর সঙ্গে এ-বাড়িতে পা দিয়েছে সে। আর সোমারও দুর্ভাগ্য নইলে সিঁড়ির ঘুলঘুলিতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে আলাপচারির আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওকে ভালো লেগে যাবে কেন? মনে হয়েছে সোমার সপ্রতিভ মুখের ওই হাসিমাখা চাউনিটা।

বন্ধুর সঙ্গে এসেই বাবার পায়ের ধুলো নিয়েছে। বাবা ব্যস্ত হয়ে বলেছে বাবা থেকো না, পায়ে হাত দেবার মতো লোক এমনিতেই কমে আসছে।...বন্ধুর মুখে অনেকদিন আপনার গল্প শুনেছি আসি আসি করেও এতদিন হয়ে ওঠেনি দিন মজুরি করে খাই তো।

সত্য হালদার বলেছেন কিছুকাল বাবার তোমাকে আমি এদিকে দেখছি কষ্ট...কি করো বাবা তুমি?

হেসে জবাব দিয়েছে ওরুণের আলাপী। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ।

—পাকা চাকরি কিছু না বুঝি?

—চাকরি পাকাই তবে বেশ অনেক—দিন-মত ছোটাছুটির ব্যাপার।

এরপর বড় একটা কোম্পানীর নাম করেছে—তাদের সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি এই এলাকার ফিলড অর্গানিজেশনের জন্য তাকে এদিকে টেনে আনা হয়েছে। চারদিকে নতুন কলোনী গজিয়ে উঠছে—ফিলড ওয়ার্ক দরকার। এরই মধ্যে মফঃস্বলেও ছুটতে হয় মাঝে মধ্যে।

আলোপাথির বাজার বাবা জাঁকিয়ে তুলতে চায় সত্য হালদারের তাদের প্রতি খুব খুশী হবার কথা নয়। ফোঁস করে বলে ফেলেছেন সেভাবে তোমরা সব দিক দখল করে বসছ আমাদের আর খেয়ে পরে থাকতে হবে না।

সপ্রতিভ বিনয়ে সম্ভাষণটা খণ্ডন করতে চেয়েছে। বলেছে এটা কিন্তু ঠিক কথা হল না—অস্ট্রেলিয়া ইয়োরোপ থেকে হোমিও-প্যাথির বাজার উঠে যেত তাহলে—সে-সব জায়গা থেকে আলোপ্যাথির মত বিলাট বিরাট অর্ডিনেন্স সেখানেই আবার হোমিও-প্যাথির বাজার তাদের ওপর টেক্কা দিয়ে চলেছে। আসলে সব কিছুর জন্যই কিছু ফিলড ওয়ার্ক দরকার কিছু চমক দরকার—এখনকার হোমিওপ্যাথিতে সেটুকু অভাব। বেশ মিষ্টি হেসেই চোট কাটার মতো বলেছে তারপর এই যে আপনি এতক্ষণ একজন খুশী চাকার সেটা আপনার এই দন্তর দেখলে সেটা যারা আপনাকে চেনে না জানে না তারা কি করে বুঝবে? অবশ্য এই একটু ভোল বদলে নিয়ে চ্যাম্পেন রেখেই দু মাসের মধ্যে আপনার ফ্যাক্টরি আমি দিব্যি করে দিতে পারি। আপনার তো তার ওপর আবার জ্যোতিষী জানা আছে— রোগীরা আপনার কাছে এসে কিউ দিয়ে দাঁড়ায় না কেন আমার মাথায় আসে না।

কথাগুলো কান পেতে [illegible] মতো মনে হয়েছে সোমার। স্পষ্ট কথাগুলো শোনার পর বাবার ভিতরে ভিতরেও একটু রোখচাপা আশার উদ্রেক হয়েছিল। তার ওপর বন্ধুর চক্রবর্তীর মন্তব্যেও কিছু জোর হয়েছে। সে বলেছে আর চেষ্টা করলে সত্যিই অনেক কিছু পারা যায়। পরে বন্ধুকেই বলেছে তোর তো এই ছ মাসের মধ্যেই অনেক লোকের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে কতজনের জন্য কত কি করে বেড়াস—এই প্র্যাকটিস যাতে বাড়ে একটু সে চেষ্টা কর না।

অরবিন্দ বন্ধুর মাথা খেয়েছে আগে বলেছে।

সত্যি কিছু করতে পারে সোমা অবশ্য বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এই প্রস্তাবটুকু ভালো লেগেছে।

বাবাকে বন্ধুর কুটিলতার একটা নজির শুনিয়েছে বন্ধুর চক্রবর্তী। এই এলাকার একটা পরিচিত ওষুধের দোকানের নাম করে বলেছে তাদের এখানে ওষুধ ডেড স্টক হয়ে গেছল আর দোকান খাচ্ছিল অম্বলে এসে ধরে পড়ায় সাত দিনের মধ্যে ও সমস্ত মাল খালাস করে এসে হাত ঝুকিয়ে নিলে—তবুও অম্বলেও হাতে মোটা লাভ হয়েছিল।

অতএব বাবা এবারে ভালো করে লোকটার খবরাখবর নিতে লাগলেন। নাম-ধাম আগেই শোনা হয়েছিল। এবারে বাড়ির খবর নিতে লাগলেন। কে আছে না আছে দাদারা কি করে—শিয়ালদহের পৈতৃক বাড়ির অবস্থা কি ইত্যাদি।

পারিবারিক প্রসঙ্গে মানুষটাকে কিরকম নির্লিপ্ত মনে হয়েছিল সোমার। বলেছে শিয়ালদহের পৈতৃক বাড়িটাকে সেখানকার লোকে বড় বাড়ি নাম দিয়েছে। কিন্তু তার ও-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। সপরিবারে দুই দাদা থাকে সেখানে ভেতরে জমি আছে চাষবাস আছে, সুখে শান্তিতে আছে—তার মধ্যে সে গিয়ে পড়লে তারা উপদ্রব ভাবে। হাসতে লাগল।

চোখ-কান কাটার মতো বাবা জিজ্ঞাসা করে সমস্ত যে কাজ করছ তাতে মাইনেপত্র কি রকম?

ওরুণ গলায় জবাব দিল আমাদের কোম্পানী বেশি কাজ চায় বেশি টাকা দিয়ে কাবো স্বভাব-চরিত্র খারাপ করে দিতে চায় না। নগদ কিছু এখন এবারে আলাউন্সটাও দেবে ভাবছি।

নগদ শুনেই সত্য হালদারের চোখ বড় বড়। তার ওপর বন্ধুর চক্রবর্তী বলল—নগদ বলছিস কেন কিছুর ওপর কমিশন তো আছে—

অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিল ওটুকুও না থাকলে তো বলেই ছেড়ে দিতাম—

বাবার পরের প্রশ্নটা শুনে ঘুলঘুলির এধারে সোমা উৎকর্ণ একটু। মন্তব্যের সুরে বাবা প্রথমে বলল—খুব ভালো এরেই লেগে থাকো। তারপর জিজ্ঞাসা করল তা বাবা তুমি পড়াশুনা কি করেছ?

জবাব দিল আসল পড়াশুনার সময় যখন তখনই তো রোজগারে ধান্দায় চাকরিতে ঢুকে পড়তে হল।...এম-এস-সি পাশ করেছিলাম রিসার্চের ইচ্ছে ছিল তার আগে ওরুণ কিছুদিন রিলাক্স করে নেবার।

নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না সোমা কিন্তু এম-এস-সি পাশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে

মুখের চেহারা যেন একেবারে শুকনো হয়ে গেছিল তার। ও-যেন কিছু একটা সম্ভাবনায় গম্ভীর মুখে পা টিপে দাঁড়াল।

ছেলেটা এম-এস-সি পাশ এ সভা হালদারও ভাবতে পারেন নি। বলে উঠলেন তাহলে কোনো কলেজে টলেজে না ঢুকে এ চাকরি করতে এলে কেন?

ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে হাসিমাখা মার্জিনটা ডবল সুখের শ্যাসল সোমার। জবাব শুনেও খুশীভরা মুখের ওপর আঁচল তুলতে হল। হেসে বলছে, আপনি তো দেখি হ্যাজিস্ট্রেটকে দারোগা হবার আশীর্বাদের মতো বলছেন। মাইনে ছেড়ে ওষুধ বিক্রীর কমিশনে যা পাই তাই দিয়ে কলেজের দুটো হাল্টার রাখা যায়।

বাবাকে লজ্জা পেতে দেখল সোমা। সঙ্গে সঙ্গে অতিথিকে চা দেবার তাগিদও অনুভব করল। ভিতর থেকে ডাক এলো, কই গো সোমা, বন্ধু সেবারো চা এনে দে তো চট করে—

সোমার মুখ লাল।

ওদিকে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বলল, না চা না—আমার আবার গ্যাসট্রিকের ট্রাবল আছে—খাওয়া দাওয়ার সময়ের ঠিক নেই তো কিছু—

সত্য হালদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সে কি কথা, এই বয়সে এসব রোগ কেন—চিকিৎসা করাও না কেন?

—করি। আমাদের ওষুধের বেশির ভাল তো ভাক্তারবাবুরা আছা এর ভালো ওষুধ আছে শুনেছি?

সত্য হালদার সাগ্রহে বলেছেন, তা তো আছে, কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে আমাদের চিকিৎসা কি তোমরা করবে?

—বিশ্বাস! অসুখ কেন। —ওষুধের আসল শক্তি একমাত্র হোমিওপ্যাথিতেই আছে এ সকলেই জানে—আমার বাবা আজীবন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে গেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসার পিছনে এই ইচ্ছেটাও ছিল।

অতএব সত্য হালদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এতদিনে এই একটাই যেন সমজদার রোগী হাতে পেয়েছেন। প্রশ্ন করে করে রোগের বিবরণ জেনে নিতে লাগলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর সহযোগিতা কি-রকম দরকার তাও জানে ছেলেটা। সেই রকম করেই নিজের সম্পর্কে হদিস দিতে লাগল।

বেশ ভেবেচিন্তে ওষুধ ঠিক করলেন সত্য হালদার। সাতটি পুরিয়া দিলেন। সাত দিন খেতে হবে। আর নির্দেশমতে খাওয়াদাওয়া একটু নিয়মমাফিক করতে হবে।

পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে সযত্নে রাখতে গেল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। টাকা দেখে এই প্রথম বোধ করি হাঁ-করা করে উঠলেন সত্য হালদার। কিন্তু অরবিন্দ গাঙ্গুলি জোর করেই টাকাটা সামনে রাখল, বলল যা আপনাকে দিচ্ছি না, আপনি গুরুজন আর নতুনের সুরুতে আপনার জন—প্রথম দিন বলতে এ টাকাটা প্রণামী হিসেবে নিতে হবে—না নিলে আর আসব না।

হাসিমুখে ওষুধ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বন্ধুর ভুই যোস আমার একটুনি না ছুটলে অনেক কাজ পড়ে।

চলে গেল।

সত্য হালদার মুগ্ধ। আর ঘুলঘুলির ও-ধারে মুগ্ধ তার থেকে বেশি সোমা। রাস্তায় যখন দেখেছে তখনো এত বিদ্বান আর এরকম মানুষ ভাবতে পারেনি। তার মুখে বন্ধুদের সুবাদে আপনার জন কথাটা একটুও ভালো লাগেনি। বসন্তের দাগ-মারা ওই মুখটা কুৎসিত লাগছে এখন। কিন্তু এই মানুষেও বন্ধুবৎসল বটে। বাবার প্রশংসার জবাবে নাম দিয়ে নিজেও বন্ধুর সুখ্যাতিই করছে। বলছে, লোকটার দরাজ হাত, দরাজ মন—বিপদকে পড়ে কেউ কিছু চাইতে এলে কক্ষনো নিরাশ হয়ে ফেরে না —নিজে এগিয়ে এসে কত লোকের উপকার করে ঠিক নেই।

শুনে সোমার মনে হয়েছিল বন্ধু কান জুড়িয়ে গেল।

ঠিক সাত দিন বাদে অরবিন্দ গাঙ্গুলি একলাই এলো। খুশীতে আটখানা মুখ। এসেই চুপ করে বাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বলল আপনাকে আর এরকম ছাই-গাদা হয়ে পড়ে থাকতে দেওয়া হবে না।

এ সাক্ষাৎকার অন্দরের উঠোনে। বাইরে থেকে একটা হাঁক দিয়ে ঘরের ছেলের মতো সোজা ভিতরে চলে এসেছে। অদূরের দাওয়ায় সোমা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখামাত্র মুখে লাল।

হাসি মুখে সত্য হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল আবার!

—আপনার ওষুধকে ওষুধ বলব না চাবুক বলব? পেটে জ্বালা নেই, চোঁয়া ঢেকুর নেই—একটা খাই-খাই ভাব।

সত্য হালদার বিগলিত। —সত্যি বলছ না বাড়িয়ে বলছ?

—বাড়িয়ে! রোগী কক্ষনো বাড়িয়ে বলে? সর্বক্ষণ শুনবেন, তেমন কিছু হল না, আরো ভালো কিছু ওষুধ দিন। সোমার দিকে ঘুরে তাকালো। —আজ আমার দু পেয়ালা চা চাই, সেই সঙ্গে মুড়ি বা বিস্কুট-টিসকুট যি কিছু থাকে দেবেন—অন্য কিছু না।

সত্য হালদার ব্যস্ত হয়ে বললেন, চা মানা চা বানা, আর ভালো বিসকুট তো ঘরেই আছে—আছে না? মেয়ে মাথা নেড়ে সায় দেবার আগেই আবার বললেন এটি আমার মেয়ে সোমা, এ বছর বি-এ পাস করেছে।

—[redacted] সব জানি। অনেক দিন দেখেছি আর বন্ধুটির মুখেও এঁর কথা শুনেছি। হাসিমাখা চন্দ্রানিটা এবারে সোজা সোমার মুখের ওপর। পলাশদার চাপ যখন সেই আপনি তো বেকার। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

হতভম্ব খেয়ে সোমা মাথা নাড়ার আগেই সত্য হালদার বলেছেন, ওকে তুমি আপনি-আপনি করছ কেন—ও আবার তোমাকে কি সাহায্য করবে?

একমুখ হেসে অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাবটা সোমাকেই দিল, সাহায্যের পরোয়ানা পেয়েই গেছি তাহলে। তুমি চা বিস্কুট নিয়ে এ-ঘরে এসো, তোমাতে আমাতে মিলে একটা ষড়যন্ত্রের বসব—এভাবে আর হালদার মশাইকে ভোলানাথের মতো চাই করে বসে থাকতে দেওয়া হবে না।

সত্য হালদারের মুখে খুশী ধরে না। সাদরে তাকে বাইরের ঘরে এনে বসালেন। আর নতুন ওষুধ দেবার সংকল্প আগে রোগের খবর নিতে লাগলেন।

সোমা চটপট চা করে ফেলল। ডিশে বিসকুট সাজালো। সুখের তুলায় কি এত নতুন বাতাস লেগেছে যেন। লোকটার কথা-বার্তার মধ্যেও যেন এক ধরনের স্পর্শ আছে। বলল কিনা, তোমাতে আমাতে মিলে একটা ষড়যন্ত্র করব। ...এর সম্বন্ধে বন্ধুর চক্রবর্তীর মুখে অনেক শুনেছে। কি এমন অনেক শুনতে পায়! জোড়ীর মতো কোন সম্ভাবনার আঁচ দেয়নি তো। বেচারা বন্ধুর চক্রবর্তীর ওপর অকারণেই রাগ হচ্ছে তার।

চা বিসকুট খেতে খেতে সত্য হালদার এর সামনেই অরবিন্দ গাঙ্গুলী তার মতলব ফাঁস করেছে। সব কিছুরই একটা শো চাই আজকের দিনে, নইলে কেউ গণের কদর করে না। প্রথমেই দরজার সামনে কবমকে সাইনবোর্ড বসাতে হবে একটা, ছোট ছোট আরো দুটো অন্তত ওষুধের আলমারি আনতে হবে। পুরনো আসবাব যা আছে সেগুলো রং পালিশ করাতে হবে, নতুন আসবাবও কিছু চাই।

সত্য হালদার হাসিফাঁস করে উঠেছেন। —এতসব করতে হলে অনেক টাকা লাগবে তো!

—কি-ছু লাগবে না। সব আপনার বাড়তি রোজগার থেকে কাটান দেবেন। না-হয় কিছু সুদও ধরে দেবেন আমাকে। হেসে উঠেছে।—শোনো সোমা, ওনার কথা মতো ওষুধের গ্রুপ করে করে তুমি আলমারিতে সাজাবে, লেবেল আটবে—আসবাবপত্র কোথায় কি বসবে না বসবে দুজনে মিলে ঠিক করবখন। কি মনে পড়তে হালদার মশাই-এর দিকে ফিরেছে আবার। —আপনার ভালো স্টেথসকোপ নেই—না?

মুখে কাঁচুমাচু করে সত্য হালদার জবাব দিয়েছেন, একেবারেই নেই—ওসব ব্যবহার করতেও জানি না।

—জানার দরকার নেই, আপনি যা জানেন সেই দাম দেয় কে।...তবু, আকাট মুখখগুলোর জন্যেই স্টেথো একটা দরকার। ঠিক আছে আমার অনেক চেনাজানা দোকান আছে, ঝকঝকে দেখে একটা এনে দেবখন।

পনের দিনের মধ্যে বাইরের ঘরের ভোল বদলে গেছে সত্য হালদারের। সামনে কবমকে সাইন বোর্ড ঝলমল্ছে, দেয়ালে দুকোটো টিউব লাইট বসেছে। ছোট ছোট, নতুন দুটো কাচের আলমারি আর কিছু নতুন আসবাব এসেছে। পুরনো চেয়ার টেবিল আর

বেশ ২৫-পালিশ করা হয়েছে। সত্য হালদারের গলায় স্টেথসকোপও ঝুলতে দেখা যাচ্ছে একটা।

বইয়ের একটা ছেলে কত সহজে কত কি যে করে ফেলতে পারে বাপ আর মেয়ে তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে। শুধু তাই নয়, রাতারাতি ভাগ্যটাও সেন বদলাতে শুরু করেছে সত্য হালদারের। অরবিন্দ গাঙ্গুলীই রোগী ধরে নিয়ে আসে। দূরের রোগীরাও ওই লোকের নাম করে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে। চিকিৎসার সঙ্গে জ্যোতিষী মেলানোর ফলেও তাদের অনেকে যায়েল।

হ্যাঁ, রাতারাতি সুদিনের স্বপ্ন দেখতে লেগেছেন সত্য হালদার। না এত বয়েস পর্যন্ত এরকম একটা ছেলে তিনি আর দেখেন নি। কিছু বললে ছেলেটা যা জবাব দেয় তা শুনেও দু কান জুড়োয়। সত্য হালদার সেদিন বলেছিলেন, এ জন্মে আমার ছেলে নেই, কিন্তু আর জন্মে তুমি বোধহয় আমার ছেলেই ছিলে বাবা—

মিটিমিটি হেসে অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছে, এ-জন্মেও আপনার ছেলেই ভেবে নিন তাহলে—

সে-কথা শুনেও সোমার মুখে লাল। বোকা কেউ বলবে না তাকে। বন্ধুর চক্রবর্তীর মুখে শুনেছে আর নিজেরাও দেখছে পরের উপকার করে বেড়ানো একটা নেশার মতো এই লোকের। কিন্তু নেশা ছাড়াও কিছু অনুভব করতে পারে সোমা। ও সামনে না থাকলে মানুষটা উনখুস করতে থাকে, সময় সময় নিজেই হাঁকডাক করে ডাকে। আয়া বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে বাবাকে নিয়ে বা বাবার দপ্তর নিয়ে কিছু একটা আলোচনার দরকার হয়ে পড়ে। ভিতরে এসে একটা পিঁড়ি বা মোড়া টেনে নিয়ে গাঁট হয়ে বসে পড়ে। দুতিন বার করে চায়ের তেষ্টা পায়।

সোমা সেদিন বলেছে, এতবার করে চা খাচ্ছেন, আপনার না গ্যাসট্রিক!

তক্ষুনি জবাব দিয়েছে তোমার বাবার ওষুধে গ্যাসট্রিক ফ্যাসট্রিক সব ছাই হয়ে গেছে।

বাবার ওষুধের এত কদর আর বোধহয় কারো মুখে শোনেনি সোমা।

বাবাকে আড়াল করে সিগারেট খাবার জন্যেও মাঝে মাঝে উঠে ভিতরে চলে আসে। কিন্তু সোমা ঠিক লক্ষ্য করেছে বাইরের ঘরে ও কাছে থাকলে সেই দু ঘন্টা কেটে গেলেও সিগারেটের নেশায় ঘর ছেড়ে নড়ে না। নিজের ভিতরেও অদ্ভুত একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছে সোমা। ওই লোক দুদিন না এলে ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ তার গলা পেলে নিজের মধ্যেই কি রকম একটা সাড়া জাগে।

গাঢ়-কোমর শাড়ি জড়িয়ে পাট জড়ানো লম্বা সরু বাঁশের খোঁটা দিয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়ছিল সোমা। নোংরা ঘর-দোর দেখতে পারে না মাঝে মধ্যে নিজেই এ-সব করে। কিন্তু গত দু মাসের মধ্যে বাবার দপ্তরের জেলা বদলানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকে মন দিতে পারে নি। অরবিন্দ গাঙ্গুলী দিন তিনেকের জন্য মফঃস্বলে গেছে, আগামীকাল ফেরার কথা। অতএব হুট করে অন্দরমহলে কারো এসে পড়ার সম্ভাবনা নেই ধরে নিয়ে সোমা ঘর সংস্কারের কাজে মন দিয়েছিল। কাপড়ে আর মুখে কালি-ঝুলি লেগেছে, একটু বেশী পরিশ্রমের ফলে সোমা অল্প অল্প ঘামছেও।

দরজার ওধারে গলা শুনে ধড়ফড় করে উঠল। হাতের বাঁশ ফেলে তাড়াতাড়ি শাড়ীর আঁচল কোমর থেকে খুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে অরবিন্দ গাঙ্গুলী। লজ্জা পেয়ে সোমা বলল আপনার তো কাল আসার কথা ছিল?

হাসি মুখেই সায় দিল অরবিন্দ গাঙ্গুলী, বলল, তাই ছিল কিন্তু ভাগ্য কাউকে কে—কাল এলে এ-রকম একটা দৃশ্য চোখে দেখতে পেতাম না। বন্ধুকে বরাত দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

বন্ধুর চক্রবর্তীর কথা বলে আগেও এক আধ সময় ঠাট্টা-তামাসা করেছে। কিন্তু এ-রকম সরাসরি ইঙ্গিত এই প্রথম। ভিতরে ভিতরে সোমা বেশ একটা ধাক্কা খেল। আর রাগও হয়ে গেল খুব। বাবা কিছু বলেছে না বন্ধুর চক্রবর্তী নিজেই ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনায় কিছু আঁচ দিয়েছে জানে না। কেন তাগিদে যে এত একটা বিঁধিয়ে করতে চাইল সোমা সেটা নিজেরও অগোচর নয় খুব। গম্ভীর মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করল বন্ধুবাবুর বরাতের কি হল, ব্যবসায় উন্নতি-টুন্নতি হল হঠাৎ?

অরবিন্দ গাঙ্গুলী হাসি মুখেই জবাব দিল, না ব্যবসার কথা কে বলছে?

সোমা এবার কষে যে-কথা বসে বসল সে-রকম বকার মেয়ে নয়। কিন্তু উষ্মার একটা চাপা ঝাপটা যেন আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। বলল, আপনার বন্ধুকে অত বেশী দিবাস্বপ্ন দেখতে বারণ করে দেবেন।

বলেই বাঁশের কোটা হাতে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ঘরে ডাকালে ওই লোকের হাসি-মাখা দু চোখ আনন্দে বিস্ফারিত দেখতে পেত।

সোমার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বন্ধুর চক্রবর্তীর ওপর। মা, বাবা কিছু বলে নি নিশ্চয়, কারণ তাহলে ইদানীং এই একজনের প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ সর্বদা। বাবা নিজের স্বার্থ বোঝে না এ অপবাদ কেউ দেবে না। তাহলে? তাহলে ওই বন্ধুর চক্রবর্তী নিজেই কিছু না কিছু বলেছে বন্ধুকে। তা না হলে সে এ-রকম ঠাট্টা করতে যাবে কেন?

এর পর অনেক একটা তুচ্ছ কারণে ওই বন্ধুর [illegible] ওপর সোমার দিবাস্বপ্ন

বেড়েই গেল। প্রশংসার সুরে বন্ধুর স্বাভাবিক পরিশ্রমের কথাই বলেছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলী। ভোর রাত থাকতে সেই ক্যানিং-এ বাজারে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। তারপর মাছ ডাঙা, মাছ পাঠানো—রাতে বেচারা দু ঘন্টাও ঘুমোনোর সময় পায় কিনা সন্দেহ। অত খাটছে অথচ কাপড়ের অভাবে বড় করে কিছু করতেও পারছে না ইত্যাদি।

সোমা তখন ঘরে বসে। নিস্পৃহ মুখে বাবা বলল, এ-রকম কাজে তো স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে, তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব তোমার লাইনেই কিছু করলে পারত—ও-রকম একটা বদরসা মাথায় চাপল কেন। অরবিন্দ গাঙ্গুলী জবাব দিল, আমার লাইনে আমাদের লাইনে চেষ্টা করার কথা ভেবেছিলাম ওষুধ কেনা-বেচা করতে পারি কিন্তু গ্রাজুয়েট না হলে চাকরি ছোটোলা শক্ত—হয়ই না।

শুনে সোমা অবাক একটু, আপনি বলেন অবাক সত্য হালদার। —বন্ধুর তো বি-এ পাস শুনেছিলাম!

অরবিন্দ গাঙ্গুলী হকচকিয়ে গেল একটু। — কোথায় শুনেছিলেন?

...কোথায় শুনেছিলাম...ও তো বোধহয় নিজেই বলেছিল, হ্যাঁ বন্ধুর নিজেই বলেছিল পাস কোর্সে বি-এ পাস করার দরুন নাকি আর পড়া হল না আর চাকরিরও তেমন সুবিধে হল না।

অরবিন্দ গাঙ্গুলীর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেছে। হেসেই ফেলল। পরে বলল, মানে তো আমরা বেশ কয়েকটা বছর ছাড়াছাড়ি ছিলাম—হতে পারে, আমি ঠিক জানি না। পরক্ষণে দু হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বলল কিন্তু কথা দিন এ নিয়ে আপনি ওকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবেন না, মাঝখান থেকে আমি অপ্রস্তুতের একশেষ হবো।

যেটুকু বোঝবার বাবা মেয়ে দুজনেই বুঝে নিল। তার হাসিফাঁস দেখা দেখে সত্য হালদার বললেন, ঠিক আছে বলব না কিন্তু আমার কাছে ও এ-রকম একটা মিথ্যে কথা বলে গেল!

—মিথ্যে তো আমি বলি নি। হতে পারে, বি-এ পাস করতে এমন আর কি লাগে। তা যে পাসই হোক ওর মতো ছেলে হয় না এ আপনি আমার কাছ থেকে জেনে রেখে দিতে পারেন।

ছেলে যে কার মতো হয় না সেটা বলা আর মেয়ে খুব ভালো করেই অনুভব করছে। না এরপর বন্ধুর চক্রবর্তীর সঙ্গে বাবা বা মেয়ের মুখে কিছু অশোভন ব্যবহার করেনি অথবা ও-ব্যাপারে একটু কথাও জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু এ-বাড়ীতে তার কদর দ্রুত কমে আসছে। অরবিন্দর সঙ্গে না এলে এক পেয়ালা চা-ও জোটে না।

এর পর অল্প এক ঝাপার ঘটে গেল যার ফলে ওই বন্ধুর চক্রবর্তীর ওপর ঝুঁকা-

মেয়ে ঘরে নিস্পৃহ। প্রায় বিরূপই বলা যেতে পারে। আটা ব্যাগ হাতে ফিটফাট পোশাকে অরবিন্দ গাঙ্গুলী ঘরে ঢুকেই খোঁজ করল, কবুণ এসেছে?

বলা শেষে সোমা বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। সত্য হালদার বললেন না তো, তার এখানে আসার কথা নাকি? বোসো—

বসার সময় নেই। ফুকনগর যেতে হবে একুনি, আজ ফিরব কিনা ঠিক নেই। কেন দরকার জানা যদি থাকত ওটার, ঠিক সাড়ে সাতটায় এখানে মিট করব বলেছিলাম, এখন শোনে আটটা। যাক, আপনি একটা কাজ করবেন তো—

হাত ব্যাগ চেয়ারে রেখে প্যান্টের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করল। গুনে পাঁচখানা দশ টাকার নোট সরিয়ে রেখে বাকী টাকা সত্য হালদারের দিকে বাড়িয়ে দিল। —ও এলে এই সাড়ে সাতশ টাকা ওকে দিয়ে দেবেন তো—

সত্য হালদার অবাক। —কিসের টাকা?

—বন্ধুর দরকার। ক্যাপিটালের অভাবে বেচারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, কাস্টিং-এর বাজারে দিয়ে মাঝারী ডাকগুলোও ছেড়ে দিতে হচ্ছে—বলেছিলাম যা পাব্লিসিটি—এর বেশী আপাতত পারা গেল না। টাকাগুলো হালদার মশাইয়ের সামনে পেশার ওটে চেপা দিল। ওকে দিয়ে দেবেন আমার দেরী হয়ে গেছে, চললাম—

হালদার মশাই বাধা দিলেন তবু, এত-গুলো টাকা দিচ্ছ ফেরত পাবে?

অরবিন্দ গাঙ্গুলী নিশ্চিন্ত খুশী মুখে তড়বড় করে বলল সে-জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না—বন্ধুর কাছে টাকা থাকা আজকে রাখার সামিল, চলি—

চলে গেল। বাবা মেয়ে দুজনেরই মনে হল বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছে ওই বরুণ চক্রবর্তী।

মিনিট চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বাদে বরুণ চক্রবর্তী এসে হাজির। এবারে আর সোমা বাইরে এসে দাঁড়াল না। কেন যে লোকটাকে দেখলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ইদানীং জানে না। মেয়েদের ওধরের ঘুলঘুলির সামনে দাঁড়াল।

গম্ভীর মুখে সত্য হালদার মুখের দিকে তাকালেন শুধু। বসতেও বললেন না।

—অরু আসে নি?

—সে তার সময় মতোই এসে চলে গেছে, তুমি সাড়ে সাতটার জায়গায় সাড়ে আটটায় এলে।

বিব্রত মুখে বরুণ চক্রবর্তী বলল না তো...সাড়ে আটটাতেই ওর আসার কথা এখানে...

ভিতরটা বিষিয়ে উঠেছিল সত্য হালদারের। নীরস স্বরে বলে উঠলেন, সাড়ে আটটায় আসার কথা ছিল আর সাড়ে সাতটায় ও এসে তোমাকে না পেয়ে টাকা রেখে গেল।

ঘাবড়ে খেয়ে বরুণ চক্রবর্তী বলল, ও...।

ড্রয়ার থেকে টাকা বার করে সত্য হালদার তার দিকে ঠেলে দিলেন। —গুণে নাও সাড়ে সাতশ আছে।

টাকাটা গোনার জন্যেই সামনের চেয়ারে বসতে হল তাকে। গোনা শেষ হতেই সত্য হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, টাকা কার জন্যে ধার নিলে?

বরুণ চক্রবর্তী জবাব দিল, ছবির। মাস এটা ফুকনগরে বাজার—এ-মাস শেষ হলেই দিয়ে দিতে পারব।

ধার-ধার গলায় সত্য হালদার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কাছ থেকে টাকা এই প্রথম নিলে

বিব্রত মুখে সে জবাব দিল, হ্যাঁ.... ছবির বাজারে কিছু টাকা পেলে বড় পার্টির ধরার সুবিধে হত শুনে ও নিজেই টাকাটা নেবার জন্য জোর করল।

বিরক্ত মুখে ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন আশ্চর্য ছেলে...

ঠিক না বুঝে বরুণ চক্রবর্তী টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করল, কে অরু?

ঈষৎ রাগত স্বরে সত্য হালদার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বেচেছ?

বরুণ চক্রবর্তী কোন রকম ঘোরপ্যাঁচের ধার দিয়েও গেল না। সরু দিয়ে বলল কেউ কোন ভাবে ঠকে গেলে ও এ-ভাবেই এগিয়ে এসে সাহায্য করে—সে-রকম দরকার পড়লে ধার করে পঞ্চাশ টাকা এনে দেয়।

—লোকে সেটা মনে রাখে? টাকা ফেরত দেয়?

—দেয়। আবার এক-এক সময় মারও খায় এই করে। কত সময় বারণ করি, কিন্তু ওর সেজন্যে কোন তাপ-উত্তাপ নেই।

প্রশংসার কথাগুলো শুনে সোমা যেমন খুশী তেমন বিরক্ত। বিরক্ত বরুণ, বন্ধুকে এ-রকম মন জেনেও সে নিজে তার কাছ থেকে সাড়ে সাতশ টাকা নিয়ে পকেটস্থ করতে ছাড়ল না। ও-দিকে তার মনের কথাগুলোই যেন বাবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

সত্য হালদার বললেন বারণ তো করো, কিন্তু তোমার নিজেরই তো আবার অত-গুলো টাকা দরকার হয়ে পড়ল—

বরুণের দাম-মাখা বোকা-বোকা মুখে এতক্ষণে একটু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ঈষৎ গম্ভীর মুখে জবাব দিল এ টাকা ওর মারা যাবে না, বরং কিছু বেশীই দিতে চেষ্টা করবে—

উঠে চলে গেল। একটু রাগ করেই গেল হয়তো। কিন্তু সোমা একটুও অখুশী হল না। এ-সব লোককে এ-ভাবেই না বললে কানে জল ঢোকে না।

অরবিন্দ গাঙ্গুলী সেই রাতেই ফুকনগর থেকে ফিরেছে এবং এখানে এসেছে। সত্য হালদার তখন বাড়ী নেই। সোমা বাইরের ঘরেই বসিয়েছে তাকে। তবু সন্তা-লন্তা করেনি কেমন। যত্ন করে চা বানিয়েছে সঙ্গে কিছু খাবারও সামনে রেখেছে। তারপর সহজ আলোচনার ফাঁকে বরুণ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। —আপনি যাবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার বন্ধু এসে টাকা নিয়ে গেছে।

—নেবার কথাই তো। অরবিন্দ গাঙ্গুলীর চায়ে মনোযোগ।

—খুব ভালো কথা নয়। তাকে নাকি আপনি সাড়ে আটটায় আসতে বলেছিলেন?

—তা হবে ঠিক মনে নেই। ও বলল বুঝি? যাকগে, ভালো কথা নয় বলল কেন?

—কেন আবার! কেউ ঠকে পড়লে আপনি নাকি ধার করে এনেও লোকটাকে টাকা দেন?

অরবিন্দ গাঙ্গুলী হেসে উঠল। পাল্টা এ-সব কথা তোমাদের বলে গেল বুঝি?

—হ্যাঁ, সাড়ে সাতশ টাকা গুনে পকেটে পুরে তারপর এ-সব কথা বলল। তবু বন্ধুর সুখ্যাতি করতে জান দেখে খুশী হলাম।

অরবিন্দ গাঙ্গুলী তেমনি হাসতে লাগল। তারপর বলল সেই ছেলেবেলা থেকেই ও আমার অন্ধ ভক্ত—তারী ভাল বাসে।

সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক মনে হল না সোমার। অন্ধ ভক্ত হওয়ার মতো ভাল-বাসার মতোই মানুষ যে এ-কথা যে বলবে। —এভাবে টাকা ধার দিয়ে আপনি তো ঠকেনও অনেক শুনলাম।

অরবিন্দ গাঙ্গুলীর ভাবটা হাল্কা থেকে গম্ভীরতার দিকে গড়ালো এবার। বলল, কেউ বিপাকে পড়েছে শুনলে আমার মাঠাই কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায়, তখন মনে হয় নিজেরই ওই বিপদ। এটা একটা রোগের মতো আমার বুঝলে...কেউ কোন-রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে জানলে আমার নিজেরই কাঁপুনি ধরে। হাসতে লাগল কলেজে পড়তে এ-জন্যে আমি ডাক্তার পর্যন্ত দেখিয়েছি, জানো—

সোমা অবাক।—ডাক্তার দেখিয়েছেন?

—সত্যি দেখিয়েছি। সেই ন' বছর বয়সে আমার মা মারা গেছে, আর বাবা গেছে আমার তেরো বছর বয়সে—তারপর থেকে কত রকমের বিপদের ছবি যে আমার মাথার মধ্যে গজাতো তুমি ভাবতে পারবে না—ভয়ে ত্রাসে পাগল হয়ে যেতাম আমি। তখন কি কাণ্ড করতাম আর কত পাগলের মতো কথা বলে নিজেকে ভোলাতাম তুমি জানো না।... ডাক্তারী আমার ভয়ানক গোঁ—নির্ঘাত মরলাতো আমার ওপর, বাবা মা সেই বয়সে মরবো জানা কথা—সেজন্য তাদেরও কোন-সময় নিজের দোষ ভাবতে পারতাম না তখন সর্বদা আমার মনে হত পায়ের নিচে মাটি নেই, আমি যেন একটা অনিশ্চয়তার ফাঁস গলায় এঁটে ঝুলছি। সেই জন্যেই

এখনো কোনরকম অনিশ্চয়তার ত্রাস আমি বরদাস্ত করতো পারি না—কে ঠকাবে আর কে ঠকাবে না তারও পরোয়া করি না।

এত হাসিখুশী মানুষটার মুখে এরকম কথা আর কখনো শোনেনি, হা করে সোমা এই মুখখানাই দেখছিল আর ভিতরে ভিতরে ভয়ে যাচ্ছিল।

একটা দুটো করে দিন যায়, আর সোমা কেন যেন বরুণ চক্রবর্তীর ওপরেই রাগে জ্বলতে থাকে। বসন্তের হাওয়ায় মুখটা উত্তরোত্তর কুৎসিত মনে হয় তার। এই বাস্তব-রাগের কারণ সহজ অনুমানসাপেক্ষ। অরবিন্দ গাঙ্গুলি ওকে কত পছন্দ করে সোমা সেটা নিজের মন দিয়ে অনুভব করতে পারে। মানুষটার দুচোখের তারায় সেটা যেন স্পষ্ট লেখা। কিন্তু বন্ধুর মুখ চেয়েই সে হয়তো মুখ ফুটে সে-কথা বলে না, বলতে পারে না। সোমার বিশ্বাস, লোকটার এখনো মনে মনে ধারণা ওই বরুণ চক্রবর্তীই এ বাড়ির ছোট জামাই হবে। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব রকমের ভুল এ আভাস সোমা তাকে বেহাত্তার মতো জানায় কি করে। এরকম কোনো প্রসঙ্গ উঠলে সেটা সে সহজ করে দিতে পারে। বলতে পারে আজন্ম বিয়ে না হলেও সোমা হালদার ওই বরুণ চক্রবর্তীর ঘরে যাবেনা —এটা আপনার বন্ধুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন। কিন্তু বলার মতো সুযোগ আসে না। ফলে রাগটা গিয়ে পড়ে বরুণ চক্রবর্তীর ওপর।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল সেদিন। পিছনের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখল, বাবা লোকটার হক নিয়ে বসেছে। ওই অরবিন্দ গাঙ্গুলির। সে-ও সামনে বসে: বাবা হক দেখছে আর এটা সেটা বলছে। যেমন, ছেলেবেলায় তোমার বাপ-মা মারা গেছেন...দাদাদের শাসনে ছিলে, তাদের সঙ্গে তোমার বনে না...তখন নানা রকম দুশ্চিন্তায় ভুগতে তুমি.....

এদিক দিয়ে বাবার কাণ্ড দেখে সোমা মুখ টিপে হেসেছে। কথায় কথায় লোকটার এ-সব গল্প সে-ই বাবার কাছে করেছে।

লোকটা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছে আর মাথা নাড়ছে।

ঠিকুজি নেড়েচেড়ে বাবা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কথা একটু বেশি বলো বুঝি?

অম্লানবদনে সায় দিল, বলল, ওই দুশ্চিন্তার রোগ থেকেই এই রোগ—হরদম দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাচ্ছি।

সোমা এদিক থেকে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসেছে।

সত্য হালদার ঠিকুজিতে মনোনিবেশ করেছেন অবার।—এমনিতে ভালোই কিন্তু অনেক রকমের কাঁড়া আছে তোমার। রাহুটা সব থেকে বেশি উৎপাত করবে, একটা আট রতির গোমেদ ধারণ করা উচিত। আর মঙ্গলটাও খুব ভালো নয়, একসময় বড় রকমের অ্যাকসিডেন্ট ফ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

কিন্তু এ-সব জানার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই যেন লোকটার। বলল, গোমেদ একটা না হয় আপনিই সিলেক্ট করে দেবেন, আর কি ভবিষ্যৎ দেখছেন বলুন—

সত্য হালদার নির্বিকারচিত্ত।—বয়েস তো তোমার তিরিশ দেখছি এখন...।

—আজ্ঞে হাঁ।

—বিয়ের সময় হয়েছে। ভালো বিয়ে হবে।

ঘুলঘুলির ওধারে সোমা নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল, ঠিকুজি দেখে এও বলা যায় নাকি আপনার!

—যায় বই কি, সব বলা যায়।

ঠোঁটকাটা আর কাকে বলে, জিজ্ঞাসা করে বসল, বউ লেখাপড়া জানা হবে?

—গ্র্যাজুয়েট তো নিশ্চয় হবে।

ও-দিকে দাঁড়িয়ে সোমা ধড়ফড় করছে। মানুষটার লজ্জা-সরম নেই।—আর দেখতে শুনতে?

বাবা বয়ে সয়ে জবাব দিল, দেখতে শুনতে সুশ্রীই বলতে পারো।.....নাক মুখ চোখ চলো, গায়ের রং একটু চাপা...বেশ দীর্ঘাঙ্গী.....আর একপিঠ চুল মাথায়..... না, তোমার স্ত্রীভাগ্য বেশ ভালো দেখছি।

মুখ লাল সোমার। হেসে ফেলারও দাখিল সেই সঙ্গে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেয়ানা বটে বাবা। ফাঁক পেলে নিজের মেয়ের চেহারাটাই সামনে তুলে ধরল! তার চুলের গোছা ওই লোক দেখেছে কিনা সোমা মনে করতে পারল না।

এ-ব্যাপারের সাত দিনের মধ্যে সরস্বতী পুজোর সকালে সেই বিভ্রাট।...ভোরে স্নান সেরে পিছনের বারান্দা ভেজিয়ে সোমা আধভেজা-গায়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে আয়নার সামনে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। চুল চিকুনির বশে আনার চেষ্টায় বুকের একদিকের কাপড় সরে সরে যাচ্ছিল—তন্ময় হয়ে নিজেকেই একটু দেখে নিচ্ছিল সোমা। ফুলের ঝুড়ি হাতে ওই লোক কখন বারান্দা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল জানে না।

...আর তারপর খেতে বসে সেই কাণ্ড। খাওয়ার রুচি নেই, আত্মহত্যা বিধিলিপি নাকি।

দিদিরা চলে যেতে বিকেলে এক ফাঁকে ঠিক এসে ধরেছে ওকে। বাবা দিদিদের এগিয়ে দিতে গেছে সেই ফাঁকে ঘরে এসে ঢুকেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছে, তোমার বাবা ভরসা দিয়েছেন আত্মহত্যা করতে হবে না।

বিয়ে হয়ে গেছে।

বরুণ চক্রবর্তী সেই বিয়েতে মাত্র সাতটা করেছে। পেট ভরে নেমন্তন্নও খেয়েছে। তার ওপর সোমার সব রাগ রাতারাতি জল হয়ে গেছে। তার মাথায় অনেক দায়িত্ব চাপিয়েছে অরবিন্দ গাঙ্গুলি। সবার আগে ছোটাছুটি করে তাকেই একটা বাসা ভাড়া করতে হয়েছে। নিজে একখানা খুপরি ঘর ভাড়া নিয়ে আছে বাড়িওয়ালার ক্যানিং-এর বাজারের মাছ তাকের জন্য ছুটতে হয় আর সকালের আগে ফেরে না—দুই দিনের কামুক ঘণ্টা ছাড়া সে-ঘরও বোধহয় ভাল সময় তালা বন্ধ থাকে। ক্যানিংএও তার ছোট ভেরা আছে একটা রাতের কয়েক ঘণ্টা সেখানেই ঘুমিয়ে নেয়।

বাড়ি ভাড়ার দরকার হয়েছে বউভাতের জন্য। কারণ, অরবিন্দ থাকে পাড়ার একটা ক্লাবে ঘরে। প্রাণের বন্ধু দীপেন ভটচায সেই ক্লাবের মাতব্বর। দীপের খুড়-তুতো ভাই দীপেন ভটচায, অরবিন্দ তার সঙ্গে কলেজে বছর দুই পড়েছিল। তার মুরুব্বিয়ানায় বিনা ভাড়ায় সেই ক্লাবের জায়গা মিলেছে। কিন্তু সেখানেই বা বউ নিয়ে গিয়ে ওঠে কি করে আর ওই এক ঘরে বউভাতই বা হয় কি করে।

সত্য হালদার ইচ্ছেটা অন্যরকম ছিল। বিয়ের দিনকণ পাকাপাকি করে ফেলার পর অরবিন্দের দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছে ছিল। শুনেছেন শিয়ালদহের কাছে দুখান-কোঠা এদের। দাদাদের সঙ্গে সম্ভাব থাক আর না থাক এক তৃতীয়াংশের মালিক তো বটেই ছোট জামাই। —বিয়ের সময়ও সমস্ত সম্পর্ক ছেঁটে বসে থাকা বিষয়-বুদ্ধির লক্ষণ নয়। অতএব তিনি চেয়েছিলেন দাদাদের খবর দিয়ে বউ-ভাতের অনুষ্ঠানটা সেখানেই হোক।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি সে-প্রস্তাব কানেও তোলেনি। বলেছে, খবর পেলে দাদারা বরং বিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করবে, তাদের চেনেন না।

সত্য হালদার ঘাবড়েছেন আর চুপ মেরেও গেছেন।

না ছোট মেয়ের বিয়েতে খরচে কার্পণ্য করেননি তিনি। চার জামাইয়ের মধ্যে ছোট জামাইয়ের ওপরেই তাঁর সব থেকে বেশি নির্ভর। কারণ সে চেষ্টা করলে খরচের অবস্থা ফেরাতে পারে এ বিশ্বাস বন্ধমূল। দ্বিতীয়, বরাত জোরে যে জামাই জুটেছে তাতে মেয়েটাকেও ছেড়ে থাকতে হবে না বা তিনি নিরাশ্রয় হবেন না এই ভরসে। এটাই যখন কর্মস্থল, মেয়ে জামাই এ-বাড়িতে তাঁর সঙ্গেই থাকবে এও স্থির। অতএব তাঁর দেখা-শুনার লোকের অভাব হবে না। মনের আনন্দে তিনি বাড়ির লাগোয়া বাড়তি জমিটুকু বিক্রী করে দিয়েছেন। আর তার-পর এই দুর্মূল্যের বাজারেও অন্য মেয়েদের থেকে কম খরচা করেন নি।

মায়ের দেওয়া ছোট মেয়ের জন্যের সোনা তৃতীয় মেয়ের বিয়েতে খরচ করে ফেলেছিলেন। তার বেশি দাম দিয়ে যা খরচ করেছেন তার অনেক বেশিই ফিরেছেন তিনি। মেয়ের পছন্দমতো গয়না গড়িয়ে দিয়েছেন। দু'ছড়া হার আট গাছা চুড়ি বালা চন্দ্রহার কণের দুসেট দুল দুটো আংটি,

জামাইয়ের সোনার বোতাম বাট ড্রেসিং টেবিল—বলতে গেলে কিছুই বাকি রাখেনি। মেয়তলের ঘটা কমিয়েও কম করে বাইশ হাজার টাকা তার খরচ হয়েছে। হোক। এই শেষ কাজ, ভালো করেই চুকে-বুকে যাক।

বউভাতসুদ্ধ ঘরে সোমা মাত্র তিন পক্ষের জন্য সেই ভাড়াটে বাড়িতে ছিল। তারপর বাপের তাগিদে অরবিন্দকে নিয়ে এ বাড়িতে উঠে এসেছে। আসতেই যখন হবে বাড়ি ভাড়া গুণে কি লাভ। মাঝখান থেকে বিয়ের জিনিসপত্রগুলো সেখানে ধুলো পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

হাঁ তিনটে মাস সব-কিছু ভুলে থাকার মতোই আনন্দে কেটেছে সোমার। মাত্র তিনটে মাস। এ লোককে সামাল দিতে গিয়ে নাজেহাল সে। অফুরন্ত হাসি আর অনর্গল কথার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ওকে। আর সেই ফাঁকে নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

...সোমার প্রথম শর্ত ছিল এখন ছেলে-পুলে নয়। কাড়া হাত পায়ে কিছুদিন আনন্দে কাটুক। ওই লোক যখন নিজের কাজে পাঁচ জায়গায় যাবে তখন ও-ও সঙ্গে যাবে, ঘুরবে বেড়াবে। সবেতে এক কথায় রাজি অরবিন্দ গাঙ্গুলি। কিন্তু রাতে—রাতে কেন, দিনে দুপুরেও প্রত্যাশার মুহূর্তে বেপরোয়া হামলা মানুষটার। ডাক্তার কথা শোনালে দু'কথায় নস্যাৎ করে দেয় বলে সব ঠিক আছে, আমি কি কাঁচা ছেলে নাকি, তোমার কোনো ভাবনা নেই।

অবশ্য এ একটা ভালো সোমার ছিল তাও নয়। সেই মুহূর্তে তৃপ্তির আবেশে সে নিজেও ভেসে যেত। গোড়া থেকেই স্নেহ ভালবাসাবঞ্চিত এই মানুষটার ওপর ভারী মায়া পড়ে গেছিল তার। দু'হাতে তাকে আগলে রেখে সেই স্নেহ ভালবাসার অভাবটা পূরণ করে দিতে চেয়েছে। ফলে দু' মাস না গড়াতে সচকিত। শরীরটা হঠাৎ কেমন বেতালা লেগেছে সোমার। অবশ্য কিছু দিনের মধ্যেই যা বোঝবার বুঝে নিয়েছে। আগন্তুক আসছে। তখন অবশ্য রাগও হয়েছে।

—তুমি না বলেছিলে ভাবনার কিছু নেই, এখন কি হল?

সোনার পর খুশীতে আটখানা হবে আরো তরল আদর করতে চেয়েছে। বলেছে ভাবনার আবার কি, আমি কি-রকম পুরুষ মানুষ একবার অন্তত বাচাই হয়ে যাওয়া দরকার।

কথা সাময়িক। ভিতরে ভিতরে খুশীই হয়েছে সোমা। রাতে আদরের ফোয়ারে ভেসে কত দিন ওই বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে জিজ্ঞাসা করেছে, কি হবে বলো ছেলে না মেয়ে?

অরবিন্দ গাঙ্গুলী নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছে, মেয়ে।

—কক্ষনো না। ছেলে।

—উঁহুঁ, তোমার মতো মেয়ে।

—কক্ষনো না। তোমার মতো ছেলে।

দুজনের হুটোপুটিতে সব ঘোষণাই বিস্মৃতির অতলে ডুবেছে তারপর।

আর এক ব্যাপারেও মানুষটা অবুঝের মতো নাজেহাল করেছে তাকে। ফোটো তোলার ব্যাপারে। ক্ষেপেছার করে গায়ের জামা কেড়ে নিয়ে আয়নার সামনে চিরুনি হতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পিছন থেকে কি বিচ্ছিরি যে ছবি তুলেছে ফটাফট—পরে সেই সব ছবি দেখে সোমার দু কানের ডগা পর্যন্ত লাল। কেড়েকুড়ে নিয়ে কতগুলো ছবি নষ্ট করেছে কিন্তু সবগুলো পারে নি। এমন দাঁড়িয়েছিল যে, স্নান সেরে তার উপস্থিতিতে ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ানো বন্ধ হত। আবার এক-একদিন হেসে হেসে বলত, সেই সন্দেহী পক্ষের সকালে তোমাকে ওভাবে মাথা আঁচড়াতে না দেখলে আমি অতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতাম না আর তুমি তাহলে ঠিক ওই বন্ধু চক্রবর্তীর গলায় দিয়ে বলতে।

অন্য সময় নিজেই আবার নিজের কথা নাকচ করেছে। বলেছে বন্ধুদের সঙ্গে তোমাদের এখানে প্রথম ঢোকার তিন মাস আগে থেকে তোমাকে লক্ষ করেছি, একটু দেখার জন্য রাস্তায় এক-একটা ওষুধের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি। আর তখন থেকেই তোমাকে পাওয়ার পাগলামো করেছি। বলেছে আর নিজের বাহাদুরীতে হা-হা করে হেসেছে।

লোকটা কথা একটু বেশী বলে। আর সব কথার মধ্যেই নিজেকেই বেশী জাহির করে। কিন্তু তাও খারাপ লাগত না সোমার। মনে মুখে আগল নেই—ভালোই।

বন্ধুর চক্রবর্তী ওদের বিয়ের পর এ-বাড়ী আসা কমিয়ে দিয়েছিল। বলত ব্যবসার ধকল বাড়ছে, সময় পাচ্ছে না। তার মুখ দেখে মনের কথা বোঝা যেত না। আগের মতোই স্নিগ্ধ হাবভাব। সোমা অরবিন্দকে বলেছে, তোমাদের ওই বাঁদর স্বভাবের সঙ্গেই বন্ধুবরের বিয়েটা লাগিয়ে দাও না—

অরবিন্দ গাঙ্গুলীর এ-সব কথায় ভারী উৎসাহ। বন্ধুর কানে প্রস্তাবটা তুলেছে। সে রাজী হলে দীপেনকে বলবে। কিন্তু তার আগেই হতাশ হয়ে সোমাকে জানিয়েছে বন্ধুটা একটা অপদার্থ, তার নাকি বিয়ে করার মতো অবস্থা এখনো হয় নি। আসলে একবার ঘা খেয়ে আবার বাতিল হবার ভয়েই এই রকম বলে—বুঝলে?

সোমা না বোঝার ভান করতে ছাড়ে না। একবার আবার কে বাতিল করল?

দু হাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে অরবিন্দ আদর করেই [illegible] বাতিল করল। [illegible] করে উঠল [illegible]

আসতে হবে তোকে—তা বলে সেই শোকে বিয়েই করবি না?...বাঁশটাও নাক উঁচু মেয়ে অবশ্য, মাছের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে শুনলে আশি-বাটি নিয়ে তাড়া করবে হয়-তো—কিন্তু এ-শর্মা চেষ্টা করলে না পারে কি?

ঘুরে ফিরে সেই নিজের কেরামতির কথা। হাসি চেপে সোমা ভুরু কোঁচকালো। —তুমি নিজের মুখে নিজের কথা এত বেশী বলো কেন?

এ-রকম বললে তবে লোকটা তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনে।

দীপেন ঘটকের প্রায়ই আসে আড্ডা দিতে। কিন্তু এই লোকটার হাব-ভাব চাছা-ছোলা আবার। একেবারে উল্টো। কি করে যে এত বন্ধুর দুজনের ভেবে পায় না। অরবিন্দ গাঙ্গুলী বেশী কথা বলা শুরু করলে থামতে থামায়। বলে বাজে বকিস না থাম এবার। সোমাকেও একদিন বলেছে, তুমি ওর এই বেশী কথা বলার অভ্যাসটা বন্ধ করো দেখি ম্যাডাম—

ভালো মুখ করে অরবিন্দ গাঙ্গুলী জবাব দিল, বন্ধ করবে কি করে তাহলে তো সারাক্ষণই ওকে অমোর মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকতে হয়!

সোমাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

মাস তিনেকের মধ্যে সামান্য একটা ঘটনা থেকে সোমার মনে একটা সংশয়ের আঁচড় পড়েছিল। তার আগেও অর্থাৎ বিয়ের প্রথম আবেগ আর প্রথম উচ্ছ্বাস একটু স্থিমিত হতে মানুষটার কিছু আচরণ খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি সোমার। যেমন বিয়ের দশ পনের দিন বাদেও লোকটা কাজে বেরোচ্ছে না দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল আপিস-টাপিস করছ না যে কি ব্যাপার?

জবাব দিয়েছে, আপিসের নাম শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে, খবরদার আপিসের নাম করবে না। পরে বলেছে আপিস থেকে তো ছুটি ফুরোবার আগে জয়েন করার জন্যে জুলুম করছেই—গাঙ্গুলী না হলে কোম্পানী অচল এ-রকম ভাব সকলের—কিন্তু এ-শর্মা এবার ছুটি ফুরোবার একদিন আগে জয়েন করছে না!

সোমা জিজ্ঞাসা করেছে, কত দিনের ছুটি?

—এক মাস।

সোমা হেসে উঠেছে, বিয়ের নামে একেবারে এক মাসের ছুটি!

—তা না তো কি আমার বিয়ে চাট্টিখানি ব্যাপার! ছুটি চাইতে আপিসের জীবনেশ কর্তামা দরাজ হাতে ছুটি দিয়ে কত রকম ঠাট্টা তামাসা করেছে।

সোমার হঠাৎ মনে পড়েছে কি।...না আপিসের জীবনেশ লোক ছেড়ে বরের তরফের কোনো পলাশনা লোককে সে উপস্থিত দেখে নি কোনো দিক থেকে কোনো [illegible] আসেনি। জিজ্ঞাসা করেছে বিয়েতে

তোমার বাড়ীর লোককে তো খবর দাও নি ভ্রান্তি, কোম্পানীকেও কাউকে বলো নি নাকি?

—কেপেছ? কোম্পানীর সমস্ত ওপর-অলাদের সঙ্গে একটা কোল্ড ওয়ার চলেছে আমার। দাবীপত্র মেনে না নিলে চাকরি রিজাইন করব হুমকী পর্যন্ত দিয়েছি। ওদেরও অসুবিধে কিছু আছে অবশ্য, আমাকে দিতে গেলে আলো একদল-জন হৈচৈ করে উঠবে। এর মধ্যে নেমন্তন্ন করলে কর্তারা সব দল বেঁধে আসত তোমাকে দুই-এক হাজার টাকার কিছু উপহার দিয়েই আমাকে কেনার চেষ্টা করত—এই যে এক মাসের ছুটি নিয়ে বসে আছি তাতেই চোখে অন্ধকার দেখছেন বাছাধনরা।

মাস কয়েকের তাকে আবার মোটা রাগ হাতে কাজে ফেরতে দেখেছে অবশ্য। কিন্তু সেটা এত অনিয়মিত যে, সেমার অসুবিধে হচ্ছে। অরবিন্দ বলে, ফিল্ড ওয়ার্ক করি আমার কি দশটা পাঁচটা ধরা-বাঁধা আপিস নাকি! কখনো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপিস কখনো সমস্ত দিন রাতই ছুটি—বুঝলে?

সোমার সঙ্গে তার কথা হয়েছিল মাসে দুশ টাকা করে সে বাবার হাতে দেবে। অরবিন্দ আপত্তি করেছিল মাত্র দুশ টাকা! ওতে কি হবে? অন্তত সাড়ে তিনশ দেওয়া উচিত।

নতুন সংসারীপনার মতোই সোমা পরামর্শ দিয়েছিল, দুশ টাকা হাতে পেলেই বাবা খুশী হবে তাছাড়াও খরচ তো এটা-সেটা যেমন কাজে—করবেই। নিজেদের হাতেও কিছু থাকা উচিত।

প্রথম মাসের দুশ টাকা স্বামীর হাত দিয়ে শ্বশুরের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের দশ বারো দিন কেটে যায় দেখে সোমাই জিজ্ঞাসা করেছে, এ মাসের মাইনে পাওনি এখনো?

অরবিন্দ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন বলো তো?

—বাবাকে মাসের টাকাটা দিলে না?

—দেখেছ! একদম ভুলে গেছি আজই এসে দেব।

দিয়েছে। সোমা জিজ্ঞাসা করেছে, মাইনের টাকা কি ব্যাঙ্কে রেখে এসেছিলে নাকি?

অরবিন্দ হেসে জবাব দিয়েছে, আমার পকেটই আমার ব্যাঙ্ক মাইনের কে পরোয়া করে!

তৃতীয় মাসেও সেই একই অবস্থা। এবারে দু-তিন দিন মনে করিয়ে দেবার পর বাবার টাকা হাতে পেয়েছে। মাসের শেষে মাইনে কেন চেয়ে দেখে না সোমা ভেবে পায় না। বিয়ের আগে শুনেছিল নগদ টাকা মাইনে পায়। কিন্তু সে-টাকা ঘরে এসে পকেটে থাকার কথা নয় রাখার জন্যে ও হচ্ছেই দেবার কথা।

এর পরের মাসেই একটা ঘটনা থেকে সোমার মনে অস্বস্তির আঁচড় পড়ল একটা। রাত-রাতে একটা হৈ-হৈ কাণ্ড পাড়ায়, কিন্তু সোমা আর অরবিন্দ তাদের ঘরে ঘুমুচ্ছে। অনেকে চেষ্টা করেও সেই ঘুম সহজে ভাঙাতে পারছে না।

ঘুম ভাঙার পরেও বাড়ীতে এত লোক কেন চট করে বুঝে উঠতে পারছে না। মাথাটা কেমন ভার হয়ে আছে তেমনি ঝিমঝিম করছে সোমার। কিন্তু এর পর ব্যাপারটা যখন বোঝা গেল তখন হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি।

রাতে দরজা ভেজিয়ে চোর ঢুকেছে ঘরে। খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কও টেনে বার করেছিল। তারা টের পায় নি বাইরে জানলা দিয়ে ঘরে ওষুধ ছড়িয়ে ওদের ঘুম পাড়ান হয়েছিল। কিন্তু সামনের বাড়ীর একজন দৈবাৎ সেই সময় উঠে বাইরে বেরুতে গিয়ে অন্ধকারে একটা লোককে দেখে আর ঘরের ভিতর টর্চের আলো দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। সভা হলেও ঘুম ভেঙে যায় তিনিও সাড়া দিয়ে দরজা ধাক্কান। তাদের চেঁচানির ওপর নিশ্চয়ই বাইরে থেকে একজন আর সোমার ঘরের ভিতর থেকে দুজন পটলডাঙা পালিয়ে যায়।

না, সোমার ট্রাঙ্ক অক্ষতই আছে। ভাগ্যের অবদান মেলে নি। কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল ভেবে সোমা থরথর করে কেঁপেছে। বিয়ের সমস্ত গয়না ওই ট্রাঙ্কে সে-সব তো সেদিন গায়েরও ছিল না। ওই ঘুমের অবস্থাতেই বলে নিয়ে যেত।

পরদিনই সোমা বলল, এ-সব গয়না সে আর এক রাত্রিও বাড়ীতে রাখবে না—ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসতে হবে। বাড়ী থেকে আধ মাইল দূরে ব্যাঙ্ক-অফিসের লকার আছে সোমা জানে। সেখানে লকার ভাড়া করা যেতে পারে নয়তো সে ব্যাঙ্কে অরবিন্দর অ্যাকাউন্ট আছে সেখানেও লকার ভাড়া করা যেতে পারে--

অরবিন্দ ফস করে বলে ফেলেছিল, আমার কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট-ফ্যাকাউন্ট নেই—কাছের ব্যাঙ্কেই রাখা ভাল।

সোমা অবাক একটু। —কোনো ব্যাঙ্কেই অ্যাকাউন্ট নেই তোমার?

—অ্যাকাউন্ট নেই অ্যাকাউন্ট হতে কতক্ষণ, দশ পনের পঞ্চাশ টাকা হলেই অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। বস আজই ব্যবস্থা করা হয় কিনা দেখো। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমাকে চেনে, পেয়ে যাব।

সেই দিনই সকাল দশটায় ব্যাঙ্কে গিয়ে ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। ম্যানেজার জানিয়েছে দুই-একটা মাত্র লকার খালি আছে, নিলে আজ-কালের মধ্যেই নিতে হবে। ছুটি যতো বাড়ছে লকারের ডিমাণ্ডও ততো বাড়ছে।

সোমা জানালো ও সেই দিনই নেবে।

চেক-বুকটার সদ্ব্যবহার পেতে হলে কম-সে-কম পনেরো টাকা জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। ম্যানেজার জানিয়েছে। ওই থেকে লকার ভাড়া আর কনট্রাক্ট-এর মাশুল কাটান দিয়েও একশ টাকার ওপর ব্যালান্স থাকবে তাহলে।

সোমা তাতেই রাজি। কিন্তু চেক-বুক ওই কটা টাকাও অরবিন্দর সঙ্গে আছে কি। ম্যানেজারকে বলল দুটো পর্যন্ত বসে সে আওরঙ্গ টাকা জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে যাবে, আর লকারের ডুপ্লিকেট-পত্র যা রাখার তাও সঙ্গে নিয়ে আসবে।

বাইরে বেরুবেই সোমা বিল্লু, আর টু বলে স্কুলে নিতে এসেছে অথচ টাকা সঙ্গে আসেনি।

অরবিন্দ জবাব দিল, লকার খালি আছে কি না আছে খবর নিতে এসেছিলাম, একদিন হবে যাবে আমি কি জানি! ব্যাঙ্কের মধ্যে করলেই তো হল।

কিন্তু বাড়ি এসেই অফিসের কি জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল তার। নাওয়া-খাওয়ারও সময় নেই আর। ছোট্ট ছোট্ট ব্যাগটা তুলে নিয়ে তক্ষুনি বেরুল। ওষুধের সঙ্গেই বোঝাই যাচ্ছে ওটা—আর ওষুধের লিটারেচর। বলে গেল, তুমি তৈরি থেকো, আমি যাব আসব—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার বদলে চক্রবর্তী এসে হাজির। ইদানীং কমই আসে। সোমার ধারণা তার মন আজকাল ভালো না। ঘরের লোকের মুখে শুনেছে দীপেন ভট্টাচার্য নাকি তুমি খুড়তুতো বোন বলে ভট্টাচার্যকে এই লোকের হাতে গাপাতে চেয়েছিল। তা সেই আক্রোশও নাকি

এ প্রসঙ্গে শুনে নেওয়া যাক সিটুয়েশন। অরবিন্দর আশীর্বাদ করবার সেই ছিরছাঁদের মাদ্রাজীরা মেজাজে সোমাকে বলেছে, সে-চেষ্টা করলে এমন লটঘট বাঁধিয়ে দিতে পারে যে, হুড়-মুড় করে ওই সময় বরণ চক্রবর্তীর ঘরে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু বরুণটাই এখনো মন ঠিক করতে পারেনি। পরে ঠাণ্ডা করেছে প্রথম আঘাতের শোকটাই এখনো ভুলতে পারেনি বোধহয়—

যথার্থ সেই আঘাতের শোকের কারণ—সোমা। ও মুখে রাগ দেখায় বটে কিন্তু মনে মনে হয়ও সেই রকমই ধারণা। ফলে এই লোকের জন্য এখন ওর কি-রকম যেন মায়াই লাগে।

বরুণ চক্রবর্তী এলে এখন আর বাইরের ঘরে অপেক্ষা করে না। ওদের বিয়ের পরে এটুকু পথ অরবিন্দই প্রশস্ত করে দিয়েছে। এসেই জিজ্ঞাসা করল, অরু কোথায়?

সোমা জবাব দিল, আপিসে। শিগগীরই ফিরবে.....আপনি কোত্থেকে?

—আমি একটু বেরিয়েছিলাম, নিচের হলার লোকের মুখে শুনলাম অরু খোঁজ করতে এসেছিল, তবে দরকার জানিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক বাদে আসবে বলে গেছে। তাই খবর নিতে এলাম।

শুনে সোমা কিন্তু খানিকক্ষণ।—

—আপনার খোঁজে কখন গেছল?

—এই আধঘণ্টা-টাক আগে।

সোমার যত চেনা আপনার জনেরই কেমন একটা আবেগ।

ছ' তারিখ। কিন্তু বাবার বরাদ্দ মুদ্রণ টাকা এখনো নেয়নি। আলি পকেটে ব্যাঙ্কে গেছে। এসেই আপিসের তাগিদে ছুটেছে, কিন্তু আগে গেছে এই লোকের বাড়ি। আপিসে গিয়ে থাকলে আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এখানে বাড়ি মানে কি করে—হাবে কেন? ওর মন বলল, টাকার তাগিদে গেছল আর আরও টাকার তাগিদেই যাবে। তক্ষুনি মনে পড়ল, ওদের বিয়ের মাসখানেক আগে ব্যবসার জন্য এই লোক সাড়ে সাতশ টাকা ধার নিয়েছিল। তার মাসের মধ্যেও সে-টাকা ফেরত দেয়নি নিশ্চয়, না না হলে এর কাছে টাকা চাইতে যাবে কেন!

সোমা ভিতরে ভিতরে তক্ষুনি বিরূপ হয়ে উঠল একটু। এই বরুণ চক্রবর্তীই গল্প করেছিল লোকেরা টাকা ধার নিয়ে অনেক সময়ই ফেরত দেয় না। আর বাবা তারপর সাড়ে সাতশ টাকা নেবার জন্য একটু হেঁটা দিলে কি বলতে ভরসা দিয়েছিল, এ টাকা মরে যাবে না, বরং কিছু বেশিই ফিরে আসবে।

কিছু বলা সম্ভব নয়, বলতও না। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তীর এই পরের বেফাঁস উঁকিটা ঠাস করে যেন মুখের ওপর লাগল সোমার। সে জিজ্ঞাসা করল, আপিসে গেছে মানে সেই পুরনো আপিসে?

সোমা বলল, আপিস আবার নতুন পুরনো কি, আপিস তো একটাই—

বরুণ চক্রবর্তী হুমচাকিয়ে গিয়ে বলল, আমি তাহলে ভুল শুনেছিলাম...

—কি ভুল শুনেছিলেন? তিক্ততা নিজের অগোচরেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সোমার।

বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল বরুণ চক্রবর্তী। এই মেয়ের চোখ-মুখ হঠাৎ এ-রকম ধার-ধর কেন বুঝতে পারছে না। ঠোকে-ঠোকে জবাব দিল, তবু নিজের মুখে কিছু বলেনি, দীপেন ভট্টচায বলছিল ওর আপিসে অনেক আগেই নাকি কি-সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে, আমাকে বলছিল ওর এই ব্যবসা-ট্যাবসাও ওর দ্বারা হবে না—তোমার সঙ্গে মাছের ব্যবসায় লাগিয়ে দাও। হটু করে নিয়ে করে বসার জন্যেও রাগ করছিল—

ভিতরটা তেতে উঠতে লাগল সোমার। নিঃসংশয়ে মনে হল, ওকে নিয়ে করতে না পারার জ্বালাতেই আজ প্রাণবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভালো মুখ করে এ-সব কথা শোনাচ্ছে। নইলে আপিসের কাজে ওরের লোক যে ভালো পরিতুষ্ট নয় সোমা নিজেই সেটা জানে। সেখানে খটাখটি আর মন কষাকষি চলছে এও সোমার অজানা নয়।

অনেক কাঁকালো সুরেই বলে উঠল, ঠকবার না রাখার মত কিছু ঘটে থাকলে আপনি না জানলে আমাকে সেটা জানানো দরকার বোধহয়?

ঘাবড়ে গিয়ে বরুণ চক্রবর্তী সায় দিল, হ্যাঁ, তা তো জানার সং...

সোমা আবার শেলের সুরে জিজ্ঞাসা করল, আপনার মাছের ব্যবসা এখন কেমন চলছে? খুব ভালো?

—ইয়ে, খুব না তবে একটু ভালোর দিকেই।

সোমার রাগ বাড়ছে। ভালোর দিকে কিছু সেই সাড়ে সাতশ টাকা হজম করে বসে আছে। হাসতেই চেষ্টা করল।—আপনি হাড়াতাড়ি ছুটে এসেছেন কেন, দীপেন ভট্টাচায্যির কথামতো আপনার ব্যবসায় ডেকে নেবার জন্যে?

—না-না ওর চাকরি বাকরির ব্যাপারটা আমি ভালো করে জানিই না কিছু। বাড়িতে আমার খোঁজ করতে গেছল আপনার খুব দরকার বলে এসেছে তাই খপর নিতে এলাম।

সোমা তার মুখের ওপর থমকে তাকালো। বসন্তের গর্ত-কতক দাগমারা সরাসরি মুখটা কেন কেন আরো বেশি কুৎসিত লাগল। যে-কথা কখনো উচ্চারণ করতে পারবে ভাবেনি ঠাণ্ডা মুখে তাই বলে ফেলল।—আপনার বাড়ি কেন গেছল তা আমি জানি, হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে...কাল রাতে আমাদের বাড়িতে সাংঘাতিক চুরির অ্যাটেম্পট হয়ে গেছে, ঘরে ঘুমের ওষুধ ছড়িয়ে আমাদের বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছিল—

—কি সর্বনাশ! নেয়নি তো কিছু?

—না তার আগেই লোক জানাজানি হয়ে গেছে। চোর পালিয়েছে—

—তারপর? তবু নিশ্বাস বন্ধ বরুণ চক্রবর্তীর।

—তারপর আর কি। ঘরে যা আছে সব ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসব ঠিক হয়েছে—ব্যাঙ্কে সেই অ্যাকাউন্টস খোলবার জন্যেই টাকার দরকার—চাকরি করলেও সব সময় তো ঘরে টাকা থাকে না—

—তা তো বটেই, বরুণ চক্রবর্তী মাথা নেড়ে সায় দিল।—কত দরকার?

—আপাতত দেড় শ'। বলে ফেলার পর মনে হল আরো বেশি বললে ভালো হত, সাড়ে সাতশর মধ্যে যা উশুল হয়। কিন্তু বলে ফেলার পর সেটা আর ফেরানো গেল না।

কিন্তু টাকাটা তক্ষুনি পাবে সোমা আশা করেনি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বরুণ চক্রবর্তী টাকা বার করল কিছু। খান তিনেক একশ টাকার নোট আর কিছু দশ টাকার। তার থেকে দেড়শ টাকা পৃথক করে সোমার দিকে এগিয়ে দিল।—এটা রাখো তাহলে.....

হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে একটুও দ্বিধা বোধ করল না সোমা। তারপরও ভিতরের অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবটা কমেনি। ও-যে

বাহির হইল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত বিশ্ববিখ্যাত বই কর্ণেলিয়াস রায়ানের "The Longest Day'

বাংলা অনুবাদ: ১২-১০

দীর্ঘতম দিনটি

ভাষান্তর—মনোজিত লাহিড়ী

শ্রাবণের মাসের

দিন বাদলায়

এ-বছরের বহু বিতর্কিত নতুন উপন্যাস। ১২-০০

"বি সিক্রেট অব আমী রোজের" ছায়া অবলম্বনে রহস্য উপন্যাস। প্রথম মুদ্রণ প্রায় নিঃশেষ দ্বিতীয় মুদ্রণের দাম বাড়বে। ৭৫

ভারত-চীন সড়ক

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রায় নিঃশেষ। তৃতীয় মুদ্রণের দাম বাড়বে। বিশ্ববিখ্যাত লেখক আর্নল্ডজেনেভের রহস্য উপন্যাস 'দি গ্রান্ড-ব্যাবিলন হোটেলের' অনুবাদ। ১০-০০ বইখানি অনুবাদ করেছেন—শ্রীইন্দুভূষণ পাল।

দ্বৈত ভূমিকা

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির ১৫বি, শ্যামার লেন, কলিকাতা—৯।

সব জানে সেটা বোঝাবার জন্যেই বলল তাহলে এলে কি বলব ...সাড়ে সাতশ টাকার মধ্যে আপনি দেড়শ রেখে গেছেন?

বরুণ চক্রবর্তী বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইল খানিক। কি বলছে তাই যেন বোধগম্য হচ্ছে না—সাড়ে সাতশ টাকা কি?...

এরকম ভিজে বেড়ালের মুখে দেখলে রাগ না রাগ হয়। আলতো ঠাণ্ডা সুরে বলল, আমার বিয়ের আগে বাবার হাত দিয়ে এর কাছ থেকে যে সাড়ে সাতশ টাকা নিয়েছিলেন, এটা তার থেকে দিচ্ছেন তো?

লোকটা যেন হতভম্ব খানিক। বসন্তের রাগ-মাখা মুখের একটু নীরব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে সোমা।

কণ্ঠে চক্রবর্তী গম্ভীর মুখে বলল সে-টাকা আমি পরের মাসে তোমার বাবার আগেই শোধ করে দিয়েছি—সাড়ে সাতশ'র জায়গায় আটশ' দিয়েছি—আর হাল পরেও দিয়েছি কিছু.....এই দেড়শ আমার নিজেরই টাকা।

গালের ওপর যেন আচমকা একটা চড় খেয়ে উঠল সোমা। বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। বিশ্বাস করতে চায় না, আবার বিশ্বাস না করার মতো শক্তিও যেন পাচ্ছে না। হাতে-ধরা দেড়শ টাকা আবার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিক্ত স্বরে বলে উঠল, তাহলে আপনার টাকা আপনি নিয়ে যান, আপনার টাকা আমি নিতে যাব কেন, নিন, নিন—

এবারে আবার ঘাবড়েই গেল বরুণ চক্রবর্তী। একটা কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে বুঝতে পারছে। সামলে নিতে চেষ্টা করে বলল তুমি রাগ করছ কেন বুঝতে পারছি না—টাকা হঠাৎ-হঠাৎ মানুষেরই দরকার হয়—আমার দরকারের সময় আমিও তো নিয়েছি—শুধু আমি কেন, বিপাকে পড়ে কত জনে কত টাকা নিয়েছে অন্যের কাছ থেকে তুমি ধারণা করতে পারবে না। টাকাটা রাখো—আমি পরে আবার এক সময় আসব খন।

ভরসা করে আর অপেক্ষা করতে পারেনি। দ্রুত পালিয়ে এসে বেঁচেছে যেন।

হাতের টাকা তবু ছুঁড়েই ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল সোমার। কিন্তু এর মধ্যেই মনে হল মাথা গরম করলে ভুল হবে। তলিয়ে ভাবার মতোই অনেক কিছু। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে টাকাটা তার মধ্যে রাখল। টাকা শোধ না করেও ও-কথা বলে যাবার মতো বুকের পাটা বরুণ চক্রবর্তীর নেই। তার মানে এই একজনই আজ তার কাছে উল্টে ধার চাইতে গেছল।

...মাসের আজ ছ' তারিখ। সরকারি অফিস নয় যে পয়লা তারিখেই মাইনে হবে—আট দশ তারিখেও হতে পারে। গত তিন মাসে তাগাদের পরে বাবাকে টাকা এনে অনেক দিয়েছে কিন্তু পুরো মাইনে সোমা কোনদিন দেখেনি আজ পর্যন্ত। কে যে বাপার হতে পারে কিছুই মাথায় আসছে না এখন। দীপেন ভট্টাচার্যের ঢ্যাঙাপেটা মুখ, সে-কি ইয়ার্কি করে বরুণ চক্রবর্তীকে একে নিজের ব্যবসায় টেনে নিয়ে যেতে বলেছিল? দুর, কুকুরে কামড়েছিল সেদিন।

...হুট বলে বিয়ে করে বসার জন্যে দীপেন ভট্টাচার্য নাক সিঁটকেও ছিল। বাটা ছেলে 'তুমিল বয়স বয়সে বিয়ে করাছে সেটা হুট করে কি করে হল' এ উক্তি থেকে চক্রবর্তীর নিজের হতে পারে। বন্ধুর জন্যেই বলেছে। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তীর এ-রকম বানিয়ে বলার মতো সাহস হবে? ...দীপেন ভট্টাচার্য ইদানীং কম আসছে। সোমার খেয়াল হল, এলে হৈ-হৈ করে এই লোক আজকাল তাকে ঘর ডেকে এনে বসায় না। তার সাড়া পেলে নিজে বাইরে চলে যায়।

মাথাটা বিশ্রীরকম ঝিমঝিম করছে সোমার। ঘরের এক কোণে মাঝারি সাইজের হাঁ-করা সুটকেস একটা। তাতেই আর একজনের জামা কাপড় প্যান্ট থাকে। সোমার কতদিন মনে হয়েছে জামাইকে একটা নতুন সুটকেস কিনে দেওয়া উচিত ছিল বাবার। হাতে টাকা এলে নিজেই কিনে দেবে ভেবে-ছিল। হাতে টাকা এলে মানে মাইনের টাকা এলে। যাই হোক, ওই খোলা সুটকেস টাকা কেউ রাখতে পারে না। সোমার কাছেও নেয় না, ব্যাঙ্কেও রাখে না। টাকা যা আনে কি হয় তাহলে—পকেটে পকেটেই থাকে? কিন্তু ব্যাঙ্কে গিয়ে তো দেখা গেল তাও নেই। এই অবস্থায় পড়ে কি করে মানুষ তাও মাথায় আসে না। কি অবস্থায় পড়েছে সে-তো বোঝাই যাচ্ছে, নইলে বরুণ চক্র-বর্তীর কাছে টাকার জন্য ছুটবে কেন...।

ফিরল বেলা তিনটেরও পরে। ঘামে ভেজা মুখ রোদের তাতে কালচে দেখাচ্ছে। ঘরে পা দিয়েই হাসতে চেষ্টা করে তড়বড় করে বলল, আজ আর হল না, ভয়ানক আটকে গেলাম—কাল ঠিক। তুমি কিছু ভেব না, আজ আমি সমস্ত রাত জেগে তোমার ঢাকা পাহারা দেব।

না চান করে না খেয়ে বেরিয়েছে লোকটা। এই মূর্তি দেখে সোমা একটুনি এ-ব্যাপারে একটা কথাও বলল না। নিজেরও খাওয়া হয়নি তখন পর্যন্ত।

খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে ঢুকেই কথাটা না তুলে পারা গেল না। জিজ্ঞাসা করল, কাজটা আজ হল না কেন, কোথাও টাকা পেলে না?

অরবিন্দ ভাদুড়ি ধড়ফড় করে উঠল একটু। বলল, আমি ঠিকই যোগাড় করেছিলাম তোমাকে যে বলল, আপিসে ভয়ানক দরকারি কাজ ছিল, যাবার সময় সেই সঙ্গে মাই-নেটাও যদি নিয়ে আসতে পারি—

মাইনে পেয়েছ?

—নাঃ। সে-জন্যে তুমি কিছু ভেব না, কালকের মধ্যে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সোমার এসব কথার মধ্যে ঢুকতে বিচ্ছিরি লাগছিল, তবু মুখের ওপর থেকে দু চোখ সরাতে পারছে না। —আজ মাস-এর ছয় তারিখ হয়ে গেল, তোমাদের মাইনে কত তারিখে হয়?

—আট-দশ-বারো যে-কোনো তারিখে বলেই হল। শালাদের কিছু ঠিক আছে। তারপরেই তড়বড় করে বলে উঠল, এ যে-ডাল ভিমের চাকরি আমি ছেড়েই দেব—বুঝলে। আজও অবশ্য বড় সাহেব আমাকে দেখে আদর করে পিঠ চাপড়ালে আর কতরকমের সুবন্দোবস্তের কথা বলে—গাধাগুলি ভালো করে কাজ করো, ও-রকম বিগড়ে যেও না। আমি তার মুখের ওপর সাফ বলে দিয়েছি এভাবে আর আমার পোষাচ্ছে না। কাছে এসে একটু খুনসুটি করে আদর করে নিল ওকে, তোমার হঠাৎ এসব ভাবনা কেন—কাল বেলা এগারোটার মধ্যে দেড়শ টাকা হাতে-পেলেই তো হল?

এই মুখের দিকে তাকালে সংশয় জাগেনি বটে। কিন্তু সোমা চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না আজ। বলল, হেড়ম্ব টাকা ওই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারেই আছে। যদুর চক্রবর্তী মেরে গেছে—

—কুছ! অরবিন্দ এবারে যথার্থ হতচকিত একটু। তুমি তাকে টাকার কথা বলেছিলে নাকি?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে সোমা স্থির জিজ্ঞাসা করল, আপিসে যাবে বলে বেরুবে তুমি প্রথমেই তার কত্ত টাকার জন্যে গেছলে তো?

—হ্যাঁ...কিন্তু আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি!

—তুমি নিচের তলার লোকটাকে বলে এসেছিলে খুব হুঁশিয়ার—তাই শুনে খবর নিতে এসেছিল। কোন্ দরকারে গেছলে আমিই বলে দিলাম।

লোকটার সন্ত্রস্ত মুখে খুশী ভাব ফুটে হতে দেখল সোমা। স্থূল একটা নতুন গুণ আবিষ্কার হল যেন চলে চোখে। মুখেও হাসির রেশ। খুব বুদ্ধি তো তোমার! ভেলা কাছে হাতে সত্যিই টাকা ছিল না এক্ষুনি...

এক মুখের দিকে চেয়ে যে অস্বস্তিটা দূর করতে চায় উল্টে সেটা যেন চেপে বসেছে অরবিন্দর। জিজ্ঞাসা করল, আজ, আমাকে বিয়ের আগে ব্যবসার জন্য কত্ত টাকা যদুবাবু তোমার কাছ থেকে যে সাড়ে সাতশ টাকা আর নির্মোহিনী সে-টাকা আমাকে দিয়েছে?

কিছু না ভেবেই অরবিন্দ জবাব দিল, কথাটা তো দিয়েছি—কেন?

—সাড়ে সাতশর জায়গায় আটশ দিচ্ছে?

—দিয়ে থাকতে পারে, মনে নেই। ইষৎ উতলা মুখ অরবিন্দ গাঙ্গুলির।

—আর আরপারেও তুমি তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ?

—হেড়ম্ব টাকা দিতে গিয়ে এসব কথা সে বলে গেছে নাকি। তার বিব্রত মুখে ঈষৎ বিস্ময়ের আভাস।

—বলেনি। ওই সাড়ে সাতশ টাকা এখনো পাওনা আছে বলে নিয়ে আসি হেড়ম্ব টাকা নিয়েছিলাম। আমার কথা থেকে মনে হচ্ছে বুঝতে পেরে সে উল্টে এই কথা জানিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ...কিন্তু সত্যি তুমি আরো কত টাকা নিয়েছ?

সোমার গলা দিয়ে শেষেরটুকু প্রায় আর্তনাদের মতোই বেরিয়ে এসে।

অরবিন্দর কানদুটো হঠাৎ লাল একেবারে। তারপর ইঁদুর ছিলাম। বলে উঠল, দেখো, আমি তোমাকে ঠকাব বলে কিছু নিই আমার টাকা আমারই পাওনা ছিল কিন্তু এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে না সোমা, প্লীজ—

সোমা চুপ মেরে গেছে। কিন্তু মাথা থেকে দুশ্চিন্তা ঝাড়তে পারেনি।

পরদিন একটা ঘন্টাতে সমস্ত গয়না পুরে দুজনে ব্যাঙ্কে গেছে। আকাউন্ট খোলা হয়েছে। লকারে সব রেখে পাস বই চেক বই আর লকারের চাবি নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত মুখ বুজেই অপেক্ষা করেছে সোমা। তারপর বলেছে, বাবা মুখ ফুটে চাইতে পছন্দ না কিন্তু তার অসুবিধে হচ্ছে—এখনো মাইনে পাওনি নাকি?

অরবিন্দ বলেছে, এই দুই একদিনের মধ্যেই দিচ্ছি।

বাবার সম্মান রাখার জন্য সোমা বলেছিল মুখ ফুটে চাইতে পারে না। কিন্তু সত্য হালদার এর মধ্যে বার কয়েক মায়ের টাকার কথা বলেছেন। তখন আবার এদিক সামলে দিতে হয়েছে সোমাকে। বলেছে, আপিসে কি-সব গণ্ডগোল চলেছে বাবা, মাইনেটা হাতে আসেনি এখনো—পেলেই এনে দেবে।

বাবার অজানা ইচ্ছেটুকু আবার খুব একটা প্রসন্ন নয়। কারণ বিয়ের দিন কতকের মধ্যেই জামাইয়ের পয়সাকড়ির ব্যাপারে জমাই অনেককিছু নিস্পৃহ। অন্তত আগের মতো উৎসাহ তো নেই-ই। ক্ষুণ্ণ হয়ে সত্য হালদার মেয়েকেই সে-কথা শুনিয়েছেন।

সোমা সে-মাসে টাকা হাতে পেল উনত্রিশে। অরবিন্দ তার মোটা ব্যাগ খুলে এক গোছা টাকা তার হাতে দিয়ে বলল, চারশ টাকা আছে, দুশ টাকা বাবার হাতে যাও আর দুশ টাকা তোমার কাছে রাখো।

সোমা অবাক। —নশ টাকার মধ্যে মাত্র চারশ টাকা কেন?

—কিসের নশ টাকা?

—তোমার মাইনে নশ টাকা না?

অথবা বিরক্তির সুরে অরবিন্দ বলে উঠল, মাইনে-টাইনে কোনো না হতো, এ শর্মা অত মাইনে-টাইনের ধার ধারে না—যেবারই টাকা—তোমার যখন টাকার দরকার হবে—বলবে। বাস।

সোমা চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। মানুষটা সেই সকালে বেরিয়ে এই সন্ধ্যায় ফিরল। সুখেনো ক্লান্ত মুখ। এক-একদিন যখন কাজ চাপে এই রকমই হয়।

আজো দু মাস যেতে এই লোকের গতি-প্রকৃতি সত্যিই জটিল মনে হতে লাগল সোমার। একদিনের এক কথার সঙ্গে অন্য দিনের আর এক কথার সামঞ্জস্য মেলা ভার। সব কথায় নিজের বাহাদুরি দেখার স্বভাব যেমন দেখেছে এখনো তাই। চাকরি বা মাইনের প্রসঙ্গ তুললে নয় রকমের বড় বড় অবান্তর কথা বলে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে। বড় বড় ঝুলে বোকাই গয়নার ওজন নিয়ে মাসে মাসে। তখনই কাজের চাপ দেখে। নিজেই সেলুলো বয়ে নিয়ে কোথায় কোথায় যেতে সোমার ধারণা নেই। ও জানত, প্রেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের সাম্পল আর প্রডিউসের নিয়ে দোকানে দোকানে ঘোরে। এত ওজন বয়ে বেড়াতে হয় দেখে অবাক। সে-সব ব্যাগ খালি হতেও দেখে আবার। পকেটে তখন থোকে টাকাও দেখে কিছু। তখন নরাজ হাত, নরাজ মন।

কিন্তু মাস মাইনের নিয়মিত টাকার মুখ সে আজও দেখল না। দেহে অশান্তি, মনেও। আগামুক আসার ঘোষণা দিনে দিনে জোরালো হয়ে উঠছে। শরীর ক্রমশ কাহিল হয়ে আসছে। এ-সময় যেটুকু বিশেষ নজর পেলে উপকার, তা পাচ্ছে না। ওদিকে বাবার মুখেও দিনকে দিন কেমন যেন থোকালো ভাব পড়ছে। সন্দিগ্ধ চোখে বাবা জামাইকে লক্ষ্য করে। মাসের টাকা সময়ে হাতে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছে। গেল মাসটাই এমনিতে কেটে গেল। সোমা হাসিমুখে দিতে অরবিন্দর সেটুকু বড় কষ্ট। —দুতিন মাসের টাকা একসঙ্গে দিয়ে দেবখন, প্রতি মাসে এই কাঙ্গালপনা ভালো লাগে না।

সত্য হালদার সেদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, ও কি চাকরি-বাকরি করে ভালো করে খবর নে তো, দু-পাঁচ কথা কানে আসছে আমার, ভালো বুঝছি না—

কপাল ঘাঁটা দেছে সোমার। মাসের বরাদ্দ টাকা সময় মতো বাবার হাতে এলে কারো কোনো কথা কানে অসঙ্গত না বলেই বিশ্বাস। ওর মনে হল, দু-পাঁচ কথা কানে আসার কথাটা বাবা শান্তির বলল।

রাগও হল। সেই দুপুরেই লোকটার মুখোমুখি একটা বোঝাপড়ার জন্য এসে দাঁড়াল।

—তুমি চাকরি করছ কি বলছ না?

—তার মানে? অরবিন্দর আকাশ থেকে পড়ার মুখ।

—তার মানে তোমাকে আমার জোকারে ওরা কেন? তোমার চালচলন দেখে লোকের সন্দেহ হচ্ছে—

—কোন্ শালার সন্দেহ হচ্ছে? অরবিন্দর গরম চোখ।

—অনেকের সন্দেহ হচ্ছে। তুমি চাকরি করো কি করো না সেই জবাব দাও।

—আলবাৎ করি। এতবড় সন্দেহ করে অপমান করার তোমার কি রাইট আছে? তোমার কি চাই তাই বলো।

—আমি সত্যি কথা জানতে চাই। চাকরি যদি করো ছমাসের মধ্যে তোমার একেবারে বাঁধা-ধরা মাইনে আনতে পারছ না কেন?

অরবিন্দ হাঁড়ি মুখ করে অনমনিক চেয়ে রইল। সোমা আবার বলল জবাব দিচ্ছ না যে?

—তুমি আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছ, এখন আমি কোনো কথা বলব না।

সোমা গলার সুর নরম করল। নরম করে বলল শুধু, সত্যি কথা বলো। তোমার মতো সুদর্শন একজন অনমনিক কর, আর সব বলে তার ভাগ আমাকেও পেতে হয়।

এই নরম কথা কটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটার অন্য মূর্তি। চোখে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো। আর সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে সোমার বুকের ভেতর যেন মোচড় পড়ল একটা। মনে হল ওই লোকের ঘুমন্ত চোখে যেন আগুনের হল্কা।

—কি হল বলো?
—কি বলব?
—চাকরি করছ?
—করছি তো।

—সেই বড় মোটরক্যার ফার্মের চাকরি?
—তা ছাড়া আর কি।
—নব্বই টাকা মাইনে?
—হ্যাঁ।

—সে টাকা কি করো?
—ধার শোধ করতে হয়।
—ধার! কত ধার?
—অনেক।
—কেন ধার?
—লোকের দরকারে দিয়েছিলাম।

সোমা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। মুখের দিকে চেয়ে আছে। অরবিন্দ গাঙ্গুলি ওকেই ঠাণ্ডা করার জন্য উদগ্রীব এখন। বলল তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু সত্যি আমি এ পর্যন্ত অনেক লোককে অনেক টাকা দিয়েছি—এখনো কেউ এসে চেয়ে পড়লে না দিয়ে পারি না—মনে হয় আমি নিজেই বুঝি বিপদের মধ্যে জড়িয়ে গেলাম—

না, সোমা অবিশ্বাস করেনি। বরুণ চক্রবর্তী সেদিনও বলেছে, বিপাকে পড়ে কত জনের কত টাকা নিয়েছে অরুর কাছ থেকে তুমি ধারণা করতে পারবে না।

কিন্তু নিজের স্বভাবে ফেরতে সময় লাগল না লোকটার। কাছে এসে জোর দিয়ে বলল তুমি কিছু ভেব না বুকলে আর কিছু দিন সবুর করো—এ শর্মা কি পাকে আর কতটা পাকে তুমি দেখে নিও।

কতটা বিশ্বাস করল বা করল না ভেবে না পেয়ে সেই বিকেলেই অরবিন্দ জোর করে সোমাকে নিয়ে বাইরে বেরুলো। বলল—এক জায়গায় যাব চলো তো—

বিকল্প থেকে নেমে এক তলার একটা ভাঙা দালানের পিছন দিকে ঢুকে গেল ওকে নিয়ে। সামনের দিকটা সেই রকমই যেখানে বিয়ের আগে অরবিন্দ থাকত। সেখানে থাকে এক অন্ধ ভদ্রলোক তার পাগলাটে স্ত্রী আর ভদ্রলোকের বুড়ী মা। বাড়িতে পা দিলেই বোঝা যায় দুঃস্থ মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা এদের। পরে সোমা শুনেছে এই রকমের তিনখানি টাকা ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল দীপেন ভট্টাচার্য এছাড়া চোখের রোগে অসময়ে রিটায়ার করার দরুন ভদ্রলোকের বাড়তি টাকা আসার সেখানে সম্বল। এদের দুটো মানুষের ছোট্ট আর একটা মেয়ে। দুরি ভ্রাম্যমাণ দাদা ছেলে দুটো কোথায় ছেলে খাটছে এখন কেউ খোঁজ নেয় না। গেল বছর মেয়েটা বিয়ে হয়ে গেছে। সেই বিয়েতে অরবিন্দ গাঙ্গুলি কত খরচ করেছে সোমা সেটা জানতে পারল এই বাড়িতে এসে।

ওদের দেখতে পেয়ে পাগলাটে মহিলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে সোমার হাত ধরে ভিতরের একটা নড়বড়ে চৌকিতে এনে বসালো। বুড়ীটা দুই এগিয়ে এসে দুজনকেই জড়িয়ে ধরতে লাগল। অরবিন্দ গাঙ্গুলির গলা শুনে অন্ধ ভদ্রলোকও লাঠি ভর করে কাছের একটা ভাঙা চেয়ারে বসল।

চিবুক ছুঁয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বুড়ী দেখল। যেন আর আনন্দ ধরে-ই পড়ছে মুখে। —এতদিনে সময় দেখানোর সময় হল তোর!...মাসী বউ হয়েছে সোনা লক্ষ্মী বউ...কিন্তু মুখ এত শুকনো আর শরীরের এই হাল কেন? পরক্ষণে আনন্দে উদ্ভাসিত হাসি ছেড়ে ছেলেদুজনে হয়ে নাকি রে তোর?

সোমার মুখ লাল। সকলের মুখেই হাসি। অন্ধ ভদ্রলোক কিছু দেখতে পাচ্ছে না তার মুখেও হাসি।

অরবিন্দ বলল—বউয়ের রেজাল্ট-পত্র খুব খারাপ গো বুড়ী মা। টাকা পয়সা রাখতে পারছি না—

বুড়ী তড়বড় করে বলে উঠল টাকার জন্য তোর মতো ছেলেকে হেনস্থা করবে মালক্ষ্মী আমার এমন মেয়ে নয়। তুই হল গিয়ে সাক্ষাৎ ভোলানাথ তোর টাকা থাকবে কি করে বল্ ছোড়া—আমার এই মা অন্নপূর্ণা তোকে দুহাত ভরে দেবে। সোমাকে আদর করে বলেছে তোমার জন্ম-জন্মের ভাগ্যি গো মা এমন ভোলানাথ পেয়েছ ও যত দেবে তোমার দুহাত ততো ভর উঠবে—ও যে আর জন্মে কি ছিল আমার কে জানে—ও না থাকলে আমার এই বাড়িঘর শ্মশান হয়ে যেত মা—শ্মশান হয়ে যেত।

অরবিন্দ মুখ টিপে হাসছিল। বলল—তুমি কি বলছ বউ কিছু বুঝতেই পারছে না বুড়ী মা—

—আঁ? তুই বলিসনি বুঝি! তা বলবি কেন তুই তো ভোলানাথ—

অন্ধ ভদ্রলোক বলল—বউমাকে সোনাও না মা আমাদের তো আর কিছু নেই—বলেই শঙ্কিত—

পাগলাটে মহিলা চকিতে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। বুড়ী বলল সেকথা মনে হলেও আমার গায়ে কাঁটা দেয় রে বাছা—

ছেলে বেলা সে সমাচার বুড়ী শোনাতো তারপর গায়ে কাঁটা দেবার মতোই।...জন্ম চলে না এমন হলে বাড়ির তার মধ্যে হবে মেয়েও সুস্থী মেয়ে। শেয়াল-কুকুরের মতো ছিঁড়ে খাবার জন্য ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায় বখাটে ছোঁড়ারা—চিঠি লেখে রাস্তায় বেরুলে ডাকে শিস দেয়। মেয়ে দেখে এক ভারগা থেকে এমনি শাঁখা-সিঁদুরে নেবে বলে গেল। সে খবর পেয়ে হাড় হাবাতে পাজিরা সেখানে চিঠি দিয়ে বিয়ে ভাঙলে। তারপর একটা ভালো জায়গাতেই বিয়ে ঠিক হল পাড়ার লোকের কথাও তাদের আসে থাকতেই বলে দেওয়া হল। চেনা ঘর মেয়ে বাজি, কিন্তু তিন হাজার টাকার কমে সেই বিয়ে নামে না। তিন হাজার টাকা কোথেকে আসবে, মেয়ের মায়ের গয়না সব বেচে পঁচিশ টাকা মাত্র ঘরে মজুত। বাড়ির সামনের অংশ থেকে

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক :—

স্বদেশ ও শিল্প (কুটিরশিল্প)
—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 15.00

ষ্টানজিস্টার রোডও তৈরী ও মেরামত
—নিরঞ্জন দত্ত Rs. 8.00

রাবার জয়ের ইতিকথা
—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় Rs. 7.00

কীর্তন ও সমাজ —কার্তিকচন্দ্র রায় Rs. 4.00

শ্রীমতী যে ডাকে (উপন্যাস)
—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 6.50

সাবান শিল্প—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 6.00

শিল্পের সন্ধানে
—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 16.00

কণ্ঠ-সংগীত
তাপস আদিত্য Rs. 5.00

RAKAMARI BOOK HOUSE
77, MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA-9
Dial : 34-7589

টাকা জোগাড়ের চেষ্টা হয় কিন্তু তিন বন্ধকী বাড়ির অংশ কে কিনবে?

আড়াই হাজার টাকা সস্নেহ হল না দেখে হতভাগী মেয়ের এই মা মনে জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরল। শিউরে উঠেও হেসে ফেলল বুড়ী। —অভাবের ঘরে লাস দড়িই বা কোথায়, অধ-মরা মাটী দড়ি ছিঁড়ে অকেতে আছড়ে পড়ল। আর · হাবপদ কেন হতে মাথা ঠুকতে লাগল— মরবই ও মাথা ঠুকেই মরবে।

মা-হতভাগী জানতই, বেড়ে ঠেকাতে পারত না। ঠেকাক ওই ভোলানাথ কড়কড়ে আড়াই হাজার টাকা হাতে দিয়ে বলল—আর মরে কাজ নেই, এ নাও, নিয়ে মেয়ের বিয়ে দাও।—

অরবিন্দ হাসছে হেমনি। সোমা আড়-চোখে না তাকিয়ে পারল না: সেই হাসি দেখে অনেক দিন বাদে আবার চোখ জুড়িয়ে গেল তার।

বাড়ি ফিরে অরবিন্দ খুশী গলাতে বলছে কিবাস হল তো? কাল আবার আর এক জায়গায় নিয়ে যাব।

সোমার মুখে রাগের চিহ্নও ছিল না। জবাব দিয়েছে আর কোথাও নিয়ে কাজ নেই। এভাবে তোমার মোট কত খরচ হয়েছে?

—পাঁচ ছ হাজার হতে পারে।

কান্ত মুখে হর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে এক বাশ ফল নিয়ে ফিরেছে। আসার সময় বুড়ী বলে দিয়েছে পোয়াতি বউ, ফল দুধ খাওয়ার জন্যে করে। শরীরে রক্ত নেই, চেহারা কি হয়েছে দেখিস না।

অতএব সোমার খারের হিসেবে মন না দিয়ে কটা দিন তার ফল-দুধের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। স্বশুরকে সোজা গিয়ে বলল—ওর জন্যে একটু ভালো খাবের ব্যবস্থা করে আমাকে বলতে পারতেন এখন ব্যবস্থা করুন।

সত্য হালদার চশমার ফাঁক দিয়ে জামাইয়ের মুখখানা নিরীক্ষণ করেছেন একটু। তারপর স্নেহের সুরে বলেছেন—তুমি এতদিন কি করছিলে ঘুমিয়ে কাটা-ছিলে? আমার যারা যেটুকু সম্ভব করেছি আর বেশি দরকার হয় নিজে করো।

না জামাইয়ের ওপর আগের খুশী মন আজকাল নিচ্ছি। এমনিতেই সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষটা। তাঁর কেবলই মনে হয় গোড়ার গোড়ার তাঁর প্রতি ছেলেটার এত আগ্রহ সবই যেন শুধু জামাই হয়ে ঢোকার জন্য। নইলে চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তো এসে দু দণ্ড বসতে পারে যা দু-পাঁচ কথায় খোঁজ খবর নিতে পারে। ভদ্রলোকের আবার সেই আগের হাল।

সোমার কথায় কান না দিয়ে আগে কিন্তু বাড়তি খরচের ব্যবস্থা অরবিন্দই করেছে। সোমা রাগ করে বলেছে আগে যার শোধ করো তারপর আর যা কিছু।

অরবিন্দ বলেছে, আগে তুমি তারপর আর যা কিছু।

সোমা বলেছে আর আমাকে না বলে তুমি নতুন করে কাউকে এক পয়সাও ধার দিতে পাবে না।

অরবিন্দর সেই রকমই জবাব ধরা পড়ে গেলে নিশ্চয় বলবে।

সেই মাস অথবা তার পরের মাসটা আপদের মাইনের আর খোঁজ করল না বা বাবার টাকার তাগিদ এলো না দেখে সে অনেকখানি নিশ্চিন্ত। তাছাড়া এই ছ মাসে সোমার চেহারা একটু ফিরেছে আর হাসি-খুশীও বেড়েছে দেখে ও মহা খুশী।

কিন্তু ভাগ্যের বিপর্যয় তার শুরু হয়েই গেছে।

...সেদিন বাবার বাইরের ঘর থেকে একটা জোর চেঁচামেচি কানে আসতে সোমা পেছনের ঘুলঘুলির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর যে-দৃশ্য চোখে পড়ল আর যে-কথা কানে এলো সোমার পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে যেন। বাবা তার চেয়ারে বসে। অরবিন্দ গাঙ্গুলি একটা অচেনা লোকের দিকে চেখ পাকিয়ে চেয়ে আছে। আর সেই লোকটা চেঁচিয়ে তাকে বলছে থামুন আপনি কি মশাই আজ দু মাস ধরে তো দেখা হলেই সাত দিনের মধ্যে ফারসলা করবেন বলে তোলাচ্ছেন—আধা-আধি বখরায় দুশ টাকার ওষুধ নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে ওষুধও গায়েব টাকাও গায়েব! চালাকি করে নিজের বাড়ির ঠিকানায় পর্যন্ত কাটপিস আজ হয় টাকা ছাড়ুন নয়তো ওষুধ ছাড়ুন—

সত্য হালদার একবার জামাইয়ের মুখখানা দেখছেন আর একবার ওই লোকের।

অরবিন্দ গাঙ্গুলির চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠছে। জবাব দিল আপনাকে আবার বলছি চেঁচাবেন না, আপনার ওষুধ বিক্রী হয়ে গেছে, তিনশ টাকা আপনার পাওনা হয়েছে, অন্য ওষুধে সে-টাকা আটকে গেছে—টাকা আবার হাতে এলেই পাবেন, আপনাকে ভালো কথা বলছি এখানে চেঁচামেচি করবেন না।

—কি? চোকরি করে আবার চোখ রাঙানি? টাকা আটকে গেছে আপনার? টাকা দিয়ে আপনি ওষুধ কেনার লোক? ওই করে আপনি ওষুধের দালালি করবেন ভেবেছেন—

সঙ্গে সঙ্গে গলার হাত পড়ল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি তাকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে সদরের বাইরে নিয়ে এলো। তারপর টানতে টানতে কোথায় নিয়ে চলল সেই জানে।

সোমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সে কোনরকমে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। প্রাণপণে তবু সে ভালোর দিকটাই ভাবতে চেষ্টা করছে।...আপিসের মাইনের বেশির ভাগ ধার শুধতেই চলে যায়। হয়তো এ-টাকা নিয়ে পড়ে ঝগড়া করেছে। ওর জন্যেও তো এখন বেশ বাড়তি খরচ হচ্ছে। আর পারে না বলে একটা ঢিলে বাঁধুনি পর্যন্ত রাখা হয়েছে...

...কিন্তু লোকটা দপ্তরের মধ্যে আর ঘরে এলো না। ওর সামনে দাঁড়াল না। নিঃশব্দে খাওয়া সেরে ওর চানের ফাঁকে নিজের মোটা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল। ...ওই মোটা ব্যাগে ওষুধ থাকে, ঘরে বোকাই ওষুধও ওরা দেখেছে। এগুলো কেন আসে কোথায় যায় সোমার তা আজ এতদিনে না স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাতেই বা খারাপ কি। শুধু চাকরির ওপর নির্ভরশীল নয়, একবার বাজারে বেরুলে অনেক টাকা ঘরে আনতে পারে—এ বড়াই তো নিজের মুখেই কত করেছে। সোমা এত ভাবছে কেন?

বাবা বাড়ি নেই সেই থেকে। কোথায় গেছে জানে না। খেয়ে বেলোরনি পর্যন্ত। মনের অশান্তি বেড়েই চলেছে সোমার। বাবাও কক্ষনো এ-রকম করে না।

সত্য হালদার রোবে ফেটে পড়ে ফিরলেন বেলা বেড়টার পর। বাড়তে পা দিয়েই হুংকার ছাড়লেন, কোথায়—কোথায়—সেই শালেসটা?

সোমা কোনরকমে সামনে এসে দাঁড়াল। বুকের তলায় আবার ধুকপুনি ধরেছে। কিন্তু মেয়ের শুকনো মুখ চোখে পড়ল না সত্য হালদারের। বলে উঠলেন, ও কত বড় ভাঁওতা-বাজ বলে তোকে বিয়ে করেছে জানিস? চাকরি-টাকরি কিছু করে না। আমি নিজে গিয়ে সেই ওষুধের কোম্পানীতে খোঁজ করে এলাম। চাকরি করত। ওই কি-সব ভাঁওতা-বাজী ধরা পড়তেই সেখানকার চাকরি গেছে। তোকে বিয়ে করার আগে থেকেই ওর চাকরি নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে কটা টাকা হাতে পেয়েছিল তাই দিয়েই তখন ফুটানি করে কাটিয়েছে চালবাজী করেছে। ওর খবর করতে ওর সেই পুরনো আপিসের লোক হাসে। একজন তো ঠাট্টাই করে বলল, মেয়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছে নাকি মশাই—হঠাৎ অরবিন্দ গাঙ্গুলির খোঁজ-খবর কেন? ও এখন শুধু ওষুধের দালালি করে—বুঝলি? পাঁচ জায়-গায় অনামী ওষুধ এনে মুখলাভী করে মফঃ-স্বলের আর পড়া জায়গার ওষুধের দোকানে ঝেড়ে দিয়ে আসে—বুঝলি? আমার মতো বোকা গাধা তো আর কম নেই এ-লাইনে—লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ও খায় —বুঝলি?

জ্ঞান বেচে এই ঘটা করে কত আশা নিয়ে মোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তার রূপে ওঠা স্বাভাবিক।

সোমা ঘরে এসে আবারও শুয়েই পড়ল।

সকালের গাঙ্গুলিটাই সব ধরে নিয়েছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। রাতের আহার সমাধা হবার আগে কেউ একটি কথাও বলেনি তাকে। এ-বেলাও একলা ঘরে খেয়েছে। বসবার ঘরটা খোলা তখন, সোমাও ঘর ছেড়ে বেরোয়নি।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। সোমা এখন আর শুয়ে নেই। খাটের বাজু ধরে তারই পুতীক্ষায় দাঁড়িয়ে মনে হল।

হাসতে চেষ্টা করে বলল, সামান্য ব্যাপারে বাপ মেয়ে দুজনেই বেকায়দায় পড়েছ দেখছি—

সোমা খুঁসে উঠল, সামান্য ব্যাপারে—কেমন?

—তাছাড়া আর কি। ওই লোকের টাকা আর সাত দিনের মধ্যে শোধ করে দেব বলেছি—তখন আবার হাতে পায়ে ধরবে—

—হাতে পায়ে ধরবে! তোমার? কেন হাতে পায়ে ধরবে—ডাক্তারবাবুর কাছে অচেল ওষুধ গচাতে পারো—সেই জন্যে?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি জোর দিয়ে বলল, চাকরির বাইরে আমি ওষুধ কেনা-বেচা করি সকলেই জানে—অতো ওষুধ যা ডাক্তারবাবুকে খেয়ে কে দিল?

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল সোমা।—কি বললে? চাকরির বাইরে ওষুধ কেনা-বেচা করো তুমি? চাকরি চাকরি! চাকরি করো তুমি?

—যা সত্য, তাই না কে বলল?

সোমা হাত-মুখটা দুপাশে নিজের এলোপাথাড়ি ঝাপটা। কারা বলেছে। বাবার সঙ্গেই তো তোমার সেই বড় কোম্পানীতে ঘুরে বেড়াতে গেছল। বিয়ের ঢের আগেই তোমার চাকরি নেই সে-খবরও জেনে এসেছে। চাকরির থেকে তোমাকে তাড়ানো হয়েছে!

অরবিন্দর প্রতিবাদ করার ইচ্ছে, কিন্তু স্ত্রীর এই মূর্তির দিকে চেয়ে মুখে আর কথা সরল না।

—কি? এখন কি করবে? এখন কি বলার আছে তোমার?

ইয়ে, চাকরি সেই তাতে কি হয়েছে, তুমি ইদি ঘাবড়া না করো, তুমি ইদি সবুর থাকো—ও-চাকরির থেকে ঢের বেশি রোজগার করব আমি, দেখে নিও।

এ-রকম বড় কথা সোমা অনেক শুনেছে। আবার কি মনে পড়তে আরো বেশি রাগ, আরো বেশি যন্ত্রণা। আরক্ত মুখে উঠে এই সেদিনও তোমার চাকরি নিয়ে আর মাইনে নিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করলাম, মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি একের পর এক মিথ্যে কথাগুলো বলে গেলে? লজ্জা করে না তোমার এখন কথা বলতে?

কোনঠাসা হয়ে অরবিন্দ গাঙ্গুলি রুখে উঠল, লজ্জা তো করছে—তোমাকেই তো ঘাটা-ঘাটি করে গয়নাগুলো পাকাচ্ছি। সেদিন সাচ্চা কথা বললে তোমার কি রাগ করা হত, তাছাড়া এই মাসে ধরা পড়ে যাব তাই বা কে জানত!

যে কোনও দিনই সঞ্চয়ের দিন যদি.....

আপনি সঞ্চয় করবেন বলে মনস্থির করেন। আর সেটা মাস পয়লার মাইনে হাতে পেলে শুরু করা যায়। তবে মনস্থির করতে বা পারলে মাইনের টাকা হাতে আসলেই খরচ হয়ে যায়।

সঞ্চয় করতে যখন মনস্থ করবেন (সেটা এখনই করা সব চাইতে ভালো নয় কি?) তখন ডাকঘরের রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্টের কথাটা ভেবে দেখবেন। মাসে মাসে মাত্র দশ টাকা করে জমালে, তা পাঁচ বছরে বেড়ে 750 টাকায় দাঁড়াবে। তাতে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার দাঁড়াচ্ছে 9.25%।

আর আপনি একটানা দু'বছর যদি নিয়মিত সঞ্চয় করে যান তাহলে আপনার টাকা বীমার মত সুরক্ষিত থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। তা হ'ল, অ্যাকাউন্ট হোলডার বা জমার খাতার মালিকের অসময়ে মৃত্যু ঘটলে বাকী কিস্তির টাকা আর জমা না পড়লেও 750 টাকা অক্ষত থাকবে।

বিশদ জানতে হলে :

বিকটতম
ডাকঘরে খোঁজ নিন
কিংবা
ন্যাশনাল সেভিংস
অর্গানাইজেশন
পোস্ট বক্স নং 96
নাগপুর

Adv 74/209

একে গরীব ছেলেটা, তার ওপর এতবড় ডিগ্রোচারের বদনাম। সোমার মাথাই খারাপ হবার লাগিয়ে। লোকটাকে যেন নতুন করে আবার দেখে নিচ্ছে সে। অদ্ভুত আকর্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরটা যেন থরথর করে উঠল। একটা অসহায় শিশু যেন হেঁচকিতার পাড়ে হাসফাঁস করছে এখন।

রাগ সামলাতে চেষ্টা করল সোমা। ধমথমে মুখ।—এত বড় মিথ্যে আমার তুমি নেবে নিলে?

অরবিন্দ চুপ।

—কেন—কেন এত বড় একটা মিথ্যে বোঝা চাপালে তুমি?

আত্মপক্ষ সমর্থন না করে উপায় নেই যেন অরবিন্দ পালচৌধুরির।—গোড়া থেকে সবটা কথা বললে তোমাকে পেতাম না, চাকরি নেই জানলে তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে দিত? তুমিই কি আমাকে বিয়ে করতে চাইতে? এদিকে রাস্তায় তোমাকে দেখে-দেখে আর বন্ধুদের মুখে তোমার কথা শুনে-শুনে তোমাকে পাবার চিন্তায় রাতে আমার ঘুম হত না—বড় জাহাজের হাতছাড়া মনে হত বুঝে তোমাকে পেলেই আমার কেউ না থাকার অভাব ঘুচে যাবে—এরপর মিথ্যের মধ্যে ঢোকা ছাড়া আর আমার কোনো উপায় ছিল?

সোমার অপলক দুই চোখ তার মুখের ওপর। এ-রকম জবাব ও জীবনে শোনেনি, আন্দাজ করেনি। মনে হল, এ-রকম বিপাকে পড়ার পর এখানে সত্যি কথাগুলোই যেন ভিতর থেকে নিংড়ে বেরিয়ে এলো। ওই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলাও বুঝি বিচিত্র ছিল না সোমার। এরপর কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে ও নিজেই হনহন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাতটা প্রায় বিনিদ্র কাটল। কিন্তু ওই লোক পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। এ-রকম মানুষকে নিয়ে ও কি করবে, আবার ছেঁটেই বা ফেলে কেমন করে?

সংকট এলে সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা-টাও সহজাত। পরদিন খেয়ে-দেয়ে কাজে বেরুবার মুখে সোমা আবার আটকালো তাকে।

—কোথায় যাচ্ছ?

হাতে মোটা ব্যাগ। থতমত খেয়ে জবাব দিল, কাজে.....

সোমা বলল, ওই ব্যাগ হাত থেকে নামাও। আমার কথার সত্যি জবাব দাও আগে। ওদের সেই বড় কোম্পানী থেকে তোমার চাকরি গেছল কেন?

—কেন আর, শুনিসনি হয়ত না।

—সত্যি কথা বলো বাবা, শুনে এসেছি তোমার চোখেই তোমাকে তাড়িয়েছে তারা।

—বা রে, শুনিসনি না হওয়াটাই তো দোষের। দরজায়ারা সেই প্রথম সংস্পর্শে এলেই আমার রাগ হয়—ওরা ভয়ানক নির্দয়।

সোমা অবিশ্বাস করল না। এই মানুষ স্নেহের কাঙাল জানে। বলল, ঠিক আছে এই অচল ওষুধ বেচার কাজ তোমাকে ছাড়তে হবে—এম-এস-সি পাস যখন সেটা বললে ভালো কাজ নিশ্চয় পাবে।

অরবিন্দ পালচৌধুরি সোজা অবাক।—এগুলো অচল ওষুধ মানে?

—ও শুনে কি তাহলে? বাজারে চলে?

—চালাতে হয়। সব ওষুধেই চালাতে হয়; বড় ওষুধের কোম্পানী তাদেরটা চালাবার জন্যে রিপ্রেজেনটেটিভ রাখে, চালাও বিজ্ঞাপন করে—ছোট ওষুধের কারবারীরা আমাদের মতো লোক দিয়ে তাদের ওষুধ চালায়। ছোট-খাট জিনিস তৈরি করে সাধারণ গরিব আর মধ্যবিত্তদের মধ্যে চালাতে চেষ্টা করে—এও তেমনি। অচল ওষুধ বলতে তুমি কি ভেজাল বা জাল ওষুধ-টষুধের কথা ভাবছ নাকি?

সোমা অনেকটা সেই রকমই ভাবছিল।

—কি কাণ্ড, তাহলে সবকিছু নাকে তেল দিয়ে ও-সব বিক্রী করলে এতদিনে জামার জেল হয়ে যেত না? ছোট-খাট নাকসা হোমে কত লোক খিদের ওষুধ হজমের ওষুধ জ্বরজ্বালার ওষুধ থেকে শুরু করে কত কি বার করছে। আমরা মুখের জোরে সেই সব ওষুধের মান বাড়িয়ে পাইকেরি হারে বেচার ব্যবস্থা করি—সবকিছুরই কি নামী ওষুধের পিছনে ছোটার অবস্থা নাকি?

ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝল সোমা। তবু বলল, কিন্তু এম-এস-সি পাস করেছ—এর থেকে ভালো কিছু করতে পারো না?

—এম-এস-সি পাসের কি দাম, মুরুব্বির জোর থাকলে তবে কথা। এম-এস-সি পাস করে বড় জোর মফস্বলে শহরে দুশ টাকা মাইনের একটা স্কুল মাস্টারি জোটানো যায়—মুখের জোর থাকলে তার থেকে এটা ঢের বেশি লাভের কাজ—বুঝলে?

কি পরামর্শ দেবে সোমা ঠিক ভেবে পেল না। তখনকার মতো চুপ করে গেল।

কিন্তু সত্য হালদার চুপ করে বসে নেই। ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। তুমি কিনা এত টাকা খরচ করে এ কোন্ প্রবঞ্চকের হাতে মেয়ে সপে দিয়েছেন ভেবে অস্থির।

পরদিনও খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছেন তিনি। ফিরেছেন বেলা তিনটের পরে। রাগে দুঃখে কাঁদ-কাঁদ মুখ। মেয়েকে কাছে এসে ডেকেই পড়লেন তিনি।—আমরা একটা আস্ত জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছি রে সোমা—সর্বনাশ হয়েছে।

সোমার সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে আবারও। নতুন করে কি হল জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না।

আধা ক্ষিপ্ত স্বরে সত্য হালদার বলে উঠলেন, কোম্পানী থেকে এই উল্লুকটার চাকরি কেন গেছে জানিস? শুনবি? নিজেকে এম-এস-সি পাস বলে জাহির করে চাকরি নিয়েছিল, তারপর সার্টিফিকেট না দেখিয়ে কি-সব তালিবালি করে চাকরিতে কন-ফার্মড হয়ে গেছল—কিন্তু কাজের সব ঠুঁটোপনা ধরা পড়ে গেল আসলে ও গ্র্যাজুয়েটই নয়—বি-এস-সি পরীক্ষাই দেয়নি। কোম্পানী ওকে ফেলে না পাঠিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছে।

সোমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছে।

নিষ্পলকের মতো শুনে যেতে লাগল।

—বাবা খুব ভোরে উঠে ওদের সিয়ালদা-স্টেশনের পৈতৃক বাড়িতে চলে গেছল। একবেলা সংগ্রহ হতে সব খবর নেবার জন্য ছুটে না গিয়ে পারেনি। সেখানে ওদের বড় দালান টালান কিছু নেই, সাদামাটা খানকতক ঘর। সেও পৈতৃক বাড়ি নয়—অরবিন্দর দুই দাদা করেছে। ওর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সিয়ালদা-স্টেশন থেকে দাদারা ওকে যেমন তাড়ানোর মতো করেই তাড়িয়েছে। চাকরি পাওয়া আর চাকরি খোয়ানোর পরে সেখানে দিগ্বিজয় করে বেড়াচ্ছিল। চাকরি কেন গেছে তারাই জানিয়েছে। চাকরি যখন করত তখন লাট-সাহেবের মতোই থাকত, মান-খাতির বাহাদুরি নিত। হাতে কিছু রাখেনি। চাকরি যাবার পর দাদাদের নাম করে টাকা ধার করে বেড়াতো। ওই দাদারাই উল্টে শমকেছে বাবাকে, বলেছে, লোকে মেয়ে বিয়ে দেবার আগে খোঁজ-খবর নেয় আর আপনি হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়ে তারপর খবর নিতে এলেন?

সেখান থেকে মাথা খারাপ করেই বাবা ঘরের দিকে ফিরছিল। পথে বরুণ চক্রবর্তীর বাবা। সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। একে দেখেও বাবার মাথায় রক্ত উঠেছে। মনে পড়েছে, প্রথম দিন এসে তার সামনেই জামাই নিজেকে এম-এস-সি পাস বলে জাহির করেছিল আর ন'শ টাকা মাইনের চাকরি করে বলেছিল।

সোমা তার ঘরে উঠে গিয়ে বাবা বলেছে, জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি তোমরা? তোমার সাধু এম-এস-সি পাস? আর ন'শ টাকা মাইনের চাকরি করে—কেমন?

শুনে ওই লোকটা নাকি আকাশ থেকে পড়েছে। পরে বলেছে, বিয়ের আগে সে-ও জানত বন্ধু ওকে কোম্পানীতে ন'শ টাকা মাইনের চাকরি করে আর সেই সঙ্গে অঢেল ওষুধের এক্সেন্সিও নিয়েছে। বিয়ের অনেক পরে দীপেন ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছে চাকরি করে না। অবাক হয়ে বাবাকেই জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু এ-সব কি বলছেন—অরু এম-এস-সি পাস নয়?

বাবা ক্ষিপ্ত।—এম-এস-সি পাস কি কি-পাস তুমি জানো না?

সে বলেছে, আমি কি করে জানব, স্কুলের পরে তো কত বছরের ছাড়াছাড়ি—আমাকে নিজের মুখে বলেছে এম-এস-সি পাস—স্কুলে ভালো রেজাল্ট করত, অবিশ্বাস করব কেন!

বাবার আবার কি মনে পড়েছে। বলেছে, তুমিও তো নিজেকে বি-এ পাস বলে জাহির

করেছিলে, তোমার কথা বিশ্বাস করব কি করে?

শুনে লোকটা নাকি হাঁ করে খানিক চেয়েছিল বাবার মুখের দিকে। তারপর চুপ-চাপ বাকস খুলে একটা সার্টিফিকেট বার করে এনেছে। বাবা স্বচক্ষে সেই সার্টি-ফিকেট দেখে এসেছে, বরুণ চক্রবর্তীর ডিগ্রী সার্টিফিকেট!

...হ্যাঁ, সোমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। বন্ধু বি-এ পাস নয় বলে সোমার পর মুখে বিড়ম্বনার মুখোশ এঁটে অরবিন্দ গাঙ্গুলি হাত জোড় করে বাবাকে বলেছিল, কথা দিন এ নিয়ে আপনি ওকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবেন না—সামনে থেকে আমি অপ্রস্তুতের একশেষ হব।

মিথ্যে মিথ্যে! সম্পূর্ণ ইচ্ছে এই লোকই শুধু মিথ্যের জাল বুনে গেছল সেদিন। আর বাবা মেয়ে দুজনেই সেই মিথ্যের জালে আটকেছে।

প্রতীক্ষা। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে সোমার। অকরুণ কঠিন প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুনে চলেছে তারপর থেকে।

রাত আটটা নাগাদ ফিরেছে টের পেল। ওদিক থেকে বাবার আগুনে-ঝরা গলার কানে এলো। এই যে বাবাজীবন, এর-পরেও তুমি আবার মুখ দেখাতে এসেছ তাহলে? আসতে পেরেছ?

যাকে বলা হল তার গলাও কানে এলো। —কি হয়েছে?

—কি হয়েছে? এমন কিছু না। আজ সকালে আমি তোমাদের শিয়ালদেদার সেই মস্ত প্রাসাদ থেকে ঘুরে এলাম। সেখানে তোমার দাদাদের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল। কি-রকম এম-এস-সি পাস তুমি, কি করে তোমার চাকরি গেল আর সেখানে কি-সব কীর্তি তোমার—সব শুনে এলাম।

—কি লাভ হল আপনার এ-সব শুনে এসে! ক্লান্ত অথচ বিরক্তির সুর।

বাবা চমকানো হয়ে ফেটে পড়ল। —কি লাভ হল! পাজী জোচ্চোর ছুঁচো কোথা-কারের! তোমাকে আমি বাড়ি থেকে ঘর করে তাড়াব—তোমাকে আমি জেলে দেব।

আর না দাঁড়িয়ে লোকটা সোজা ভিতরে চলে আসছে টের পেল সোমা।

এলো। শুকনো ক্লান্ত মুখ। হাতের মোটা ব্যাগটা এক কোণে রেখে হাসতে চেষ্টা করল একটু। চোরালো অবস্থাটা বুঝছে। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কত-গুলো ভাঁজ করা নোট বার করে সোমার দিকে বাড়িয়ে দিল।—দুশ পঞ্চাশের আছে এখানে, রাখো।

টাকাটা নিয়ে সোমা সজোরে ছুঁড়ে মারল তার গায়ে। নোটগুলো গায়ে লেগে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। —টাকা! মিথ্যেবাদী, তুমি টাকা দেখাতে এসেছ এখন আমাকে! বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে, যাচ্ছ না কেন? কোন্ মুখে তুমি আবার এসে এখানে দাঁড়িয়েছ?

—কি মুশকিল! বিড়ম্বনার ছাওয়া ক্লান্ত মুখ অরবিন্দর। —আচ্ছা বোকা তো তোমরা দেখি কাউকে—যা শুনছ সব তো সেই পুরনো ব্যাপার!

—পুরনো ব্যাপার? এম-এস-সি পাসের কথায় কাল পর্যন্ত সামনে দাঁড়িয়ে তুমি একবারও মিথ্যে কথা বলো যাওনি? কেন—কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে?

একটা ছোট ছেলে কোনো বয়স্কজনের অবুঝপনা দেখলে যেমন হয় তেমনি মুখ অরবিন্দ গাঙ্গুলির। —সর্বনাশ করলাম! তুমি কাল জানতে আমি এম-এস-সি পাস আর আজ জানলে তা নয়—তাতেই মানুষটা আমি তফাত হয়ে গেলাম। আমার রক্ত-মাংস হাড়মাস বদলে গেল?

—গেল। সম্ভব হলে সোমা ওই হাড়-মাস ছিঁড়ে আনে। —কেন তুমি একের পর এক এত মিথ্যে বলে এ-রকম ভাঁওতা দেবে?

রাগত মুখে অরবিন্দও জবাব দিল, বলেছি তো সব তোমার জন্যে—তুমি বি-এ পাস আর আমি গ্রাজুয়েটও নই জানলে তোমার বাবা আমাকে ঘরে ঢুকতে দিত না তুমি দিতে—যা করেছি সব তোমার জন্যে করেছি, বাস!

না, সোমা আর পারেই না, এ-রকম কথা অনেক শুনেছে। তবু জ্বলসে উঠল, আমার জন্যে? এম-এস-সি পাসের ভাঁওতা দিয়ে তুমি চাকরি জোটাওনি?

—সেটা চাকরির জন্য। তা না হলে চাকরি হত না।

—সে চাকরি করে তোমার কি লাভ হল? খাচ্ছ? আমিও খাচ্ছি না তুমি দূর হয়ে যাও আমার চোখের সমুখ থেকে! এতবড় নির্লজ্জ বেইমান তুমি, ওই বি-এ পাস বরুণ চক্রবর্তীকে তুমি বি-এ ফেল সাজিয়েছ!

ধৈর্য কমেছে অরবিন্দ গাঙ্গুলিরও, গজগজ করে জবাব দিল, তোমার জন্য বাবার চোখ ছিল ওর দিকে—তাই করেছি।

—তাই করেছ? ঠিক আছে—এখন যাও এ-ঘর থেকে—যাও বলছি।

—যাচ্ছি যা-বা, যার জন্য এত করলাম, ঠিক আছে, আজ না-হয় আমি বইয়ের ঘরেই থাকছি, কিন্তু মাথা ঠান্ডা হলেই দেখবে এত রাগারাগির কিছু হয়নি—যেমন ছিল সব ঠিক তেমনিই আছে।

রাগ যতই হোক, অরবিন্দর হালচালের সাম্ভব বুদ্ধি কম নয়। ছোট জামাই স্টাকে সর্বস্বান্ত করেছে জানছেন, কিন্তু মেয়ের এ-অবস্থায় লোকটাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চান না। অনেক খরচ আর অনেক ঝামেলা।

এরপর সমস্ত ব্যবস্থার জন্য জামাইকে তিনি হুমকি দিয়ে চলে যেতে বলেছেন। অরবিন্দ যে-টুকু সম্ভ্রম দেখিয়ে গেল তা বাবার ভাল লাগে নি। তাই ঘরে ঢুকে

অরবিন্দই বলেছে, থাক বাবা, আমিই যাচ্ছি, তুমি তোমার কাজে থাকো।

সেই থেকে পৃথক ঘরে দুজনের।

সমস্ত মন বিষিয়েছে সোমার। সমস্ত অস্তিত্ব যেন আলো-বাতাস শূন্য হয়ে গেছে তার। হতাশায় ভরে গেছে। এই হতাশার পরিণাম ক্রোধ। আরো রাগ এই জন্যে যে মানুষটাকে বরদাস্ত করতে পারছে না আবার এই সংকটে তাকে দূর করে তাড়াতেও পারছে না।

শরীরের এই সময় তার নাকি ঘি খাওয়া দরকার বলে। সত্য হালদারই জানিয়েছেন তাদের। তাদেরও জানতে বাকি থাকেনি কিছু। উনিই বলেছেন। ছোট বোন-টার দুর্ভাগ্য দেখে তারা হায় হায় করেছে। সোমার তাতে আরো বেশি যন্ত্রণা, অন্যের বেশি রাগ।

বোনেরা আসায় ফলে অরবিন্দর খাটের শয্যা বাইরের ঘরে চালান দেওয়া হয়েছে। রাতে চেয়ার টেবিল সরিয়ে নিজের বিছানা নিজেকেই করে নিতে হয় তার।

ঠিক এই সময় পরপর দুটো অঘটনের খবর কানে এলো সোমার। এ-সব বলেনীতেও রাজনীতির হানাহানি লেগেই ছিল। নিত্য খুন-জখমের খবর জানা-সওয়া হয়ে গেছল। এর মধ্যে পুলিসের গুলি খেয়ে বীপেন ভটচায মারা গেল। হাস-পাতালে দুদিন বেঁচে ছিল লোকটা। অর-বিন্দকে বলেছিল, যারা পারল তাদের দেখিস একটু।

দুর্ভাগ্য তার দোসর নিয়ে আসে। দিন-কতক না যেতে বীণা ভটচাযের বাপটাও ধরি চাপা পড়ে অপঘাতে মরল। এই দু-দুটো অঘটনের সময় এই লোকের আবার আর এক মূর্তি লক্ষ্য করেছে সোমা। যেন তার নিজেরই হাড়-পাঁজর দুমড়ে ভেঙেছে এমনি দিশেহারা অবস্থা।

সোমা ঠিক জানে সে-সময় বহু-টাকা খরচ হয়ে গেছে এই লোকের। ধোপা থেকে টাকা আনতে দেখেছে, করোতে দেখেছে। আবার কোথায় ধারে তলিয়ে টাকা সংগ্রহ করছে জানে না। জিজ্ঞাসা বাদের রুচিও নেই। কিন্তু বাবা ছাড়েনি, বলেছে, অন্যের ব্যাপারে যে এ-রকম নেচে বেড়াচ্ছ, সামনে যে খরচ আসছে তার ব্যবস্থা করেছ?

জবাব দিয়েছে, আমি একবার ওই নেচে বেরিয়ে যে ব্যবস্থা করতে পারব—আপনার ওই হোমিওপ্যাথির আলমারি বেচে দিলেও তা হবে না—আবার ব্যবস্থা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।

বাবা ক্ষিপ্ত। —চোপ্ রও-ও জোচ্চুরির ঘরে আবার বড় বড় কথা! বের্ হারামি থেকে দূর হয়ে যা এক্ষুণি।

যাব, পরেও জবাব। —সময় হলে একেবারে সব নিয়েই যাব—আপনার মতো কানুকে কাছে ডাকতে যেন বলে যাবে না।

দিকে বড়ই কড়াকড়ি। ঘর করে ছেড়ে যা যে করে হোক ভোলিভাবির সময়েও সে হাতে খরচ করেছে। আর সেই সময়ে লোকটার উদ্বেগও যে লক্ষ্য করেনি এমন নয়। পাঁচ টাকা ধকার হলে দশ টাকা ধার করে দিয়েছে।

ছেলে ধরেছে। সেই অনেক ধরে না। এগারো ছিন বাদে অন্নপ্রাশনের দিনের পরে মাসির কোলে ছেলেকে ভালো করে দেখেছে আর মিষ্টি মিষ্টি হেসেছে। কোন হলুদ করেছে, নায়, আমার মতে হলু না তোমার মতোই মনে হচ্ছে। অর্থাৎ মায়ের মতো।

হাসি অমনি সন্তোষে বলে উঠেছে, থাক, আর তোমার মতো হয়ে কাজ নেই।

অরবিন্দ গালগুলি পারলে ওই মাসিতে লুচেখে গিলে খায়। ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

হাসি মুখে কষটা দিয়েছে, ওঃ! আবার রাগ!

মানুষটাকে বুঝতে পারে না লোকও। কিন্তু মিলির অক্ষরণও তার ভালো লাগেনি।

ছয়জন পেরুতে ছেলের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থাও সোমার হুকুম মতো করতে হয়েছে। টাকা শ্রাদ্ধনাদিতে ভাটা পড়ে আসছে সোমা টের পায়। কিন্তু তার মধ্যে বন্ধ গেছে। ও ঠিক জানে এই অবস্থায় বুঝে বাঁণা ভট্টাচার্য আর তার মা-কে যথাসাধ্য সাহায্য করে চলেছে লোকটা। ওই মা-মেয়ে প্রায়ই আসে আজকাল এ-বাড়িতে। মা-টা তো সোমাকে পুতুর মতো তোয়াজ তোষামোদই করে। আর অরবিন্দর সম্পর্কে এমন উচ্ছ্বসিত দুজনেই যেন এমন ছেলে অর্তায় দিয়ে ছাড়ো তৈরি হয় না। এত উচ্ছ্বসের কারণ বুঝতে পারে সোমা। বাঁণার মনের মতলবও আঁচ করতে পারে। ওকে অনেকদিন বলেছে, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো যদি মেয়েটার কোনো গতি হয়। আসলে তার এখন বরুণ চক্রবর্তীর দিকে চোখ। সোমা একটু বললে, বরুণ চক্রবর্তী নাকি রাজি হয়ে যেতে পারে। এ প্রস্তাব নিশ্চয় এখান থেকেই গেছে। কিন্তু সোমা কেন যেন বিরূপ ওই মেয়েটার ওপরে। তার চটক একটুও ভালো লাগে না।

তাছাড়া নিজের জবানীতে জানে, তার কথা ভাবতে যাবে ও। বরুণ চক্রবর্তী মাঝে মাঝে আসে। যাবার কাছে এখন আগের তার একটু খাতির বেড়েছে। মাঝে মাঝে উপরি করছে। সোমাও তার ওপর বিরূপ নয় এখন আর। বরং একদিন তার ওপর অবিচার করা হয়েছিল বলে এসে ঘরে ডেকে বসতে বলে, চা-টা করে খাওয়ায়। কিন্তু মেজাজ এখন সর্বদা এমনই তেতে থাকে সোমার যে বরুণ চক্রবর্তীও তাকে ভয়ের চোখেই দেখে।

ছেলের অন্নপ্রাশনে তিনদিনের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। আর বরুণ চক্রবর্তীকে। ওদিকে অরবিন্দ নিজে থেকেই বাঁণা আর তার মা-কে নেমন্তন্ন করে এসেছে। মন মেজাজ এ দিনটায় ভালো রাখতেই চেষ্টা করেছে সোমা। বরুণ আসতে বাঁণাকে দেখিয়ে চুপি চুপি বলেছে, পছন্দ হয় কিনা ভালো করে দেখুন—আপনার জন্য আমাকে বড় জ্বালাচ্ছে ওরা।

বরুণ হেসে জবাব দিয়েছে, দেখেই তো আছি, নতুন করে আর কি দেখব।

সোমা ভ্রূকুটি করেছে। —দেখা যাচ্ছে মনে? কতটা দেখা আছে?

অমনি আস্তে করে বরুণ জবাব দিয়েছে, বেশি না—কিন্তু আমি তো এখনো সেই মাছের ব্যবসাই করি!

পরে যে লোকটা অনেক বার অনেক বাঁণাকে দেখে চলেছে, তার সঙ্গে দুটো কথার সুযোগ খুঁজেছে সোমার চোখ এড়ায়নি। তাই দেখেও ভিতরটা তর্জনিক্ত হয়ে উঠেছে কেমন। মনে হয়েছে, যত ধরনধারণেই পড়ুক ওই মেয়ের তার সঙ্গের আশা আছে, কিন্তু ওর কোনো আশার ছিটে ফোঁটাও নেই।

একটা বিতিকিচ্ছির ব্যাপারটাকে ঘিরে রয়েছে সেই অন্নপ্রাশনের দিনটাও। রাত পর্যন্ত হয় নি, দই মিষ্টিও সোমার মতে যথেষ্ট নয়। অতিথিরা চলে যেতে যা দুঃখ আসে তাই বলে গালাগাল করেছে অরবিন্দকে। বলেছে, টাকা আসবে কোথা থেকে, বদনাম করে আর এক জায়গায় টাকা ঢালছ আমি জানি না!

এর কিছুদিনের মধ্যেই সেই গানের মাস্টারের সঙ্গে বাঁণা ভট্টাচার্য উধাও। তার মা এসে কেঁদে পড়তে এই লোককেই যেন তখন সংকটে হাবুডুবু খেতে দেখেছে। ঈশ্বরে করে আনার পর আবার সে-কি আনন্দ। বার বার ওকে বলেছে, মেয়েটার এবার চোখ খুলেছে, বুঝলে—অভাবাতি বদলে গেছে।

এত মাখামাখি সত্ত্বেও সোমার মনে আবার একটু একটু করে যেন বিষ ঢুকছে। এই লোকের সেই তুচ্ছ রূপ জানে। একটু-খানি স্নেহের জন্য কাঙ্গালপনা জানে। না, সোমা আর তাকে পাত্তা দেয় না বড় একটা। কাছে আসতে চাইলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চায়। একটা ছেলে এসেছে, এটাকে নিয়েই কি সুখ জানে না—আবার কোনো হঠকারিতায় [illegible] ও নির্মম কঠিন। কিন্তু নিজের [illegible] বজায় রেখেও যেটুকু বিনিময় সম্ভব, সোমা লোকটার সেটুকু আনন্দের তৃষ্ণাও বড় মেজাজে বাতিল করে দেয়। অরবিন্দ গালগুলি অনুনয় করে রাগ করে, শাসায়। কিন্তু ওসবের আর কানা-কড়িও দাম দেয় না সোমা। ক্বচিৎ কখনো নিজের সাময়িক দুর্বলতা ছিন্ন তাকে ধারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না। তবু লোক-টার মেহনতের মতো হামলার চেষ্টা।

সেই লোক দিন-রাতের একটা দীর্ঘ সময় বাঁণাদের বাড়িতে পড়ে থাকে। সেখানে যত্ন-আত্তি পায় জানা কথাই। পায়ে না কেন, টাকা তো যা পায় ঢালছেই। কিন্তু স্বভাব যার এরকম, তাতে তলায় সে কেমন মজবুত আছে কে জানে? এই লোককে আর কি ভরসা বিশ্বাস করতে পারে সে?

বিশ্বাস করে না। কিন্তু মুখেও এ নিয়ে বলে না কিছু। বলতে হাঁচতে বাধে। এমন একজনের খপ্পরে পড়ে অনেক নেমেছে, আর কত নামবে?

বোজগারের ব্যাপার নিয়েই খিটির মিটির বাধছে সব থেকে বেশি। ধারে দেনায় তলায় যাচ্ছে তাও সহ্য করতে পারে। ওরুধ বিক্রির মোক্ষগাতেও কম আসছে। বিক্রীর টাকা থেকে বসে থাকে বলে লোকে হয়তো বিশ্বাসও করে না আর। আগের মতোই দেনা নায়া দরদ পেলে যে উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে পারত অরবিন্দ গালগুলি, তাও নেই। সে-ও যেন আস্তে আস্তে গা ছেড়ে দিচ্ছে। বকাবকি গালি-গালাজ কানে ঢোকে না। আগে সিগারেট খেত খুব। এখন বিড়ি ধরেছে। দুপুরে কোথায় তাসের আড্ডা খেলতে যায় তাও সোমার কানে এসেছে। এ-সোনার পর সে-মুখ হয় ব্যবহার করেছে, পরে মানুষের সঙ্গে থাকলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। পাড়ার [illegible] কেউ কেউ বাড়িতে টাকার আশায় আসছে। সোমা একদিন স্পষ্ট মুখের ওপর বলে দিয়েছে, ছেলে একজনও [illegible] এই এ বাড়িতে আর তার আসবে না।

এ-কথা বলার মতো একটু জোর এখন সে পেয়েছে। নিজের আর বিশেষ করে বরুণ চক্রবর্তীর চেষ্টায় অনেক তদবির তদারক করে মেয়ে-স্কুলে সামান্য মাইনের একটা চাকরি পেয়েছে সোমা। তারপর ধরের লোককে ওই কথা বলেছে।

একদিন কি মনে হতে বরুণ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনার কাছে ও এ-পর্যন্ত কত ধার নিয়েছে?

সোমার মেজাজ দেখলে বরুণ চক্রবর্তীও আগের মতোই ঘাবড়ে যায়। আগের থেকে বেশি বেশি বরং। ঢোক গিলে জবাব দিয়েছে, ঠিক হিসেব করিনি—ঠেকে দেলে মাঝে মাঝে দেয়।

খুব সত্যি কথা বলেনি। যখন-তখন এসে টাকা চায়। সেজন্য বরুণ চক্রবর্তীকেই শাসিয়ে দিল, এর পর কের আপনি এক পয়সাও দিলে আপনার সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

কের টাকা চাইতে যেতে অরবিন্দকে সে ওই কথা বলেছে। টাকা দেবার উপায় নেই। সোমা বলে দিয়েছে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

বিরস মুখ করে অরবিন্দ বলেছে, থাকবে না তো থাকবে না—আমার বউয়ের সঙ্গে তোর সত্যি কোনো সম্পর্ক আছে নাকি! দেওয়া টাকা না দিসতো দুটো টাকা অন্তত দে।

—সেবার উপায় নেই ভাই, ও ঠিক ছেলে ফেলবে।

—কি করে জানবে?

—জিজ্ঞেস করলে?

—বলবি নিসনি।

—তা হয় না, মুখের দিকে চেয়ে যখন জিগেস করে আমার মুখ দিয়ে গলগল করে সত্যি কথা বেরিয়ে যায়।

তবু নাছোড়বান্দার মতো কিছু কিছু আন্দাজ করে ছাড়ে জানকীর। কিন্তু আগের তুলনায় সামান্যই। অল্পে বেশির ভাগ সময় সোমা অথবা ছেলের খরচের কথা বলে টাকা নিত।

দিন যায় মাস যায় বছর ঘোরে। সোমার সহ্যের সীমা ছাড়তে বসেছে। বিড়ি টানে, তাস খেলে, জুয়া খেলে, আড্ডা দিয়ে কাটায়। বাড়ির সঙ্গে দুবেলা কেবল খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক। মুখোশ খুলে যেতে লোকটার সামান্য লজ্জাশরমও বালাইও নেই আর। এরই মধ্যে এক এক দিন পেট-মোটা ব্যাগে বা ঝোলাতে ওষুধ ভর্তি করে নিয়ে আসে কোথা থেকে। দুই একদিনের জন্য বাইরে বেরিয়ে খালি ব্যাগ বা খালি ঝোলা হাতে ফিরে আসে আবার। ঘরের কাছে আর সুবিধে হয় না বলেই বোধহয় দূরে যায়। কিন্তু তখন হাতে পয়সা এলেও সোমা বিশেষ কিছু ছিনিয়ে আনতে পারে না। দান-ধ্যান খুব করেই আসে নিশ্চয়ই। কেউ কিছু চাইলে ধার করে হলেও টাকা এনে দেওয়ার অভ্যেস তার চেষ্টা এখনো আছে। [illegible] তো পছন্দ করবেই এখনো। কার ওষুধ-পথ্য জুটছে না কোন বাড়ির রোগী, মরল কী মর-মর—সবার আগে ছুটে যেতে এই অকম্মার ঢেঁকি।

কাজ আছে এখনো। আবার কারো জন্য কিছু করার বাহাদুরি নিজেই জাহির করে বলে ঠাট্টা ঠিসারাও করে অনেকে।

এরপর আবার যে ঘটনাটা ঘটল সেটাই চূড়ান্ত। সোমার বুকের তলার মাটিটার শেষ বিন্দুটুকুই নিঃশেষ হয়ে যেতে। হঠাৎ একদিন দুচোখ কপালে তুলে সোমার কাছে এসে দাঁড়াল অরবিন্দ—সর্বনাশ হয়েছে, মাসিমার মানে বাবার গলার পাশে কার্বাঙ্কল—ডাক্তার বলেছে।

সোমা শুনল। পড়শীও যে না হল তা নয়। কিন্তু [illegible] করতে পারে সে।

কিন্তু ওই লোকের তখন মাথার ঠিক নেই যেন। —কি করা যায় বলো তো, বাবাটা কেঁদে ভাসাচ্ছে, একটা কিছু তো করতে হবে—বহু টাকার ধাক্কা পড়ে গেল যে!

উচিত নয়, তবু জেতেই উঠল সোমা। টাকার ধাক্কায় তুমি পড়তে যাবে কেন? তোমার টাকা আসবে কোথা থেকে?

—তুমি বন্ধুকে একবার বলে দেখে? সত্যি খুব দরকার।

—না! আমি তাকে বারণ করে দেব।

—কি মুশকিল! তাহলে চিকিৎসা হবে কেমন করে? বাবাটা যে ভয়ানক কাঁদছে।

—তবে যাও কি, তুমি আদর করে চোখের জল মুছিয়ে দাওগে—

—অঃ! আচ্ছা ছোটলোক তো তুমি! লোকের এই বিপদের সময়—

—কি? কি বললে তুমি?

—কি আবার বলব? খুব ঠিক টাকা দিতে তোমার ভয়ে মেরে না। এতদিন বাবাকে হয়তো বিষেও করে ফেলত—তোমার জন্যে পারছে না। তুমি ওর নাকে দড়ি পরিয়েছ—

সোমা গর্জন করে উঠল, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে!

মাথা খারাপ করে বেরুলেই গেল।

তারপর ঠান্ডা, চুপচাপ কদিন। ভিতরে ভিতরে কি প্লান ভাঁজছে বোঝাই যায়। আবার প্রচুর বোঝাই আর পেট মোটা ব্যাগ বোঝাই ওষুধ এলো কোথা থেকে। দফায় দফায় চার দিন পাঁচ দিন করে বাইরে বাইরে কাটাতে লাগল। টাকা কোথায় ঢালা হচ্ছে সোমা জানে কিন্তু মুখে কিছু বলে না। তার মনে হয়, টাকা অঢেলে খরচ করছে ওই বাবার জন্যে, তাকে ঠান্ডা রাখার জন্যে। ক্যানসার রোগী—মরেই। তার জন্য এমন দিলেহারা ভাব কেন?

কিন্তু ইচ্ছে করলেই যত খুশি ওষুধ আনা যায় না যত খুশি ওষুধ খেলে যায় না। সোমার ধারণা অন্তে দেড়শো বছরের গাঁয়ের লোকের ফলে ওষুধ আনা এবং বিক্রির ব্যাপারে আগের থেকে লোকটার ক্ষমতাও কমেছে। তা ছাড়া, মিথ্যেবাদী জোচ্চোর—এমন লোককে কতকাল কে চোখ বুজে বিশ্বাস করবে। কারো সঙ্গে সততা রক্ষা করে কাজ করে এমন বিশ্বাস নেই। ফলে ওদিকে এক জনের অসুখ, আর এদিকে আর একজনের ওটকটানি লক্ষ্য করে সোমা। সাড়ম্বরে চিকিৎসা করার ইচ্ছে—সেটা হচ্ছে না বোধ হয়। এ অসুখে আড়ম্বর করতে হলে টাকা অনেক লাগে বলেই বিশ্বাস সোমার।

শিগগিরই আবার ছুটকটানির অবসানও লক্ষ্য করল সোমা। ভবিতব্য মনে নিয়ে হাল ছেড়েছে কিনা জানে না। তাছাড়া দেখাই যা কতটুকু হয়। সকাল দুপুর বিকেল রাত্রির অনেকটা সময় তো বাবাদের বাড়ীতেই কাটিয়ে আসে।

মাস ছয়েক পরে।

স্কুলের কি একটা বিশেষ জংশন সেদিন। অল্প বয়সী টিচাররা অন্তত যেন সেলেব্রেট করে। শিক্ষয়িত্রীদের এ-রকম সুযোগ খুব বেশী হয় না। অন্যান্য লকার থেকে কিছু গয়না তুলে আনবে সোমা। গায়ে যা আছে সেগুলো বদলাবে।

প্রস্তুত হয়ে ড্রয়ার থেকে লকারের চাবি খুঁজতে গিয়ে চাবিটা পেল না। ভেবল ছোট জিনিস, তলায় পড়ে আছে কোথাও। কিন্তু যাবতীয় জিনিস নামানোর পরে আর শাড়ীগুলোর ভাঁজ খুলে দেখার পরেও চাবি নেই। অবাক লাগছে সোমার। মাস চার-পাঁচ আগেও তো লকার থেকে গয়না বদলে এনেছিল, ফিরে এসে কোথায় রেখেছিল তার চাবি?

ঘরে সবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। চাবি নেই।

দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিল সোমার। মাথার ঠিক থাকে না আজকাল। কোথায় রাখতে কোথায় কখন তাহলে?

ব্লেকেতে পড়ে থাকলে কি না দেখে ঝাঁটপাট দিয়ে ফেলে দিয়েছে কিনা তাই বা কে জানে?

দুপুরে অরবিন্দ খেতে এলে তাকে বলল, লকারের চাবিটা পাচ্ছি না।

—কোন লকার?

—কোন লকার আবার—ব্যাঙ্কের।

—ও তোমরা তোথাও যাবে কোথায়।

—তুমি খুঁজে দেখো না একটু। আমি তো কত খুঁজলাম।

দুজনে মিলে এক প্রস্থ খোঁজা হল আবার। কিন্তু চাবি নেই তো নেই।

—কি হবে তাহলে? সোমার কেঁদে ফেলার উপক্রম।

—কি আবার হবে চাবি হারিয়েছে ব্যাঙ্কে জানিয়ে দিতে হবে। লকার তো আর কেউ ইচ্ছে করলেই খুলতে পারবে না।

—তুমি একটুনি যাও তাহলে, জিগ্যেস করে এসো। ওরা নতুন চাবি দেবে?

অরবিন্দ বলল, সে এখন ঢের ঝামেলার পালা। এ-সব লকার যেখে থেকে আসে সেখানে খবর যাবে তারপর এখানে ব্যাঙ্কের লোকের সামনে লকার ভাঙা হবে—সেই যন্ত্র থেকে আবার নতুন চাবি তৈরী হয়ে আসবে, ব্যাঙ্কে আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি, সময় লাগবে এই পর্যন্ত—উতলা হবার কিছু নেই।

তবু মন মেজাজ একেবারে বিগড়ে আছে সোমার। পরদিনটা ছুটি ছিল স্কুলের উৎসবের দরুণ। সকালে বন্ধুর চক্রবর্তী এসেছিল। ইদানীং ফাঁক পেলে আসে। ছেলেটার সঙ্গে খেলা করে; সোমা মনে মনে হাসে—যেন ওই ছেলের টানেই বেশী আসছে আজকাল। কিন্তু সেদিন হাসি পেছে। বন্ধুর আসা মাত্র তাকে লকারের চাবি হারানোর খবরটা দিল। সেও

॥ নতুন নাটক ॥

অগ্নিদূত

শ্যালক সমাচার ৪-৫০

বেতারে বহুরূপী নামে অভিনীত

সমর মুখোপাধ্যায়

অজগর ৫-৫০

বহু পুরস্কার প্রাপ্ত

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু অন্তরা ৫-০০

লিপিকা ৩০।১এ, কলেজ রো,

কলিকাতা—৯

একটা আশ্বাস দিল ঘরেতে কিছু নেই, তবে জামেদার বাপার।

কথায় কথায় এক সময় বীণার মায়ের অসুখের প্রসঙ্গ উঠল। বরুণ বলল, ওই বড় অপারেশনটা হবার পর বীণার মা তো এখন একটু ভালই আছে—সীতা জন্ম যা করল নিজের ছেলেও অতটা করে না।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড ঘা পড়ল সোমার। না, বীণার মায়ের বড় অপারেশনের কথা ও কিছু জানে না। কিন্তু যা ঘেটে পড়ল সেটা অন্য কিছুর।

বরুণকে বিদায় দিয়ে সোমা নিজের ঘরে এলো। তীক্ষ্ণ চোখে চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। আধ খোলা সাটকেসটা টেনে নিল প্রথম। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। নেই। মোটা ওষুধের ব্যাগটা খুলল এবার। ওষুধ আর কাগজপত্র খুব বেশী নেই। সে-সব ঝেড়ে-ঝুড়ে দেখল। নেই। বাক্সের মধ্যে কয়েকটা খুপরি। হাত ঢোকাল একে একে। কাগজ-পত্র বেরিয়ে এলো। শেষে কোণের প্রায় অগোচরের একটা ছোট্ট খুপরি থেকে চামড়ার কেস মোড়া ছোট্ট জিনিসটা বেরুল।

লকারের চাবি।

দু চোখ ধক-ধক করে উঠল সোমার। বেলা তখন সাড়ে দশটার বেশী হবে না। সেই অবস্থাতেই হন্তদন্ত বেরিয়ে এসে রিকশ নিল একটা।

ব্যাঙ্কের সংলগ্ন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল ওদের লকারের চাবি হারানোর কথা কেউ রিপোর্ট করে গেছে কিনা।

কেউ কিছু রিপোর্ট করে নি।

সোমা লকার খুলবে। ব্যাঙ্কের অফিসার সই করার খাতা খুলে এগিয়ে দিল।... পাঁচিশ তিরিশ দিন অন্তর অন্তর চার বার লকার খোলা হয়েছে। অরবিন্দ গাঙ্গুলীর চাবটে সই আছে। দুজনের নামে লকার—যে-কেউ একজন খুলতে পারে।

ডাঃ দীপক সেন-র পি এইচ ডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত
গবেষণা গ্রন্থ
বঙ্কিম মূল্যায়ন ১০,
যৌন আচরণ নিয়ে যারা উদার মতবাদ প্রচার করেন, তারাও আপন স্ত্রীর বহু পুরুষোচিতা মেনে নিতে পারেন কিনা—এই জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে গড়ে উঠেছে একখানা উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির দশখানার মধ্যে অবশ্যই একখানা, নাম—
উদারপন্থী ৫,
কলকাতা দেখেছি—৩,
প্রেমিক প্রেমিকাদের বৈঠকে—৪,
বুক ল্যান্ড, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

তবু সোমা লকার খুলবে। দেখবে।

অফিসার ওকে সঙ্গে করে ভেতরে এসে তার নম্বরের লকারে মাস্টার কী ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেল। এবার নিজের চাবি লাগিয়ে সোমা লকার খুলল।

বাকসগুলো সব ঠিক আছে।

ভেতরে টুকি-টাকি কিছু হেরা বাকী চোখ ভাল করেই বুলাও।

বাড়ী। সোমা অপেক্ষা করছে। তখন পর্যন্ত বাবাকেও বলে নি কিছু।

দুপুরে খেতে এলো।

সোমা তাকল, আগে শোনো।

স্ত্রীর এই মূর্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুকে বুঝি হাতুড়ির ঘা পড়ল অরবিন্দর।

সোমা বলল, লকারের চাবি পেয়েছি।

শুকনো বিবর্ণ মুখে অরবিন্দ বলল, হ্যাঁ...কোথায় ছিল?

—তোমার ওই ব্যাগে।

চাবি পাওয়া পর্যন্তই খবর কিনা জানে না, তখনো প্রাণের তাগিদে যেন কিছু আশা করছে অরবিন্দ।

—ব্যাঙ্কে গেছলাম। এবার তুমি জেলে যাবার জন্যে তৈরী হও।

বজ্রাঘাত হয়েই গেল। লোকটা এর পরেও টেনে তুলতে চেষ্টা করছে নিজেকে। —ফেলে ছেতে হবে কেন...তোমার জিনিস তো আর নষ্ট হয় নি, ও আমি ঠিক উদ্ধার করে এনে দেব—

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না। বলতে বলতে বাস্ত মুখে ঘর ছেড়ে চলে এলো। তারপর বাস্তায়।

বিকেলে বরুণ চক্রবর্তী এলো।

সত্য হালদারের চিৎকার চেঁচামেচিতে তখনো বাড়ী সরগরম। আশ-পাশের বাড়ীর লোকেরাও ঘটনা জেনেছে। সত্য হালদার কিছু রেখে ঢেকে চেঁচামেচি করছেন না বা হুমকি দিচ্ছেন না।

বরুণকে দেখেও চিৎকার করে উঠলেন তোমরা এবারে থানায় যাবে কিনা একটা কিছু বিহিত করবে কি না?

কিন্তু এও জানেন, থানায় গিয়ে ফল কিছু হবে না। দুজনের নামে লকার। দুজনের যে-কোন একজনের জিনিস তোলার অধিকার। এটা চুরি প্রমাণ হবে কি করে?

বরুণ চক্রবর্তী সোমাকে জানালো অরবিন্দ তার কাছে গেছল, সে সবই স্বীকার করেছে। গয়নার কিছু বন্ধক আছে আর কিছু বিক্রী হয়ে গেছে। একটা প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই কাজ করেছে। কিন্তু জানাজানি হবার ভয়ও মনের মধ্যে ছিল। তাই চট করে টাকাটা তুলে আনার জন্যে বন্ধুর সঙ্গে মাঠের রেসে গেছল। বন্ধু তাকে জানিয়েছিল যে-যে বাজী খেলা হবে সেগুলোর মার নেই। কিন্তু সেখানেও মার খেয়েছে।

বরুণ চক্রবর্তী পকেট থেকে কিছু গয়না বার করে আমতা-আমতা করে বলল ওর সঙ্গে গিয়ে মাত্র এ কটা আমি ছাড়িয়ে এনেছি।

যা ভেবেছিল তাই। সোমা রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফুঁসে উঠল। —কেন? কেন আপনি ছাড়িয়ে আনতে গেলেন? কে আপনাকে ছাড়িয়ে আনতে বলেছিল?

গয়না কটা ফেরত দেখে বরুণ চক্রবর্তী তখনকার মতো পালালো।

না, সেই থেকে অরবিন্দ গাঙ্গুলী আর এ-বাড়ীতে পা দেয় নি। এখানে আর তার জায়গা হবে না এটা সে বুঝে নিয়েছে। নিজের সামান্য জিনিসপত্র লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেছে। সত্য হালদার বরুণের মারফতই তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, জেলফেরতের সঙ্গে তাদের সমস্ত সংস্রব শেষ হল। নাতি আর একটু বড় হলেই মেয়ের তিনি আবার বিয়ে দেবেন। যথাসময়ে ডিভোর্স সুটও ফাইল করা হবে।

অরবিন্দ বরুণকে বলেছে বিক্রীটা তুই-ই করে ফেল তাহলে তবু একটু সান্ত্বনা থাকবে আমার।

বরুণ চক্রবর্তী জবাব দিয়েছে, যে মেজাজ দেখছি—কি হবে না হবে ও-ব্যাপার কাউকে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

অরবিন্দ আবার দীপেন ভট্টাচার্যের সেই পুরনো ফ্ল্যাট ঘরেই ফিরে এসেছে। সেই বুড়ী অন্ধ তার অন্ধ ছেলে আর তার স্ত্রী আবার তাকে সাদরেই গ্রহণ করেছে। এমন মহত্বের ছেলেটাকে তার বউ চিনতে পারল না বলে বউয়েরই দোষ দিচ্ছে বুড়ী।

বীণা ভট্টাচার্য মা সেই চোখ বুজল এত কাল বাদে।

শ্মশান থেকে ফিরছে যখন। অরবিন্দ গাঙ্গুলী স্নান-টান সেরে নিজের ঘরে বসেছে। মনে এখন অনেক দুশ্চিন্তা। কেউ চলে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করে তাকে। কিন্তু চলে গেলে আর শোক নিয়ে বসে থাকে না। এখন চিন্তা বীণা ভট্টাচার্যের জন্য। মেয়েটার আর কেউ থাকল না। এও পরের ভাবনা সমূহে চিন্তা শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ। নমো নমো করে করলেও করতে তো হবেই কিছু। বীণার সম্বল এখন দক্ষিণ গড়িয়ার টিউশনি আর বাচ্চাদের গানের স্কুলের একটা মাস্টারি। সব মিলিয়ে একশ টাকা হয় কিনা সন্দেহ। তার উপর এই শেষের দিকে চোখ বুজে ধার করে গেছে মায়ের জন্য। এখন আর পাঁচটা টাকাও বার করতে পারবে না। চেয়ে-চিন্তে টাকা যোগাড় করে সৎকার করে আসতে হয়েছে।

অরবিন্দ গাঙ্গুলী এখনো পেট মোটা ব্যাগে ওষুধ ভরে বেরোয় মাঝে মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ওষুধ ছেড়ে এখন চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ওষুধে এসে ঠেকেছে সেগুলো। ধারে-কাছের কেউ আর বিশ্বাস করে ওষুধও ছাড়তে চায় না তার কাছে। ওষুধ চাইতে গেলে আগাম টাকা চায়। অথচ আজও মন

ঠিক করে বেরুতে যাবে যা-ই আজ ঠিক বিক্রী করে আসতে পারে এখনো।

ভাবছে সেই চেষ্টা করবে, না বলরাম নিয়ে চানা তুলতে বেরুবে। এ-কাজটাও পারে। পাড়ার বায়েজাড়ী পাকো পার্বণে চাঁদা সংগ্রহ আর উৎসবের প্রধান কর্মকর্তাও এখন সে-ই। এখনো সে সবদাই সবলকে বোঝাতে ছাড়ে না যে তার কদর কত। দলের অন্যান্যরা মুখ মুচকে হাসে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে থাকে, কাজের সময় তাকেই ডাকে। এত সময় এর করে হাতে আছে?

এক গেলাস চায়ের সঙ্গে মুড়ি চিবুতে চিবুতে টাকা সংগ্রহের পাঁচ রকম সম্ভাবনার কথা ভাবছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। টাকা কিছু সোমার থেকেও চাইতে পারে কিন্তু সে টাকা আদায় করতে চলে তাকে সেজন্য রাস্তায় পাওয়া দুষ্কর। না বাড়িতে আর তার যাবার উপায় নেই। রাস্তায় ধরে চাঁদা-টাদা আদায় করেছে অনেক সময়—কিন্তু এ তো আর দু-চার টাকার ব্যাপার নয় যে কুবাহাদুর পাণ্ডার জন্যে মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে চলে যাবে। তাছাড়া বীণার মায়ের জন্য তো এক পয়সাও দেবেই না—তার জন্যে যন্ত্রণাগুলো গেছে।

মেঘ না চাইতে জল। করুণ চক্রবর্তী এসেছে। টাকার ব্যাপারে তার আজকাল আর আসেই না বুদ্ধি একদম। এই কটা বছরে মানুষের ব্যবসার অনেক উন্নতি করেছে মাল গেলে এখন কম করে হাজার দুই রোজগার হচ্ছে। নিজে একটা টেম্পো কিনেছে সম্প্রতি। এর ফলে রোজগার আরো অনেক বাড়বেই জানে। কিন্তু ওর কাছে থেকে টাকা আদায় করা ক্রমে শক্ত হয়ে পড়ছে। সোমা ওকে এ ব্যাপারে এমন শাসানির মধ্যে রেখেছে যে ইচ্ছে থাকলেও কিছু পারে না।

তবু ওকে দেখামাত্র ভিতরে ভিতরে সচকিত হয়ে উঠল অরবিন্দ গাঙ্গুলী।

—আয় আমার মাছ ভাজা খাই!

করুণ চৌকির একপাশে বসে বলল—খেয়েছিলাম—কাঁচা তুলে নিয়ে যেতে বলল।

—তাই তুলে নিয়ে এলি না কেন দু-বিপক্ষের। আমার জন্য আলাদা করে ভেজে পাঠাবে না জানা কথাই তো...তা তুই হঠাৎ যে?

—বীণার মা-টা মারা গেল একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত কিনা ভাবছিলাম...।

অরবিন্দ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।—নিশ্চয় উচিত। চল আমি নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েটার সে-কান্না যদি দেখতিস। আমাকে বলে আমা তুমি ছাড়া আমার আর কে আছ। আমি বললাম—কেন করুণও আছে তোর এত ভাবনা কি। এই চা মুড়িটা খেয়ে তোকে নিয়ে যাচ্ছি চল—

করুণ জিজ্ঞাসা করল বীণাটা এখন অনেক বদলেছে না রে?

—বদ বলেছে একেবারে নিজেদের বউয়ের মতো হয়ে গেছে। তোর কথা তো প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। তুই যে আবার আমার বউটাকে নিজে আটকে গেলি নইলে এতদিনে ওকে তোর ঘর করতে পাঠিয়ে দিতাম—কি সুন্দর যে গান করে এখন শুনলে তোর গান ছেড়ে দিতে। ক যে হবে এখন ভগবান জানে—

চিন্তিত মুখে করুণ বলল অনেককাল আগে ওর গান শুনেছিলাম তখনো ভালো লাগত। এক কাজ কর তুই-ই ওকে বিয়েটা করে ফেল। ডিভোর্স তো এতদিনে হয়েই আছে তোদের কোর্ট থেকে দাঁড়ালেই হল।

টাকার মুখ দেখার পর থেকে বন্ধু এখন বিয়ের ভাবনা ভাবছে ভেবে অরবিন্দ এটা জানে। এখন ও সোমাকে নিয়েই খোলাখুলি আলোচনা হয় দুজনের। কিন্তু ওই প্রস্তাব সোমার সামনে ওর টান যত জোরই হোক।

অরবিন্দ গাঙ্গুলির দাঁত খিঁচিয়ে উঠল তোর যেমন বুদ্ধি—বীণা নিজের ভাল বলেই ভাবে আমাকে—তাছাড়া জানিস একটা বিয়ের ফল তো দেখলি সব ছেড়েই পালায় দড়ি ছিঁড়তে চাইবে।

করুণ সেটা অস্বীকার করতে পারল না। বলল কিছু ভালো লাগছিল না একবার তাই এলাম তোর কাছে...বীণার বাড়িতে যাওয়া-টাওয়া এখন হবে না জানতে পারলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

অরবিন্দ মনে মনে একটা গালাগাল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল জানতে পারছে কি করে?

—ও মুখের দিকে তাকালেই কেমন করে বুঝে নেয়। আজ তুই আমার খোঁজ করেছিস জেনেই পাঁচসের বেখেছে এক পয়সাও যাতে না নিই—

—না নিলে ওর মায়ের কাজ হবে কি করে? হাজার হোক ও-ও তো তোর আপনার জন হতে পারত। অতখানেক টাকা তোকে দিতেই হবে।

—ও না-বা! করুণ আঁতকে উঠল শ' খানেক পয়সাও আমি দিতে পারব না ভাই—আজ রাতেই সোমার ওখানে আমার খেতে যাবার কথা—খপ্পর পড়লে খাওয়া বার করে দেবে।

অরবিন্দ বন্ধুকে চেয়ে রইল মুখের দিকে খানিক। —এত যে ভয় করিস বিয়ে করার পর সামলাবি কি করে?

করুণ চক্রবর্তী সমস্যাটা স্বীকার করেই নিল যেন। বলল, সত্যি এক একসময় এত ভয় করে মুখের দিকে তাকানো যায় না পর্যন্ত—বীণাটাকে সে তুলনায় আজকাল আর একটুও ভয় করে না—মনে মনে মায়া হয় তো—ও হেসেই কথা বলে। ...কিন্তু তোর কষ্টটা হাসতেই ভুলে গেছে যেন...তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন মিষ্টি লাগে বুঝলি—এই আজই তো সকালে—

হেসে ফেলল। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল আজই সকালে কি?

—না না না—কিছু না। আমি চাঁদা চাই—

যেন ধরা পড়ে পালাবার চাগিদ। অরবিন্দ অস্বাচ্ছন্দ্যে বাড়ার টাকার সমস্যা হবার আশা দেখছে না। —দুই ভাইয়ে ঝগড়ার কথা একটু শুনলো মহানুভবই দেখাতে এসেছিল তাহলে?

আবার মনে পড়ল কি। দুর্বলতার কিছুই যেন। দ্বিধান্বিত মুখে বলল, সেই জন্যও এসেছিলাম আর একটু অন্য কাজও এসেছিলাম—

—কি?

—একটু বেরুবার সময় হবে তোর?

—হবে। কোথায়?

—ইয়ে, সোমার মনে মনে একটা ঘড়ির শখ আছে হাতে টাকা এলে একটা কিনবে বলছিল...ইচ্ছে করছে একটা ঘড়ি কিনে আজ ওকে প্রেজেন্ট করি। কি-রকম ঘড়ি ওর পছন্দ হতে পারে আর কিভাবে প্রেজেন্টটা করব ঠিক না পেয়ে তোর কাছে এসেছিলাম।

শোনার পর অরবিন্দ গম্ভীর একটু। —আমি তোকে এমন ঘড়ি কিনে দিতে পারি যা দেখলে তোর দাম ওর কাছে চার গুণ বেড়ে যাবে। ওর পছন্দ অপছন্দর নাড়ি-নক্ষত্র জানা আছে আমার।

করুণ সাগ্রহে বলল, তাহলে চল না ভাই আমার সঙ্গে একটু।

—তাহলে আজ সকালে কি হয়েছিল বল। আজই বা তোর এত ঘড়ি দেবার ইচ্ছে হল কেন?

—ইয়ে, না না সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার।

—এই যে বললি মিষ্টি? খুলে বল, না তোর হাতে সুখবর ছাড়া অসুবিধে হবে না—ওর মায়ের দিক যেমন জানা আছে মিষ্টি দিকটাও তেমনি জানা আছে আমার—বুঝলি? বল বল—এসব কথা বলতেই বলতে হয়।

মুখ লাল করে করুণ বলল, আমি ভাই ইচ্ছে করে দৌখনি ওর বাবার তাগিদে চায়ের কথা বলতে এসে হঠাৎ দেখে ফেলেছি তার-পর থেকে আর ভুলতে পারছি না ভাই—

—তা দেখে ফেলেছিস—তাতে কাপড় টান-টান করা অবস্থায়?

যান্ত্রিক এপ্রিল মাসে অভিনয় করল

৬ই পাতুরিয়া, কেষ্টধনের কেরামতি
১৫ই চিত্তরঞ্জন, আমার জননী
১৯ই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, সোমক ও কালীচরণ
২০শে চন্দননগর, সোমক ও কালীচরণ
২২শে মধুমন, সোমক ও কালীচরণ
২৪শে শিবেরণী, আমার জননী
২৮শে কাঁচরাপাড়া, সোমক ও কালীচরণ ও সন্ন্যাসী
২৯শে নৈহাটী, চুপ সভ্য বলছি

—না-না—ইষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল—

—ও। আর একটু সোজা হয়ে বসে মুখের দিকে তাকালো অরবিন্দ। —গায়ে জামা-টামা ছিল না?

—তুই বড় বিচ্ছিরিভাবে জিগ্যেস করিস জামা থাকবে না কেন তবু...

—ঠিক আছে বোস। উঠে গম্ভীর মুখে নিজের বাক্স খুলতে গেল। ঘাঁটাঘাঁটি করে কি বার করতে দেখা গেল হাতে ছোট অ্যালবাম একটা। বন্ধুদের সামনেই বসল আবার। ভিতর থেকে ছবি টেনে বার করল একটা। নিজে একটু দেখে নিয়ে ফোটোটা ওর সামনে ধরল। —ঠিক এ-রকমটা নয় তাহলে?

আঙুল দিয়ে সেই মাথা আঁচড়ানোর ফোটোগ্রাফের একটা। সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটির বসন্তের দাগ ভরা মুখে এক ঝলক হাসি হঠাৎ উঁকি এলো যেন। কালো কবে তাকাতেও পারছে না আর না হাসিয়েও পারছে না।

অরবিন্দ আর একখানা ফোটো এগিয়ে দিল তার দিকে। —এটাও দেখ।

সেই একই ছবি। কিন্তু অন্য ভংগি হোলা। কান-মাথা গরম হয়ে উঠছে বন্ধুর চক্রবর্তীর।

ছবি দুটো তার হাত থেকে নিয়ে অরবিন্দ গাঙ্গুলি চুপচাপ ভাবল একটু—আমাকে বলে তোর লাভ হল না লোকসান হল?

—লা-লাভই হল।

—এক গেলাস জল খাবি?

—হ্যাঁ ভাই—বড় তেষ্টা পেয়েছে।

উঠে এক গেলাস জল গড়িয়ে তার হাতে দিল। বন্ধু তখন বিস্ফারিত চোখে ফোটোর খামটার দিকে চেয়ে আছে। আর একবার দেখার ইচ্ছে কিন্তু সাহস নেই।

—নে ধর।

জল খেল। তার সামনে বসে অরবিন্দ গাঙ্গুলি যেন চিন্তাচ্ছন্ন। বলল একটা সমস্যার কথা ভাবছি...সোমার কাছে আমি এখন পরপর দুদিন আগে থেকে পরে ছোট ডিক্লেয়ার্ড ছো হয়েই আছে এ-ছবি এখন আর আমার কাছে থাকা উচিত?

ঘোর মুখে একটা অস্বাভাবিক আরক্ত ফুটে উঠল বন্ধুর চক্রবর্তীর। ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকালো। —থাক্, উঁহু...

—বরং তোর কাছেই এখন এ দুটো থাকলে ভাল নেই—আমার থেকে তোর বেশি অধিকার।

বন্ধুর আবার মাথা নেড়ে সায় দিল। অর্থাৎ ভাই!

খাম থেকে ফোটো দুটো আর একবার বার করল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। বন্ধুর দিকে একটু তেরচা করে ধরে দেখবার মতোই দেখে নিল যেন। বলল, এ দুটো হাতছাড়া করতে আমার পাঁজর ভাঙছে—

—তুই প-পরপর দুটোই ভাল না নিজেকে।

—চেষ্টা করছি। ঠিক আছে এ দুটো রাখ তোর কাছে। দু'শ টাকা দে—

দু' চোখ কপালে তুলে ফেলল বন্ধুর চক্রবর্তী। —দুটো ছবির দাম দু'শ টাকা।

—হ্যাঁ তার এক পয়সাও কম নয়। আমার মনস্থাটা বুঝেছিস?

—ইয়ে, তা বলে দু'শ টাকা!

মুখ ঈষৎ বিকৃত করে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বলল, ছবির দামটাই সব নাকি—মাত্র দু'শ টাকার জন্যে পরপুরুষের হাত থেকে আপনার জনের এ ছবি ছিনিয়ে যদি নিতে না পারিস তো ভাগ—ঘড়ি-টড়িও নিয়েই কেন গে যা।

বন্ধুর চক্রবর্তী থমকে বসে রইল খানিক। আবারও জল তেষ্টা পাচ্ছে। —ইয়ে...সোমা জানতে পারবে না?

—এসব জানতে পারার ব্যাপার নাকি। তুই নিশ্চিন্ত থাক—

পকেট থেকে দুখানা একশ টাকার নোট বার করে বন্ধুর হাতে দিল। —নে খুস ভাই।

নোট পকেটে পুরতে পুরতে অরবিন্দ আবার আশ্বাস দিল তুই হলি গিয়ে প্রাণের বন্ধু তোকে দেখব না তো কাকে দেখব। নে ছবি নে—

ছবির খামটা বুক পকেটে রাখার ফাঁকেই বন্ধুর ঘেমে ওঠার দাখিল।

ঘড়ি কেনা হল। সুন্দর লেডিজ রিস্ট-ওয়াচ। এখন বন্ধুর সমস্যা সোমাকে এটা দেবে কি করে।

অরবিন্দ বলল, খপ করে হাতখানা কোথি পরিয়ে দিবি—আবার কি! সবে তো শুরু আরো কত ডিনিসের শখ ছিল সোমার—একটা গ্যাস প্ল্যান্ট সুন্দর একটা বাথরুম—

—বাথরুম! বন্ধুর হাঁ। তারপর বলল—ও-সব না হয় বিয়ের পর আস্তে আস্তে হবে—

অরবিন্দ একটু ভেবে বলল, বাথরুমটা না হয় পরেই হবে গ্যাসটা ইচ্ছে করলে আগেই দিয়ে দিতে পারিস—আর কারা এসব আগে দিতে পারলুম না বলেই তো হাড়াহাড়ি পরলে কি কথা ছিল!

বেনারসী • সিল্ক
ভাঁড • পোষাক
রত্নদীপ
৭৩, জি, টি, রোড, সাউথ, হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

বন্ধুর চক্রবর্তী চিন্তাচ্ছন্ন আবার।

...নের পর স্নান-টান করে কেউবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তার আগে বার দুলেক সোমার ওই ছবি দুটো দেখেছে। একটা ঘরেও দেখতে ভয় হার।

এ-বাড়িতে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যে সোমা তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

—না-না-তো... কেন?

—মুখ লাল-লাল দেখছি।

বন্ধুর কেন যেন ভালো বলে তাকাতে পারছে না সোমার দিকে। সামনে কাছে টেনে নিয়ে তার দিকেই মনোযোগ দিল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, মাছটা কেমন ছিল?

—খুব ভালো। কয়েকটা ভেজে রেখেছি যাবার সময় নিয়ে যাবেন। পরক্ষণে নিজের ওপরেই যেন বিরক্ত সোমা। —মাংস মাথা গেছে বলে নন্দিতাদির কাছ থেকে পঁচিশ দশটা টাকা নিয়েছে—বুঝলেন? আমি রাগ করে সে-টাকা দিয়ে দিয়েছি।

এই মুখ মুখ দেখলেই বন্ধুর চক্রবর্তী ছটফট করে। বলল খুব অন্যায়।

না ঘড়ির কথা উত্থাপন করার মতো সাহস সংগ্রহ করতে পারছে না। অরবিন্দ খপ করে হাত টেনে নিয়ে ঘড়ি পরতে বলেছিল। ওর ওই হাতের দিকে বার বার তাকানোই সার। শেষে খাওয়া-দাওয়া চুকতে মাত্রা হয়েই বলে ফেলল, একটা কথা ছিল—

সোমা ঘুমন্ত ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছিল। গলার স্বর অন্য রকম লাগতে ঘুরে তাকালো। মুখ দেখে আরো অন্য রকম লাগল। গম্ভীর একটু। ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।—বলুন।

—মা-মানে একটা জিনিস এনেছিলুম।

সোমা এবারে যথার্থ অবাক একটু। —কি জিনিস?

পকেট থেকে ভয়ে ভয়ে ঘড়ির কেসটা বার করল বন্ধুর। সোমা অবাক— অবাক। খপ করে সে-ই তার হাত থেকে কেসটা নিয়ে খুলে দেখল। —ব্যাঃ সুন্দর ঘড়ি তো। আমার জন্য নাকি?

বন্ধুর গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। মাথা নাড়ল। তাই

—কি কাণ্ড! এ-তো দামী ঘড়ি দেখি! কত দাম পড়ল?

—দু'শ পঁচাত্তর।

—দেখে তো! খুশি হয়েছে খুব বোঝা যায়। কিন্তু গলায় অনুযোগের সুর। আমার জন্য হঠাৎ ঘড়ি আনতে গেলেন কেন?

বন্ধুর চক্রবর্তীর মুখখানা ঘুরতে ওদিকে। বলে ফেলল, অনেক দিন ইচ্ছে করছিল কিনে আনি... সাহস পাচ্ছিলাম না।

সোমার দু' চোখ তার মুখের ওপর দমকালো একদফা। —আজ সাহস পেলেন কি করে?

খুশি হবার হাতড়ে পেল না। আজকের দিনটা এই লোকের কাছে কি কারণে বাতকুম সেসব মনে পড়ল। সকালের মাথা আঁচড়ানোর সেই ঘটনাটা আর একটা তিক্ত স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। চোখে কৌতুকের ছায়া তবু একটু।

সাহস পেয়ে বরুণ এবার মনের বাসনা ব্যক্ত করেই ফেলল। —ঘড়িটা একটু পরিয়ে দিয়ে দেখব ঠিক হল কিনা?

কৌতুকের ছায়া ঠোঁটের ফাঁকেও স্পষ্ট হল এবার। ভারিক্কি ধরনের একটি চুড়ি মানায় কিনা এই ছুতোয় সেটাও যে পরিয়ে দেখতে হবে! বলল কিছু। ঘড়িসুদ্ধ হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিন—।

...হ্যাঁ আজ ভোর রাতে ওই স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই মন সে অনেকখানি স্থির করে ফেলেছে। না বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে কোন রকম আনন্দ-কল্পনার প্রশ্রয়ে ভাসে নি। একটা বড় বাজি সম্পন্ন করে ফেলার কথাই ভেবেছে। বড় নিপুণভাবে সম্ভব এবার ডিভোর্সটা চুকিয়েই ফেলবে। ওরকম আজে বাজে স্বপ্ন দেখার কোন মানে হয় না, সত্যিই মাথা গরম হলে কখন কি করে বসে ও ঠিক কি। ডিভোর্স হলে যে লোকটার এগিয়ে আসার সম্ভাবনা সে আজকের দিনেই পা বাড়াবে এটা ভাবে নি। খারাপ লাগছে না।

ঘাড় পরাতে গিয়ে গলদঘর্ম অবস্থা বরুণের। সোমার এত কাছাকাছি আর কখনো আসে নি। তার ওপর ওর উষ্ণ নরম বাঁ হাতটা তার দুই হাতে। হাত দুটো কাঁপছে বরুণ নিজেই টের পাচ্ছে। সোমার কৌতুকমাখা দু চোখ তার মুখের ওপর। গম্ভীর কৌতুকে ও যেন একটা মজা দেখছে।

ঘাড় পরানো শেষ হতে আরো গিলে বরুণ বলল বেশ হয়েছে।

সোমা হেসে ফেলল।

কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছিল বরুণ চক্রবর্তী কে জানে। আনন্দ ধরে না। কিন্তু তা প্রকাশের ভাষা নেই। মনে হচ্ছে এক গ্লাস ও শিগগীরই আনছি, তারপর বাকিটা আস্তে আস্তে হবে—

সোমা হাঁ হয়ে তাকালো এবার। —বাকিটা?

—ইয়ে...ও দুটোরও শখ তোমার...

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সোমা স্তব্ধ খানিক। চাউনিটা লোকটার মুখের ওপর স্থির হয়ে এঁটে বসছে।

—আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল?

—কার সঙ্গে?

সোমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, কার সঙ্গে বুঝতে পারছেন না?

বরুণ চক্রবর্তী ঘাবড়ি খেল বার কয়েক। —হয়েছিল।

সোমার ইচ্ছে করল ঘড়িটা হাত থেকে খুলে মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে।

অস্বাভাবিক গম্ভীর বলল আপনি আর কিছু আনবেন না বা এক পয়সাও খরচ করবেন না।

ধড়ে প্রাণ এলো বরুণ চক্রবর্তীর।—আচ্ছা আচ্ছা,—আর ওই ওর সঙ্গেও কোন সম্পর্ক রাখব না—মাছ ভাজা কখনো পৌঁছে দিয়েই চলে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে অরঙ্গ মুখে সোমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে বারান্দার ঢুকল। কাপড় সঠিক না রেখে বরুণও পিছনে এলো। হয়তো মাছ ভাজা দেবার জন্যই রান্নাঘরে ঢুকেছে ভাবল।

রেকাবির ভাজা মাছ কটা এনে সোমা উঠোনের ও-ধারের নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সরোষে বলে উঠল, মাছ ভাজা খেতে হলে এসে ওখান থেকে খেয়ে যান যেন!

হন হন করে আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল সোমা।

বিমূঢ় মূর্তি বরুণ চক্রবর্তী বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

—একদিন একটু দেরি হলে কি হয়।... শোনো সামনের বৃহস্পতিবার বাঁধার মায়ের বাড়ি যেয়ো। তোমার কাছে হাত পাততে সাহসই করছে না। আমাকে নেমন্তন্ন করার জন্যে পাঠিয়েছে। বরুণের দেওয়া ওই দুশো টাকায় নামো-নমো করে কাজ হচ্ছে...অত করে বলছে মেয়েটা সম্ভব হলে যেও একবার।

স্থান-কাল ভুল হবার দাখিল সোমার। ফুঁসে উঠল। —মিথ্যে কথা! বরুণবাবু দশ টাকা দিয়েছেন?

আলাকম হবে অরবিন্দ বলল দিয়েছে বলেই তো সব দিক রক্ষা হল। ...অবশ্য ওই দশ টাকার বদলে দেহও হয়েছে কিনা।

শোনার প্রতীক্ষায় সোমা তেমনি জ্বলন্ত নেত্রে চেয়ে আছে।

নিস্পৃহ মুখে অরবিন্দ বলল, সেদিন সকালে আয়নার সামনে তোমাকে মাথা আঁচড়াতে দেখার পর থেকে কোথা ছটফট করছিল। ...তাই আমার তোল তোমার সেই মাথা আঁচড়ানোর দুটো ছবি দুশো টাকায় দিয়ে নিলাম তাকে। বরুণও স্বীকার করল আমার মতো পর-পুরুষের কাছে ও-ছবি আর থাকা উচিত নয়।

সোমার পায়ের তলার মাটি সবেগে দুলে উঠল বুঝি। সমস্ত মুখ টকটকে লাল। এই মানুষকে ধরে একটানা পথের ওপর যদি কেউ খুন করে ফেলে তাহলেও বাগ যায় না।

সোমা স্কুলে এসেছে। কিন্তু একটা ক্লাসেও ভালো মতো নিতে পারেনি।

ভোর রাতের স্বপ্নটা বার বার মনে পড়ছে। হ্যাঁ নিজেই ওই ভাবেই মানুষটার সমস্ত স্নেহ মমতার সঙ্গে থেঁতলে দিতে ইচ্ছে করেছে তার।

সেই সঙ্গে আর একজনের ওপরেও চড়াও আঘাত হানার ইচ্ছে। বরুণ চক্রবর্তীর ওপর। কিন্তু একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবার পর মনে হল যা শুনল তার সব

আব্বাসের আলোড়নকারী উদ্দীপনায় দুটি নবগতের
অসাধারণ অভিনয়দীপ্ত বহুরেখাশ্রেষ্ঠ জুটি

শাবানা আজমী • রমন খান্না

কে.এ. আব্বাসের

ফাসলা

ইস্টম্যানকলার

সংগীত জয়দেব

লাইট হাউস প্রত্যহ ৩ ৬ ৯টা

রূপবাণী (হাওড়া) নাগিরথী (আলমবাজার)
বিশ্বরূপা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার

সীতা নাও হতে পারে। যে বলেছে সে নতকথা একশটাই মিথ্যে বলে।...সীতা কি মিথ্যে সেটাই আগে জানার দরকার সোমার। এই ছবি হাতে পড়ার সম্ভাবনার কথা ভাবতে গিয়েও সমস্ত মুখ আবার টকটকে লাল সোমার।

বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে বিভোর হয়ে ছবি দেখছিল বরুণ চক্রবর্তী। ঘরে অপ্রত্যাশিত রমণীর পদার্পণে আঁতকে উঠে বসা একেবারে। মুখের দিকে বহু ছুটেছে একবার। হাতের বস্তু তাড়াতাড়ি বালিশের নীচে চাপা দিয়ে রমণীর মুখোমুখি হল।

এসেছে বীণা ভটাচার্য। পরনে লালপাড় কোরা শাড়ি। তেল বিহীন লালচে চুল পিঠে ছড়ানো। বিষণ্ণ কিন্তু রমণীয়।

হাসতে চেষ্টা করে বলল ভয়ানক সময়ে উঠলেন দেখি...আর তো কেউ নেই নিজে না এসে কি করি বলুন...।

—বে-বেশ করেছ। ব্যা-ব্যাপার বলো তো?

—কেন আর কি গরীব হলে কি কৃতজ্ঞতাটুকুও থাকতে নেই ভাবেন বুঝি। আপনার দয়াতেই তো আজ উদ্ধার হতে পেরেছি। অরুণ বলল, আমার বিপদের কথা শুনে আপনিও কেঁদেই ফেলেছিলেন... তারপর টাকা তো দিয়েইছেন..

—আমি কেঁদেছি! টাকা দিয়েছি! অরু বলল?

—আপনি আমাকে জানতে দিতে চাননি বুঝতে পারছি...আপনি অনেক বড় নইলে আমার মতো মেয়ের তো মুখ দেখাও কথা নয় আপনার—

বরুণ চক্রবর্তী কাপড়ে পড়ল যেন। বলল, মুখ না দেখার কি আছে তুমিই তো গণ্ডগোল করে ফেলেছিলে নইলে এতদিনে তো...যাকগে কবে কাজ মেয়েদের তো তিন দিনে হয় শুনেছিলাম—

গণ্ডগোল না হলে এত দিনে কি হত বলতে গেলে বুকে বীণার মুখে সামান্য লাল হয়ে উঠল। পরের প্রশ্নে হেসেই ফেলল। বলল, আমার কি বিয়ে হচ্ছে যে তিন দিনে কাজ সারব—এগারো দিনেই কাজ—আপনি একবার গিয়ে দাঁড়াবেন।

—আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে—কিন্তু ইয়ে—আমার এই টাকা-কাকা দেবার কথা কারো কাছে যেন গল্প কোরো না। অরুটা একটা বাচ্চেতাই—

একটু মুখের দিকে চেয়ে থেকে বীণা বলল—অপেক্ষা না থাকলে আপনাকে একটা প্রণাম করে যেতাম। চলি—

চলে গেল।

বরুণ চক্রবর্তী বিমনা হয়ে রইল খানিক: ...অরু বলেছিল মেয়েটা অনেক বদলেছে। বরুণের মনে হল রাগের চুলনায় সীতা ফেরে বদলেছে।

পরক্ষণে কি মনে পড়তে সাগ্রহে বালিশের তলা থেকে সেই ছবি দুটো বার করল আবার। চিত হয়ে শুয়ে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে একসঙ্গে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও পারল না। এত রাগ সত্ত্বেও ওগুলো বাইরে ফেলার নির্বুদ্ধিতা থেকে নিজেকে রক্ষা করল। হাতের মুঠোয় সে-গুলো রেখেই চোখের আগুনে ওই লোকের মুখটা পোড়াতে চেষ্টা করল খানিক। অসভ্য ইতর কোথাকার, লজ্জা করে না আপনার?

মাথাটা ঘুরছে এখনো বরুণ চক্রবর্তীর। —না মানে সোমা আমার কথা শোনো—

—কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু শুনতে চাই না—একজনের সঙ্গে মিশে আপনিও একটা জানোয়ার হয়ে গেছেন। আপনাদের মুখ দেখতে ঘেন্না করে। অনেক টাকা হয়েছে আপনার—না? এক কথায় দু'শ চারশ হাজার দু' হাজার বের করে দিলেই হল—কেমন? লজ্জাও করে না? লজ্জাও করে না?

একটা ঝড়ের মতোই বেরিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

প্রাণের দায়েই কাশে এসে উপস্থিত অরবিন্দর কাছে। কিন্তু প্রথম দর্শনে চিনতেই পারে নি। বলল, তুই আমার এভাবে সর্বনাশ করলি—অ্যাঁ?

অরবিন্দ পাল্টা জবাব দিল, মেয়েছেলের মতো বকিস না, কি হয়েছে খুলে বল—।

কাঁদ কাঁদ মুখে দুঃসংবাদের জানালো বরুণ। শুনে অরবিন্দ আরো গম্ভীর।—তার জন্য এত উতলা হবার কি আছে—

—উতলা হবার কি আছে! তুইই বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিস নিলজ্জ!

—আমি আবার কি করলাম, ও-ছবি তো সে নিজের চোখেই তোর বালিশের ওপর দেখেও ফেলেছে— তাতেনাতে পেয়ে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করেছে—

—হ্যাঁ। কিন্তু সোমা হঠাৎ আমার ঘরে গিয়ে হাজির হল কেন? কিছু একটা খবর নিশ্চয় পেয়েছে—

একটু ভেবে অরবিন্দ বলল, বীণাদের টাকা দেবার খবর পেয়েই হয়তে গেছিল—গিয়ে দেখে এই কীর্তি তোর।

স্বাগত সুরে বরুণ বলল, আমি টাকা দিয়েছি এ-কথা বীণাকে কেন বলতে গেলি তুই—তার মুখ থেকেই নিশ্চয় পাঁচ কান হয়েছে—আমার নাম করে কেন এই মিথ্যে বলতে গেলি তুই?

অরবিন্দ খেঁকিয়ে উঠল তবে কি, অরুর নড়ুয়ের বুক-ফোলা দুটো জনী দশটা টাকা দিয়েছিস এই কথা বলব? দিনকে দিন একটা ইডিয়েট হচ্ছিস তুই।

অসহায় সুরে বরুণ বলল, কি লজ্জা খাওয়ার এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

একটু ভেবে অরবিন্দ বলল, মরতে হবে না, ভালই হয়েছে বোধহয়।

উদগ্রীব হাবা নিয়ে বরুণ তাকালো তার মুখে।

—ওই সব বুঝবি না ব্যাপার-ট্যাপারগুলো। গল্প পড়ে মেয়েরা উল্টে মনে মনে পছন্দ করতে থাকে। ওই ছবির মতো অবস্থায় আমি দেখে ফেলেছিলাম বলেই তো বিপদ হল আমারই সংগে।

বরুণ চক্রবর্তী দুর্বোধ্য বিস্ময়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

পরের ছ' মাসে মাছের ব্যবসায় বরুণ চক্রবর্তীর রোজগার আরো বেড়েছে। টোপা কেনার ফলে মাসে কম করে তিন সাড়ে তিন হাজার টাকা করে থাকে তার। কিন্তু ভিতরটা বিষণ্ণ সর্বদা। মনেও এতটুকু শান্তি নেই। নিজের ব্যাপারে এবারে একটু হেস্তনেস্ত করে ফেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু সোমার দিক থেকে কোনরকম সাড়া নেই। সেই ঘটনার পর থেকে ওর প্রতিও নিষ্পৃহ সকরুণ। অথচ প্রথমে তুলেই সেটা জানিয়ে দিয়েছেন, ঘরকিয়ে শুনিয়ে ছিরকুটে তৈরী করে রাখো, কখন কি ফ্যাসাদ এসে উপস্থিত হবে ঠিক আছে!

কিন্তু বরুণ চক্রবর্তী বোঝাবে কাকে। সোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তো ভিতরটা কি-রকম ঠাণ্ডা মেরে যায় তার। তেষ্টা পায়। এর থেকে বীণার সামনে বরং অনেক সাচ্ছন্দ্য আর স্বাভাবিক বোধ করে। অরবিন্দ আজকাল একটা ছিপ্ ছিপে বাচ্চাকে রাখে বুকে ওকে বীণার এখানে ধরে নিয়ে হয়। মেয়েটা একদম থাকে, এখানেতেও ছেড়ে ইচ্ছে করে। যখন দাঁড়িয়ে সেদিন কি সুন্দর গানখানা না শুনলে। আমার পানের কালি বকুল হয়ে ফুটবে যেদিন—। আর মনে নেই। অরুটার জন্য পুরো গানটা শোনা হল না, ও হুড়হুড় করে ভিতরে ঢুকে গেল। না, বীণার কাছেও সোমার ভয়, তার কথা যেন ভাবতে ভয়। ভয় সেখানে জন্য। ওখানেই বিয়েটা ভবিতব্য হয়ে নিয়েছে।

আর, সত্যি কথা বলতে কি, সোমার সঙ্গে বাঁধার তুলনা হয় না। সেই ছাব্বিশ বছরের কুটি-পাটি কবে ছিঁড়ে ফেলা হয়েও বন্ধুদের মন থেকে তো কবে কেড়ে নিতে পারেনি। মনে পড়লে এখনো স্পষ্ট দেখতে পায়, আর কানের চড়া মুটো গরম হয়ে ওঠে।

সান্ত্বনা বা আশ্বাসের অপর বন্ধুরা প্রায়ই অরবিন্দর কাছে আসে। আসে যখন তখন বাগে দু পাঁচ টাকার বেশি থাকে না। কখন হাতে বেশি থাকবে তাতো বেশি খসার সম্ভাবনা। এর মধ্যে অবশ্য একদিন যেচে-মাচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, অন্য মেয়ে বাঁধাকে বেশি ভালো লাগে না সোমাকে?

বন্ধুর ছেলে-চলতে অবাক জিজ্ঞাসা দু জনকে পরস্পরকে ভালো লাগে।

—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দু জনকেই যদি তোর সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়, তুই কাকে নিবি?

—সোমাকেই।

—তাহলে ওকে তুই এত ভয় করিস কেন?

—ভয়ের মধ্যেও ওকেই বেশি ভালো লাগে। তাছাড়া, অন্য মেয়ের কথা অবান্তর। ওর ভালো ও উচিত নয়—তাই বা?

...অরবিন্দ হঠাৎ সে-চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল বন্ধুর কেমন যেন ভয়ই ধরে গেছে। অরবিন্দর অবশ্য গাঁজ খায় মাঝে মধ্যে, তাই বলে থাকে।

সান্ত্বনা বন্ধুরা এসে ঘরের ছেলেটাকে সাতা মনোরঞ্জনে পাঠিয়ে দিল—

অরবিন্দ সচকিত। —ওর ছেলেটাকে?

—ওই ...ছেলেটাকে।

—কেন কেন?

বন্ধুরা যেমন শুনে আসছে তেমনি বলল। —এমন কি একটা মানুষ হবে না, তার মতো ছেলে উচ্ছন্নে গেলো। যে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সোমাকে চোখে ঘুম নেই। আজ সকালে সঙ্গে নিয়ে চলে এলো। সেখানে হস্টেলে থেকে পড়বে।

ছেলের জন্য কোনো কথাই জানল না আর। ...সিনেমা থেকে ফিরে পড়তে বসেছিল। বন্ধুরা বলল, সোমা কি-যে ভাবে বুঝি না। কিছুর পর ছেলেটাকে কি আমি দেখব না।

—সোমাকে বলেছিলি সে-কথা।

—ওর আর বলার কি আছে, জানা কথাই তো। তাছাড়া সোমাকে কটা কথাই বা বলা যায়।

অরবিন্দ কি ভাবছে সে-ই জানে। জিজ্ঞাসা করল, রেখে এলি সে ছেলেটা কান্নাকাটি করল না?

—খুব। সোমা ফিরে ধমকে থামালো। ওর মন খারাপ দেখে আমাকে সঙ্গে আনি।—আপনারা কি চান বাপের মতো হয়ে ওই রকম হা-হা করে ঘুরে বেড়াক?

—না, কথা-কাটাকাটি অবশ্য হলই না সেদিন। কেমন একটা ছটফটানি ভাব নিয়ে উঠে গেল।

সত্যি কেমন যেন মন কেমন হয়ে আসছিল অরবিন্দর পাপড়ির। বাবা মন্দির মতো সেই জলজ্যান্ত ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। বাইরে ধাপ্পা দেখিয়ে তখন হা-হা করে বেড়াতো বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হাহাকার করত। জ্যাংটোকে বড় হলে যার মনটুনো মতন হত তার। সবার মতো নাথের ওপর একটা অনিশ্চয়তার ভাব ঝুলছে তার। সর্বনাশ! ছেলেটা কি তাহলে এই রকমই হবে নাকি! সোমা তো তাহলে ঠিকই করেছে। কিন্তু সোমার ক্ষমতা কতটুকু? কটা টাকা মাইনে পায় স্কুলে? ওই সম্বল নিয়ে সে ছেলেটাকে বড় করবে কি করে? মানুষ করবে কি করে? সোমা তাকে জীবন থেকে ছেঁটে নিয়েছে ঠিকই। ওদের দুজনের জীবন আর এ-জীবনে জড়াবে না এটা অরবিন্দ ধরেই নিয়েছে। তবু বন্ধুকে ও কিছু করবে এ-কথা কিছুতেই মনে হয় না। কেন মনে হয় না জানে না। তাছাড়া বিয়ে করলে এ-ক বছরে মুখে করেই ফেলত। অরবিন্দ সব ভাবতে পারে কিন্তু সোমা আবার বিয়ে করবে এ-চিন্তা কখনও করতে পারে না। পরে না বুঝেই একবার বন্ধুকে দুশ টাকার বদলে ওই ছবি পাঠিয়ে সোমাকে সে-খবর জানিয়ে এসেছিল।

...কিন্তু বিয়ে না করলে সোমার থাকল কি। ঘুমহীন, দুশ্চিন্তা, ছেলের জন্য অনন্ত উৎকণ্ঠার হাহাকার। ছেলেটারও সেই দশাই হবে। সন্তান্তি না থাকলে তাই হয়ে থাকে। অরবিন্দর বাবা-মা যদি তার জন্য সে-রকম সম্পত্তির ব্যবস্থা রেখে যেত তাহলে কি তার এই দশা হত। অনিশ্চয়তার কাঁপুনি চোখে ধরত তাদের?

সেই ছেলেবেলার ব্যাধিটাই যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে আবার নতুন করে ছেঁকে ধরল তাকে।

দিন কতকের মধ্যেই মনের তলায় আবার একটা সংকল্প দানা বেঁধে উঠতে লাগল তার। এই রোগে ধরলে যেমন ধরে তেমনি বেপরোয়া সংকল্প কিছু। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আবার সেই পেট মোটা ব্যাগে আর পকেটে গুছিয়ে ভর্তি করে চারদিন পাঁচদিনের জন্য উধাও হয়ে যেতে লাগল। আর ফাঁক পেলে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন পরিচিত প্রতিনিধি দালালের কাছে মেরামতি করতে লাগল।

মাস বেড়েক পরের কথা। কি একটা ছুটি চলেছে। ছেলেকে সেই উপলক্ষে সোমা এখানে নিয়ে এসেছে টের পেয়েছে। দিন দুই পরে দেখেছেও। অরবিন্দর ছুটে গিয়ে তাকে আদর করতে ইচ্ছে করেছে। ছেলেকে আর সোমাকে দুজনকেই বলতে ইচ্ছে করেছে কোনো ভাবনা নেই—সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। চিন্তার বোঝ বাঁধিয়ে রাখা নেই। কিন্তু সামনে যাবে কি তাকে দেখলেই ছেলের হাত ধরে সোমা কঠিন মুখে অন্য দিকে ফেরে।

এই ভেড়ি রোডের অমনুষ্যিক খাটুনিতে অরবিন্দর শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছে। সমস্ত খাওয়া-দাওয়ার প্রতি গাল ছেড়েছে চেয়ারের হাড় উঁচিয়ে উঠছে।

এর মধ্যে পাড়ার বড় বাড়িতে একটা বিয়ে লেগে গেল। এ-সব ব্যাপারে অরবিন্দর মাতব্বরি একটা ধরা-বাঁধা ব্যাপার। বিয়ে বাড়ির লোকেরাই তাকে বলল—সব কিছু দেখে-শুনে কাজ উদ্ধার দিতে হবে। অরবিন্দ হাসির আশ্বাস দিয়েছে কোনো ভাবনা নেই।

এদিকে যে ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে তিনি আবার সতা হালদারের পরিচিত বন্ধু এবং মক্কেল। জোতিষ করে এখনো তিনি এঁর কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়ে থাকেন। এই মেয়ের জোটক বিচারও সতা হালদার করেছেন। অতএব সেআদেরও দোদুল্য। বাপের তাগিদে সেজেগুজে ছেলের হাত ধরে যেতেই হল তাকে।

বিরাট প্যান্ডেলের নিচু সব থেকে বসানো হয়েছে। কিন্তু পরিবেশনের ঝামেলা হাতে অরবিন্দ সেই থেকে এক কোণের একটা বিশেষ দিকেই আটকে আছে। সেখানে সোমা আর ছেলে খেতে বসেছে।

—মাছ দেব আর দুখানা?

সোমা সরোষে মুখ তুলে তাকায়।

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি ছেলের দিকে ফেরে। —তোকে দেব? একসঙ্গে তিনটে মাছ ওই বাচ্চার পাতেই দিয়ে যায়।

—অংশ দেব আর একটু?

আবার সেই উগ্র দৃষ্টি।

আবার সেই মাংসের থালা উপুড় হল ছেলের পাতে। অপচয় হচ্ছে সে-খেয়ালও নেই।

কিন্তু খেয়াল আর পাঁচজন করছে। কেউ কেউ হাসছে। অপচয় দেখে বিয়ে-বাড়ির লোক গম্ভীর। অহোরত দুই-একজন টিপ্পনীও কাটল, আপনি যে পরিবেশনের বামন হাতে ও-দিকেই আটকে আছেন মশাই—আগে পাঁচজনের দিকে তাকান!

অরবিন্দর ভ্রূক্ষেপও নেই। সে হাসছে। সোমার মুখ লাল।

যে-থালা গণ্ডগোল বেধে গেল একটু, বলেই।

—আর একটু দই দেব?

জবাবে সোমার সেই রকমই জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ। ঘোড়াইয়ের দই গিয়ে পড়ল ছেলের পাতে—যে পাতে একে একে সবই জমছে। সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক থেকে উঁকি ঝাঁকিও নিক্ষেপ।

ঠিক তখনই বিয়ে বাড়ির একজন অরবিন্দর হাত থেকে দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে নিল। অন্য হাতে তাকে ঠেলে সরাতে সরাতে বলল, আপনি এখন নিচে যান তো মশাই, খুব হয়েছে—আর পরিবেশন করতে হবে না।

রাগে চিড়বিড় করছে সোমা। অরবিন্দ হাসতে হাসতে চলে গেল।

ছেলের হাত ধরে নিচে নেমে কোথাও লোকটাকে দেখতে পেল না সোমা। ভেবেছিল, ঠিক ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে। ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে নেমে এলো সে। মুখে না দেখে চলেই যেতে হয়।

কিন্তু খানিকটা এসে আমকে দাঁড়াতে হল। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা হাতে কি চিবাচ্ছে অরবিন্দ গাঙ্গুলি। ওই দোকানের মুড়ি ভালো—নিশ্চয় মুড়ি। ওদের দেখে হাসি মুখেই এগিয়ে এলো। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, পেট ভরেছে?

—খুব। কিন্তু বিয়ে বাড়ি থেকে এসে তুমি মুড়ি খাচ্ছ বাবা? ছেলে অবাক।

—মুড়ি খারাপ কি রে! সোমা, তুমি ওকে নরেন্দ্রপুরে পাঠিয়েছ—ভালোই করেছ। ওর জন্য তোমাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না, আমি ঠিক একটা ব্যবস্থা করব—বুঝলে?

এবারে সোজাসুজি অগ্নিদৃষ্টিতে ওর মুখখানা এক পলক ভালো করে দেখে সোমা ছেলেকে টেনে নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগোলো।

ভিতরটা ঘচঘচ করছে বলেই আরো রাগ ওর। বিয়ে বাড়িতে মাছ মাংস চপ-কাটলেট লুচি মিষ্টি ছড়াছড়ি—আর এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুড়ি চিবুনোর বরাত। এই ব্যাপারে ওদের জ্ঞানই মনে হতে লাগে অসহ্য।

সংকল্প মতো ব্যবস্থাটা হয়ে উঠছে না বলেই ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতা বাড়ছে অরবিন্দ গাঙ্গুলির। কাল রাতেও ইনসিওরেন্সের সেই জাঁদরেল দালালের কাছ থেকে ঘুরে এসেছে। একই হিসেব বার বার দিতে হচ্ছে বলে সেই লোকটাও বিরক্ত তার ওপর।

মাত্র হাজার টাকা হয়েছে এই তিন মাসে। আর প্রায় হাজার দেড়েক চাই। ওষুধ বিক্রীর কাজে দিবারাত্র পরিশ্রম করে আর অর্ধ-পেটে খেয়ে ওই টাকা জমিয়েছে। কিন্তু তার মতো মার্কামারা লোকের পক্ষে আড়াইশো টাকা জোগাড় করাও মুশকিল হয়ে পড়ছে।

একলে হবে না। আর কোনো উপায় চাই। চাই-ই। এই চওড়ার মধ্যে সততা অসততার প্রশ্ন নেই।

মন যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি। উপায় মাথায় এলো। মতলবটা নিজের আবিষ্কারের বহর দেখে নিজেই চমকে দিয়েছে। সোমার মন পাচ্ছে না বলে দিনকে দিন অস্বস্তি বাড়ছে। একটা কিছু উপায় বাতলাবার কথা প্রায়ই বলছে ওকে।

মতলব অনুযায়ী দিন তিনেক ঘোরা-ঘুরি করল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। তারপর প্রস্তুত সে।

তার প্রতীক্ষায় ছিল সে এলো। মনের উত্তেজনায় প্রায়ই আসন্ন হচ্ছিল। বহু পরিচিত।

বন্ধ দরজায় টোকা পড়তে অরবিন্দ আগে বাক্স খুলে নিজের বোকাপনের সেই ২ হাজার টাকার গোছা বার করে চৌকিতে বসে গুনতে সুরু করে সাড়া দিল, কে?

—আমি বন্ধু। দুদিন ধরে দরজা ভেজানো দেখছে যেন সে বুঝতে পারে না। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সে থমকেই গেল। এক পাঁচশো নোট গুনছে অরু।

এভাবে ঢুকে পড়ায় যেন অপ্রস্তুত একটু। হেসে বলল, দেখে ফেললি তো! আর—

—এত টাকা কিসের?

—আমারই। অরবিন্দ নির্লিপ্ত। —এবারে দিন ফিরবে মনে হয় ভাই, কাউকে কিছু বলিস না।

—ওষুধ বিক্রী করে পেয়েছিস?

—ফেলেছিস!

—তাহলে?

জেরায় পড়ে অরবিন্দ যেন রেগেই গেল হঠাৎ। —সে খোঁজে তোর দরকার কি, তোর টাকার কোনো অভাব আছে!

থতমত খেয়ে বরুণ বলল, না ভাই টাকার কোনো অভাব নেই। এক অভাবেই মারা পড়লাম—যা হোক একটা কিছু উপায় কর ভাই—আর পারি না।

টাকা গোনা বন্ধ করে অরবিন্দ ভুরু কুঁচকে খানিক চেয়ে রইল তার দিকে। —সোমার জন্য?

—তা ছাড়া আর কি। ওর সামনে গেলে আজকাল আমার হাড়-হিম করে কেমন একটা অস্বস্তি সুরু হয়।

—বীণাকে দেখলে হয় না?

—বীণাকে আর বেশি দেখছি কোথায়, সোমাকেই তো রোজ দেখছি।

—বিয়ের কথা বলিস না কেন?

—ও মুখের দিকে অকালে আমি কিছুই আর বলতে পারি না।

—তাহলে সোমাকে বিয়ে করে নাও কি তোর?

—কেন?

—তোকে গোরুকে গাধি হুড়তে দেখেছিস?

—দেখেছি হয়তো ... কেন?

—বিয়ের পরেও তোর সেই দশা হবে, মনে হলে সাত হাত দূরে ছেড়ে যেতে দেবে। ওকে তো জানো আমার।

—বলিস কি! তাহলে...?

—তাহলে একমাত্র উপায় ওর মন বশ করা। ওর মনটাকে তোর দিকে ফিরিয়ে না দিতে পারলে বিয়ে করেও কোনো লাভ নেই।

—সে কি করে সম্ভব?

—দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু আছে আজ আমি জানি না। দেখলাম তো নিজের চোখে।

—কি? কি দেখলি? বরুণ উন্মুখ।

অরবিন্দ গাঙ্গুলী ভ্রুকুটি করল। —এমন জ্বালাতন করিস তোকে বলেই ফেললাম।

—কি-কিন্তু কিছুই তো বলিস নি।

অরবিন্দ খিন মেরে বসে রইল খানিক। তারপর দুহাতে জোড় করে কপালে ঠেকালো। শেষে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল।—তুই বন্ধু, তোকে বলেই ফেলি। দুনিয়ায় কত অঘটন আর কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে খবর রাখিস?

বরুণ মাথা নাড়ল। রাখে না।

—আমিও রাখতাম না। বরাত জোরে এক মহাপুরুষের সন্ধান পেয়ে গেলাম। সাক্ষাৎ দৈবশক্তি তিনি।

—কোনো সাধুটাধু?

অরবিন্দ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল।—ওই ভণ্ডামির কথা বলিস কেন? কপালে দুহাত ঠেকালো আবার।—কৃপা পেলে বর্তে যাবি, ওই সোমা তখন আঠার মতো গায়ে সেঁটে থাকবে তোর। আর কৃপা করতে না চাইলে ঢেলা কাঠের পিটুনি খেয়েও পালিয়ে আসতে হতে পারে।

—ব-বলিস কি!

—তবে? এই দেখ, আমার দিব্যিরই গায়ের চুল দাঁড়িয়ে গেছে।...কত বড় বড় হোমরা চোমরা লোক গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে ধুলোয় লুটোপুটি খায় স্ব-চক্ষে দেখেছি। সাধু কাউকে মেরে তাড়াচ্ছেন, কাউকে অযাচিত করুণা করছেন। কতজনে টাকা-কড়ি সোনা-দানা ঢালছে উপুড় করে সাধু ফিরেও তাকান না।

—তুই তাঁর খপ্পর পেলি কি করে?

—কপাল ভালো বলেই পেয়ে গেলাম।...আমার জানাশোনা এক ওষুধের কারবারী, বয়েস কম করে ষাট—তার তৃতীয় পক্ষের বউ অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াতো—সেই মেয়েকে টিট করে ঘরে ফিরিয়ে দিলে ওই সাধু। বলেছিল ছেলে হবে—ষাট বছরের লোকটার সত্যি ছেলে হল। ভদ্রলোক অন্ধ তার সেই বউ সাধুর পুজো দিতে যাচ্ছিল, তাদের গাড়িতে আমিও উঠে বসলাম। তখনো কানাকড়িও কিবাস করিনি আমি।

আমাকে দেখেই সাধু ছেড়ে মারতে এলেন। বলে উঠলেন তোর এ-মুখো পাষণ্ডকে মা আমার কাছে কেন পাঠালো! আমার কি-যে হল কে জানে, দুপা জড়িয়ে ধরে বললাম হয় শিব দাও, নয়তো বাঁচার রাস্তা করে দাও।

সাধু গর্জন করে উঠলেন, তুই তো জন্মে খেলিস তাতে কিছু হল না?

বললাম, না বাবা উল্টে সর্বস্বান্ত হয়েছি বেসএ—বউয়ের গয়না গেছে, বউও গেছে।

সাধু বললেন তাহলে ফের জন্মই খেলগে যা, ওমুক দিন অত নম্বর ঘোড়ার অত নম্বর ঘোড়া—মা যা দিয়েছে ওই ছেলের হাত দিয়েই বল বিলকুল ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু একলপ্তে যেন ঘোড়া কিনবি না, যে-দিন যা বলব তাই করবি—যা ভাগ!

—তারপর? তারপর? বরুণ চক্রবর্তীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ।

—তারপর আর কি, টাকাগুলো দেখালো।—তারপর এই—এক খেলাতেই হাজার টাকা। আরো সামনের বছর যেতে বলেছেন। কিন্তু সে টিপ কাউকে দিতে পারব না—তাহলে সর্বনাশ!

বরুণ চক্রবর্তী অস্থির হয়ে আবেদন জানালো, না ভাই আমায় ঘোড়ার টিপ চাইনে—আমাকে শুধু এই বাবস্থাটা করে দে।

অরবিন্দ টাকার বান্ডিল বালিশের নিচে রেখে চোখ বুজে ভেবে নিল একটু।—আমার তো ভেট এক মাস বাদে আসে যেতে দেখলে ক্ষেপে যাবেন।

—আমার জন্যে তো বাচ্ছিস, নিজের জন্যে তো নয়।

—চল তাহলে কালই একবার কি আছে অদৃষ্টে কে জানে। সেই আন্দামানের শ্মশান ছাড়িয়ে সাধুজির ডেরা—দূরে আছে

পরদিন। দুরু দুরু বুকে বরুণ চক্রবর্তী অরবিন্দর সঙ্গে সাধুর কাছে চলল। বেশির ভাগ পথই অরবিন্দ অতি-মাত্রায় গম্ভীর। একবার শুধু বলল, নিজে থেকে তুই সাধুজীকে কিছু বলবি না।

দর্শন মিলল। ধুনী জ্বালিয়ে সাধুজী একলা বসে আছেন। অরবিন্দ ফিস ফিস করে বলল বয়স্ত ভালো মনে হচ্ছে, সাধুজী একলা বসে আছেন।

তাঁরা কাছে যেতেই অমনি চক্ষু মেলে তাকালেন সাধুজী। হুংকার দিয়ে উঠলেন নিকালো হিয়াসে—নিকালো! সকালকে তাড়ালাম আবার তোরা এসেছিস? খুব লোভ—না?

তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে অরবিন্দ বলল নিজের জন্যে আসিনি বাবা—বন্ধুর জন্যে! ওকে দয়া করো।

আবার অমনি চোখ এবং বরুণের দিকে। সেই চক্ষু দেখে বরুণের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

এবারে প্রবল হুংকার ছাড়লেন সাধুজী।—ও পাপী! অন্যের বহুকে সাদী করতে চায়—তার প্রেম ভিখ মাগে—নিকালো হিঁয়াসে পাপী কাঁহাকা!

কাঁদ কাঁদ হয়ে বরুণ বলল, অন্যের বউ নয় বাবা—কোর্টে ছাড়াছাড়ি হবার পরে বিয়ে করব—বউ থাকতে নয়। আর জানে—ওরই বউ!

জবাবে চণ্ডাল রাগে মাটি থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে সজোরে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন সাধুজী। ভয় পেয়ে বরুণ চোখ বুজে ফেলল। অবাক পরক্ষণে। তাঁর মুখে এসে লাগল এক বাদা বাদা কলের পাপড়ি।

সাধুজী বললেন তুইও পাপী নস তাহলে—মা তোকেও দয়া করবেন বলে পাঠিয়েছেন। চিমটি ফেলে দু' আঙুলে আবার খানিকটা ধুলো মাটি তুলে বললেন, হাঁ কর—

বরুণ হাঁ করল। তারপর আবার হুত-ভম্ব! তার মুখে মাটি নয়, সন্দেশের গুঁড়ো।

বাবা চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন এবার। বেশ খানিকক্ষণ ধ্যান মগ্ন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বশীকরণ।

বরুণ চমকে উঠল। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল কি করতে হবে বাবা?

—বশীকরণ যজ্ঞ! অতিচারিকা! বশীকরণ যজ্ঞের ফোটা কপালে পরলে আর যজ্ঞের সহস্র ধাতুর মাদুলি ধারণ করলে ফুলের গন্ধে অলির মতোই প্রতিকূলা কুলশীলনী সহচরী বরাঙ্গনাও অতিকের দিকে আকৃষ্ট হবে, অতিকের মোহপাশে আবদ্ধ হবে! যা যা যা! দূর হ! দূর হ এখন। রাগত চোখে আবার বাবা ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরলেন এবার।

মাটি ছেড়ে বরুণ চক্রবর্তী সভয়ে বেশ গজ দুরে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু দেখল অরুটার সাহস বটে। ত্রিশূল উঁচানো সত্ত্বেও তার চুপা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকল। আর পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে কি বলতে থাকল।

একটু বাদে আনন্দে হাসতে হাসতে আর কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলো সে। বলল, তোর ভাগ্য ভালো যারা নিজেই যজ্ঞ করতে রাজি হয়েছেন—পরশু অমাবস্যার রাতেই যজ্ঞ হবে তারপর কাল্ডটা দেখিস।

বাড়ি ফিরে বাক্স খুলে আলবাম থেকে সোমার আর একখানা সেই রকম মাথা আঁচড়নোর ছবি বার করে নিজে দেখল, বরুণকেও দেখালো। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল সোমা এবার তোরই হয়ে গেল রে, আর কোনো বাধা থাকল না। ফুলের গন্ধে অলির মতো ও তোর সঙ্গেই লেগে থাকবে, এরপর তোর ইচ্ছে মতো উঠবে বসবে হুকুম করবে কিংবা হাসবে কাঁদবে—

ফোটোর ওপর চোখ রেখেই বরুণ বলল, কাঁদবে কেন—কাঁদবে না।

—তোকে দু'দণ্ড চোখে হারালেই কেঁদে আকুল হবে। রাত বারোটায় উঠে দেখবি ক্যানিং-এ তোর সঙ্গে যাবে তাকের বাজারে গিয়ে হাজির হবে।

ছবিটা দেখার জন্য হাত বাড়ালো বরুণ। অরবিন্দ ধমকে উঠল আবার একটা ফেলেংকোরি করবি? তাছাড়া যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংযম দরকার—সাধু বাবা ধ্যানে জানতে পারলে তোর মাথা উড়িয়ে দেবে—সহস্র ধাতুর যজ্ঞ ইয়ার্কির ব্যাপার নাকি!

ফোটো আবার সযত্নে রেখে দিল সে!

যজ্ঞ হল। যজ্ঞের মাদুলি হিসেবে বরুণ চক্রবর্তীর ব্যাঙ্ক থেকে তোড়া হাজার টাকা খসে এসেছে।

অরবিন্দ তাকে যজ্ঞের বিবৃতি শুনে রয়েছে আর সহস্র ধাতুর মাদুলি নিয়েছে। বলেছে এক মাস ধরে রোজ চান করে উঠে যজ্ঞের ফোটা কপালে পরবি, আর মাদুলি ধোয়া জল খাবি। সাধু বলেছেন একটা মাস পর্যন্ত কালী সময় সময় উগ্র অথবা প্রতিকূল মূর্তি ধরতে পারে—তার জন্যে ভাবনা নেই, সেটা সুলক্ষণ।

অরবিন্দ গঙ্গাজলি এর পর নিজের সংকল্প সাধনের কাজে লেগেছে। ইন্সিওরেন্সের সেই অভিজ্ঞ গাঙ্গুলীর কাছে গেছে। চুপচাপ কাজ সেরেছে।

দিন কতক বাদে ডাকে তুষ নামে মস্ত রেজিস্ট্রি খাম একটা। তিনশটা ভালো করে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটা বাক্সে পুরেছে।

এর পর আবার সোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার, তাকে সুচারুরূপে কথা বলতে হবে...এখন বিশ্বাস করবে না হয়তো। কিন্তু পরে ঠিকই করবে। আত্মতুষ্টিতে মিটি মিটি হাসছে অরবিন্দ। ...তাছাড়া বরুণের কথাও বলতে হবে। ভবিষ্যতের আশায় ছাই দিয়ে ওকে বর্তমানের দিকেই টেনে নিয়ে যেতে হবে। এ-দিক থেকে বান্ডিল কয়েক দিতে পারলে ও আপনি যাবে আর একদিকে।

স্কুল থেকে বাড়ির পথে একটা সোফের মধ্যর অপেক্ষা করছিল। দেখা হল। চোখে চোখ পড়মাত্র সেই চিরচারিত ঝলমলে মুখ সোমার। হৃৎপিণ্ড দ্রুত হল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোফের নিল। কন্ডাক্টর সেও। বলল আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে, তোমার সোনা দরকার কখন সময় হবে?

জবাব না দিয়ে আরো জোরে হাঁটতে লাগল সোমা। এই লোকের সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না, বিতৃষ্ণা। কিন্তু ছুটে জব্দ এই লোককে পিছনে ফেলবে কি করে। পাশে ঘেঁষে চলতে চলতে অরবিন্দ আবার বলল, সাঙ্ঘাতিক দরকারী কথা—বাড়ি আসব?

—না! এক কলক স্বচক্ষে বেরুলো সোমার গলা দিয়ে।

—তাহলে কখন সময় হবে?

—সময় হবে না!

—ঠিক আছে, তাহলে এখন ছেড়ে ছেড়েই বলি।...সেদিন তোমাকে আমি বাজে কথা বলিনি, তোমার আর ছেলের ব্যবস্থা আমি করেছি। আজ থেকে এক বছরের মধ্যে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি হাতে পাবে। এক বছরের মধ্যে নয়, এক বছর বাদে। ছেলেকে মানুষ করবে, তাকে আমার মতো অনিশ্চয়তার ভোগে ভুগতে দেবে না,

দুশ্চিন্তার হাইকোর্টে আমৃত্যু মুলতুবি হয়ে যেতে পারে না, অথচ নিজেও দুশ্চিন্তা করবে না।

গোড়ায় গোড়ায় এরকম শুনলে সোমার মন নরম হয়ে যেত। সে ছেলেই আবার কেমন ফুঁসে এঁটে এসেছে ধরে নিয়ে সোমা ভিতরে-ভিতরে কিন্তু হয়ে উঠল। পঞ্চাশ হাজার টাকা একসঙ্গে কখনো চোখে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল। একটি কথাও না বলে মুখ বুজে হনহন করে হেঁটে চলল সে।

অরবিন্দর আবার বলল, সেই টাকা হাতে এলে বন্ধুটাকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে দিও ওই গাধাটাকে আর ঠকাতে চাই না। কিন্তু ছেলের দিব্যি এক বছরের আগে এসব কথা কাউকে বলবে না, বন্ধুকেও না।...ওটা একটা পয়লা নম্বরের গাধা, ওটাকে মিছিমিছি আটকে রেখেছ কেন? বীণার হাতে ছেড়ে দাও না!

এবার সোমা ফুঁসে না উঠে পারল না। চাপা রাগে বলল, তোমার তুলনায় স্বর্গ—তুমি লিগগিরই ডিভোর্সের নোটিস পাচ্ছ।

—ও...বেশ বেশ। নিজের স্বভাবে ফিরে এলো অরবিন্দ। —ওর বশীকরণ যন্ত্রের ফল এরই মধ্যে মিলছে তাহলে! হাসছে। —ও এখন বশীকরণ যন্ত্রের ফোটা কপালে পরে আর গলায় বশীকরণের সহস্রধাতুরমাদলি পরে বেড়াচ্ছে লক্ষ্য করেছ? সাধুবাবা বলেছে, ফুলের গন্ধে জাদুর মতো তুমি ওর সঙ্গে আটকে যাবে এরপর থেকে। যাকে বলে বদ্ধ পাগল হয়ে উঠবে একেবারে।... বেচারা সোমন আমার কাছে তোমার সেই রূপই বন্ধ খোলা আর একখানা মাথা খাঁচড়ানোর ছবি দেখে নেবার জন্য হাংলার হাতে বাড়িয়ে ছিলাম—শ' পাঁচেক টাকায় ছেড়ে দিতে পারতুম—ছেলেও দিব্যি, একটাও মিথ্যে কথা বলছি না। হাসছো!—জাদুর তুলনায় স্বর্গ! জয় সাধুবাবা বশীকরণ! শুধু ছবি কেন, এবারে একদিন ডেকে সমস্ত নেগেটিভগুলোই দিয়ে যেয়ো ওকে!

সহ্যেরও শেষ আছে। সোমা দাঁড়িয়ে গেল। দুচোখ ধকধক করে জ্বলছে।

অরবিন্দও দাঁড়িয়ে গেল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে।

অরবিন্দর মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। চাউনিটা গভীর। গলার স্বরও। বলল, যাক, আসে যে কথাগুলো বললাম মনে রেখো। ...ছেলেটাকে দুশ্চিন্তার হাইকোর্টে পড়তে দিও না, নিজেও দুশ্চিন্তা কোরো না।

হাল্কা আড়াআড়ি পেরিয়ে অন্য পথ ধরল সে। জ্বলন্ত চোখে সোমা চেয়েই রইল সেদিকে।

ঘড়ি তখন আটটা বাজে। অরবিন্দর ঘরে যাবার নাম নেই। বীণার ওখানে বসে আছে তার আজে-বাজে কথা বলে সময় কাটাচ্ছে। ওর মিয়ানোই দেখবে বন্ধুর অপেক্ষা করছে তার জন্যে। অরবিন্দর ধরণা সত্য হলেওয়ার ভাবায় আজকের থেকেই তার বন্ধু-মঙ্গলের দশা শুরু হল। এই জন্যই এতনোর তাগিদ।

—অন্ধু আছিস?

বাইরে থেকে বন্ধুর জড়ো ভেসে এলো। বীণা বলল, বন্ধুবাবুর গলা মনে হচ্ছে!

অরবিন্দ মনে মনে তার উদ্দেশ্যে একটা কটূক্তি করে নিয়ে পাল্টা আহ্বান জানাল। আয়, ভিতরে আয়।

তার এই মূর্তির দিকে চেয়ে বীণা যথার্থ অবাক। ছোটখাট একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন মানুষটার ওপর দিয়ে। শুকনো বিবর্ণ মুখ, কেমন একটা দিশেহারা ভাব। জিজ্ঞাসা না করে পারল না, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

—না...। অরবিন্দর দিকে ফিরল, শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁটটা একবার ঘষে নিয়ে বলল, তোর সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল—

—বোস। অরবিন্দ গম্ভীর। —বীণা, বন্ধুবাবুর জন্য কড়া করে এক পেয়ালা চা কর।

বীণা উঠে গেল। অরবিন্দ তার দিকে ফিরল। কপালে এখনো বশীকরণ বিভূতির কালো তিলক চকচক করছে। গলায় তাবিজ বাঁধা কালো সুতোটা দেখা যাচ্ছে।

—বল্।

বিমর্ষ উৎকণ্ঠায় বন্ধুবাবু ফিসফিস করে বলল, সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে আজ, কি হল বুঝছি না—তোর সঙ্গে সোমার দেখাটেখা হয়েছে নাকি?

—বিকেলে স্কুল ফেরার সময় দুশ্চিন্তার জন্য দেখা হয়েছিল। আমাকে ডেকে জানিয়ে দিল, লিগগিরই ডিভোর্সের নোটিস পাঠাচ্ছে।

—অ্যাঁ! বন্ধুবাবু অবাক। —তাহলে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন! আমাকে দেখেই সোমা ক্ষেপে উঠল একেবারে—বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল, এক গাদা ইংরেজি গালাগাল করে আমার দেওয়া ঘড়িটা পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিল!

—তুই কি করলি? অরবিন্দ তেমনি গম্ভীর।

—আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আরো ক্ষেপে উঠে ঘর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম।

চাঙ্গড়ে হাত কপালে ঠেকালো অরবিন্দ। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, জয় সাধুবাবা।

—কিন্তু এদিকে যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

—ধুস ফাচ ফাচ করিস না। ঝাঁটা পেটা করেছে শুনলে আরো খুশী হতাম। সাধু বলেন নি এটাই সুলক্ষণ? বলেন নি, গ্রহণী মাঝে মাঝে উগ্র হবে, প্রতিকূল মার্চ করবে? নইলে একই দিনে আমাকে বশ ডিভোর্সের নোটিস নেবার জন্য প্রস্তুত থাকা। ওর মাথার এখন সাংঘাতিক রিঅ্যাকশন শুরু হয়েছে বুঝছিস না?

বন্ধুবাবু চেষ্টা করে কয়েক মিনিটের মতো বসে রইল।

বীণা চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকল।

অরবিন্দ বলল, দে গা দে। তারপর বসে বন্ধুকে যেন সুন্দর একখানা গান শোনা দেখ—।

এক বছরের মিয়াদের একটা ছক কেটেছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। সেই ছক ধরে সংকল্পের শেষ মাথায় পৌঁছুতে পারবে ধরে নিয়েছিল। এর মধ্যে কোনো ভুল আছে বা ফাঁক আছে ভাবেনি।

কিন্তু ওপরওলার ছকের খবর রাখে না। ওর জন্য তিনি আর এক ছক কেটে বসে আছেন। সেটার চেহারা আর এক রকম।

...প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব একটা জগতের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বাস করছে। বাইরের জগতের কারো প্রতিনিয়ত এসে যাচ্ছে যেমন। তবে সব এড়িয়ে সে নিজেকে নিয়ে আছে, বাইরের ওই ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন নয়।

শত সহস্রজনের মতোই অরবিন্দ গাঙ্গুলিও এর ব্যতিক্রম নয়।

কলকাতার সর্বত্রই তখন বেশ একটা মাৎস্যন্যায় চলেছে। কিন্তু সেটা একটা আত্মরিক্ত উত্তেজনার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বেশি মূল্য দেবার সময় নেই কারো। কেবল, যাদের ঘাড়ে পড়ে মানুষ তখনই বিভ্রান্ত।

...এক মিনিটও নয়, মাত্র কটা মুহূর্তের মধ্যে যা ঘটে গেল, অরবিন্দ গাঙ্গুলির তার জন্য প্রস্তুতির অবকাশ ছিল না।

মোড়ের একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। বেলা তখন সবেমাত্র। রাস্তায় লোক চলাচল খুব বেশি না হলেও একেবারে কমও নয়। মোড়ের থানায় একটা পুলিস ডিউটিতে দাঁড়িয়ে আছে। খুব তৎপর হয়ে ডিউটি করছে এমন নয়। সেও যেন নিস্পৃহ মুখে জনতার চলাচলের ছবি দেখছে। তার কোমরের খাপে রিভলবার গোঁজা।

ব্যাপারটা আচমকা চোখে পড়ে গেল অরবিন্দর। চোখে পড়বে এটাই ভবিতব্য বোধহয়। তার হাত কয়েক দূরে দুটো ছেলে। বছর বাইশ চব্বিশ বয়স। নিরীহ মুখ। দুজনেরই গায়ে পাতলা রঙিন চাদর জড়ানো। ছেলে দুটো একজন আর একজনকে চোখের ইশারা করল। সেটুকুই চোখে পড়ে গেল অরবিন্দ গাঙ্গুলির। তারপর পুলিসটার দিকে গুটি গুটি এগোতে লাগল ওরা।

সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে অরবিন্দর ভিতরে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল যেন। অন্তরাত্মা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল। ও-দিক কেবা পুলিসটার দিকে তাকালো। কি হতে যাচ্ছে অরবিন্দ জানে। কলকাতায় এরকম কাণ্ড অনেক ঘটেছে। ঘটছে। কেবল দুটো পিছন থেকে পুলিসটার সামনে পৌঁছে গেছে প্রায়।

হাতের বিড়ি ফেলে দিশেহারার মতো অরবিন্দ গাঙ্গুলি সেদিকে ছুটল।

তবু একটু দেরি হয়ে গেল। একজনের ধারালো অস্ত্রের প্রথম আঘাতেই পুলিসটা মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের জন্য হাত তুলতেই অরবিন্দ গাঙ্গুলি পিছন থেকে ছেলেটাকে জাপটে ধরে হ্যাচকাটানে সরিয়ে আনল। ছেলেটার সঙ্গী পুলিসের কোমর থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নেবার তালে ছিল। অপ্রত্যাশিত বাধা পড়তে মুচকি।

পথের লোকজন মুহূর্তের মধ্যে দিশেহারা সন্ত্রস্ত।

অরবিন্দ আর সেই ছেলেটা তখনো জাপটা জাপটি করছে। চোখের পলকে উঠে এসে দ্বিতীয় ছেলেটা হাতের ধারালো অস্ত্র দিয়ে অরবিন্দর পরে পিঠে উপর্যুপরি তিন চার বার প্রচণ্ড আঘাত করল। অরবিন্দ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারই ওপর দুজনে মিলে আরো দুতিনটে ঘা বসিয়ে উন্মত্ত অস্ত্র হাতে তীরের মতো সামনের গলির দিকে ছুটল।

পাড়ায়, এলাকায়, তারপর সমস্ত কলকাতায় খবরটা ছড়িয়ে গেল। রেডিওতে খবর ঘোষণা করা হল। সাধারণ একজন শুভবুদ্ধির মানুষ অসম সাহসে নিজের জীবন বিপন্ন করে একটি পুলিসের প্রাণরক্ষা করেছে।

সেই সাধারণ শুভবুদ্ধির মানুষের নাম অরবিন্দ গাঙ্গুলি। সে হাসপাতালে আছে। পুলিসের আঘাত সামান্য, কিন্তু অরবিন্দ গাঙ্গুলি মুমূর্ষু অবস্থা। মিনিস্টাররা এবং রাজ্য সরকারের পদস্থ ব্যক্তিরা অনেকেই হাসপাতালে ছুটে গেছেন তাকে দেখতে।

ঘটনাটাকে শুভবুদ্ধির একটা সাদা নজির বলে ঘোষণা করছেন অনেকে।

নবকল্লোলী উত্তেজনায় টইটম্বুর। অনেকেই হাসপাতালে ছোটাছুটি করছে। খবর নিয়ে আসছে। কিন্তু কেউ ঢুকতে পাচ্ছে না। কেউ অরবিন্দ গাঙ্গুলি এখন কেমন দেখে আসতে পারছে না। পুলিস যেতে দিচ্ছে না তাদের।

বরুণ চক্রবর্তীও ছুটে গেছিল। দুঘণ্টা অপেক্ষা করে সেও ফিরে এসেছে। শুধু খবর জেনেছে, অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

সোমা একবার করে ঘর বার করছে কেন নিজেও জানে না।

বাবা গহল ইঁচি দিয়ে তার বাইরের ঘরে বসে আছে। সোমা সেখানেও এসে দাঁড়াচ্ছে এক-একবার। আবার ভিতরে চলে যাচ্ছে। পাড়ার অনেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এসেছে। স্ত্রীকে নিশ্চয় ঢুকতে দেওয়া হবে। সোমা মাথা নেড়েছে। যাবে না।

...কেন যাবে? কে স্ত্রী? সোমা তো অনেক দিনই তার কপালের সিঁদুর সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে। এখন কাকে দেখতে যাবে? কি দেখতে যাবে?

অন্যমনস্ক হঠাৎ। ডাক্তার সেদিনের গম্ভীর কথাগুলো মনে পড়ছে। ...বলেছিল, ছেলেটাকে মানুষ করো, তাকে দুশ্চিন্তার হাহাকারে পড়তে দিও না, আর নিজেও দুশ্চিন্তা কোরো না।

...আর বলেছিল, এক বছরের মধ্যে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা সোমা হাতে পাবে। বলেছিল, তোমার আর ছেলের ব্যবস্থা আমি করেছি।

কেন বলেছিল? সরকার নাকি এর মধ্যে কি একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছে কানে এসেছে। আগে থাকতে একে নিশ্চিন্ত করতে চাইল কি করে? সব কি সাজানো ব্যাপার নাকি?

সোমা কিছুই বলতে চায় না, কিছুই জানতে চায় না। কিন্তু ছটফটানি বাড়ছেই—বাড়ছেই তার।

ট্রানজিস্টার হাতে বরুণ চক্রবর্তী এলো। আজ আর তাকে ধরে তাড়াতে পারল না সোমা। তার মুখখানা অস্বাভাবিক শুকনো দেখছে। চোখে মুখে আর্ত ছাপ।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিওতে নাকি আহত আত্মত্যাগী মানুষটার খবর জানানো হচ্ছে।

...রাত নটায় আবার একটা ঘোষণা ভেসে এলো। শুনে আগেই সোমা বিবশ ঝিমিয়ে উঠল।

...রোগীর অবস্থা এখনো মুমূর্ষু। কিন্তু এরই মধ্যে তার জ্ঞান ফিরেছিল। এরই মধ্যে কথা বলেছিল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি নাকি বলেছে, সে কোনো মহৎ কাজ করার জন্য ওভাবে ছুটে যায়নি। তার নিজের একটা রোগের তাড়নায় ও ভাবে গিয়ে কাঁপিয়ে পড়েছে। ছেলে দুটোর উদ্দেশ্য বোঝা মাত্র সে পুলিসটার দিকে তাকিয়েছে। তক্ষুনি সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তাকে ঘিরে তার পরিবার আর ছেলেমেয়েরা হাহাকার করে কাঁদছে—এরপর কি হবে তাদের সেই অনিশ্চয়তার হাহাকার। সেই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ে পারেনি।

কেবারে আরো বলছে, বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক একযোগে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন এই মহৎ মানুষটাকে জীবনের পথে নিয়ে আসতে। রোগীর প্রাণশক্তি অপরিসীম—এটুকুই তাদের ভরসা।

...বরুণ উঠে চলে গেছে একসময়। ট্রানজিস্টারটা রেখে গেছে। কিন্তু ওটা জ্বলে আছে।

...রাত বাড়ছে। সোমা বিছানায় গা ঠেকাতে পারছে না। উঠছে, বসছে, শুচ্ছে।

...এক বড়লোক নাতনির বিয়েতে আড়াই হাজার টাকা দিয়েছিল। কিন্তু ওই মেয়ের মাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। বুড়ী সোমাকে আদর করে বলেছিল, তোমার জন্ম-জন্মের ভাগ্যি গো মা এমন ভোলানাথ পেয়েছ—ও যতো দেবে তোমার দু হাত ততো ভরে উঠবে।

ওই রোগের তাড়নায় আড়াই হাজার টাকা দিয়েছে। ওই রোগের তাড়নায় অমনা চুরি করে বাঁধার মানুষের সেবা চিকিৎসা করেছে। ওই রোগের তাড়নায় মিথ্যে মলে চাকরি নিয়েছে। ওই রোগের তাড়নায় অনেক-অনেক কিছু করেছে।

...একের পর এক মিথ্যে ধরা পড়ছে। চাকরি মিথ্যে, নগদ টাকা মাইনে মিথ্যে, এম এস-সি পাশ মিথ্যে, বহুরূপ চক্রবর্তীর বি-এ ফেল মিথ্যে। কিন্তু সব মিথ্যে ধরা পড়ার পরেও আগাগোড়া এক কথাই বলেছে, তোমার জন্যে—সব তোমার জন্য করেছি। নইলে তোমাকে পেতাম না।

সকলের বিরূপ হলে করেছে সোমা তখন তাকে। সে শুধু বলত তুমি ঘৃণা করো না তুমি শুধু সঙ্গ দিয়ো। কিন্তু সোমা শুধু ঘৃণাই করেছে।

ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। ও হাসপাতালে যাচ্ছে রোগী দেখতে। সঙ্গে ছেলেও আছে। ছেলেকে সোমা নবেন্দুপুর থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের কাছে রেখেছে। রোগীর অবস্থা ভালোর দিকে। ছেলেকে দেখে মানুষটা অবাক। জিজ্ঞাসা করল, নবেন্দুপুর থেকে ওকে নিয়ে এলে নাকি?

সোমা বলল, হ্যাঁ নিজের কাছেই রাখব।

সে বলল, নিজের কাছে রাখলে ও মানুষ হবে কি করে? আমার মতো হয়ে যাবে?

সোমা বলল, তোমার মতো যাতে হয় সেই কনেই নিয়ে এসো।

ঘুম ভেঙে গেল। ঘরময় ঝকঝকে রোদ্দুর। খোলা জানলা দিয়ে ঝলমলে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সোমা উঠল। বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হল। তিনতলা থেকে নীচে নেমে এসে দেখল, বাবা মা কেউ নেই।

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — অমৃতের কল্প কাহার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১২১৫ আপার সার্কুলার রোড, কলি-২৫ এবং ৫০ বে স্ট্রীট, কলি ৬

হেড অফিস : ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

উপহার প্রতীক্ষায় আছে সোমা। বাঁশি দেখে টানা স্টার্ট দিল। অন্যের প্রথমেই মোদীর প্রশ্ন। বাসটা নির্বিঘ্নে কেটে যাবে তো? চিকিৎসকরা দুজনেই। মোদীর জ্ঞান আছে সম্পর্ক এটুকুই ভদ্রতার কথা।

সোমা ট্রানজিস্টার বন্ধ করে আন সেবে নিল। বাথরুম থেকে বেরুতেই দেখে বাঁশি ভটচায বসে আছে উৎকণ্ঠিত মুখে। তার হাতে মস্ত খাম একটা।

ওকে দেখেই বাঁশি বলে উঠল, বউদি গো, তুমি এখনো চোখে না আমাকে দেখতে, এখনো মানুষটাকে চিনতে না তুমি? এখনো রাগ তোমার?

সোমা চেয়ে আছে তার দিকে।

কান্নায় ভেঙে হাতের খাম থেকে মস্ত একটা কাগজ বার করে বাঁশি বলল, এই দেখো—তোমার জন্যে আমরা কি সাংঘাতিক মতলব এঁটে বসেছিলাম। এটা পঞ্চাশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সের পলিসি— তুমি এর নমিনি। এক বছরের একটা প্রিমিয়াম একবার দিয়ে রেখেছি। এক বছর বাদে আমরা কেউ ইনসিওরেন্সের পুরো টাকা পাওয়ার আগে এই কাণ্ড করে বসেছি। এক বছর পার হলেই আমরা তবে এ-টাকা তোমাকে পাইয়ে দিই। আমাকে বলল, ডাক্তার মানুষ এ-পাপ থেকে রক্ষা করল, এর পরের প্রো আগেই সোমা এ-টাকা পেয়ে যাবে— পলিসিটা আমার বাক্স থেকে বার করে নিয়ে আজই সোমার হাতে দিবি। আর তাকে ছেলের জন্য বা নিজের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

সোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারকয়েক কেঁপে উঠল থর থর করে। একটা ঝড় আসছে। এখন সে বুঝতে পারছে— সব বুঝতে পারছে। একটা ঝাপসা সমুদ্র বুক ঠেলে তারই দিকে ধেয়ে আসছে তার কিন্তু চোখে পড়ে না সে-কান্না মুখে আসছে না।

সোমা বাঁশির দিকেই চেয়ে আছে।

—তুমি এখনো জানতে কি না জানতে বউদি যাবেনা। আমি তোমাকে সাবধান করে দেবার কেউ এলাম।

ছোট রাতের সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল সোমার হঠাৎ। আর একটিও বিন্দু ফিকার স্বপ্ন দেখেছিল একটা। কিন্তু ওটা বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। আজকের স্বপ্ন তার থেকে ঢের বেশি সত্য, তার থেকে ঢের বেশি জোর এর। মনের ভিতরে নিশ্চিত বিশ্বাস জমার একটা। ... মিছে হতে পারে না. আর কোনো অঘটনই ঘটতে পারে না। পারে না পারে না পারে না।

বলল মাকে, একটু অপেক্ষা করো। কেঁদ না। ভয় পেও না।

তার হাত থেকে খামসুদ্ধ পলিসিটা নিয়ে ঘরে ঢুকল ও। বিছানার ওপাশেই ফেলে রাখল এক মিনিট। মায়ের দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক করে নিয়ে আবার সামনে দাঁড়াল ও ভটচায মাসিটা তা তখনি।

বাঁশি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চিঠিটা তুলে নিয়ে খাম থেকে সিগারেট কেটে বার করল সোমা। এবার তার ভাঁজ খুলল না। পরিপাটি করে কাগজটা সিগারেটে টিপ সরল। চিঠিটা মোড়া করে সাবধানে ধরাল। প্রথম টানটা মধুর।

সিগারেট পুড়তে পুড়তে আঙুলের নিজেকে দেখছে সোমা।

স্বপ্ন মিথ্যে হবে না। আজই বিকেলের মধ্যে নবেন্দুপুর থেকে ছেলেকে নিয়ে আসবে।

...ছেলেকে দেখে মনুকাকা অবাক হবে। জিজ্ঞাসা করবে, নবেন্দুপুর থেকে ওকে নিয়ে এলে নাকি?

...সোমা বলবে, হ্যাঁ নিজের কাছেই রাখব।

...সে বলবে, নিজের কাছে রাখলে ও মানুষ হবে কি করে? আমার মতো হবে বলছো?

...সোমা বলবে, তোমার মতো যাতে হয় সেই কনেই নিয়ে এলাম।

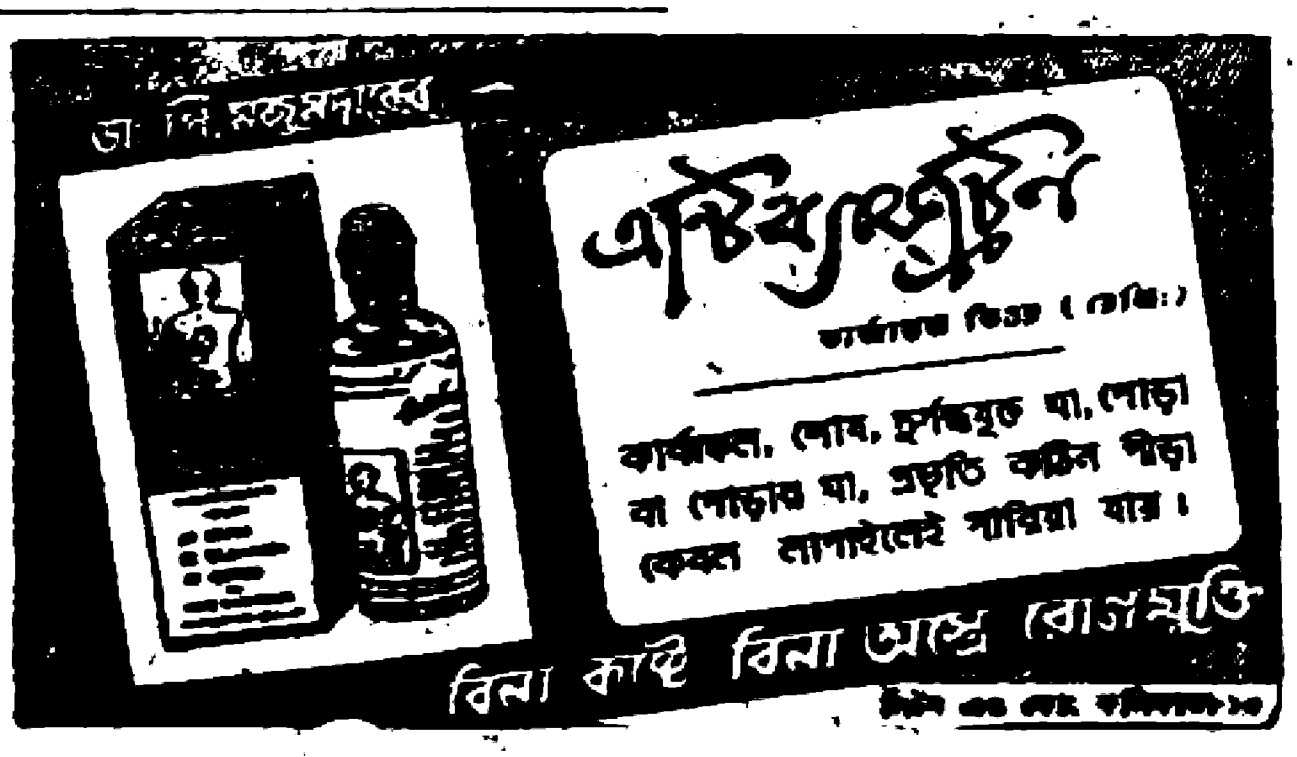

অমৃত পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লি-এর পক্ষে ইন্দুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলি- [৬ হইতে ৭, হইতে মুদ্রিত ও ১৯৫/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এ কলপ গড়িয়ে ছড়িয়ে যায়না

নতুন ট্রু-টোন জেল

চুলে সমানভাবে কলপ লাগানোর সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট উপায়, কারণ ট্রু-টোন জেল জেলির মত ঘন।

এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন—
হে.কে. হেলীন কার্টিস,
বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

ভাই আর ডেভেলপার মেশানোর পর ট্রু-টোন জেল গাঢ় হয়ে যায় বলে চুল থেকে গড়িয়ে পড়েনা...আর একেবারে চুলের গোড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে যায় বলে চুলের রঙ স্বাভাবিক লাগে। চুলের যত্নের ব্যাপারে অগ্রণী মার্কিন কোম্পানী হেলীন কার্টিস-এর অভিজ্ঞ কারিগরীর সাহায্যে তৈরী।

* ট্রু-টোন কলপ একেবারে তরলও পাওয়া যায়

বিনামূল্যে
রবারের গ্লাভস্
এই বিশেষ উপহার স্টক ফুরোনো পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ট্রু-টোন জেল-এও হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো রয়েছে!

পূর্ব ভারতের পরিবেশক : জি. এথারটন এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

everest/39 JKH-bn

Regd. No. WB/NC-13
Gram AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 9th May, 19
Phone 55-5231 (14 lines)

14 MAY 1975

IBM/KCD-75